সপ্তরিপু

রবিন জামান খান

সপ্তরিপু

রবিন জামান খান

একটি বইরাগ পাবলিকেশন উদ্যোগ

প্রথম ই-বুক প্রকাশ – ডিসেম্বর, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব – রবিন জামান খান এবং বইরাগ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ- ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী

প্রকাশক – বইরাগ পাবলিকেশন, কলকাতা

www.boiraag.in

contact@boiraag.in

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য যে কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। উপরোক্ত কারণগুলি লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গল্পটা কোন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের নয়, কিংবা ইতিহাসের বুকে লুকিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর কোন সত্যেরও নয়- যা প্রকাশ পেলে পাল্টে যাবে ইতিহাসের গতিপথ। বরং গল্পটা একজন ডিমোশন পাওয়া পুলিশ অফিসারের। একদিকে পারিবারিক বিপর্যয় অন্যদিকে ডিমোশন পেয়ে ক্যারিয়ারের যখন বারোটা বেজে গেছে এমন সময় অদ্ভু¢ত এক কেসের দায়িত্ব এসে পড়ে ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশারের ওপরে। ময়মনসিংহ শহরের পরিত্যক্ত এক পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার হয় একটি পুরনো গাড়ি, সেটার ভেতরে একজন মানুষের লাশ। এই ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ধার করতে গিয়ে বাশার যখন দিশেহারা তখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সাংবাদিক জুয়া সরকার। অন্যদিকে তাদের সাথে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে আর্কিওলজিস্ট রিফাত মজুমদার। ঘটনার পরিক্রমায় তারা জানতে পারে বর্তমান সময়ের এই অদ্ভুত রহস্য সমাধান করতে হলে তাদেরকে ডুব দিতে হবে অতীতের এক অন্ধকার সময়ে, যখন ভারতবর্ষের বুকে বিচরণ করে বেড়াত হিংস্রতম খুনে ডাকাতের দল, ইতিহাসে যারা ‘ঠগী’ নামে পরিচিত। বৃটিশ অফিসার ক্যাপ্টেন জেমস ম্যাকফি আর ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশারের সাথে আপনাদেরকেও ঠগী’র অন্ধকার ভুবনে নিমন্ত্রণ।

সূচিপত্র

পূর্বকথা

প্রথম অংশ: ছন্দপতন

অধ্যায় দুই

অধ্যায় তিন

অধ্যায় চার

অধ্যায় পাঁচ

অধ্যায় ছয়

অধ্যায় সাত

অধ্যায় আট

অধ্যায় নয়

অধ্যায় দশ

অধ্যায় এগারো

অধ্যায় বারো

অধ্যায় তেরো

অধ্যায় চোদ্দ

অধ্যায় পনেরো

অধ্যায় ষোল

অধ্যায় সতেরো

অধ্যায় আঠারো

অধ্যায় উনিশ

অধ্যায় বিশ

অধ্যায় একুশ

অধ্যায় বাইশ

অধ্যায় তেইশ

অধ্যায় চব্বিশ

দ্বিতীয় অংশ: মৃত্যুহরণ

অধ্যায় পঁচিশ

অধ্যায় ছাব্বিশ

অধ্যায় সাতাশ

অধ্যায় আটাশ

অধ্যায় উনত্রিশ

অধ্যায় ত্রিশ

অধ্যায় একত্রিশ

অধ্যায় বত্রিশ

অধ্যায় তেত্রিশ

অধ্যায় চৌত্রিশ

অধ্যায় পয়ত্রিশ

অধ্যায় ছত্রিশ

অধ্যায় সাইত্রিশ

অধ্যায় আটত্রিশ

অধ্যায় উনচল্লিশ

অধ্যায় চল্লিশ

অধ্যায় একল্লিশ

অধ্যায় বিয়াল্লিশ

অধ্যায় তেতাল্লিশ

অধ্যায় চুয়াল্লিশ

শেষকথা:

লেখক পরিচিতি

পূর্বকথা

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

ফোর্ট উইলিয়াম, কোলকাতা

তলোয়ারের চকচকে ফলাটা যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে।

উইলিয়াম হেনরি স্লীম্যান প্রহরীর উল্টো করে ধরে থাকা তলোয়ারের ফলাটার দিকে এমনভাবে দিকে তাকিয়ে আছে যেন ওটার ওপরেই নির্ভর করছে তার জীবন-মরণ। দূর থেকে তার তাকিয়ে থাকার ভঙ্গি দেখলে যে-কেউ এমনটাই ভাববে।

তবে সত্যি কথা হলো হেনরি স্লীম্যান মোটেই এমনকিছু ভাবছে না। সে এমনকি দেখছেও না ফলাটা, শুধু তাকিয়েই আছে। তার মন জুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আসন্ন বিপজ্জনক সাক্ষাৎকার। যেটার জন্যে ভোপালের নর্মদা এলাকা থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাকে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে কোন দাপ্তরিক কাজের উদ্দেশ্যে তাকে ডাকা হয়নি। কারণ সেরকম কোন উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠালে এভাবে ডাকা হোত না। সে-ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে ডাকা হোত। সেটা যেহেতু হয়নি, তারমানে যে-উদ্দেশ্যেই তাকে ডাকা হোক না কেন সেটা ভালো কিছু নয়।

আসন থেকে উঠে গভর্নর জেনারেলের দপ্তরের বাইরে পায়চারি শুরু করলো সে। অস্থির লাগছে। স্থানীয় সরকারের অধীনে কর্মরত সর্বোচ্চ পদের লোকজন ডেকে পাঠিয়েছে তাকে। কিছুতেই বুঝতে পারছে না এভাবে ডেকে পাঠানোর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। গুরুতর কিছু না ঘটলে এভাবে ডেকে পাঠানোর কথা নয়।

গত কয়েক মাস ধরে খুব অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে সময় কাটছে হেনরির। এর পেছনে একটা বড় কারণও আছে। সে যদি ভুল না ভেবে থাকে তবে সেই নির্দিষ্ট বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্যেই ডেকে পাঠানো হয়েছে তাকে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে একদিক থেকে ব্যাপারটা ভালো, আবার অন্য দিক থেকে সেটা খুব খারাপও হতে পারে।

ভালো এই অর্থে, যে-ব্যাপারটা নিয়ে সে চিন্তিত সে-ব্যাপারটা কোম্পানির হাই কমান্ডের কানে দিতে পারলে এই ব্যাপারে সাহায্যও পেতে পারে। আর খারাপ এই অর্থে, সে যদি তাদেরকে পুরো ব্যাপারটা বোঝাতে না পারে তবে উল্টো ফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই মুহূর্তে তাদেরকে বোঝানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই সে। কারণ ব্যাপারটা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ঠ প্রমাণ সে এখনো সংগ্রহ করতে পারেনি।

ভাবতে ভাবতেই করিডর সংলগ্ন বড় জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো হেনরি স্লীম্যান।

ভারত উপমহাদেশের বুকে ইংরেজদের সর্ববৃহৎ স্থাপত্য ফোর্ট উইলিয়ামের সৌন্দর্য সবসময় বিমোহিত করে তাকে। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত স্থাপনাটার একদিকে নদী, অন্যদিকে কোলকাতা শহর। দুর্গের সামনেই বিরাট ময়দান। এই মুহূর্তে কোম্পানির সৈন্যরা প্যারাড করছে ময়দানে। ময়দানের একটা অংশ বিকেলে খুলে দেয়া হয় সাধারণ মানুষের জন্যে। ওই সময়টাতে কোলকাতা শহরের মানুষেরা মুক্ত হাওয়ার খোঁজে এখানে বেড়াতে আসে।

দুর্গ থেকে একটু দূরেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। হেনরির মনে পড়লো বছরকয়েক আগে সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে নর্মদা যাবার আগে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো তার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লাইব্রেরিতে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হেনরির মনে হলো ভারতবর্ষে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তনের পেছনে এই দুর্গের প্রতিটি ধূলিকণার সম্পর্ক রয়েছে। এই দুর্গই ছিল ভারতের মাটিতে ইংরেজদের প্রথম শেকড়, যেটাকে তারা ভারতবর্ষের মাটির সবচেয়ে গভীরে পুঁতে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতে আসার পর অন্যান্য যেকোন অফিসারের মতো হেনরির প্রাথমিক সময়ও কেটেছে এই দুর্গে। এই দুর্গের সাথে তার আত্মার সম্পর্ক। আর এ-কারণেই ফোর্ট উইলিয়ামের প্রতি তার মুগ্ধতা, বিস্ময় আর ভালোলাগা সীমাহীন।

তবে এই দুর্গ হেনরিকে যতোটা না বিস্মিত করে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত করে তার স্বজাতি। হাজার-হাজার মাইল দূর থেকে জাহাজে ক'রে ভিন্ন এক ভূখন্ডে এসে ঁফে বুদ্ধি আর কূটনীতির বলে যেভাবে তারা পুরো

উপমহাদেশটা শাসন করছে সেটা বিস্মিতহবার মতোই বটে। আর এই বিরাট শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে মাত্র তিনটে দুর্গ থেকে।

কোলকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজ। এতো বিশাল ভূখন্ড, আর মাত্র তিনটে নিজস্ব স্থাপনা! তিনটে পরিচালনা কেন্দ্র! ভাবা যায়!

তবে বর্তমান সময়টা হেনরির পছন্দ নয়। যুদ্ধে বিদ্ধস্ত ভারতের মাটিতে কোম্পানি তার শাসনের শেকড় বিস্তারে রত। অন্যভাবে বলতে গেলে কোম্পানির বেশিরভাগ লোকজন লুটপাট আর শোষণে ব্যস্ত।

অন্যদিকে দিল্লীতে মোঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা তাদের ঘোলাটে রঙের সুরার মতোই ঘোলাটে আর দূর্বল। ভারতের সম্পূর্ণ দক্ষিণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে নিজামুদ্দিন বাহাদুর, তারও যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে। বক্সারের যুদ্ধ, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, সবশেষে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ডামাডোলে সবচেয়ে অসহায় আর নিপীরিত এখন সাধারণ মানুষ।

তাদের কেউই নেই। না আছে ভালোটা দেখার, না আছে মন্দটা দেখার। আর এ সুযোগেই...মনের কথা মনেই রয়ে গেল, সাদা কুর্তা আর লাল পাগড়ী পরনে আর্দালি এসে জানালো ভেতর থেকে বড় সাহেবরা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সাথে-সাথে হেনরির শরীর টান-টান হয়ে গেল। মাথায় বেরেট পরে নিয়ে হাতের কাগজগুলো ঠিক করে দৃঢ় পদক্ষেপে নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে রওনা দিলো সে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বড় ক'রে দম নিয়ে সে আর্দালিকে ইশারা করলো পথ দেখানোর জন্যে। আর্দালি সামান্য টোকা দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে দরজাটা মেলে ধরলো।

কক্ষটার ভেতরে ঢুকেই পলকে একবার ভেতরের পরিস্থিতি দেখে নিলো হেনরি। বিরাট কামরাটার মাঝামাঝি বড়-বড় দুটো টেবিল পাতা। সেগুলোর পেছনে তিনজন মানুষকে বসে থাকতে দেখলো সে। তাদের সামনে থাকা টেবিল দুটো পরিষ্কার করছে আর্দালিরা।

এখন বৈকালিক চা-পানের সময়। নিশ্চই তারা এতোক্ষণ চা পান করছিল যে-কারণে তাকে ভেতরে ডাকতে দেরি হয়েছে।

হেনরি আরেকবার নিশ্চিত হয়ে গেল তাকে ভালো কোন উদ্দেশ্যে ডেকে আনা হয়নি। তাই যদি হোত তবে তাকে চা পানের সময়েই ভেতরেই ডাকা

হোত। এটা অনেক পুরনো ব্রটিশ কেতা।

হেনরি ভেতরে ঢুকলেও কোন কথা বললো না। কারণ কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের ভেতরে আলোচনা করছে, আর আর্দালিদের উপস্থিতিতে কথা শুরু করাটা কোন অফিসারের জন্যে শোভনীয় নয়। হেনরি অপেক্ষা করতে লাগলো।

এরই মধ্যে সে টেবিলের অন্যপাশে বসে থাকা মানুষ তিনজনকে পর্যবেক্ষণ করে নিলো এক দফা। তিনজনের ভেতরে একজন তার খুবই পরিচিত। বলা চলে বৃটিশ ভারতে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, কর্নেল গ্রেগরি। উনি বসে আছেন মাঝখানে। কর্নেল গ্রেগরির বামে বসা মানুষটিকেও চিনতে পারলো সে। ফোর্ট উইলিয়ামসহ এই বাঙ্গাল প্রদেশের অধিকর্তা জেনারেল এডগার। তার সাথে হেনরির খুব খাতির না থাকলেও পরিচয় আছে ভালোই। তবে সে অবাক হলো অন্য মানুষটিকে দেখে।

এই মানুষটি কর্নেল গ্রেগরির ডানে বসে আছে। এই মুহূর্তে সে তার পাইপ ধরাতে ব্যস্ত। হেনরি এই মানুষটাকে দেখে অবাক হলো কারণ তার পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব ওপর-মহলের কেউ হবে। তবে হেনরি তাকে চিনতে পারলো না। আর এটাই তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। এই অঞ্চলের সব বড় অফিসারদেরকে সে চেনে, তবে এই মানুষটি চিনতে পারছে না কেন।

সদ্য ইংল্যান্ড থেকে এসেছে এরকম কেউ? কিন্তু মানুষটার রোদে পোড়া বাদামী চামড়া তো সে-কথা বলে না।

“শুভ বিকেল, স্যার,” আর্দালিরা চলে যেতেই মাথা থেকে টুপি খুলে পরিষ্কার বৃটিশ উচ্চারণে বলে উঠলো হেনরি। উদ্দেশ্য দুটো; সম্বোধন করা, সেইসাথে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়া।

“শুভ বিকেল, মিস্টার স্লীম্যান,” বলে উঠলো কর্নেল গ্রেগরি। তার কথা শুনে হেনরি একটু অবাক হলো। কর্নেল সাধারণত তাকে উইলিয়াম নামে ডাকে। যদি তাকে দাপ্তরিক কাজে নাই ডেকে পাঠানো হয় তবে এই আনুষ্ঠানিক নাম বলার কারণ কি। “বসুন, প্লিজ।”

হেনরি দেখলো টেবিল দুটো থেকে খানিকটা সামনে একটা চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। সেটাতেই বসলো সে। তার কাছে মনে হলো চেয়ারের নরম গদিতে কেউ যেন গেঁথে ফেললো তাকে। মে মাসের গরমে এমনিতেই

উত্তপ্ত চারপাশ, মাথার ওপরে দুলতে থাকা টানা পাখার বাতাস শুধুমাত্র টেবিলের ওপাশে বসা লোকজনের ওপরেই যা একটু প্রবাহিত হচ্ছে। গরমে সিদ্ধ হতে থাকা হেনরি অস্বস্তির সাথে অনুভব করলো তার পিঠের চামড়ার ওপরে একদিকে গড়াতে থাকা ঘামের ¯্রোত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, অন্যদিকে শিড়দাড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠান্ডা ¯্রোত ওপরের দিকে উঠে আসছে।

“মিস্টার স্লীম্যান, কেমন আছেন আপনি?” বলে উঠলো কর্নেলের বামে বসা জেনারেল এডগার। তার ইংরেজিতে সামান্য আইরিশ টান। উচ্চারিত শব্দগুলো শেষদিকে এসে অদ্ভুতভাবে বেঁকে যায়। হেনরির জানা আছে জেনারেল এডগারের পূর্ব পুরুষেরা আইরিশ।

“জি, স্যার। ভালো আছি। ধন্যবাদ।”

“আপনার এলাকা নর্মদার অবস্থা কেমন এখন? কিছুদিন আগেও নাকি স্থানীয় তল্পিবাহকদের সাথে আইনের লোকজন আর টোলঘরের কর্মচারিদের সমস্যা হয়েছিল?”

“স্যার, ওটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। স্থানীয় সরকারের শাসনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই,” কথাটা বলতে পেরে একটু হলেও সুস্থির লাগলো, কিন্তু মনের ভেতরে সে জানে এসব আলতু-ফালতু কথা। মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে ভণিতা মাত্র।

“তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আপনার নর্মদা এলাকায় এই মুহূর্তে পরিপূর্ণ শান্তি বজায় আছে?” কর্নেল গ্রেগরি তাকে সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলো।

“স্যার...” হেনরি কথা শুরু করার আগেই কর্নেলের ডানে বসা মানুষটা তাকে থামিয়ে দিলো। ব্যাপারটা খুবই অবাক করলো হেনরিকে। কারণ এটা বৃটিশ কেতার একেবারেই বাইরে। একজন জেন্টেলম্যান কখনোই আরেকজন জেন্টেলম্যানের কথার মাঝখানে কথা বলবে না। এরকম আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে তো একদমই নয়।

“আপনি সেনাবাহিনী ছাড়লেন কেন?” পাইপের ভেতর থেকে নির্গত ধোঁয়ায় তার চেহারা প্রায় অন্ধকার হয়ে থাকলেও লোকটার কথা শুনে বেশ চমকে উঠলো হেনরি। মানুষটার কথা বলার ভঙ্গি খুবই অদ্ভুত। প্রতিটি শব্দের শুরু যেন বিকৃত। মানুষটা এতোক্ষণ কোন কথা বলেনি কিন্তু কথা বলার

সাথে সাথে তাকে চিনতে পেরেছে হেনরি। পুরো বৃটিশ ভারতে একজন মানুষই এভাবে কথা বলে। আর একারণে তার একটা বিশেষ নামও আছে। ‘তোতলা কর্নেল’। তবে এই নামের চেয়ে অন্য একটা নামেই সে বেশি পরিচিত। সে নামটা হলো ‘দক্ষিণের কষাই’। সাম্প্রতিক সময়ের যুদ্ধে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে এই নামটা অর্জন করেছে সে।

এই তাহলে সেই দক্ষিণের কষাই ‘তোতলা কর্নেল’, মনে-মনে ভাবলো হেনরি। যে প্রশ্নটা তাকে করা হয়েছে সেটার জবাব গুছিয়ে নিয়ে শুরু করলো ও,“স্যার, আমার আসলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যপনা করার ইচ্ছে ছিল। সে-কারণেই সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছিলাম কিন্তু স্যার গ্রেগরি চাননি আমি দাপ্তরিক কাজ থেকে বিরতি নিয়ে পুরোপুরি শিক্ষক বনে যাই। যে-কারণে উনিই আমাকে নর্মদা ও সগর এলাকায় গভর্নরের জুনিয়র অ্যাসিটেন্ট হিসেবে কাজ করতে বলেন।”

“আপনি কতোদিন যাবৎ সেখানে কাজ করছেন?” আবারো তোতলা সুরে জানতে চাইলো দক্ষিণের কষাই। লোকটার ভয়ঙ্কর অবয়ব আর হাস্যকর গলার স্বরের মধ্যে অদ্ভুত এক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই অসামঞ্জস্য বাকিদের ওপরে খুবই বাজে প্রভাব সৃষ্টি করে। যে-বাজে প্রভাবে হেনরি এই মুহূর্তে ভুগছে।

“স্যার, দুই বছরের ওপরে,” যতোটা সম্ভব অস্বস্তি কাটিয়ে শান্ত স্বরে জবাব দেয়ার চেষ্টা করলো সে।

“দাপ্তরিক হিসেব অনুযায়ী বলতে গেলে দুই বছর সাত মাস,” তোতলাতে তোতলাতে বলে উঠলো দক্ষিণের কষাই। “আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আপনি যখন ওখানে গেলেন তখন ভারতবর্ষের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল অনেক খারাপ কিন্তু আপনার এলাকা নর্মদা ও সগরের অবস্থা ছিল সবদিক থেকে ভালো। কিন্তু গত এক বছরের অধিক সময় ধরে আপনার এলাকার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে,” বলে সে হেনরির দিকে তাকিয়ে ভ্রু উঁচু করে জানতে চাইলো। “ব্যাপারটা কি?”

“স্যার, খারাপ বলতে আপনি আসলে কী বোঝাচ্ছেন? নির্দিষ্টভাবে বললে আমার জন্যে বুঝতে সুবিধে হোত,” হেনরি অনুভব করতে পারছে তার চারপাশ থেকে জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে। একটু পরেই আটকা পড়বে সে।

কাজেই সেও শক্ত হবার চেষ্টা চালালো, যাতে সময় এলে গুটিয়ে আসতে থাকা জাল ছিড়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

“রিপোর্ট অনুযায়ি যদি আপনার রেকর্ড নিরীক্ষা করে দেখা হয় তবে প্রথমেই বলা যেতে পারে খাজনা আদায়ের ব্যাপারটা...”

“কিন্তু স্যার, সেটা তো সরাসরি আমার অধীনে নয়,” অসহায়ভাবে কর্নেল গ্রেগরির দিকে তাকালো সে। কর্নেল তাকিয়ে আছে তোতলার দিকে।

“হ্যা, আমি জানি খাজনা আদায়ের ব্যাপারটা সরাসরি আপনার অধীনে নয় কিন্তু সেটা আপনার এলাকারই ব্যাপার। এখানে দেখা যাচ্ছে খাজনা আদায়ের পরিমাণ যেখানে বৃদ্ধি পাবার কথা ছিল, সেখানে গত এক বছর ধরে আগের চেয়ে সেটা আরো কমে গেছে। আর আপনার অধীনে কর্মরত লোকজনের জবানীতে জানা গেছে আপনি তাদেরকে এই ব্যাপারে সহায়তাও করছেন না...”

“স্যার, গত বছর খরার কারণে...”

“ঠিক আছে, সেটা বাদ দিন,” বলে সে পাইপ থেকে টেনে নিয়ে ক্রমাগত ধোঁয়ার কুন্ডলী ছাড়তে ছাড়তে বলে চললো। “আপনার এলাকায় গত ছয় মাস ধরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি তো হচ্ছেই। সেই সাথে দাপ্তরিক সব কাজেও গাফিলতি দেখা দিয়েছে। অন্তত আপনার অধীনে কর্মরত প্রত্যেকে এমনটাই বলছে।”

হেনরি কোন জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল। এবার সময় উপস্থিত। “স্যার, কী বলেছে আমার অধীনে কর্মরত লোকজন?” বাক্যের শেষ অংশটুকু সে খুব কঠিন স্বরে উচ্চারণ করলো।

“তারা বলেছে,” কর্নেল গ্রেগরি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে তোতলা কষাই বলে উঠলো। “আপনি নাকি নিজের কাজ কর্ম সব বাদ দিয়ে কাদের পিছু নিয়ে বেড়াচ্ছেন। সত্যি কথা হলো এ-ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই ডেকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে। ব্যাপারটা আসলে কি, আমরা আপনার মুখ থেকে সেটা জানতে চাই।”

তিনজনেই তাকিয়ে আছে হেনরির দিকে।

বড়কর্তাদের কাঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে বড় ক'রে একবার নিঃশ্বাস নিলো হেনরি। সময় উপস্থিত, হয় এসপার আর না হয় ওসপার।

"স্যার, আপনরা যা শুনেছেন সেটা পুরোপুরি ভুল নয়। আমি সত্যি-সত্যি সংঘবদ্ধ অপরাধিদের একটি চক্রকে সনাক্ত করার চেষ্টা করছি।"

"সংঘবদ্ধ অপরাধি বলতে কি বোঝাচ্ছেন আপনি?" কষাইয়ের প্রশ্ন।

"এরা কি ডাকাত?" তার সাথে যোগ করলো জেনারেল এডগার।

"না স্যার, এরা ডাকাত নয়," একবাক্যে জবাব দিলো হেনরি। "যদিও পথিকদের সর্বস্ব লুট করাই এদের উদ্দেশ্য তবু এরা ডাকাত নয়। এরা আরো অনেক বেশি কিছু।"

"এর মানে কি, মিস্টার স্লীম্যান? একবার বলছেন পথিকদের সর্বস্ব লুট করাই এদের কাজ। আবার বলছেন এরা ডাকাত নয়। সঠিক জবাব দিন।"

"স্যার, আমি যাদের কথা বলছি এরা ডাকাত নয়। এরা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর আর সংঘবদ্ধ একটা গোপন সংঘের মতো। আমি এখনো এদের ব্যাপারে খুব বেশি জানতে পারিনি কিন্তু যতোটুকু শুনেছি তা খুবই ভয়ঙ্কর," হেনরি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। "স্যার, আমার গবেষণা যদি সঠিক হয় তবে বলা চলে প্রতি বছর ভারতবর্ষের পথ-প্রান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়া মানুষদের একটা বড় অংশকে এই সংঘবদ্ধ খুনিরা গায়েব করে, স্যার।"

"কে কোথা থেকে হারিয়ে যায়, সেটা বিবেচনা করার আপনি কে? ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। এখানে শত-শত মানুষ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, আবার ফেরতও আসে। এ আর নতুন কি?"

"না স্যার, এরা বাড়ি থেকে পালানো কিংবা বনে-জঙ্গলে বাঘে খেয়ে ফেলা মানুষ নয়," বলে সে নিজের হাতের ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করে পড়তে শুরু করার আগেই আবারো তাকে থামিয়ে দিলো একজন।

"আপনি যাদের কথা বলছেন এরা কি আপনার এলাকায় অবস্থান করে?"

"না স্যার, আমি আপনাদের এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি। এরা পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। আমার হিসেব মতে এই গোপন সংঘ প্রতি বছর

ভারতবর্ষের পথ-প্রান্তর থেকে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মানুষ খুন করে তাদেরকে গায়েব করে ফেলে।”

হেনরির কথাটা শেষ হওয়ামাত্র মুহূর্তের জন্যে নিরবতা ঝুলে রইলো কক্ষে। তারপর যেন ছোটখাট একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো।

তিন বড়কর্তা নড়েচড়ে উঠে একে অপরের দিকে তাকালো। “আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন নাকি?” উত্তেজনার চোটে জেনারেল এডগার দাঁড়িয়ে গেছে। “কর্নেল গ্রেগরি, আপনার এই অফিসার কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? কী বলতে চাইছে সে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসনরত অবস্থায় প্রতি বছর বিরাট এক সংঘবদ্ধ অপরাধি দল হাজার-হাজার মানুষ খুন করছে আর এদের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই আমাদের কাছে। এমনকি অমাদের কোন ধারণাও নেই এই ব্যাপারে। কী বলছে, সে এসব! এসব কথা যদি ইংল্যান্ডের রাজ দরবারের লোকজন জানতে পারে তারা কোম্পানির শাসনের ব্যাপারে কী ভাববে! আপনার অফিসার পাগল হয়ে গেছে।”

“অফিসার স্লীম্যান, আপনি যা বলছেন সেটা কতোটুক সত্যি?” কর্নেল গ্রেগরিই এখনো একটু শান্ত আছেন।

“স্যার, আমার কথা পুরোপুরি সত্য,” স্যার গ্রেগরের শান্ত ভাবটা যেন হেনরির ভেতরেও প্রবাহিত হচ্ছে।

“আপনি বলছেন এই সংঘবদ্ধ অপরাধিদের ব্যাপারে কোম্পানির কোন ধারণাই নেই, তবে আপনি কিভাবে জানতে পারলেন এদের কথা?”

“স্যার, ব্যাপারটা আমি প্রথম পড়েছিলাম ফরাসী পর্যটক থিভেনটের এক ভ্রমণ কাহিনীতে। সে তার ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা করেছে; পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে নাকি একটি অদ্ভুত গোত্র ছড়িয়ে আছে যারা...”

“হাহ্! এক পাগল ফরাসী মাতাল হয়ে উল্টোপাল্টা কী-সব লিখে গেল আর আপনি তার কথা পড়ে এসব প্রলাপ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন,” জেনারেল এডগারের চোখের দিকে তাকিয়ে হেনরি অনুভব করলো, ইংরেজ আর ফরাসিদের মাঝের শতবর্ষব্যাপি বিরাজমান যুদ্ধের ঘৃণা এখনো এতোটুকু কমেনি। ইংরেজরা আজো ফরাসিদের একইরকম ঘৃণা করে।

“অবশ্যই না স্যার, আমি গত ছয় মাস ধরে এদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করার...”

“মিস্টার স্লীম্যান,” অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর তোতলা কষাই কথা বলে উঠলো। “আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে এদের অস্তিত্বের ব্যাপারে?”

“স্যার, আজ থেকে দু’বছর আগে চিতোরে দুটি দল ধরা পড়েছিল।”

“আমরা ওই দল দুটোর ব্যাপারে জানি। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল ওদের নিয়ে। সেটা মিটে যাবার পর ওদরেকে ছেড়ে দেয়া হয়।”

“স্যার, মাস কয়েক আগে দোয়াব জেলায় কুয়োর ভেতরে প্রায় বিশটির মতো মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওদেরকে...”

“মিস্টার স্লীম্যান, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? দোয়াবের ওই মৃতদেহগুলো মারাঠাদের সাথে যুদ্ধের পরবর্তী ফলাফল ছিল।”

“স্যার, ওদেরকে যেভাবে মারা হয়েছে মারাঠারা ওভাবে খুন করেনা। বরং...”

“আর কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে?” এবার কর্নেল গ্রেগরি সরাসরি প্রশ্ন করলো।

মাথা নিচু হয়ে গেল হেনরির। “না, স্যার। আমি এখনো তেমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি,” বলে সে মাথা উঁচু করে বললো। “স্যার, আমি এখনো তেমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি ঠিকই কিন্তু আমি জানি এই খুনে গোত্রের অস্তিত্ব আছে। ওরা কারা, ওদের ধর্ম কি? কিভাবে মানুষ মারে, কোথায় বসবাস করে সব আমি বের করে ফেলবো যদি...”

“কোন যদি নেই,” জেনালের এডগার তার সামনেই ফাইলটা বন্ধ করলেন। “মিস্টার স্লীম্যান, আপনাকে সরাসরি নির্দেশ করছি আমি। আপনি আজ থেকে এসব কিছু ভুলে গিয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিবেন। আপনি একজন সৎ ও যোগ্য অফিসার, সেটা প্রমাণ করে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করুন। পথে প্রান্তরে কে কাকে মারছে, কে কার মাল লুট করছে এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার কাজ নয়। আর আপনাকে পরিষ্কার বলে দেই, এমন কিছু করবেন না, বা বলবেন না যাতে ক’রে ইংরেজ রাজ পরিবারের কাছে কিংবা ইংল্যান্ডের দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদনাম হয়। এমনিতেই কোম্পানি আর রাজ দরবারের মাঝে বিদ্যমান জটিল সম্পর্কের

ব্যাপারে আশা করি আপনি অবগত আছেন। কাজেই নেটিভদের সামান্য কিছু ক্ষতির কথা বিবেচনা করে আমরা কোম্পানির মান-সম্মান ধূলোয় লুটাতে দিতে পারি না। অতএব, আজ থেকে এসব ভুলে নিজের কাজে মনোযোগ দিন।"

চুপ করে বসে রইলো হেনরি।

"আমার কথা বোঝা গেছে অফিসার?"

"জি, স্যার।"

"এখন বিদায় নিন।"

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে রওনা দিয়েও হঠাৎ কর্তাদের দিকে ফিরে তাকালো হেনরি। "স্যার, যদি আমি এদের অস্তিত্বের ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারি? যদি আমি প্রমাণ করে দিতে পারি ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার-হাজার ছদ্মবেশী খুনির দল। যাদের কাছ থেকে শুধু নেটিভরাই না এমনকি ইংরেজরাও নিরাপদ নয়, তবে কি হবে?"

তিনজনে নিজেদের ভেতরে ফিসফাস করে জেনারেল এডগার বলে উঠলো, "যদি আপনি মজবুত প্রমাণ নিয়ে আসতে পারেন, তবে এদেরকে দমন করার ব্যাপারে আপনাকে সার্বিক সহায়তা করা হবে। এখন আপনি বিদায় নিন।"

হেনরি কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এল গভর্নরের অফিস কক্ষ থেকে।

যদিও সে বড় কর্তাদের সামনে পুরো ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারেনি কিন্তু মনের গহীনে সে জানে ভয়ঙ্কর কিছু খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে। এদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তবে তার। এদের ব্যাপারে সব জানতে হবে।

সেইসাথে সম্ভব হলে ধ্বংস করতে হবে এই খুনে গোত্রকে।

প্রথম অংশ: ছন্দপতন

অধ্যায় এক

বর্তমান সময়

শানকিপাড়া শেষ মোড়, ময়মনসিংহ

সাঈদ আলী একটা ফালতু লোক।

এটা সে নিজে যেমন জানে, ঠিক তেমনি তার আশেপাশের প্রতিটা মানুষও জানে। প্রকৃতপক্ষে সাঈদ আলীর মতো লোকদেরকে ফালতু বলাটাও ঠিক না। কারণ এই ধরণের মানুষেরা ঠিক ফালতু না। এরা এক অদ্ভুত ধরণের ল্যালপা ধাঁচের মানুষ। আপনারা যারা 'ল্যালপা' শব্দটা ঠিক বুঝতে পারলেন না তাদেরকে বুঝিয়ে বলছি।

ময়মনসিংহের স্থানীয় ভাষায় 'ল্যালপা' একটা বিশেষণ। যে-বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট প্রকৃতির মানুষকে বোঝানো হয়ে থাকে। এক ধরণের মানুষ আছে যারা পৃথিবীর অনেক বিষয়েই অজ্ঞ ও ডাহা মূর্খ কিন্তু এরা একটা কাজ খুব ভালো পারে। সেটা হলো টাকা কামানো।

এইসব মানুষেরা পোশাক-আষাক ঠিকমতো পরবে না, সামাজিক কোন দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারবে না, সংসারের লোকজনের প্রতি এদের থাকবে চরম অবহেলা কিন্তু এরা টাকা কামাতে জানে। সেটা যেভাবেই হোক। এই ধরণের মানুষ যারা পারিবারিক-সামাজিক-মানবিক কোন কিছুরই ধার না ধেরে শুধুমাত্র টাকা কামাতে পারে, যাদের জীবনে শুধুমাত্র একটা শব্দই অর্থ বহন করে 'টাকা', এই ধরণের মানুষকে বলা হয়ে থাকে ল্যালপা।

ল্যালপা শব্দটার এই বিশেষ সংজ্ঞার সাথে একেবারে খাপে-খাপে মিলে যায় সাইদ আলীর জীবন। এক অর্থে বলতে গেলে তাদের পুরো পরিবারই এমন। ময়মনসিংহ শহরের গোলকিবাড়ি ও কাঁচিঝুলি এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি বলা চলে তাদের পরিবারকে।

সাঈদ আলীরা ছয় ভাই। সেই সাথে প্রত্যেক ভাইদের ছেলে-মেয়ে-নাতি সব মিলিয়ে বিশাল পরিবার তাদের। আর এই পরিবারতান্ত্রিক মাস্তানি দিয়ে এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখে তারা। মাফিয়ারা যেমন যেকোন

পরিস্থিতিতে পরিবারকে আগে প্রাধান্য দেয় সাঈদ আলীদের পরিবারও ঠিক একই কাজ করে। আর এই পরিবারকেন্দ্রিক মাস্তানি দিয়েই তারা সমাজের একেবারে নিচু স্তর থেকে উঠে এসেছে আজকের অবস্থানে। কন্ট্রাকটারি আর রিয়াল এস্টেট ব্যবসায় ময়মনসিংহ শহরে একচ্ছত্র আধিপত্য তাদের।

সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় সাঈদ আলীর দাদা রহমত আলী পকিস্তানের করাচি থেকে পরিবার নিয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে চলে আসে তৎকালীর পূর্ব পাকিস্তান মানে বর্তমান বাংলাদেশে। বেচারি ভাগ্যের অন্বেষণে এলেও ভাগ্য তাকে খুব বেশি সহায়তা করতে পারেনি। বরং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে সব হারিয়ে সে আর তার পরিবারের স্থান হয় ময়মনসিংহ শহরে।

এ'শহরেই বেড়ে ওঠে সাঈদ আলীর বাবা সাদেক আলী। চোখের সামনে নিজের বাপকে সব হারাতে দেখে ছোটবেলা থেকে সাদেক আলীর মনের ভেতরে বড়লোক হবার একটা বাসনা আসন গেঁড়ে বসতে থাকে। কিন্তু কিভাবে সেটা হবে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সে। কারণ না সে ছিল দেখতে সুন্দর, না ছিল তার মেধা। এটা নিয়ে মাঝেমাঝেই সে খুব গভীর ভাবনায় পড়ে যেত।

সাদেক আলী যখন বিশ বছরের পরিপূর্ণ যুবক তখনই একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু হবার পর তার বয়সী ছেলেরা যখন যুদ্ধে যেতে শুরু করে তখন সে যোগ দেয় শান্তি কমিটিতে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সাবধানে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয় সে।

সে ছিল আসলে শান্তি কমিটির চর। কোন বাড়ির ছেলে যুদ্ধে গেছে, কোন বাড়িতে মালিক অনেক সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে, কোন হিন্দু পরিবারকে মেরে তাদের সম্পত্তি দখল করা যাবে- এসব খবর শান্তি কমিটিতে পৌছে দিয়ে লাভের বখরা নেয়াই ছিল তার কাজ। এভাবেই লুকিয়ে-লুকিয়ে একাত্তরের যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসের ভেতরেই ভালো পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে ফেলে সে। এরপর যখন যুদ্ধের পরিস্থিতি উল্টোদিকে বইতে থাকে তখন সাদেক আলী বুঝে ফেলে পাকিস্তানী বাহিনী এদেশে আর বেশিদিন টিকবে না। সাথে সাথে সে ভোল পাল্টে আড়ালে আবডালে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শান্তি কমিটির ভেতরের খবর পাচার করতে থাকে।

ডিসেম্বরে যখন বিজয় মিছিল ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করে তখন সাদেক আলীকে দেখা যায় সেটার অগ্রভাগে। পুরো একাত্তর জুড়ে সে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানকারী পরিবারকে মেরে তাদের সম্পদ দখল করেছে। বহু হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে আর একাত্তরের পর দিয়ে বহু রাজাকারকে খুন করে তাদের সম্পত্তি দখল করে ওই বয়সেই সে রীতিমতো পয়সাওয়ালা হয়ে ওঠে।

একাত্তরের পর দিয়ে তার সব সম্পত্তির পাকা কাগজপত্র তৈরী করে গ্যাট হয়ে ব্যবসা শুরু করে দেয় সে।

এই সাদেক আলীর ঔরসেই জন্ম সাঈদ আলীর। তার বাবার দ্বিতীয় সন্তান সে। সাঈদ আলী জন্মের পরপরই যখন সে স্কুলে যেতে শুরু করে তার বাপ তখুনি বুঝতে পারে এই ছেলেকে দিয়ে পড়ালেখা হবে না। তাই মোটামুটি অক্ষর জ্ঞান হবার পরপরই তাকে স্কুল থেকে সরিয়ে পারিবারিক ব্যবসায় লাগিয়ে দেয় তার বাবা। সাঈদ আলী যখন সদ্য যুবক সময়টা তখন আশির দশকের শেষ ভাগ। ওই সময়ে সারা দেশে ডেভলাপারদের জোয়ার মাত্র শুরু হচ্ছে। ঢাকা শহরের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে বড়-বড় হাউজিং সোসাইটিগুলোর ছোঁয়ায়।

এমন সময় সাঈদ আলীর বাপ সাদেক আলী দারুণ একটা কাজ করে। সে নিজের কানেকশনের জোরে ছেলেকে ঢাকায় একটা বড় হাউজিং কোম্পানির চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়। সাদেক আলীর ইচ্ছে ছিল ছেলে বড় কোম্পানিতে কাজ করে হাতে-কলমে ডেভলাপার ব্যবসার খুটিনাটি শিখে আসুক। কারণ সেই সময় সাদেক আলী বুঝতে পেরেছিল, যে-উন্নয়নের ছোঁয়া এখন ঢাকায় লেগেছে দুদিন বাদে সেটা ঢাকা ছাড়িয়ে অবশ্যই অন্যান্য শহরগুলোতে লাগবেই। তখন যেন তারা ময়মনসিংহ শহরে এই ব্যবসার অধিনায়ক হতে পারে সেটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার উদ্দেশ্য শতভাগ কাজে লাগে।

বেশি শিক্ষিত না হলেও ছোটবেলা থেকেই ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকার কারণে সাঈদ আলী চাকরিতে ভালোই করতে থাকে, সেইসাথে শিখে নিতে থাকে ডেভলাপার ব্যবসার খুঁটিনাটি। কয়েক বছর চাকরি করার পর নব্বইয়ের দশকের দিকে সে ফিরে আসে ময়মনসিংহ শহরে। ততোদিনে তার অন্যান্য ভাইয়েরাও বড় হয়ে গেছে। নিজেরও বিয়ে হয়েছে। মেয়ে হয়েছে। তার বাপ ততোদিনে খুব বেশি বুড়ো না হলেও অসুস্থ হতে শুরু করেছে। বাপের পরামর্শে সে প্রথমেই নিজের পরিবারের দিকে নজর দেয়।

পরিবারের সবাইকে নিয়ে সে একটা শক্তিশালী দলের মতো তৈরী করে ফেলে। এরপর নজর দেয় ব্যবসার দিকে। এতোদিনে সে যা শিখে এসেছে তা কাজে লাগাতে শুরু করে।

ফলাফল খারাপ ছিল না। কখনো নরম, কখনো গরম পন্থায় সে পরবর্তী দশ বছরের ভেতরেই ময়মনসিংহ শহরে ডেভলাপার ব্যবসায় নিজের পরিবারকে এক নম্বর আসনে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। কাঁচিঝুলি গোলকিবাড়ি থেকে শুরু করে পন্ডিতপাড়া, শানকিপাড়াসহ আরো অনেক এলাকার বেশিরভাগ কাজই তার পরিবারের অধীনে চলছে। ইতিমধ্যে তার বাপ মারা গেছে। বাপ মারা যাবার আগে তাকে একটা অদ্ভুত অনুরোধ করে যায়।

তাদের বাড়ির খুব কাছেই শানকিপাড়া শেষমোড়ে হাইওয়ের একেবারে পাশে একটা বিরাট পুকুর আছে। শহরের ভেতরে মূল রাস্তার পাশেই এরকম একটা পুকুর থাকবে আর সেটার দিকে ডেভলাপারদের নজর পড়বে না, তা কি হয়! এই পুকুরটা বহুবছর আগে থেকে তার বাপ দখল করে কিছু একটা করতে চাইছিল কিন্তু পারেনি।

সাঈদ আলীর বাপ মারা যাবার সময়ে তাকে অনুরোধ করে যায় সে যেন এই ব্যাপারে কিছু একটা করে।

মৃত বাপের অনুরোধ সে ফেলেনি। বছর দুয়েক আগে বাপ মারা যাবার পর থেকেই সে চেষ্টা করে আসছিল এই জায়গাটার দখল নেয়ার কিন্তু পারেনি।

পারেনি কারণ জায়গাটার মালিক ছিল এক গোঁয়াড় বুড়ো। সরকারি ম্যানপাওয়ার অফিসের রিডায়ার্ড কর্মচারি এই বুড়োকে কিছুতেই বাগে আনতে পারেনি প্রভাবশালী সাঈদ আলী। প্রথমে স্বাভাবিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, টাকার লোভ দেখিয়েছে, কাজ হয়নি। এরপর দেখিয়েছে ভয়, তাতেও কাজ হয়নি। সবশেষে এমনকি পরিবারের লোকজনকে হাত করেও জমিটা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছে, তাতেও কাজ হয়নি। গত দুইটা বছর ধরে প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসে যাবার পথে পুকুরটা দেখতো আর বুড়োকে অভিশাপ দিতো সাঈদ আলী। অবশেষে তার সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বছরখানের আগে বুড়ো মানুষটা মারা গেলে নতুন উদ্যমে আবার জায়গাটা দখল করার চেষ্টা শুরু করে সে।

এবার বলতে গেলে প্রায় কোন কষ্টই হয়নি। বুড়োর একটাই মাত্র ছেলে, আর বড় মেয়ে। মেয়ে স্বামীর সাথে কানাডাতে সেটেল। বুড়োর মৃত্যুর পর

ছেলেকে বলা মাত্রই সে রাজি হয়ে গেছে। পুকুরের জায়গা বিক্রির টাকা দিয়ে সে ‘সপরিবারে’ কানাডায় চলে যাবার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

কাগজপত্র থেকে শুরু করে সব ঠিক-ঠাক করার পর সে পুকুরের জায়গাটা নিয়ে কাজ শুরু করবে এমন সময় আরেকটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা দেখা দেয়।

এই পুকুরের জমিটা নিয়ে যেন ঝামেলা পিছুই ছাড়ছিল না ল্যালপা সাঈদের। সে যেমন এই জমিটার পেছনে দীর্ঘদিন যাবৎ লেগে ছিল ঠিক তেমনি লেগে ছিল আরেকটা ডেভলাপার কোম্পানি। নিজে বেশি প্রভাবশালী হবার কারণে তাদেরকে টপকে সাঈদ আলী জায়গাটার দখল নিয়ে নেওয়াতে ওরা শত্রুতা শুরু করে। শত্রুতার ধরণটাও খুব অদ্ভুত। পুকুরের জমিটার ব্যাপারে সবকিছু ঠিকঠাক করে যেই সে কাজ শুরু করতে যাবে এমন সময় ওই কোম্পানির মালিক খুঁজে বের করে জমির কাগজপত্রে ঝামেলা আছে। কি ঝামেলা?

মারা যাওয়া বুড়ো লোকটা এই জমি যার কাছ থেকে কিনেছিল সেই লোক এই জায়গা পেয়েছিল ওয়ারিশ সূত্রে, মানে পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে। সেই ওয়ারিশের কিছু ঝামেলা ছিল। সত্যিকথা হলো বাংলাদেশে খুঁজতে গেলে বেশিরভাগ জমিতেই এইরকম কোন না কোন ঝামেলা আছে। এইগুলো কোন ব্যাপারই না। কিন্তু ঝামেলা করতে চাইলে ছোট্ট ব্যাপারই অনেককিছু হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অবশেষে বহু দেন দরবার করে বহু জায়গায় ঘুষ দিয়ে জায়গাটা নিজের করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে সে।

নিজের অফিসে বসে সাঈদ আলী ঘড়ি দেখলো। এগারোটার ওপরে বাজে। মনে-মনে পুকরের কাজের অগ্রগতির হিসেব করে ফেললো সে।

বেশ কয়েকদিন যাবৎই কাজের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। সে-কাজেরই অংশ হিসবে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি নিয়ে গতকাল রাতেই পুকুরের পানি সেচার জন্যে পাম্প মেশিন সেট করা থেকে শুরু করে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে। এই ধরণের জলাধারে কন্সট্রাকশনের কাজ করতে গেলে সাধারণত পানিতেই মাটি ফেলে পুকুর ভরাট করে কাজ করা হয়। তবে এ-ক্ষেত্রে সেটা করা সম্ভব হয়নি কারণ তার ইঞ্জিনিয়ারেরা পুকুরের

মাটি পরীক্ষা করে কিছু ঝামেলা পাওয়াতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আগে পুকুর সেচা হবে তারপর ভরাট করা হবে।

সেই হিসেবে সব ঠিক থাকলে তার লোকেরা আজ ভোর ছয়টা থেকে পানি সেচার কাজ শুরু করে দেয়ার কথা। তার নিজের কর্মচারি, ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে এক চাচাত ভাইয়ের ছেলেকেও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানে। আর হ্যা, তার ভাড়াটে বাহিনীও প্রস্তুত আছে পুকুর এলাকার আশেপাশেই। ওরা আড়ালে আছে তবে কেউ ঝামেলা করতে চাইলে এগিয়ে আসবে। সব প্রস্তুত থাকলেও সে নিজে এখনো যায়নি। এর পেছনেও কারণ আছে। সে চাচ্ছে পানি সেচার কাজটা আরেকটু এগোলে সে জয়াগামতো গিয়ে সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করবে।

টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা উঠিয়ে নিল সে। মিষ্টি আনা হয়েছে কিনা খবর নিতে হবে। সে মোবাইলটা আনলক করতেই ওটার রিংটোন বাজতে লাগলো। ডিসপ্লেতে দেখতে পেল তার ভাতিজার কল- যাকে সে সাইটে পাঠিয়েছিল তদারকি করার জন্যে। কলটা রিসিভ করলো সে।

“হ্যালো, আদনান। সব ঠিকঠাক আছে নি ওনু?”

“না চাচা, একটা ঝামেলা হয়া গেছে।”

ছেলেটার আতঙ্কিত কণ্ঠ শুনে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেল সাঈদ আলী। নিশ্চই বাজে কিছু একটা হয়েছে তা-না হলে এর মতো মাস্তান ছেলের এতো উত্তেজিত হবার কথা নয়।

“ক দেহি আদনান, কি অইছে? কেউ কোন ঝামেলা করতাছে? স্থানীয় কেউ নাহি...?”

“চাচা, আইন্নে জলদি এইনে চইলা আসেন,” তাকে কথা শেষ করতে দিলো না ছেলেটা। “ফুনে কউন যাবে না। আগে আপনি আসেন, পরে সব কইতাছি।”

সাথে সাথে সে ফোন কেটে দিয়ে গাড়ি বের করতে বললো। গাড়িতে ক’রে তার অফিস থেকে জায়গামতো পৌছাতে দশ মিনিটও লাগলো না।

তার ভাতিজা আদনানের কল পেয়ে সে ভালো-খারাপ অনেক ধরণের আশঙ্কা করেছিল। মনে-মনে সম্ভাব্য ঝামেলা সামলানোর প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু জায়গামতো পৌছে যা আবিষ্কার করলো এরকম কিছু সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

অধ্যায় দুই

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

নালুন্দি গ্রাম, সেইন্ট গ্রেগর দুর্গ এলাকা, মাদ্রাজ

স্বপ্ন নাকি দুঃস্বপ্ন!

প্রচন্ড গরম নাকি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, ঠিক কোনটার কারণে ঘুম ভেঙে গেল ঠিক বুঝতে পারলো না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসার ক্যাপ্টেন জেমস ম্যাকফি।

তবে ঘুম ভেঙে যেতেই একেবারে ধড়-মড় করে উঠে বসলো সে। প্রথম কয়েক সেকেন্ড বুঝতেই পারলো না জায়গাটা কোথায়, সময়টা কখন। ঁফে হাঁপড়ের মতো হাঁপালো কিছুক্ষণ। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে কয়েকবার মাথা ঝাড়া দিলো। খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে অনুভব করলো, সব ঠিকই আছে। সে বাংলো বাড়িটাতেই আছে আর সময়টাও এখন দিনের বেলা। গরমে ঘেমে নেয়ে গেছে পুরো শরীর। হাত বাড়িয়ে খুলে দিলো বিছানার পাশের জানালাটা। প্রায় সাথে সাথেই বঙ্গোপসাগরের নোনা হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল পুরো শরীর। বাইরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সমুদ্র চোখে পড়ছে।

উফ্, সবই স্বাভাবিক আছে। খামাখাই ঘাবড়ে গেছিল বিশ্রী স্বপ্নটা দেখে।

পায়ে চপ্পল গলিয়ে দেয়ালে ঝোলানো বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। ম্যাকফির গায়ের রঙ রোদে পুড়তে-পুড়তে প্রায় ভারতীয়দের মতোই হয়ে গেছে। মাথায় লালচে সোনালি চুল আর নীল চোখ না থাকলে তাকে যেকেউ ভারতীয় বলেই মনে করতো। আয়নার দিকে তাকিয়ে কথাটা মনে হতেই ম্যাকফি ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুঁটে উঠলো। তাকে ভারতীয় মনে করার কিছু নেই, সে আসলে ভারতীয়ই।

রোদে পোড়া শরীরটার জায়গায়-জায়গায় শুকনো ক্ষতচিহ্ন বিভিন্ন যুদ্ধের স্মৃতি বহন করছে। ডান হাত তুলে বাম হাতের পেশির ওপরে তৈরী হওয়া

সাম্প্রতিক ক্ষতচিহ্নটাতে হাত বুলালো সে। নতুন এই ছোট্ট চিহ্নটার জন্যে দায়ি তার নিজেরই গোত্রের মানুষ।

প্রায় শুকিয়ে আসা ক্ষতটা আয়নায় দেখতে-দেখতে হঠাৎই তার চোখ পড়লো ওপরের দিকে। সাথে-সাথে বুঝতে পারলো কেন এই তীব্র গরমে ঘুম ভেঙে গেছে। আয়নায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাথার ওপরে টানা পাখাটা স্থির হয়ে আছে। তারমানে ওটা যে টানছিল সে এখন আর টানছে না। আর একারণেই বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়াতে গরমে ঘুম ভেঙে গেছে তার। বেশ রাগের সাথেই রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। মেজাজ চড়ে গেছে।

পাখাওয়ালাকে তীব্র একটা ঝাড়ি দেয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে বেরুলেও দরজার বাইরে এসে থেমে গেল ক্যাপ্টেন ম্যাকফি। এসেছিল ঝাড়ি দিতে কিন্তু তার বদলে যা দেখলো তাতে উল্টো আরো মায়া লাগলো তার। পাখা টানার জন্যে নিয়োজিত বুড়ো মানুষটা একহাতে পাখা টানার দড়িটা ধরে মুখ হা করে ঘুমাচ্ছে।

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ম্যাকফি। আহা বেচারা, বুড়ো মানুষ!

পাখাওয়ালাকে ওখানে রেখে সে বাংলোর টানা বারান্দার অন্যপাশে চলে এল। এখানে বৈকালিক চা পানের জন্যে বেশ কয়েকটা বেতের তৈরী চেয়ার- টেবিল পাতা আছে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সে। চপ্পলসহ পা তুলে দিলো সামনের টেবিলের ওপরে। অফিসারদের জন্যে কাঠের বাক্সে সবসময় তামাক সাজানোই থাকে। তবে প্রায় কখনোই খায়না ম্যাকফি। আজ কী মনে করে তামাকের বাক্সটা টেনে নিলো কোলের ওপরে। ছুটিতে আছে বলেই কিনা কে জানে হঠাৎ তামাক খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বাক্সটা খুলতেই চোখে পড়লো একটা সুন্দর পাইপ। ভেবেছিল ওটাতে তামাক সাজিয়ে নিতে হবে কিন্তু আনন্দের সাথে খেয়াল করলো তামাক সাজানোই আছে। মনে-মনে সে বাংলোর বুড়ো তত্বাবধায়কের প্রশংসা করলো। সবদিকে নজর থাকে লোকটার। আজ তিনদিন যাবৎ সে আর তার দল অবস্থান করছে এখানে, এই তিনদিনে ছোটখাট কোন ত্রæটিও তার চোখে পড়েনি।

পাইপটাতে আগুন দিয়ে কষে টান দিলো কয়েকটা। প্রথম টানের দমকে বুকের ভেতর থেকে কাশি উঠে এল। অনভ্যস্ততার ফল। বহুদিনের অব্যবহৃত তলোয়ারও ঠিকমতো যুদ্ধে সাফল্য দেখাতে পারে না, আর

এটাতো তার অনাঘ্রাতা ফুসফুস। পর-পর কয়েকবার পাইপে টান দিতেই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল ভেতরটা। বেতের চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে নিজের মনের কোনে হারিয়ে গেল সে। একটু আগের দুঃস্বপ্নটার স্মৃতি তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো।

ম্যাকফি মনে-মনে ভাবতে লাগলো, এর হাত থেকে কি কোন মুক্তি নেই। একই দুঃসহ যাতনা চিরকাল একই দুঃস্বপ্নের হাত ধরে ফিরে-ফিরে আসে। একইরূপে, একই যন্ত্রণা নিয়ে, একই তীব্রতা নিয়ে। এমনকি দুঃস্বপ্নের স্থান কাল পাত্র, পাত্রী সবই একই।

মাটিতে পড়ে থাকা অসহায় মানুষটির করুণ আর্তনাদ, চেয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার বিকৃত কণ্ঠস্বর...

“সাহিব,” হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠলো ম্যাকফি। বাংলোর বুড়ো তত্ত¡াবধায়ক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মৃদু স্বরে ডাকছে তাকে। “সাহিব, আপনার জন্যে সন্দেশা এসেছে,” বুড়ো তত্বাবধায়কের ভাঙা ইংরেজি কেন জানি বেশ মিষ্টি লাগে ম্যাকফির কানে।

“মকসুদ মিয়া, বলো,” ম্যাকফি পাইপটাকে টেবিলের ওপরে রেখে সোজা হয়ে বসলো। গায়ে কিছু না থাকায় একটু অস্বস্তি লাগছে। কেতাদুরস্থ ভাব বজায় রাখতে-রাখতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। অন্যান্য সময় হলে ব্যাপারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু ছুটির সময় ব’লে তেমন একটা গায়ে মাখলো না ম্যাকফি। “কিসের সন্দেশ?”

“সাহিব, গেরগর সাহিবের দুর্গ থেকে লোক এসেছিল। সে এইটা দিয়ে গেছে। বলে গেছে সরাসরি আপনাকে দিতে। কর্নেল ক্রেয়াগ সাহিব আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন। বলেছেন আপনাকে মোলাকাত করতে।”

ম্যাকফি হাত বাড়িয়ে কাগজের রোলটা নিয়ে নিলো। ওটার ওপরে কর্নেল ক্রেয়াগের সিলমোহর লাগানো।

“ঠিক আছে, মকসুদ মিয়া, তুমি যাও,” বলেই সে মত পরিবর্তন করলো। “না দাঁড়াও,” বলে সে সিলমোহর ভেঙে কাগজটা খুলে পড়লো। কর্নেল ক্রেয়াগ তাকে দেখা করতে বলেছেন। জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সান্ধ্যকালীন পার্টি শুরু হবার আগেই যেন ক্যাপ্টেন ম্যাকফি তার দলবল নিয়ে দুর্গে পৌছে যায়। পার্টিতে যোগদানের আগে অবশ্যই যেন তার সাথে মোলাকাত করে ম্যাকফি।

“তুমি সবাইকে বলো প্রস্তুত হয়ে নিতে,” বলে সে মনে মনে সময়ের হিসেব করলো। দুর্গে পার্টি শুরু হবার কথা সন্ধ্যের পর। এখন প্রায় বিকেল হতে শুরু করেছে। তারমানে তারা যদি পার্টি শুরুর আগে দুর্গে পৌছে কর্নেল ক্রেয়াগের সাথে মিটিং করতে চায় তবে অবশ্যই কিছুক্ষণের ভেতরে রওনা দিতে হবে। কারণ পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছোটালেও কমপক্ষে এক ঘন্টা লাগবে দুর্গে পৌছাতে।

“সবাইকে জানিয়ে দাও, ছুটি শেষ। আমরা কিছুক্ষণের ভেতরেই দুর্গের দিকে রওনা দিচ্ছি।”

মকসুদ মিয়া চলে যাবার পর ম্যাকফি চুপচাপ কিছুক্ষণ পাইপ টানলো। সেইসাথে ঠিক করে নিলো নিজের আপাত পরিকল্পনা। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না, হঠাৎ কর্নেল এভাবে ডেকে পাঠানোর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে কথা বলার জন্যে ডেকে পাঠানোর সম্ভাবনাই বেশি। মনে-মনে একটু হাসলো ম্যাকফি। ঘটনাটাকে ঘটনা না বলে দূর্ঘটনাই বলা উচিত।

ক্যাপ্টেন ম্যাকফি যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে কাজ করে তবুও সে আসলে বৃটিশ আর্মির লোক। তার দলটাও প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ আর্মির অধীনেই কর্মরত। ক্যাপ্টেন ম্যাকফি আর তার দলের নাম ‘বৃটিশ আর্মি স্পেশালাইজড টিম’। ম্যাকফির দল ভারতবর্ষে কোম্পানির অধীনে কর্মরত সবচেয়ে স্বাধীন আর সফল দল। বৃটিশ আর্মির দক্ষ কিছু অফিসারের প্রচেষ্টায় বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সৃষ্টি এই দলের। ক্যাপ্টেন ম্যাকফির দলের কাজই হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসারদের ওপরে নজরদারি করা, সেইসাথে যেকোন সমস্যার সমাধানের জন্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া। এই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার ভেতরে রয়েছে গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ। সাম্প্রতিক সময়ের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেনের দলের সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি দুটোই ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

বিশেষ করে কোম্পানির ভেতরে অনেকেই এই বিশেষ দলের ওপরে বেশ নাখোশ। এমনিতেই কোম্পানি আর বৃটিশ রাজ দরবারের ভেতরে নাখোশি দিন-দিন বেড়েই চলেছে। এই নাখোশিতে আরো যোগান হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির সৈন্যদের সাথে ম্যাকফির দলের একটা খন্ডযুদ্ধ। এই খন্ডযুদ্ধের পরে একরকম জোর করেই তাদেরকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গত তিনদিন ধরে অলস সময় কাটানোর পর ডাক এসেছে এখন।

পাইপটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকফি। ঘরের ভেতরে ঢুকে পরিচ্ছন্ন হয়ে তৈরী হয়ে নিতে লাগলো আসন্ন মোলাকাতের জন্যে। যদিও আজকের পার্টিতে সে ও তার দল আমন্ত্রিত অতিথী হিসেবে স্যুট পরে যাবার কথা কিন্তু অনিয়িমিত মোলাকাতটা হঠাৎ দাপ্তরিক রূপ নেয়াতে সে সিদ্ধান্ত নিলো সামরিক পোশাকেই যাবে। তাই সুট্যের পরিবর্তে ব্রিচেস পরে নিয়ে তার ওপরে তার লাল রঙের সামরিক পোশাক চাপিয়ে অস্ত্রসহ বেরিয়ে এল।

বাইরে এসে দেখল তার ছোট্ট দলের সবাই পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দলের কমান্ডিং অফিসার মহাবীর সিং সংক্ষিপ্ত সুরে জানালো, তারা যাত্রার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দেরি না করে ঘোড়ায় চড়ে বসলো সবাই।

প্রায় এক ঘন্টা টানা ঘোড়া চালিয়ে যখন তারা দুর্গের কাছাকাছি পৌছালো তখন সন্ধ্যের রেশ নেমে এসেছে প্রকৃতিতে।

দূর থেকেই ম্যাকফি দেখতে পেল সুন্দর করে সাজানো হয়েছে দুর্গ। ইংরেজদের বাৎসরিক উৎসবের সময় এখন। ছোটখাট সব কুঠিতে পর্যন্ত উৎসবের আমেজ, আর সেইন্ট গ্রেগর তো ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রধান তিনটে দুর্গের একটি।

সাদা রঙের চমৎকার স্থাপনাটা ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণের পর থেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজদের অধিপত্য বিস্তারের মূল কেন্দ্রগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। স্থাপনাটার সৌন্দর্য এমনিতেই অসাধারণ সেই সাথে উৎসবের ঝলমলে আলো আর চোখ ধাঁধানো রূপসজ্জায় আরো অসাধারণ লাগছে। দুর্গে পৌছে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে রেখে ওরা রওনা দিলো অফিসারদের কোয়ার্টারের দিকে। লোক মারফত খবর পাঠানো হলো কর্নেল ক্রেয়াগের কাছে। ওরা অফিসারদের কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছে এমন সময় একজন আর্দালি এসে জানালো তাদেরেকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নিজের দলকে অন্যান্যদের সাথে পান-ভোজনে অংশ গ্রহণ করতে বলে ম্যাকফি রওনা দিলো অফিসারদের বলরুমের উদ্দেশ্যে। বলরুমে পৌছে আর্দালিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো ম্যাকফি।

বলরুমের ভেতরে পুরোমাত্রায় পার্টির আমেজ।

বিরাট কামরাটার এক কোনা থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর মিষ্টি সুর। গ্লাসের সাথে গ্লাসের বাড়ি খাবার মৃদু টুংটাং শব্দের সাথে পুরুষদের

অট্টহাসি আর মেয়েদের খিল-খিল হাসিতে মুখরিত চারপাশ। একদিকে জোড়ায় জোড়ায় বল ড্যান্সও চলছে। রুমের একপাশে সারি-সারি টেবিল পেতে সাজানো হয়েছে মুখরোচক খাবার। মাথায় লাল পাগড়ি আর গায়ে সাদা পোশাক পরা আর্দালিরা রূপোর তৈরী ট্রেতে ওয়াইন আর অন্যান্য খাবার সার্ভ করছে।

ম্যাকফি ভেতরে প্রবেশ করতেই তার দিকে ফিরে তাকালো অনেকে। দুয়েকজনকে মৃদু ফিসফাসও করতে শুনলো ও। অনেকেই তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন ম্যাকফি ভুল করে চলে এসেছে এখানে। এদের অভিব্যক্তি দেখে ম্যাকফি পরিষ্কার বুঝতে পারলো তার সাম্প্রতিক মারামারির ঘটনা ইতিমধ্যেই রঙ চড়তে শুরু করেছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে যায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। কারো দিকে না তাকিয়ে সে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। অফিসারদের জটলায় পরিচিত দুয়েকটা মুখ দেখতে পেয়ে সেদিকে পা বাড়ালো ও।

“হেই, ম্যাকফি, মাই ব্রাদার,” ওকে দেখতে পেয়ে হাসি মুখে সম্ভাষণ জানালো ওরই এক প্রাক্তন সহকর্মী। একটা সময় তারা দুজনেই বেঙ্গল ব্রিগেডের অধীনে কাজ করতো।

“স্কট,” বলে ওকে জড়িয়ে ধরলো ম্যাকফি। সাধারণ বৃটিশ কেতা কিংবা সামরিক নিয়ম অনুযায়ী এইভাবে সম্ভাষণ না জানালেও এটা অনিয়মিত পার্টি তাই পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশে কোন বাঁধা নেই। “তো, কি খবর তোমার? তুমি আর তোমার দল তো রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে গেছ,” হাসতে হাসতেই বলে উঠলো স্কট।

“বিখ্যাত, নাকি কুখ্যাত?” স্কটের পেছন থেকে আরেকজন বলে উঠলো। “আমরা বৃটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করতে এসেছি। আর সেটা করতে গেলে ক্ষেত্রবিশেষে শক্ত হতেই হয়। এই ব্যাপারটাই অনেকে বুঝতে পারেনা। পরিণতির কথা চিন্তা না করেই সদ্য পাওয়া ক্ষমতার দম্ভে দিশা হারিয়ে ফেলে অনেকে।”

ম্যাকফি মনোযোগ দিয়ে দেখলো মানুষটাকে। সাথে-সাথে চিনতে না পারলেও এটা বুঝতে পারলো নিশ্চই এমন কেউ যে কিনা ম্যাকফির বিশেষ অপারেশনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সাধারণ স্যুট পরে থাকায় তার র‍্যাঙ্কটাও বোঝার উপায় নেই। তবে ম্যাকফিও কথা ছেড়ে দেবার মতো

লোক নয়। কথাগুলো মনে-মনে গুছিয়ে যখন সে জবাব দিলো সেটা যথেষ্ঠই কঠিন শোনালো।

“কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ সেটার বিচার করার আমরা কেউ নই। সেটা কর্তৃপক্ষ দেখবে। আমাদের কাজ হলো নিজের কর্তব্য করে যাওয়া। আর বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর ক্ষতি যারা মেনে নিতে পারে না তারা বোকা।”

ম্যাকফির বক্তব্যের শেষ শব্দটা শুনে ঝট করে মাথা ওপরের দিকে তুললো অফিসার। ঠাস করে মেঝেতে ছুঁড়ে মারলো হাতের গ্লাস। “অফিসার, আমি আপনাকে বক্তব্য সংশোধন করতে বলছি। তা-না হলে...” লোকটার কথার জবাবে ম্যাকফিও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই স্কট তাকে টেনে নিয়ে এল এক পাশে।

“বাদ দাও তো ম্যাকফি।”

“কে এই লোক?” ম্যাকফি আসলেই রেগে গেছে। “এভাবে কথা বলার সাহস পায় কোত্থেকে?”

“তুমি ওকে চিনতে পারোনি!” স্কট একটু অবাক হয়েছে। “গেল হপ্তায় তোমার হাতে মার খেয়েছে যে অফিসার তার বড় ভাই এই লোক। ম্যাকফি, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। এই লোক খুব খারাপ। মাদ্রাজ শহর আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, দুই জায়গাতেই তার প্রভাব অনেক। বিশেষ করে ওপর মহলে তার সংযোগ খুব সাংঘাতিক। কাজেই সাবধান।”

ম্যাকফি হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলো।

“আচ্ছা, আমাকে একটা ব্যাপার বলোতো, তহলিশপুরে আসলে হয়েছিল কি? একেকজনের কাছে একেক কথা শুনি। কেউই পরিষ্কার কিছু বলে না। শুধুই ঢাক গুড়-গুড় আর সবার কাছে শুধু তুমি আর তোমার তোমার দলের বদনাম। ব্যাপারটা খুলে বলোতো।”

ম্যাকফি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। “আমি জানি না তুমি কি শুনেছো কিন্তু সত্যিকথা হলো আমি আর আমার বিশেষ বাহিনীর কর্মকান্ডে বিভিন্ন সময়ে যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে তারাই এখন সুযোগ পেয়ে এসব ছড়াচ্ছে।”

“তুমি কোম্পানির লোকজনকে মারতে গেলে কেন? ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না। হাজার মাইল দূর থেকে এসে আমরা যদি এখানে টিকে

থাকতে চাই তবে তো আমাদের একত্রে থাকাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি।"

"শোন, যা ঘটেছে সেটা অনাকাঙ্খিত ছিল কিন্তু এতে আমার দলের কোন দোষ নেই। আমি পুরো ঘটনা তোমাকে খুলে বলছি। তুমি তো জানোই আমাদের বিশেষ বাহিনীর কাজই হলো সর্বক্ষণ নজরদারিতে থাকা ও বিশেষ পরিস্থিতিতে যেকোন ব্যাবস্থা নেয়া। আমরা তখন বোম্বে থেকে রওনা দিয়ে মাদ্রাজের দিকে আসছি এমন সময় তহলিশপুরের কাছে এক স্থানীয় গ্রামের সর্দার আমাদের কাছে অনুরোধ করে তাদের ওদিকে নাকি কন্নরের কিছু দস্যু খুব উৎপাত করছে। তো সেটার সমাধান করতে আমরা তার এলাকায় চলে যাই। কন্নরের ডাকাতদের খোঁজে টহল দিতে-দিতে এক পর্যায়ে আমরা তহলিশপুরের কাছে ছোট্ট একটা গ্রামে পৌছাই। সারাদিনের টহল শেষে ওখানে পৌছানোর পর খুবই ক্লান্ত ছিলাম আমরা।"

"গ্রামে পৌছে আমরা কুয়ো থেকে পানি খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এমন সময় দেখতে পাই গ্রামে আগে থেকেই কোম্পানির একটা দল এসে খাজনা আদায় করছিল। আমরা যে কুয়ো থেকে পানি খাচ্ছিলাম সেই কুয়োর কাছেই এক বাড়িতে ঢুকে ওরা গৃহস্বামীকে মারতে-মারতে বের করে আনে। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি এই লোকের নাকি অনেক খাজনা বাকি পড়েছে। তুমি তো জানোই গেল বছর খরায় ফসলের কী অবস্থা হয়েছে। তো যাই হোক, তখন লোকটা বার-বার হাত জোর করে মাফ চাইছে আর খাজনার জন্যে আরেকটু সময় চাইছে। কোম্পানির অফিসার কোন কথা না শুনেই তাকে বেদম মারছে। লোকটাকে বাঁচাতে তার স্ত্রী আর ছোট বাচ্চা এসে তার গায়ের ওপরে পড়লে ওরা তাকেও মারতে থাকে। মারের চোটে লোকটার ছোট ছেলেটা একপাশে ছিটকে পড়লে কোম্পানির এক সৈন্য বাচ্চাটার ওপরে পা তুলে দেয়।"

"ঘটনা ঘটার সময়ে আমরা প্রধমে চুপচাপ দর্শকই ছিলাম। কারণ আমি জানতাম কোম্পানি এসব খাজনার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। কিন্তু সৈনিকটা বাচ্চাটার ওপরে পা তুলে দিতেই আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আমি রাজার নামে নির্দেশ করি তাকে থামতে। সাথে-সাথে সেই অফিসার এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। ব্যাস দুয়েকটা কথা কাটাকাটি থেকে সেটা মারামারি পর্যন্ত গড়াতে সময় লাগেনি," এই পর্যন্ত বলে ম্যাকফি শ্লেষের হাসি হাসলো। "কোন সমস্যা হোতনা যদি আমি আর আমার দল মার খেতাম। ওই অফিসার আর তার দল আমার সৈন্যদের কাছে মার খেয়ে আহত হওয়াতেই যত সমস্যার উদ্ভব, সেটা কি আমি বুঝি না? আর এ থেকেই ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে যে আমি নাকি ক্ষমতা পেয়ে

কোম্পানির সৈন্যদের পিটিয়ে বেড়াচ্ছি," একটানা কথা বলে ম্যাকফি দম নিতে লাগলো।

ওর কথা শুনে আনমনে মাথা নাড়তে লাগলো স্কট। "শোন ম্যাকফি, তোমার দলের কর্মকান্ডে আগে থেকেই অনেকে রেগে ছিল। এবার তারা সুযোগ পেয়ে গেছে তোমাকে দেখে নেয়ার।"

"আমি এখন কর্নেল ক্রেয়াগের ওপরে ভরসা করে আছি। আশা করি এই বাজে পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার ব্যাপারে উনি কোন একটা উপায় বের করবেন।"

"সাধারণ একটা ব্যাপার আচমকাই অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কর্নেল তোমার পক্ষে থাকবেন কিন্তু মনে রেখো তারও ওপরওয়ালা আছে। আর তারা সবাই এখন কোম্পানির লাভের গুড়ে ভাগ বসাচ্ছে। কাজেই তার কাছ থেকেও খুব বেশি আশা করো না। আমি তো এরকমও শুনতে পাচ্ছি..."

"স্যার, ম্যাকফি," মৃদু ডাক শুনে ফিরে তাকালো দুজনেই। সাদা পোশাক আর লাল পাগড়ী পরা এক আর্দালি দাঁড়িয়ে আছে। "কর্নেল ক্রেয়াগ স্যার, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

ওয়াইনের গ্লাসটাতে বড় ক'রে একটা চুমুক দিয়ে আর্দালির পিছু-পিছু ম্যাকফি রওনা দিলো কর্নেলের কক্ষের দিকে। যেতে-যেতে শুনতে পেল কেউ একজন বলছে 'খুব নাচানাচি করেছে, এবার টের পাবে'।

উড়ো কথায় পাত্তা না দিয়ে দৃঢ় পায়ে কর্নেলের কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করলো ও।

কর্নেলকে সবসময় সামরিক পোশাকে দেখলেও এই প্রথমবারের মতো তাকে স্যুটে দেখতে পাচ্ছে ও। রুমের ভেতরে প্রবেশ করে মৃদু কাশি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো ও। কারণ কর্নেল তার চেয়ারে নেই। বরং ওর দিকে পেছন ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের টাই ঠিক করতে ব্যস্ত সে।

ওর কাশির শব্দ শুনে হাসিমুখে ফিরে তাকালো কর্নেল। "ওহু, ক্যাপ্টেন তুমি এসেছো," বৃটিশ আর্মির সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ কর্নেল ক্রেয়াগ ম্যাকফিকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসেন। "দেখতো ছাই, কী একটা

অবস্থা! এই বয়সে এসেও টাই বাঁধতে পারছি না। এদিকে তোমাদের ম্যাডাম আগেই চলে গেছে পার্টিতে।"

"স্যার, কিছু মনে না করলে আমি বেঁধে দিচ্ছি," বলে ক্যাপ্টেন ম্যাকফি তার ছড়ি আর হ্যাট টেবিলের ওপরে রেখে কর্নেলের দিকে এগিয়ে গেল। কর্নেল স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। ক্যাপ্টেন মনোযোগ দিয়ে বাঁধতে লাগলো টাই।

"ক্যাপ্টেন, তুমি কি জানো একটা দুষ্টু ছেলে তুমি," কর্নেল যখন কথাগুলো বললো তখন ম্যাকফি থেকে কর্নেলের মুখের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি। "আর ইদানিং তোমার দুষ্টুমি আমাকেও বিপদে ফেলে দিচ্ছে।"

"আমার দুষ্টুমির জন্যেই তো আপনি আমাকে ভালোবাসেন কর্নেল," বলে টাই বাঁধা শেষ করে কয়েক ধাপ পিছিয়ে এল ম্যাকফি। "স্যার, আপনি যদি আমাকে সময় দেন তবে আমি সব ব্যাখ্যা করে..."

"ক্যাপ্টেন, তোমার পাঠানো রিপোর্ট পড়েছি আমি," কর্নেলকে খানিকটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। "কাজেই আমি জানি তহলিশপুরে কী ঘটেছিল। ওখানে যাই ঘটে থাকুক সেটা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। কোথায় জানো," বলে সে ম্যাকফির দিকে চোখ তুলে তাকালো। "প্রশ্নটা হলো দৃষ্টিভঙ্গির। তুমি কি জানো নিজেদের মাতৃভূমি থেকে এতোদূরে এসে গুটি কয়েক মানুষ নিয়ে কিভাবে আমরা এই বিরাট ভারতবর্ষ শাসন করছি। আমরা ভারতবর্ষ শাসন করত পারছি কারণ আমরা এক, আর ভারতবাসীরা বিভক্ত। এই বিভক্তি আর অবিভক্তির মাঝখানে এটা $সূ^2$ ফাটল তৈরী করেছে তোমার দলের কর্মকান্ড। ওপর মহল কখনোই এটা মেনে নেবে না।"

"স্যার, যথাযথ সম্মানের সাথে বলছি," ম্যাকফি মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ালো। "আমাদের বিশেষ বাহিনী যখন গঠন করা হয় তখন সেই প্রক্রিয়াটার সাথে আপনিও ছিলেন স্যার। আমাদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল যাতে কড়া নজরদারি, সহসিক পদক্ষেপ আর সুবিচার দ্বারা আমরা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন আরো সুদৃঢ় করতে পারি। আমি ও আমার দল গত একটা বছর ধরে এই চেষ্টাই করেছি। কিন্তু এখন যদি ক্ষমতার নামে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে তবে শাসনের নামে শোষণের প্রশ্ন আমিও তুলতে পারি। তবে সে যোগ্যতা আমার নেই। একারণে আমার কিছু বলারও নেই। স্যার, আপনি আমার পিতৃসম, যে-শাস্তি দেবেন আমি মাথা

পেতে নেবো কিন্তু আমার দলের কারো যেন কিছু না হয়। সব দ্বায়ভার আমার।”

কর্নেল এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলো ম্যাকফির কাঁধে। “ম্যাক, তুমি যেমন আমাকে নিজের পিতার মতো শ্রদ্ধা করো আমিও তেমনি তোমাকে নিজের সন্তানের মতোই মনে করি। একটা ব্যাপার মনে রাখবে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যেও কখনো কখনো কৌশলী হতে হয়, আগে বাড়ার জন্যে কখনো কখনো পেছনে হটতে হয়,” ম্যাকফির কাঁধে একটা হাত রেখে হাঁটছিল কর্নেল হঠাৎ সে একটু এগিয়ে থেমে গেল। “তহলিশপুরে যা হয়েছে এরপর হাই কমান্ড চাইছে তোমার দলটা ভেঙে দিয়ে তোমাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে।”

ম্যাকফি শক্ত মুখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ওর ভেতরটা কেঁপে উঠেছে। নিজের এই বিশেষ দায়িত্বই তার প্রাণ, আর নিজের বাহিনীই ওর পরিবার। তাকে যদি এখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয় তবে বেঁচে থাকাটাই ওর জন্যে শাস্তি হয়ে যাবে। “আপনি, আপনি কী চাইছেন?” ম্যাকফি শুষ্ক মুখে জানতে চাইলো।

“আমি চাইছি কোনভাবেই যেন তোমার দল ভেঙে না যায়। আমি চাইছি কোনভাবেই তোমাকে যেন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া না হয়। আর একারণেই আপাতত দৃশ্যপট থেকে তোমাকে সরিয়ে দিতে চাইছি আমি।”

“মানে, স্যার? ঠিক বুঝলাম না,” কর্নেলের কথায় ম্যাকফি একটু দ্বিধান্বিত। কর্নেল আসলে চাইছেন কি?

“তোমাকে আমি একটা বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে আপাতত এখান থেকে সরিয়ে দিবো,” বলে কর্নেল টেবিলের সামনে গিয়ে একটা রোল করা কাগজ তুলে নিয়ে ম্যাকফিকে তুলে নিতে ইশারা করলো। “তোমাকে আমি বাঙ্গাল প্রদেশে বদলি করে একটা বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে পাঠাচ্ছি।”

ম্যাকফি প্রবল আপত্তির সাথে মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই কর্নেল বলে উঠলো। “আগে আমার কথা শোন। তোমার কাজই হলো বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারগুলো দেখা ও সেগুলোর সমাধান করা, তাইনা? শোন, বাঙ্গাল প্রদেশের এক অঞ্চলে মধুপুর নামে একটা জায়গা আছে। চারপাশে জঙ্গল, একপাশে নদী আর মাঝখানে বসতি। সেখানে কিছুদিন যাবৎ উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের একটা ছোট দল বিশেষ কাজে ওখানকার রাজার সাথে দেখা করতে গিয়ে হারিয়ে

গেছে। কোনভাবেই ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, একেবারে হাওয়া। আমি চাই তুমি সেখানে গিয়ে খুঁজে বের করো ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে।"

ম্যাকফি বুঝে গেছে কথা বলে তেমন লাভ নেই। "স্যার, আপনি তাহলে এটাই চাইছেন?"

"হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। সবাই তোমার মুন্ডুটা চিবিয়ে খেতে চাইছে আর আমি তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। সেইসাথে তোমার দলটাকেও। আর সেটা করতে হলে এই মুহূর্তে দৃশ্যপট থেকে সরে যাওয়াই তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ওখানে গিয়ে ভালো কিছু কাজ দেখাও, হারিয়ে যাওয়া সৈন্যদের খুঁজে বার করো, আমি আবার সুপারিশ করে তোমাকে ফিরিয়ে আনবো। আগের চেয়ে আরো বেশি শক্ত অবস্থানে বসাবো তোমাকে।"

"স্যার, আমার দল সাথে থাকবে তো?"

"সবার ওখানে যাবার দরকার নেই। তুমি দু'জনকে নিয়ে যাও। বাকিরা এখানে আমার অধীনে থাকবে আপাতত। ওখানে গেলে বেগুনবাড়ি ও মুক্তাগাছার স্থানীয় রাজা তোমাকে সব ধরণের সহায়তা করবে। কারণ এই ঘটনায় সে ই সবচেয়ে বেশি বিব্রত হয়েছে।"

"ঠিক আছে, স্যার," বলে ক্যাপ্টেন হাত বাড়িয়ে রোল করা কাগজটা নিয়ে নিলো। ওটা নিয়ে বেরিয়ে আসছিল হঠাৎ পেছন থেকে ডাক দিলো কর্নেল।

"ক্যাপ্টেন, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। কাজেই ভালোভাবে ফিরে এসো, সব সমস্যার সমাধান হবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে।"

কর্নেলের শেষ কথাটা ম্যাকফি শুনেও শুনলো না। তার মাথায় ঘুরছে নিজের বদলি আর তার দল ভেঙে যাবার ব্যাপারটা। কর্নেলের রুম থেকে বেরিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে সে সিলটা ভেঙে কাগজটা পড়লো। ওটা পড়তে-পড়তেই ভাবতে লাগলো কর্নেল কি ওকে বদলি করে ওকে রক্ষা করলো নাকি নিজেকে রক্ষা করলো।

ঠিক আছে বদলিই যদি হয় আপাত সমাধান তবে তাই হোক।

অধ্যায় তিন

বর্তমান সময়

কতোয়ালি মডেল থানা, ময়মনসিংহ সদর

বদলি ব্যাপারটা মনে আসতেই মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছে ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশারের।

তাও শুধু বদলি হলে একটা কথা ছিল। ডিমোশন, সেই সাথে বদলি। বদলিটাও হয়েছে এমন এক জায়গায় যেখানে এইমুহূর্তে আসার একবিন্দু ইচ্ছে ছিল না তার।

ময়মনসিংহ শহর তার নিজের শহর কিন্তু এর সাথে জড়ানো তিক্ত স্মৃতির কারণেই সে এই শহর থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে এতোদিন। একদিন ঠিকই এই শহরে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা এভাবে নয়। যে-শহরে একদিন মাথা উঁচু করে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল সেই শহরেই কিনা তাকে ফিরে আসতে হলো মাথা নিচু করে। এরচেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতেই পারে না। বাম হাতের মধ্যমায় পরা আংটিটা ডান হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে মোচড়াতে লাগলো সে।

জীবন যখন যেভাবে প্রবাহিত হয় মানুষকেও সেভাবেই তাল মিলিয়ে চলতে হয়। কখনো জীবনের ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে আবার কখনো-কখনো নিজেকে ছেড়ে দিতে হয় ভাগ্যের হাতে। কিছুটা ভাগ্য আর কিছুটা কর্মফলের সংমিশ্রণের দোলাচালেই প্রবাহিত হয় প্রতিটি মানুষের জীবন। কিন্তু বাশারের সাথে যে-ঘটনা ঘটে গেল এরপর কী জবাব দিবে ও নিজের কাছে। কখনো মনে হয় নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে, আবার কখনো মনে হয় একমাত্র ওর ভুলই এই পরিণতির জন্যে দায়ি।

দিন সবেমাত্র শরু হতে চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাশার দেখলো, এগারোটা বাজে। ময়মনসিংহ সদর কতোয়ালি মডেল থানার ব্যস্ততা এখনো তেমনভাবে শুরু হয়নি বললেই চলে। সপ্তাখানেক আগে জয়েন

করার পর থেকে সে এরকমই দেখছে। দৈনিক ডিউটি বাদ দিলে এখনো তাকে তেমন গুরুতর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সেও খুব বেশি গরজ দেখাচ্ছে না। নিজের ডেস্কে বসে পত্রিকা পড়তে-পড়তে আর চা খেতে-খেতে আরো ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়ে বেরিয়ে এল ও।

নিজে যখন ওপরের লেভেলের কর্মকর্তা ছিল তখন নিজের ডেস্কে বসেই সিগারেট টানতো কিন্তু এখন তো নিচের পদে চলে গেছে কাজেই সে-উপায় নেই। আর তাছাড়া নতুন এসেছে এই থানায়, এখানকার হাব-ভাব এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতেও পারেনি। বেলা বাড়ার সাথে থানার ব্যস্ততা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। প্রাত্যহিক সেই দৃশ্য। মানুষের আনাগোনা, কারো সমস্যা, কারো সমাধান, কারো তৈলমর্দন, কারো খবরদারি, কারো পাগলামি এই নিয়েই থানার দৈনন্দিন জীবন।

থানা থেকে বেরিয়ে একটা টঙ দোকানের বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো ও। মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। কথাটা মনের ভেতরে আসতেই সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে সাথে শরীরের ভেতরে থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

জীবন কতোই না বিচিত্র। কিছুদিন আগেও সময় কোনদিক দিয়ে পার হয়ে যেতো টেরও পেতো না ও। আর ডিমোশন হবার পর থেকে সময় পার করাই এক বিচিত্র যন্ত্রণা। চায়ের টঙে বসেই দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে-ধরাতে ভাবতে লাগলো লাঞ্চ করবে কোথায়। থানায় অবশ্য খাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না।

বেঞ্চের নিচ থেকে কী যেন পায়ে নাড়া দিচ্ছে। বাশার দেখলো একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা। ওর পায়ে জিভ দিয়ে চাটছে। বাচ্চাটাকে দেখে হেসে উঠলো ও। দোকানের সামনে টাঙানো প্যাকেট থেকে এক টুকরো কেক নিয়ে ছুঁড়ে দিলো ওটার দিকে। মহা আনন্দে খেতে শুরু করলো ব্যাটা।

“কি রে তোর মা কই?” খেতে খেতেই কুকুরের বাচ্চটা একবার লেজ নেড়ে উঠলো। “বুঝছি কেউ নাই তোর,” বলে বাশার সিগারেটে কষে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। “আমারও কেউ নাই,” বাশারের কথা শুনে কুকুর ছানা কি বুঝলো কে জানে। কেক খাওয়া থামিয়ে মাথা তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো দুই সেকেন্ড। তারপর আবার খেতে শুরু করলো। ব্যাটার হাবভাব দেখে হেসে উঠলো বাশার।

উঠতে যাবে হঠাৎ চোখ তুলে দেখতে পেল এক কন্সটেবল দৌড়ে আসছে ওর দিকে। কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে সালাম দিলো ছেলেটা।

“কি ব্যাপার, হাফিজ? এরকম দৌড়াচ্ছো কেন?” বাশার এখনো সিগারেটটা ফেলেনি। তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে কষে টান দিলো একটা।

“স্যার, ওসি স্যারে আইন্নেরে ডাকছে,” একেবারে খাস ময়মনসিংহের ভাষায় তাকে তথ্যটা জানালো কম বয়সের কন্সটেবল ছেলেটা।

সিগারেটটাতে শেষ টান দিয়ে ওটাকে মাটিতে ফেলে কন্সটেবলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “কখন ডেকেছে?”

“স্যার, এট্টু আগে। আমি তো আইন্নেরে খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান। কী নাকি সমইস্যা অইছে আইন্নেরে অহনি দরকার।”

ব্যাপার কি, গত সাতদিন ধরে বসিয়ে রেখেছে এখন হঠাৎ ওসির জরুরি তলব কেন। মাটিতে ফেলে দেয়া সিগারেটের মোথাটা জুতোর তলায় পিষে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। দোকানির দিকে তাকিয়ে কুকুর ছানাটাকে দেখিয়ে বললো, “আরেকটু পরে ওরে দুইটা রুটি দিস,” বলে টাকা শোধ করে কন্সটেবলের দিকে তাকিয়ে বললো। “চলো দেখি, কী দরকার ওসি সাহেবের?”

থানার ভেতরে ঢুকে কন্সটেবলকে নিয়ে ওসির রুমের দিকে এগোল বাশার। কাছাকাছি পৌছে কন্সটেবলকে ওসির রুমের বাইরে থাকতে বলে সে প্রবেশ করলো ভেতরে।

কতোয়ালি সদর থানার ওসির নাম সাবের আহসান মল্লিক। একদিকে সে ওয়াকিটকিতে কথা বলছে অন্যদিকে আবার টিএনটি ফোনটাও ক্রেডল থেকে ওপরে তুলে রাখা। তারমানে সে টিএনটি ফোনে কথা বলছিল এমন সময় টকিতে কোন জরুরি খবর এসেছে। হঠাৎ ওসির এই অতি ব্যস্ততা একটু রহস্যময়। কারণ একটু আগেও জরুরি কিছুর আভাস পায়নি বাশার। হঠাৎ কী এমন হলো কে জানে। ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখে ওসি তাকে হাতের ইশারায় বসতে বললো। কথা শেষ করে ফিরে তাকালো ওর দিকে। “বাশারসাহেব কেমন আছেন? নতুন জায়গা, নতুন থানা, কেমন লাগছে?”

“জি স্যার, ভালো,” বেশ কঠিন সুরে জবাব দিলো বাশার। ইচ্ছে করলেও কিছুতেই সহজ হতে পারছে না ও। সময় স্থান ও সম্পর্ক অনুযায়ি ভাষার

ব্যবহার ও শব্দ চয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। তুই শব্দটার ব্যবহার যেমন সবসময় অপমানসূচক নয় ঠিক তেমনি আপনি সম্বোধনও সবসময় সম্মানসূচক নয়। বিশেষ করে আপনার কোন বন্ধু যদি কোন বিশেষ কারণে হঠাৎ তুমি থেকে আপনি বলা শুরু করে তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটার ভেতরে প্রকট সমস্যা রয়েছে।

ওসি সাবের আহসান মল্লিক আর বর্তমান ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার একইসাথে চাকরিতে জয়েন করেছিল, সারদাতে তাদের ট্রেনিংও হয়েছিল একইসাথে। সারদার ট্রেনিঙের শুরুতে এই ওসি আহসান মল্লিক একেবারেই ভালো করতে পারছিল না। তখন বাশার আর ওর আরেক বন্ধু রাজু যথেষ্ঠ সাহস যুগিয়েছিল মল্লিককে। এমনকি চাকরিতে জয়েন করার পর বাশার আর ওদের ব্যাচের আরো কয়েকজন খুব সহজেই প্রমোশন পেয়ে যায় তখন এই মল্লিক প্রমোশন না পেয়ে বেশ হতাশ হয়ে পড়ছিল। তখনো ওরাই তাকে সাহস যোগাতো। আর এখন ভাগ্যের ফেরে এই মল্লিকই বাশারের বস। তার অধীনেই এখন কাজ করতে হবে ওর।

তবে ডিমোশন পেয়ে বদলি হবার পর বাশার প্রথম যখন জানতে পারে তাকে একসময়ের সহপাঠী মল্লিকের অধীনে কাজ করতে হবে, প্রথমে খারাপ লাগলেও একসময় মনে হয়েছিল এক অর্থে ভালোই হবে। মল্লিকের কাছ থেকে সে সহায়তা পাবে। কিন্তু জয়েন করার পর থেকে মল্লিকের ঠান্ডা আচরণে হতাশ হয়েছে ও। এমনকি যে মল্লিক আগে সবসময় ওকে তুমি বলতো, ও জয়েন করার পর থেকে আপনি ডাকা শুরু করেছে। এটা সে কেন করছে এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি বাশার। আর বুঝেই বা লাভ কি ‘হাতি যখন গর্তে পড়ে ব্যাঙও তখন মাথায় চড়ে বসে’। সম্পর্কের ক্ষেত্রফল পলকে-পলকে কিভাবে পাল্টে যায় সে-অভিজ্ঞতা তো এই জীবনে কম হয়নি ওর।

“কোন সমস্যা নেই তো? আপনি উঠেছেন কোথায়?” ওসি মল্লিক একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে জানতে চাইলো।

বাশার উত্তর দেয়ার আগে একটু অপেক্ষা করলো। কারণ সে বোঝার চেষ্টা করছে মল্লিক তাকে সিগারেট অফার করে কিনা। কারণ একটা সময় এক সাথে তারা অনেক ধূমপান করেছে। মল্লিক তার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো না।

“স্যার, কোন সমস্যা নেই। আমি অফিসার্স মেসে উঠেছি। পরে কোয়ার্টার পেলে সেখানে উঠে যাবো,” বাশার শরীরটাকে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করলো। খুব বেশি শক্ত হয়ে আছে সে। যখন আপনি কারো উপকার করবেন আর পরবর্তীতে কোন কারণে সেই ব্যক্তির দ্বারস্থ হবেন তখন দুই ধরণের ঘটনা ঘটবে। আপনার অতীত উপকারের কথা স্মরণ করে হয় সে আপনাকে খুব আপন করে নেবে, আর না হয় সে আপনার সাথে কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা করবে, যাতে আপনি অতীত উপকারের বিনিময়ে কোনকিছু প্রত্যাশা করে না বসেন। এইমুহূর্তে দ্বিতীয় ঘটনাটাই ঘটছে। যেহেতু মল্লিক বসগিরি ফলানোর চেষ্টা করছে কাজেই সেটাই সই। “জিজ্ঞেস করার জন্যে ধন্যবাদ , স্যার।”

“কোন সমস্যা হলে বা কোনকিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন,” বলে সে হেসে যোগ করলো। “আরে, আমি কী সাহায্য করবো, এটা তো আপনারই এলাকা। আপনার শহর,” বলে সামান্য একটু হেসে উঠলো মল্লিক।

সাথে সাথে বাশারের মনে হলো ওর পেটে লাথি মেরেছে কেউ। পুরনো বন্ধু মল্লিক তার সাথে বসের মতো আচরণ করছে এটা মেনে নেয়া যায় কিন্তু সে তার পুরনো ক্ষত ধরে টান দেবে এটা ভাবতেও পারেনি বাশার। সেই ধরণের মানুষ হলো সবচেয়ে খারাপ যারা আপনার দূর্বলতাকে পুঁজি করে আপনাকে আঘাত করার চেষ্টা করবে। মনটা তিক্ততায় ভারি হয়ে উঠলো বাশারের। এই শহর নিয়ে কতোটা কষ্ট জমে আছে ওর মনের ভেতরে এটা ওর সব বন্ধুবান্ধবই জানে। মল্লিক আরো ভালো জানতো। ওর মনের ভেতরের কষ্টটা ধরে মল্লিক এভাবে টান দিবে এটা ও ভাবতেও পারিনি। অসুস্থ একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেললো ওকে কিন্তু কিভাবে যেন একেবারে স্বাভাবিক গলায় কথা বলে উঠলো সে।

“জি, স্যার। এটাতো আমারই শহর,” একেবারে সরাসরি মল্লিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো সে। ওর তীব্র দৃষ্টির সামনে একটু নরম হয়ে এল মল্লিকের তাচ্ছিল্যের ভাব। “স্যার, আপনি আমাকে কোন কারণে ডেকেছিলেন?”

“হ্যা, কিছুক্ষণ আগে শানকিপাড়া শেষমোড়ে একটা ঘটনা ঘটেছে। ওই জায়গাটা আজ সকাল থেকেই হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত ছিল। আমরা আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলাম ওখানে কিছু একটা ঘটতে পারে আজ।”

“কেন, ওই ডেভলাপার কোম্পানির জমি দখলের ব্যাপারটা নিয়ে?”
ব্যাপারটা গতকালই শুনেছিল বাশার। ওখানে নাকি এক ডেভলাপার পুকুর ভরাট করে তার কোম্পানির কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। সেটা নিয়ে নাকি আগে থেকেই একটা ঝামেলা হবার আশঙ্কা ছিল।

“হ্যা, ওই ব্যাপারটাই। সাঈদ কন্ট্রাকটার তার কোম্পানির প্রভাব খাটিয়ে জায়গাটা করায়ত্ব করলেও কাজ শুরু করতে পারেনি স্থানীয় কিছু ঝামেলার কারণে। আজ থেকে সেটা শুরু করার কথা। সাঈদসাহেব আমাকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল পুরো ব্যাপারটা, আর তাই আমিও টহল পুলিশদের একটা গ্রæপ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওখানে,” ওসি মল্লিককে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে।

“এখন কি ওখানেই ঝামেলা হচ্ছে?” বাশার অনুমান করলো মল্লিক সম্ভবত প্রটেকশান দেয়ার নামে সাঈদ কন্ট্রাকটারের কাছ থেকে বেশ ভালো অঙ্কের একটা টাকা খসিয়ে নিয়েছে। এখন সমস্যা হওয়াতে ঘাবড়ে যাচ্ছে।
“সমস্যাটা ঠিক কি নিয়ে?”

“সবাই ঠিক ছিল। আমরা যেসব সমস্যা আশা করেছিলাম তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু ওরা কাজ শুরু করার পর অন্য এক দিক দিয়ে ঝামেলা বেঁধে যায়।”

“কিরকম?”

“ওরা পুকুরের পানি সেঁচে ফেলে দিতে গিয়ে পুকুরের মাঝখানে নাকি কাদার মধ্যে গেঁথে থাকা অবস্থায় একটা পুরনো গাড়ি খুঁজে পেয়েছে।”

“কি খুঁজে পেয়েছে, গাড়ি?” বাশারের মনে হলো ও ভুল শুনেছে।

“গাড়ি, পুকুরের তলায় একটা গাড়ি খুঁজে পেয়েছে ওরা।”

“ওখানে কাদার ভেতরে পুকুরের তলায় গাড়ি আসবে কোত্থেকে?”

“সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তাই আমি চাইছি আপনি সেখানে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখেন। আমি জিপ আর ফোর্স রেডি করেই রেখেছি, আপনি এক্ষুণি ওখানে চলে যান।”

বাশারের মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছিল কিন্তু সেগুলো জিজ্ঞাসা করার আগেই ওসি ওয়াকিটকিতে কথা বলতে লাগলো। কথা শেষ করে সে বাশারের দিকে ফিরে নির্দেশনা দিতে লাগলো।

“স্যার, আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল।”

“সব কথা হবে। আগে আপনি দেখে আসুন ওখানকার পরিস্থিতি কি?”

“ঠিক আছে, স্যার,” ও সালাম ঠুকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলো হঠাৎ ওসি মল্লিক পেছন থেকে ডাক দিলো।

“বাশার।”

মল্লিকের ডাকে ঘুরে তাকালো বাশার, “স্যার?”

“বাশার, যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। সেটাতো পাল্টানো সম্ভব নয়। আর যেহেতু আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে কাজেই সব ভুলে স্বাভাবিকভাবে কাজ করাই ভালো।”

“অবশ্যই স্যার, আমার তরফ থেকে কোন সমস্যাই হবে না, স্যার,” বলে ও সালাম ঠুকে ওসি মল্লিকের রুম থেকে বেরিয়ে এল।

বাশার বুঝতে পেরেছে মল্লিক শেষ কথাগুলো কেন বলেছে। বাশারকে ওর শহর নিয়ে খোঁচাটা মেরে সে কাজটা ভালো করেনি, ওর মনে কষ্ট দিয়েছে এটা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছে মল্লিক। আর সেই ব্যাপারটাকেই একটু তরল করার জন্যেই সে বলেছে শেষ কথাগুলো। কিন্তু বাশার জানে মল্লিক ব্যাপারটাকে যতোই তরল করার চেষ্টা করুক না কেন ওর মনের ভেতরে বন্ধু হিসেব মল্লিকের অবস্থান চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। মন থেকে কোনদিনই আর ওকে শ্রদ্ধা করবে না ও। থানার বাইরে এসে জিপে উঠতে-উঠতে বাশার ভাবতে লাগলো, মনের গহীনের কষ্টগুলোতে যারা খোঁচা দেয় তাদের প্রতি আর যাই হোক অন্তত শ্রদ্ধাবোধ কাজ করেনা।

অধ্যায় চার

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

মধুপুর বনাঞ্চল, মুক্তাগাছা জমিদারের কাচারি বাড়ি

মনের গহীনের কষ্ট আর অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলোই নাকি বার-বার ফিরে ফিরে আসে মানুষের স্বপ্নে। যদি তাই হয় তবে ক্যাপ্টেন জেমস ম্যাকফির জন্যে সেই চিরাচরিত দুঃস্বপ্নের হাত থেকে কোন নিস্তার নেই।

মুক্তাগাছার জমিদারের কাচরি বাড়ির লম্বা ঝুল বারান্দায় বসে নিজের দিনলিপিতে চোখ বুলাতে-বুলাতে কথাগুলো ভাবতে লাগলো ম্যাকফি। সামনের ঘন সবুজ বনভূমির দিকে তাকিয়ে তার মনে হতে লাগলো, নীল সমুদ্র থেকে যাত্রা শুরু করে সবুজ বনভূমিতে চলে এসেছে ওরা। পথ-প্রান্তর, মানুষ-প্রকৃতি কতো কী বদলে গেল, শুধু পিছু ছাড়লো না সেই চিরচরিত দুঃস্বপ্ন।

সেই একই হাত, একই আর্তনাদ, প্রত্যেকবার সেই একই স্মৃতির ফুলঝুড়ি। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাসের সাথে ও আবারো অনুভব করলো স্বপ্নে দেখা আর্তনাদ করতে থাকা মানুষটা আর কেউ নয় তার মা, আর অত্যাচারী মানুষটা তার বাবা; যাকে সে নিজ হাতে খুন করেছিল।

“ক্যাপ্টেন, স্যারজি,” হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠ শুনে লেখার কাগজগুলো ভাঁজ করে ফিরে তাকালো ম্যাকফি। তার একনিষ্ঠ অনুচর ও দলের প্রধান সেনা-অফিসার মহাবীর সিং দাঁড়িয়ে আছে। নিজের দলের যে-দু’জন মানুষকে ম্যাকফি এখানে নিয়ে আসার অনুমতি পেয়েছিল তাদের ভেতরে মহাবীর সিং একজন। মহাবীর সিং ক্যাপ্টেন ম্যাকফির বিশেষ বাহিনীতে সবচেয়ে প্রভাবশালী কমান্ডার।

যেকোন ইংরেজ বাহিনীর জন্যে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। ভারতবর্ষে বৃটিশ আর্মিতে প্রচুর স্থানীয় ভারতীয়রা কাজ করলেও তাদের বেশিরভাগই খুব

বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পায়না। এমনকি কর্মদক্ষতা দেখানোর পরেও পায় না। আর সেখান বৃটিশ আর্মির একটা বিশেষ দলে একজন ভারতীয়ের যেখানে স্থান পাবারই কথা নয় সেখানে ম্যাকফির দলে ক্যাপ্টেনের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একজন পাঠানের অবস্থান খুবই আশ্চর্য ব্যাপার ।

মহাবীর সিং এর সাথে ম্যাকফির পরিচয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ময়দানে। এর আগে মহাবীর সিং দক্ষিণ ভারতের নিজাম বাহাদুরের বাহিনীতে কাজ করতো। কিন্তু সেখানে নিজামের প্রধান সেনাপতির সাথে বনিবনা না হওয়াতে মোঘলদের বাহিনীতে এসে যোগ দেয় সে। ভগ্নপ্রায় মোঘল সেনাবাহিনীতে মহাবীর সিং এর মতো একজন দূর্ধর্ষ সৈন্যের ভালো লাগার কথা নয়, লাগেওনি। সে ওখান থেকে পালিয়ে এসে যোগ দেয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে।

ইংরেজরা যখন ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের ঘোষণা দিলো তখন তাদের প্রচুর সৈন্যের দরকার। শুধুমাত্র ইংরেজ সৈন্য দিয়ে তাদের প্রয়োজন পরিপূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রচুর ভারতীয় সৈন্য নিজেদের দলে নিয়োগ দিতে শুরু করে। মহাবীর সিং মোঘল সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসে যোগ দেয় ইংরেজ বাহিনীতে। সেখানেই তার স্থান হয় ক্যাপ্টেন ম্যাকফির দলে। মারাঠাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানেই মহাবীর সিংয়ের বীরত্ব চোখে পড়ে ম্যাকফির। সেই থেকে মহাবীর সিংয়ের প্রতি ম্যাকফির একটা টান তৈরী হয়।

যুদ্ধের পর কর্নেলের মাধ্যমে ম্যাকফিকে যখন প্রস্তাব দেয়া হয় বিশেষ একটা দল গঠনের জন্যে তখন সবার আগে ম্যাকফির মনে আসে তার অধীনে কর্মরত অফিসার লিউক জোনাথনের কথা আর ভারতীয়দের ভেতরে মহাবীর সিংয়ের কথা। যদিও এরকম একটা দলে ভারতীয় একজনকে রাখার ব্যাপারে ওপর মহল থেকে যথেষ্ঠ আপত্তি তোলা হয়েছিল কিন্তু ম্যাকফি মহাবীর সিংয়ের ব্যাপারে নিজের জেদ ধরে রাখে। ফলে মহাবীর সিংয়ের জায়গা হয় তার দলে। নিজের দলের কেউই ম্যাকফির নেতৃত্বের ব্যাপারে কিছু বলেনি কিন্তু তার ডান হাত হিসেবে মহাবীরের সিংয়ের আদেশ মানার ব্যাপারে প্রথম দিকে একটু আপত্তি তাদের ছিল। কিন্তু দল গঠনের এক বছরের ভেতরে মহাবীর সিংয়ের সাহস আর কর্মদক্ষতার গুনে সবাই তাকে একবাক্যে দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মেনে নেয়।

মহাবীর সিংয়ের পূর্বপুরুষেরা ছিল রাজপুত কুস্তিগীর। পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই বিশাল দেহ তার। অস্বাভাবিক শারীরিক শক্তি সে পেয়েছে পরিবার থেকে, সেই সাথে বিভিন্ন ফৌজে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করেছে বন্দুক, তলোয়ার আর অন্যান্য ছোট আগ্নেয়াস্ত্রে। পুরোদস্তুর সৈনিকের ইউনিফর্মে থাকলেও নিজের পূর্বপুরুষদের আদলে সবসময় মাথায় লাল-রঙের একটা পাগড়ি পরে থাকে সে। আর কোমরে রাখে ছোট্ট একটা কুঠার।

মাথার বিরাট লাল পাগড়ি নেড়ে সে ম্যাকফিকে অভিবাদন জানালো, “ক্যাপ্টেন স্যারজি, রাজা মশাই আপনার সাথে দেখা করার ইচ্ছে পোষণ করেছেন।”

মহাবীর সিংয়ের দিকে না তাকিয়েই নিজের লেখার কাগজগুলো রোল করতে লাগলো ম্যাকফি। “জোনাথন কোথায়?”

“জোনাথন স্যার, জরুরি কাজগুলো সেরে খোঁজখবর করতে আগেই বাইরে গেছেন। রাজা মশাইয়ের সাথে কথা বলার আগে কিছু ব্যাপারে খবর নেয়া খুব জরুরি। উনি সেসব ব্যাপারেই খোঁজ করতে গেছেন।”

“হুম, বুঝতে পেরেছি। মহাবীর সিং, তোমার সাথে কিছু কথা আছে,” ম্যাকফি ডায়েরি রেখে তার দিকে তাকালো। ছয় ফিট তিন ইঞ্চি উচ্চতার চওড়া সিনা টান করে দাঁড়িয়ে থাকা মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “দলটা ভেঙে যাওয়াতে আমি সত্যি দুঃখিত।”

টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহাবীর সিং যেন একটু কেঁপে উঠলো। দ্বিধার সাথে সে জবাব দিলো, “স্যারজি, আপনি যা করেছেন সেটা ঠিকই হয়েছে। এতে ক’রে যদি আমাদের মৃত্যুদন্ডও হোত সেটাও মেনে নিতে রাজি ছিলাম আমরা। এটাতো অনেক ছোট ব্যাপার। আর খোদা চাইলে আবারো সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি দুঃখ নিবেন না।”

ম্যাকফি নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত রাখলো মহাবীর সিংয়ের কাঁধে। “আমাদের দলটা যদিও আমার নেতৃত্বে ছিল কিন্তু এর ওপর সবার অধিকার সমান। তোমরা সবাই সমান শ্রম-মেধা ব্যয় করেছো এর পেছনে। তবে আমি তো আগেই বলেছিলাম অনেক ঝড় ঝাপটা আসবে আমাদের ওপরে। আমরা এখানে যে-কাজে এসেছি সেটা ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারলে আশা করি আবারো আমরা এক হতে পারবো।”

“জি, স্যারজি,” বলে সে সামনে এগোনোর পথ দেখানো।

ম্যাকফি হাঁটতে লাগলো তার পাশাপাশি। “তুমি কি কোন খোঁজ-খবর করেছো?”

“এখনো তেমন কিছু করতে পারিনি। তবে যা বুঝতে পেরেছি এখানে অনেক ঝামেলা হয়েছে। খবর নিয়ে আমি এটুকু জানতে পেরেছি শুধু ইংরেজ সৈন্যরাই হারিয়ে যায়নি। তাদের সাথে সাথে কিছু স্থানীয় লোকজনও হারিয়েছে। এরা এখানে কী করছিল, কি হয়েছে এই ব্যাপারে কেউই কথা বলতে রাজি না।”

ওরা হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়ায় টানা গাড়ির কাছ পর্যন্ত চলে এসেছে। ম্যাকফিকে গাড়িতে ওঠার জন্যে পাদানিতে পা ফেলেও থেমে দাঁড়ালো। “এর মানে কি? ওরা জানে কিন্তু কথা বলতে রাজি নয়, নাকি কেউ আসলে কিছু জানেই না?”

“স্যারজি, এতোটা আমরা এখনো বের করতে পারিনি। দেখা যাক রাজাসাহেব কী বলেন। আর জোনাথন স্যার তো গেছেই খোঁজ খবর বের করার জন্যে।”

“এখান থেকে রাজার বাড়িতে যেতে কতোক্ষণ লাগবে?”

“আধা ঘন্টার মতো।”

“আচ্ছা, এক কাজ করো,” বলে ও একটু ভাবলো। “জোনাথন তো গেছে জায়গাটা জরিপ করতে। রাজার সাথে দেখা করার আগে আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই। ওকে আমরা চাইলে পথে কোথাও ধরতে পারার সম্ভাবনা আছে?”

“আছে,” মহাবীর সিং জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে সূর্যটা দেখার চেষ্টা করলো। “বেলা তো বেশি হয়নি এখনো...” সে কথা শেষ করার আগেই নিজের বুক পকেট থেকে বের করে চেইনের ঘড়িটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো ম্যাকফি। “সিং, এইটা ব্যবহার করতে শেখো এখন।”

ঘড়িটা হাতে নিয়ে এক পলক চোখ বুলিয়ে ম্যাকফিকে ফেরত দিয়ে মহাবীর সিং বললো, “স্যারজি, এইসব শৌখিন জিনিস আমার সয় না। তারচেয়ে আমার প্রকৃতি মাতাই ভালো। আমার মনে হয় আমরা যদি এখুনি রওনা

দিয়ে বেগুন বাড়ির দিকে যাই তবে পথে জোনাথন স্যারের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। কারণ জোনাথন স্যার যেখানে যাবার কথা সেখান থেকে রাজার বাড়িতে যেতে হলে তাকে বেগুনবাড়ির পথই ধরতে হবে।"

"বেগুনবাড়ি তো আমাদের যাবার পথেই পড়বে নাকি?"

"তা পড়বে কিন্তু আমাদেরকে একটু বামে যেতে হবে।"

"ঠিক আছে ওইদিকেই যাও, আমি রাজার সাথে দেখা করার আগে জোনাথনের সাথে কথা বলতে চাই।"

***

বৃটিশ আর্মির স্পেশার টিমের অফিসার লিউক জোনাথন অবশ্য এই মুহূর্তে এক পিচ্চি ছেলের সাথে দুষ্টামিতে ব্যস্ত।

খুব ভোরে উঠে সে প্রথমে বেরিয়েছিল আশপাশটা দেখতে। কাচারি বাড়ির আশেপাশের জঙ্গলে মহাবীর সিংয়ের সাথে কিছুক্ষণ চক্কর মারার পর জোনাথন সিদ্ধান্ত নেয় ইংরেজ অফিসারেরা যেখান থেকে গায়েব হয়েছে সে-জায়গাটা দেখতে যাবে সে। মহাবীর সিং ফেরত চলে যায় কাচারি বাড়িতে আর জোনাথন এক সহিসকে নিয়ে রওনা দেয় ওদিকে।

ঘন্টাখানেকের মতো লাগে ওদের নদীর পাড়ে নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌছাতে। সহিসকে নিয়েই আশপাশটা ঁুফে একবার চক্কর দিয়ে দেখে নেয় ও। চক্কর মারতে গিয়ে এটা বুঝতে পারে এখানে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষা না করলে তেমন কিছু বোঝা যাবে না। কারণ জায়গাটাতে বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। কাজ শেষে সে আশেপাশে আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। নদীর ঘাট আর বাজারে গিয়ে লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলে কিছু ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে একটা দোকানে এসে পানি খেতে চাইলে এক পিচ্চি ছেলে জগে করে পানি এনে দেয় ওকে। ও খানিকটা পানি খেয়ে কিছুটা পানি নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওর দিকে।

অন্য যেকোন বাচ্চা হলে চমকে উঠতো কিংবা হেসে উঠতো। এই পিচ্চি ঁুফে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকে। একজন সাদা চামড়ার মানুষ

এমনটা করতে পারে, এটা সে মেনেই নিতে পারছে না। ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে- হাসতে ঘোড়ায় এসে উঠলো জোনাথন। সহিসকে নিয়ে রওনা দিলো উল্টো দিকে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সে উদাসীন হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল এরকমই এক জলধারার পাড়ে জন্মেছিল সে। এখান থেকে বহুদূরে, অন্য এক পৃথিবীতে, ফেলে আসা ভিন্ন এক জীবন।

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন পোর্ট এলাকার এক লর্ডের বাড়ির আর্মারারের ঘরে জন্ম জোনাথনের। লর্ডের বাড়ির অস্ত্রাগারের রক্ষক সেই ক্যাথলিক আর্মারারের ছয় নম্বর সন্তান ছিল লিউক জোনাথন। তার বাপ খুব বেশি ধর্মকর্ম মানতো না, তবে তার মা ছিল মারাত্মক ধর্মভীরু। এ-কারণেই ছেলের নাম রেখেছিলেন বাইবেলের চার রচয়িতার একজন লিউকের নামানুসারে। নামের মধ্যে যতোই ধর্মীয় ছোঁয়া থাক না কেন ছোটবেলা থেকেই জোনাথন ছিল একটা বাঁদর বিশেষ। বাপ অস্ত্রাগারের রক্ষক হবার কারণে ছোটবেলা থেকেই অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বড় হয়ে ওঠে সে। আর বন্দর এলাকাতে বাড়ি হবার করণে সমুদ্রের প্রতি তার তৈরী হয় দূর্বার নেশা। তাই মাত্র ছোল বছর বয়সেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ভারতগামী এক জহাজে চড়ে বসে সে।

ভারতবর্ষে নেমে তারই স্বজাতি এক বাটপারের পাল্লায় পড়ে সব হারিয়ে যখন না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে তখন ঘটনাচক্রে ম্যাকফিই তাকে একদিন উদ্ধার করে বিপদের হাত থেকে।

সেই থেকে সে ভিড়ে যায় ক্যাপ্টেন ম্যাকফির বিশেষ দলে। পূর্বের জীবনে অস্ত্রচালনা আর শিকারের অভিজ্ঞতার কারণে দূর পাল্লার অস্ত্র চালনা আর শত্রু দলের ট্র্যাকিঙে অসাধারণ দক্ষতা দেখায় সে। দিন-দিন চর্চা করে এই দক্ষতাকে সে মারাঠাদের সাথে যুদ্ধের সময়ে সময়ে রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হবার পর ম্যাকফির নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর ম্যাকফি যখন বিশেষ দল গঠন করে সাথে সাথে সেটাতে ভিড়ে যায় সে। এরপর থেকে আছে তার সাথেই। কিছুদিন আগে গ্রামের সেই ঘটনার পর ভেবেছিল ওদের পথ বুঝি আবারো ছিন্ন হলো কিন্তু ভাগ্য এখনো তাদেরকে ধরে রেখেছে একসাথেই।

ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে জোনাথনের মনে হতে লাগলো এই জঙ্গুলে এলাকায় যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে যাচ্ছে ওরা সেটার সমাধান খুব

সহজ হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। কারণ সহিসকে নিয়ে লোকজনের সাথে কথা বলে সে যা জানতে পেরেছে সেটা বেশ জটিল। ভাবতে-ভাবতেই ওর ঘোড়া বেগুনবাড়ি বাজারে প্রবেশ করলো। দূর থেকে দেখতে পেল লাল রঙের পোশাক পরা দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে দেখে হাসি ফুঁটে উঠলো তার মুখে।

***

ম্যাকফি নির্দেশ দেয়ার সাথে-সাথে কোচোয়ানকে বলে ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা দিয়ে আধা ঘন্টার ভেতরেই ওরা বেগুনবাড়ি বাজারে পৌছে গেল। বাজার বলতে কিছু দোকানপাট, কয়েকটা গুদাম ঘর, একটা সরাইখানা আর দুটো কাঠ মাড়াইয়ের কল। মুক্তাগাছা জমিদারবাড়ির গোড়াপত্তনের পর স্থানীয় শ্রমিকদের প্রয়োজনেই প্রথম গড়ে উঠেছিল এই বাজার এলাকা। এখনো যে খুব জমজমাট তা বলা যাবে না কিন্তু প্রায় জনমানবহীন এই জঙ্গুলে এলাকার এই অংশে এরকম বাজার মানেই অনেক কিছু। মূলত ব্রহ্মপুত্র নদী পথে যাতায়াতকারী ব্যবসায়িদের জন্যে ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই এলাকা। এছাড়াও স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়িদের অনেকের কাজের যোগানদাতাও এই বেগুনবাড়ি এলাকা। গাড়ি ঘোরানোর আধা ঘন্টার ভেতরে ওদের ঘোড়ার গাড়ি প্রবেশ করলো বেগুনবাড়ি বাজারে। গাড়িটাকে একপাশে করে ওরা নেমে এল।

স্থানীয় লোকজনের দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় খুব বেশি সাদা চামড়ার লোকজন এদিকে আসে না। কোম্পানির সৈন্যরা সম্ভবত আরো কম আসে। কারণ প্রায় সবার দৃষ্টিতেই কৌতুহলের সাথে সাথে এক ধরণের অজানা ভীতির ছায়াও দেখতে পাচ্ছে ম্যাকফি। বৃটিশরা কিভাবে এতো কম লোকবল নিয়েও পুরো উপমহাদেশটা শাসন করতে পারছে আরো খানিকটা পরিষ্কার হলো ম্যাকফির কাছে।

সমীহ ও ভীতি।

বৃটিশদের অনেকগুলো অস্ত্রের মধ্যে এই দুটো অন্যতম।

ম্যাকফি গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো, আর মহাবীর সিং চলে গেল খবর নিতে। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে ফিরে এসে জানালো সকালবেলা একজন সাহেব নাকি এদিকে দিয়ে গেছে কিন্তু এখনো ফিরে আসেনি।

“তারমানে জোনাথন যেকোন সময় ফিরে আসবে। ও যেদিকে গেছে সেদিক থেকে ফেরার রাস্তা তো এই একটাই নাকি?”

“জি, স্যারজি,” মাথা দুলিয়ে বললো মহাবীর সিং। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দূর থেকে ওরা দেখতে পেল লাল পোশাকের ঝলক। এই পোশাক বৃটিশ সৈন্যরা ছাড়া আর কেউ পরে না। তাই এটা জোনাথন না হয়েই যায় না। আরো কাছে আসার পর পরিষ্কার বোঝা গেল। কারণ ঘোড়ার পিঠের ওপরে মানুষটার চেয়ে বেশি নজরে পড়ছে তার পেছন থেকে বেরিয়ে থাকা বিরাট একটা বন্দুক। ঘোড়াটার পিঠে বসে থাকা অবস্থাতেই দূর থেকেই ওদেরকে দেখে হাত নাড়লো সে। কাছে এসে সহিসকে ঘোড়া বুঝিয়ে দিয়ে ওটাকে পাঠিয়ে দিলো কাচারি বাড়ির দিকে।

“আরে বস, তুমি এদিকে!” মুখে হাসি নিয়ে ম্যাকফির সাথে এসে হাত মেলালো সার্জেন্ট লিউক জোনাথন। সাদা চামড়ার মানুষ হিসেবে তার উচ্চতা অনেক কম। কোনমতে ম্যাকফির কাঁধ পর্যন্ত পৌছেছে। বিশালদেহী কুস্তিগীর মহাবীর সিংয়ের সামনে তাকে দেখাচ্ছে অনেকটা ছোট বাচ্চার মতো। তার কাঁধ থেকে ঝুলতে থাকা বন্দুকটা মনে হয় প্রায় তার সমানই লম্বা হবে। “আরে, মহাবীর যে। আমি তো আরো ভাবছিলাম তোমরা এতোক্ষণে রাজার বাড়ি পৌছে গেছ।”

“জন, কি দেখলে ওখানে? কিছু পেয়েছো?” প্রশ্ন করলো ম্যাকফি।

“কথা আছে বস, চলো সরাইখানায় গিয়ে বসি,” ম্যাকফি আর মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো সে।

“নাহ, সময় নেই। গাড়িতে বসে কথা বলবো।”

গাড়িতে উঠে বসলো ওরা সবাই। ম্যাকফির মুখোমুখি বসেছে জোনাথন আর মহাবীর সিং। বসেই পাইপ বের করে ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ম্যাকফি।

সেটা দেখে গভীর নিল চোখ নেড়ে কৌতুকের ভঙ্গিতে একটা টিটকিরি সুলভ হাসি দিলো ছোটখাট সার্জেন্ট জোনাথন। নিজের টুপি খুলে একমাথা

রূপালি চুল নেড়ে হাসতে লাগলো। “বস, তুমি তামাক টানছো! আমাকে যদি কেউ বলতো মহাবীর সিংয়ের মাথায় দুটো শিং গজিয়েছে তাহলেও আমি এতোটা মজা পেতাম না।”

সাথে-সাথে ম্যাকফি আর মহাবীর সিং দুজনেই রাগত ভঙ্গিতে ফিরে তাকালো তার দিকে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের পিস্তল বের করে ওটার যতœ নেয়া শুরু করলো সে।

“জোনাথন, ফাজলামো বাদ দিয়ে বলো ব্যাপারটা কি? যা দেখে এসেছো, বিস্তারিত বলো,” ম্যাকফির ডাক শুনে পিস্তল পরিষ্কার করা বাদ দিয়ে সে মুখ তুলে তাকালো। “রাজার বাড়িতে পৌছাতে কতোক্ষণ লাগবে?”

“আধা ঘন্টার মতো,” জবাব দিলো মহাবীর সিং।

জোনাথন বন্দুকটাকে শেষবারের মতো চেক করে পাশে রেখে ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে জবাব দিলো, “খুব বেশি কিছু বলার নেই। যেতে যেতেই বলছি সব। ”

অধ্যায় পাঁচ

বর্তমান সময়

গাঙ্গিনাপাড়, ময়মনসিংহ

শেষ মোড়ের দিকে যাবার পথে স্মৃতিকাতর একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখলো বাশারকে। সত্যি কথা হলো, ফিরে আসতে যতোই খারাপ লাগুক ময়মনসিংহ শহর ওর নিজের শহর। এই শহরের রাস্তা-ঘাট আর অলি-গলিতেই বেড়ে উঠেছে ও। তাই শহরটার পথে চলতে গেলেই কেন জানি নস্টালজিক লাগে বাশারের। যদিও শহরটা বদলে গেছে অনেক, তবে তারচেয়ে বেশি বদলে গেছে ও নিজে।

“স্যার, একটা কথা আছিল,” বাশারের পেছন থেকে বুড়ো এক কন্সটেবল বলে উঠলো। জিপের সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আছে ও। পেছনে পুলিশের কয়েকজন কন্সটেবল। ওদের পেছনে একটা পুলিশের বড় ভ্যানও আসছে। বাশার ইচ্ছে করেই ওটাকে সাথে নিয়ে এসেছে। কারণ ওখানে গিয়ে কী ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে কে জানে। কাজেই ব্যাক-আপ নিয়ে যাওয়াই ভালো।

বাশার কিছু না বলে চোখের সানগ্লাসটা খুলে কথা বলার জন্যে ইশারা করলো।

“স্যার, আমরার মনে অয় ওসিসাইব আপনারে সব বলেন নাই। ওইহানে আরো কুনো ব্যাপার আছে। আমরাও আপনারে সব বলতে পারতাছি না,” কন্সটেবল কথা বলছে খুব আস্তে-আস্তে। শেষ কথাটা আরো আস্তে বলে তার সাথে বসে থাকা অন্য কন্সটেবলদের দিকে ইশারা করলো।

“স্যার, আমার পরামর্শ থাকবো আপনে খুব সাবধানে থাকবেন। আর সবকিছু খুব সাবধানে সামলানির চেষ্টা করবেন,” অপর কন্সটেবল বলে উঠলো। “আমরা যদিও সব জানি না কিন্তু এইটা বুঝতে পারতাছি ওইহানে কুনো ঝামেলা বাঁধছে আর ওসিসাইব নিজেও ওই ঝামেলা সামলাইতে পারতাইন না। কারণ হেয় নিজে আগেই সাঈদ মিয়ার কাছ থাইক্কা টাকা

খায়া বইসা আছে। তাই হে নিজে ব্যাপারটার সাথে জড়াইতে চাইতাছে না," বলে সে দম নিলো।

"স্যার," পাশ থেকে অন্যজন বলে উঠলো। "এই কেইসডা আপনেরে দেওনের আগে ওসিসাইব আরো দুইজনরে যাইতে কইছিল কেউই রাজি অয়নাই। তাই আপনের ঘাড়ে নামায়া দিছে। কারণ আপনে অহন সহজ শিকার। কাজেই সাবধান।"

কন্সটেবলরা কথা শেষ করতেই বাশার আবার সামনে তাকিয়ে সানগ্লাসটা চোখে পরে নিলো। ওদের জিপ সিকে ঘোষ রোডের মুখের জ্যাম ছাড়িয়ে নতুন বাজারের মোড় পার হয়েছে। জিলা স্কুলের মোড় দিয়ে বামে ঢুকে গেল জিপ। ও নিজে জিলা স্কুলের ছাত্র। স্কুলের গেটের দিকে তাকিয়ে শত-শত স্মৃতি মনে পড়ে গেল ওর। কতো আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা-ভালোলাগা, ভয়-ভীতি, স্যারদের বকুনি-চোখ রাঙানি এড়িয়ে স্কুল পালানো। মানুষ ছোটবেলা ভাবে ইস্ কবে যে বড় হবো, বড় হয়ে এটা হবো, ওটা হবো। আর বড় হয়ে ভাবে ইস্ আবার যদি ছোট হতে পারতাম। মনের গহীন থেকে উঠে আসা হাজারো স্মৃতির ভিড়কে ঠেলে দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে মনস্থির করার চেষ্টা করলো ও। একটু আগে কন্সটেবলের বলা কথাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করছে।

বাশার এটা বুঝতে পারছে, শানকিপাড়া শেষ মোড়ে কিছু একটা হয়েছে যেটা নিয়ে ওসি মল্লিক কোন না কোন গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। যে-গ্যাঁড়াকল সামনা-সামনি মোকাবেলা করার মতো পরিস্থিতি সম্ভবত সে রাখেনি। যে-কারণে এখন ওকে পাঠিয়েছে পুরো ব্যাপারটার মোকাবেলা করতে। ঠিক আছে, দেখা যাক কী অপেক্ষা করছে সামনে। ভালো কিংবা খারাপ যাই থাকুক না কেন, ওর জন্যে একই। কারণ ওর সাথে যা ঘটে গেছে এর চেয়ে খারাপ এই মুহূর্তে আর কিছু হতে পারে না।

ওদের জিপ এই মুহূর্তে শানকিপাড়া রেলক্রশিং পার হয়ে শেষ মোড়ের দিকে চলেছে। আর কিছুক্ষণের ভেতরেই জায়গামতো পৌছে যাবে ওরা। বাশার ঘড়ি দেখলো। একটা বেজে বিশ।

একেবারেই মধ্যদুপুর। পেটের ভেতরে ক্ষুধার মৃদু গুড়গুঁড়ানি টের পাচ্ছে ও। গতকাল পর্যন্ত সকালে নাস্তা খাবার পরে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দুপুরে খাওয়া। আর আজ দুপুরে খাবার সুযোগ পাবে কিনা কে জানে। শেষ মোড়ে এসে গাড়ি ডানে মোড় নিলো। ওয়াকিটকিতে রিপোর্ট

শেষ করতে-করতেই ওদের জিপ বেশ খানিকটা এগিয়ে মূল রাস্তার পাশেই একটা পুকুর পাড়ে এসে থেমে গেল।

জায়গাটা বাশারের বেশ পরিচিত। ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়ার সময়ে ও প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতো। এই এলাকাতে ওর বেশ কিছু বন্ধু ছিল। ওরা মিলে এই পুকুরের অন্যপাড়ে শীতের সময়ে কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলতো প্রতি বছর। কোন এক অজানা কারণে এই পুকুরটাকে ওরা ডাকতো 'পাগলার পুকুর'। এই পাগলার পুকুর নিয়ে বেশ কিছু স্মৃতিও আছে ওর। এই পাগলার পুকুরের পাড়ে ব্যাডমিন্টন খেলতে এসেই কোন এক 'শুভক্ষণে' প্রথমবারের মতো সিগারেটে টান দিয়েছিল। কলেজে পড়ার সময়ে মাঝেমাঝেই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে এই পাগলার পুকুরের পাড়ে এসে বসে থাকতো ও।

জিপ থেকে নেমেই চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ও। শেষবার এখানে এসেছিল বহুবছর আগে। চারপাশের বাড়ি-ঘরের ভেতরে শুধুমাত্র পাগলার পুকুরটারই অস্তিত্ব আজো বিদ্যমান। বাকি সবই বদলে গেছে। পাগলার পুকুরের চারপাশের খালি জায়গাগুলো সব অদৃশ্য হয়ে সেখানে এখন বড়-বড় ভবন দৃশ্যমান। পুকুরপাড়ের আশেপাশের স্থাপনা থেকে শুরু করে রাস্তার একাংশ পর্যন্ত পাল্টে গেছে। ডেভলাপারদের জাদুর ছোঁয়ায় পাল্টে গেছে প্রায় পুরো ময়মনসিংহ শহর। মুক্তি নেই পাগলার পুকুরেরও।

মাকড়শার জালের ভেতরে মাছি আটকে পড়লে মাকড়শা যেভাবে ধীরে-ধীরে তার প্রাণশক্তি চুষে ছোবড়া বানিয়ে ফেলে ঠিক তেমনি মাকড়শার দাড়ার মতোই অসংখ্য পাইপ গিয়ে ঢুকেছে পাগলার পুকুরের ভেতরে। এই পাইপগুলোই পুকুরের পানি টেনে নিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ফেলেছে তাকে। প্রায় পানিহীন পুকরের কাদাযুক্ত তলা দেখা যাচ্ছে এখন। পুকুরের পাড়ে অসংখ্য মানুষের ভিড়।

যখন কাজে নামে তখন বাশারের কাছে মনে হয় যেন রক্তের ভেতরে জোয়ার চলে আসে ওর। শরীরের ভেতরের শিরা-উপশিরা দিয়ে বানের স্রোতের মতো ছুটতে থাকে টগবগে রক্ত। বিগত কয়েক মাসের ব্যবধানে ওর নিজের ভেতরে এই অনুভূতিটা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। বহুদিন পর কাজে নেমে পুরনো সেই অনুভূতি যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। প্রতিবার কোন মিশনে নামার আগে, কোন কেস সলভ করার প্রাক-মুহূর্তে সেই একই

উত্তেজনা, সেই একই অনুভূতি তাড়া করে ফেরে ওকে। চোখের ওপরে সানগ্লাসটাকে ঠিক করে কন্সটেবলদের নিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এগোল সে। আর ঠিক তখুনি চোখে পড়লো অদ্ভুত দৃশ্যটা।

পাগলার পুকুর ড্রেজিং করে প্রায় শুকিয়ে ফেলা হয়েছে। তলার কাদা দেখা যাচ্ছে। পুকুরের পাড়ে এক জায়গায় চালা তুলে কন্সট্রাকশন কোম্পানির জিনিসপত্র রাখা হয়েছে। সেটার সামনেই বিরাট একটা ক্রেনট্রলি বসানো পুকুর পাড়ে। ক্রেনের সাথে আটকানো একটা গাড়ি। গাড়িটাকে সম্ভবত পুকুরের তলা থেকে টেনে তোলা হয়েছে ক্রেন দিয়ে। কারণ ওটার সারা গায়ে কাদা লেগে একেবারে সাদাটে দেখাচ্ছে। দূর থেকে দেখে বোঝা গেল না গাড়িটার রঙ কালো নাকি সাদা। আধঝুলন্ত গাড়িটার একটা অংশ ক্রেনের সাথে আটকানো, আর অন্য অংশটা পুকুর পাড়ের মাটি ছুঁয়ে আছে। গাড়িটার সামনের উইন্ডশীল্ড ফেটে মাকড়শার জালের মতো হয়ে আছে। কাদা আর শ্যাওলায় ছেয়ে আছে সম্পূর্ণ গাড়ি।

কন্সটেবলদের সাথে বাশারকে দেখতে পেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল একজন, তার পেছনে আরো কয়েকজন। সবার সামনের দিকে থাকা লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই লোকটাই এখানকার অবিসংবিদিত নেতা। লোকটাকে দেখা মাত্রই হাতের ছোট্ট পুলিশি লাঠির ডগা দিয়ে দিয়ে বাম হাতের আংটিটাতে একবার টোকা দিলো বাশার।

যে-মানুষটা এগিয়ে আসছে তার পরনে সাদা পাজামা, ধূসর রঙের পাঞ্জাবি। মাথায় এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, চোখে গোল সিলভার রিমের চশমার আড়াল থেকে চোখজোড়া যেন ঘোলাটে আলোর চর্ট লাইটের মতো জ্বলছে। কানে একটা চ্যাপ্টা সোনার রিং চক-চক করছে। ছোটবেলা থেকে নাম শুনলেও সাঈদ আলীকে কখনো দেখেনি বাশার। ও অনুমান করলো, এই লোকটাই সাঈদ কন্ট্রাকটার। মানষটা শুকনো হলেও ভুরিটা তার বিরাট।

মানুষটা এই মুহূর্তে মুখে একটা কৃত্রিম হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, হ্যান্ড-শেইক করার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিয়েছে একটা হাত। লোকটা কিছু বলার আগেই তার হাতটা ধরে জোরে একটা ঝাঁকি দিলো বাশার।

“আপনি নিশ্চই কন্ট্রাকটার সাঈদ আলী?” বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে জোরে একটা চাপ দিলো ও।

“জি, জি, ইন্সপেকটর সাহেব,” বলে সে হাতটা বাশারের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার লোকদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, “এই কি করিস তোরা! ইন্সপেক্টর সাহেবের বসার জন্যে চেয়ার আন। এই, তুই যা ঠান্ডা নিয়ে আয়। ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনারা এদিক দিয়া আসেন।”

ক্রেনের সাথে লাগানো গাড়িটা এখন পুকুর পাড়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। ওদেরকে পথ দেখিয়ে সামনের নিয়ে যাওয়া হলো। গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার ওটার দিকে তাকালো বাশার। ঘোলাটে কাদা আর সবুজ শ্যাওলায় ঢেকে আছে পুরো গাড়ি।

ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ক্রমাগত কথা বলে চলেছে সাঈদ কন্ট্রাকটার। তার কথার তোড়ে গাড়িটার দিকে খুব একটা খেয়াল করতে পারলো না বাশার। ওরা গাড়িটা পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

কন্সট্রাকশনের কাজে ব্যবহারের জন্যে টিনের চালা দিয়ে ছোট একটা ছাউনির মতো ফেলা হয়েছে। সেখানে পেতে রাখা হয়েছে কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল। ওদেরকে নিয়ে সেখানে বসানো হলো। বসার প্রায় সাথে সাথেই পরিবেশন করা হলো কোল্ড ড্রিঙ্ক।

“ইন্সপেক্টর সাহেব নেন,” সাঈদ আলী একটা গ্লাস এগিয়ে দিলো ওর দিকে। “এই সামান্য ব্যাপারে আপনেরা না আসলেও চলতো। আমি তো ওসিসাহেব মানে মল্লিক স্যাররে কল দিয়া না করতে চাইছিলাম। আসলে ব্যাপার হইছে কি, এইখানে অনেক রাজনীতি আছে। আমি এই জায়গাটার উন্নতি সাধন করতে চাইছেতি এইডা অনেকেরই ভালা লাগতাছে না। তাই ক্যামনে কাম বন্ধ করবো সেই উছিলা খুঁজতাছে। আর বোঝেনই তো সব লাইনেই কম্পিটিশিন এহন বাইড়া গেছে। স্যার, নেন না। ঠান্ডা ছাইড়া দিবে তো।”

এদের অতিরিক্ত আদর-যতœ ভালো লাগছে না বাশারের। ময়মনসিংহ শহরে সাঈদ কন্ট্রাক্টার মানে একটা বিরাট ব্যাপার। সেই লোক তার মতো একজন ইন্সপেক্টরকে তেল মারছে কেন, সেটাও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ওর। কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাশে চুমুক না দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো ও। সাঈদ কন্ট্রাকটার তড়-বড় করে কী জানি বলছিল সিগারেট ধরাতে-ধরাতে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো বাশার।

“সাঈদসাহেব, আপনি আগে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।”

“স্যার, পুরা ব্যাপারটা মানে?”

“এই যে গাড়ির ব্যাপারটা। এটা কিভাবে খুঁজে পেলেন আপনারা? আর এটা এখানেই বা এল কিভাবে? কার গাড়ি হতে পারে আপনার কোন ধারণা আছে?” বাশার ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে জানতে চাইলো।

“কার গাড়ি, এইনে কেমনে আইলো, সেইটা তো কইতে পারছি না তবে আমরা এইডারে খুঁজে পাইলাম সেইটা বিস্তারিত কইতে পারি। আসলে বিস্তারিত কওনেরও দরকার নাই। ঘটনা সামান্যই। এই জায়গাডাতে কাজ করার জন্যে বহুদিন যাবৎ আমার কোম্পানি চেষ্টা করতেছিল কিন্তু সেইটা সম্ভব হইতেছিল না। অবশেষে আমরা যহন কাম শুরু করুনের প্রস্তুতি নিতাছি তহনি ওই খাদেমের লোকেরা আমগো পিছে লাগলো। কাম আর শুরু করতে পারতেছিলাম না।”

খাদেম ছলিমুল্লাহ নামে আরেকজন ডেভলাপার আছে এই শহরে। সেও সাঈদ কন্ট্রাকটারদের মতোই প্রভাবশালী। দুই কোম্পানির ভেতরে তুমুল প্রতিদ্ব›িদ্বতা, এটা বাশার জানে। “সাঈদসাহেব এতোকিছু শুনে আমার কাজ নেই। গাড়িটা কিভাবে পেলেন সেটা বলেন,” বাশার সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পিষে দিলো।

“যাই হোক,” হঠাৎ করে বাশার থামিয়ে দেয়াতে সে কথার তাল হারিয়ে ফেলেছে। “মানে ঘটনাগুলা বলতেছিলাম যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয়,”

লোকটা কি একটু নার্ভাস, মনে মনে ভাবলো বাশার। এর মতো পোড় খাওয়া লোকের তো এরকম হবার কথা নয়।

“তো কাইল রাইতে সব ঠিকঠাক কইরা আইজ সকাল থেইক্কা কাম শুরু করনের পরে পুকুরের পানি যখন কমতে শুরু করে প্রথমে আমার এক কর্মচারি দেহে পুকুরের তলায় কী জিান দেহা যাইতেছে। পানি আরেকটু নামার পরে দেহা গেল ওইটা একটা গাড়ি। আমি তখনো এইখানে আসি নাই। ফোনে কইলাম কেরেন দিয়া গাড়িটা টাইনা উডানির লাইগা। কেরেন দিয়া উডাইতে গিয়া খবর ছড়ায়া গেল। কে জানি ওসিসাবরেও খবর পাঠায়া দিলো। তো আমি এইহানে আইসা পৌছানির লগে-লগেই আপনেরা হাজির। কার গাড়ি, কে জানে। কেমনে আইয়া পড়লো সেইডাও তো বাইর করা সম্ভব না। গাড়ির অবস্থা দেইখা মনে হইতেছে অনেক আগে থাইক্কাই পইড়া ছিল এইহানে।”

সাঈদ আলীর শেষ কথাটার সাথে একমত হলো বাশার। এতোক্ষণ যাবৎ সাঈদ কন্ট্রাক্টার কেন এরকম অসংলগ্ন আচরণ করছিল সেটার ব্যাপারেও খানিকটা ধারণা পেল ও।

এই ব্যাটা বহু কষ্টে এইরকম একটা দামি জায়গা বাগাতে পেরেছে। এখন কাজ শুরু করার পর একটা সামান্য ঘটনার কারণে পুরো ব্যাপারটা ভেস্তে যেতে পারে ব'লে ভয় পাচ্ছে সে। বাশারের কাছে মনে হলো ঘটনা আসলে খুব সামান্যই কিন্তু সাঈদ কন্ট্রাকটারের প্রতিদ্ব›িদ্ব কোন গ্রæপ এটাকেই বড় আকারে প্রচার করেছে। ওরাই সম্ভবত খবরটা থানায় পাঠিয়েছে। কারণ শুধু ওসি আর সাঈদ কন্ট্রাকটারের মাঝে থাকলে ব্যাপারটা তদারকি করার জন্যে ওসি ওকে পাঠাতো না। ও যখন এখানে এসেছিল তখন ভেবেছিল সাঈদ কন্ট্রাকটারের সাথে একচোট ঝামেলা করবে কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে তেমনটা করার আসলেই কোন দরকার নেই।

"সাঈদসাহেব, একটা ঘটনা যেহেতু ঘটে গেছে কাজেই ব্যাপারটা আমাদের তদন্ত করে দেখতেই হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তেমন কিছু না। আপনারা কাজ চালিয়ে যান। আমরা গাড়িটা সিজ করে নিয়ে যাচ্ছি। কার গাড়ি, কোত্থেকে এসেছে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।"

কথাগুলো বলার সাথে-সাথে সাঈদের চেহারা অভিব্যক্তি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছিল বাশার। একইসাথে দু-ধরণের অভিব্যক্তি খেলে গেল তার চেহারায়। বাশারের প্রথম কথাটা শুনে স্বস্তির আর দ্বিতীয় কথাটা শোনার সাথে-সাথে তার চেহারায় ফুটে উঠলো অস্বস্তি। "আরে স্যার, আপনেগো এতো ঝামেলা করার দরকার কি। আর গাড়িটার যে-অবস্থা তাতে এইডারে থানায় নিতে বহুত হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে। তারচেয়ে যদি অনুমতি দেন তবে আমার লোকেরাই এইটারে পরিষ্কার কইরা বিকালের আগেই থানায় দিয়া আইবো।"

কন্ট্রাকটারের প্রস্তাব খারাপ না, তবে এই লোকটার কাছ থেকে কোন নিগ্রহ নিতে ইচ্ছে করছে না বাশারের। ও মানা করতে যাচ্ছিলো পাশ থেকে সেই বয়স্ক কন্সটেবল মৃদু স্বরে বলে উঠলো, "স্যার, এইটুক কাম তারেই করতে দেন। সে আরো বড় কিছু করতেও রাজি ছিল। আপনি তো তার কাছ থেকে কোন সুবিধাই আদায় করতে পারলেন না। আর আমগোর লগে এহন টো-ট্রেরাকও নাই। গাড়িটা ওরাই পৌছায়া দিয়া আসুক। "

কন্সটেবলের যুক্তি খারাপ না। “ঠিক আছে, সাঈদসাহেব আপনারা কাজ চালিয়ে যান। আমরা যাই। তাহলে আপনিই ওটাকে পরিষ্কার করে বিকেলের ভেতরে থানায় পাঠিয়ে দিয়েন। ”

“অবশ্যই, স্যার।”

বাশার পুরো ব্যাপারটা টকিতে রিপোর্ট করতে-করতে হাঁটতে লাগলো। গাড়িটার কাছে এসে মুহূর্তের জন্যে থামলো ও। ওটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রওনা দিলো জিপের দিকে। ওর সাথে-সাথে আসছে কন্সটেবলরা আর ওদের পেছনে সাঈদ কন্ট্রাকটার আর তার লোকেরা। রিপোর্ট শেষ করে টকিটা রেখে জিপে উঠতে গিয়ে নিজের ভেতরে অস্বস্তির একটা খোঁচা অনুভব করলো বাশার। কী জানি একটা মিলছে না। কী জানি একটা দেখতে পেয়েছে সে যেটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি ওর কাছে। জিপে উঠতে গিয়েও থেমে গিয়ে আবারো গাড়িটার দিকে এগোল ও।

গাড়ির সামনের উইন্ডশীল্ড শ্যাওলায় প্রায় ঢেকে আছে কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে আবছাভাবে ভেতরে দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। ভেতরে অস্বাভাবিক কী জানি একটা আছে। বাশার কাঁচের ওপরে হাতের ছড়িটার ডগা দিয়ে ডলা দিতে ওটা আরেকটু পরিষ্কার দেখতে পেলো। হলদে-সাদাটে কিছু একটা আছে ভেতরে।

“এ্যাই, কেউ একজন গাড়ির দরজা খোলো,” বাশার উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলো। কেউ কোন জবাব দিলো না।

“কী হলো দরজা খুলতে বললাম না,” সাঈদ কন্ট্রাকটারের লোকেরা সবাই চুপ। কন্ট্রাকটার নিজে এগিয়ে এসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই ধমকে উঠলো বাশার। “আপনি চুপ,” বলে ও গাড়িটার দরজার একেবারে কাছে গিয়ে হাতের ছড়িটা দরজার সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ডালার ভেতরে ঢুকিয়ে চাপ দিলো। দুই তিনবার শক্ত চাপ দিতেই হেলে পড়লো ওটার দরজা।

দরজা খুলে যেতেই ভেতরে পরিষ্কার দেখা গেল একজন মানুষের কঙ্কাল। বাশার মাথা নিচু করে উঁকি দিলো ভেতরে। শ্যাওলা-কাদায় অনেক জায়গা ঢেকে থাকলেও ওটা যে একজন মানুষের দেহাবশেষ এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

অধ্যায় ছয়

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

বেগুনবাড়ি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

“খুন হোক আর ডাকাতিই হোক একটা দেহাবশেষ পর্যন্ত নেই, এটা কেমন কথা?” খুবই চিন্তিত মুখে তার সামনে বসে থাকা জোনাথনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো ম্যাকফি।

“এই ব্যাপারটাই তো অবাক করছে আমাকেও,” নিজের ধূসর চোখের মণি নাচিয়ে জবাব দিলো জোনাথন। “অন্তত আমি তো কিছুই পেলাম না।”

“জোনাথন, তুমি কতোটা গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেছো?” ম্যাকফি ঘোড়ার গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের জঙ্গল দেখছে। রাস্তার দুপাশে গভীর অরণ্য সবুজ দেয়ালের মতো গভীর হয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

“বস, আমি জায়গাটা খুব গভীরভাবে দেখতে পারিনি, জায়গাটার সন্ধান বের করার পর মনে হলো একবার অন্তত চোখ বুলানো উচিত তাই ওখানে গেলাম। একে তো জায়গাটা যতোটা দূরে হবে বলে ভেবেছিলাম তারচেয়ে বেশি দূরে ছিল তাই যেতে সময় লাগলো। তার ওপরে ওখানে পৌছানোর পর মনে হলো আর দেরি করলে রাজার বাড়ি পৌছাতে দেরি হয়ে যাবে তাই বেশি দেরি করিনি।”

“হুম্,” ম্যাকফি চিন্তিত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কোম্পানির সৈন্যদের হারিয়ে যাবার ব্যাপারটা ঠিক যতোবার মাথার ভেতরে নেয়ার চেষ্টা করছে ঠিক ততোবারই পুরো ব্যাপারটা ঘোলাটে মনে হচ্ছে।

“বস, যদি কিছু মনে না করো তবে পুরো ব্যাপারটা আমি একবার বিস্তারিত শুনতে চাই। আসলে ঘটেছিল কি এখানে?” এভাবে কোম্পানির সৈন্যরা কখনো হারিয়ে যায় না। অন্তত আমি শুনিনি।”

“স্যারজি, আমিও শুনতে চাই,” মহাবীর সিং গোঁফে মোচড় দিতে দিতে মাথা নেড়ে জানতে চাইলো।

পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলতে শুরু করলো ম্যাকফি, “আমি নিজেও খুব বেশি বিস্তারিত কিছু জানি না। মাদ্রাজের দুর্গে কর্নেল আমাকে খুব বেশি কিছু বলার সময় পাননি। আর এরপর তো এখানেই চলে এলাম। তবে কর্নেলের দেয়া রিপোর্টে খুব সংক্ষেপে যা লেখা ছিল তাই জানি। আর সেটাই শোনাচ্ছি তোমাদের। বাকিটা আমাদেরকে রাজাসাহেবের কাছ থেকে শুনে নিতে হবে।”

“বস, তুমি কথারে এতো প্যাচাইতে পারো। আসল কথা শুরু করো,” যথারীতি কথা শুরু করার আগেই জোনাথনের তী² খোঁচা। বৃটিশ আর্মি তো বটেই এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতেও কেউ ভাবতেও পারবে না একজন জুনিয়র এভাবে একজন সিনিয়রের সাথে কথা বলছে। তবে ম্যাকফির দল যেমন আলাদা ঠিক তেমনি ওদের অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতিও আলাদা।

“ঠিক আছে, মূল কথায় আসছি,” জোনাথনের উত্তর শুনে মুচকি হাসি দিলো ম্যাকফি। “মুক্তাগাছার জমিদার পরিবার, যাকে আমরা রাজা বলে ডাকছি, এদের পারিবারিক উপাধি আচার্য। তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছে শ’খানেক বছর যাবৎ। মনে হয় তারা বাংলা প্রদেশের বগুড়া অঞ্চল থেকে মোঘলদের শাসনামলের সময়ে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসেছে। এই অঞ্চলের একটা বড় অংশ তাদের অধীনে। সত্যিকার অর্থে এই অঞ্চলে বেগুনবাড়ি, মুক্তাগাছা এসব অঞ্চলে যাবতীয় স্থাপনা থেকে শুরু করে ব্যবসার একটা বড় অংশ তাদেরই গড়ে তোলা। এই এলাকাতে দুটো প্রধান পরিবার আছে; তালুকদার পরিবার আর আচার্য পরিবার।”

“এই দুই পরিবারের বিবাদ বহু পুরনো। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি এই এলাকাতে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চাইলে বর্তমান রাজার বাবা আর তালুকদার পরিবারের কর্তা নিজেদের বিবাদ ভুলে একসাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরী করে কোম্পানিকে এই এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। রাজ্যটা খুব বেশি বড় না হওয়াতে আর অন্যান্য এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার কারণে কোম্পানি তখন এইদিকে খুব বেশি নজর দেয়নি,” পাইপের আগুন নিভে যাওয়াতে আবারো ওটাকে ধরাতে ধারাতে বলতে লাগলো ম্যাকফি।

“তো মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ ততোদিনে শেষ হয়েছে সেইসাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ততোদিনে নিজেদের ছোট-ছোট রাজ্যগুলোর দিকে নজর দেয়া শুরু করেছে। হঠাৎই এই রাজ্যের দিকে কোম্পানির নজর পড়ে একটা বিশেষ কারণে। ব্রহ্মপুত্র নদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ততোদিনে মেঘালয় রাজ্য দখল করেছে। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক পণ্য তারা এই মুল্লুকে আনতে পারলে চট্টগ্রাম কিংবা অন্যান্য বন্দর দিয়ে রপ্তানি করে বড় আকারের ব্যবসা করতে পারবে। সেটা করতে হলে ব্রহ্মপুত্র নদ তাদের জন্যে হতে পারে সরাসরি যোগাযোগের দারুণ একটা মাধ্যম। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের পাশেই ভাওয়াল গড়ের এই একটি বিশেষ অঞ্চল পুরোপুরি এখানকার জমিদার পরিবার আর তালুকদার পরিবারের দখলে। তো এখান দিয়ে নদীপথে পণ্য পারাপার করতে হলে, হয় তাদের অনুমতি লাগবে আর না হয় তাদের সাথে সমঝোতায় আসতে হবে। আর না হয় তাদের রাজ্য দখল করতে হবে। কোম্পানি এই তিনটের কোনটাই করতে পারেনি এতোদিন। এইদিকটায় কোম্পানির নজর পড়ার আরেকটা কারণ হলো এই অঞ্চল ভালোমানের কাঠের জন্যে খুবই বিখ্যাত। এতোদিন সুযোগ না পেলেও যুদ্ধ শেষ হবার পর আবারো কোম্পানি এদিকে নজর দেয়া শুরু করে। সেইসাথে তারা একটা সুযোগও পেয়ে যায়।”

“কি সুযোগ?” জোনাথন প্রশ্ন করলো।

“সুযোগটা হলো, ততোদিনে এই রাজ্য পূর্ববতী রাজার আয়ত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই রাজ্যের শাসন কর্তা হয়েছে আগের রাজার ছেলে। বর্তমান রাজা। এই লোক ক্ষমতায় বসতেই তার সমস্যা দেখা দেয় এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী তালুকদার পরিবারের সাথে। এই পরিবারের সাথে বিবাদ মোকাবেলা করার জন্যে সেইসাথে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্যে বর্তমান রাজা নিজে থেকেই আগ বাড়িয়ে ইংরেজদের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে। কোম্পানির জন্যে তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। কারণ বহুদিন যাবৎ তারা এই এলাকাতে ঢোকার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না। তাই সুযোগ পেতেই তারা শুভেচ্ছা স্বরূপ তাদের অফিসার আর সৈন্যদের একটা দলকে এখানে প্রেরণ করে রাজার সাথে কথা বলার জন্যে। এই দলটার সাথে উপহার হিসেবে বেশকিছু অস্ত্রসহ আরো অনেককিছুও পাঠায় তারা। অফিসারদের এই দলটা নাকি রাজাসাহেবের সাথে দেখাও করেছিল কিন্তু এরপর হঠাৎ করেই তারা হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় মানে একেবারেই গায়েব হয়ে যায়। তাদের আর কোন নাম-গন্ধ নিশানা কিছুই নেই,” বলে সে

একটু থামলো। “আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে এদের আসলে কী হয়েছে সেটা খুঁজে বের করার জন্যে। কিন্তু এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে।”

“আচ্ছা সেগুলো শোনার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যারজি,” হঠাৎ মহাবীর সিং বলে উঠলো।

“বলো, মহাবীর।”

“এই সৈন্যরা যে হারিয়ে গেছে সেটা কোম্পানি জানলো কিভাবে? তাদেরকে জানিয়েছে কে?”

“এখানকার রাজাসাহেব। প্রথমত সৈন্যরা এখানে পৌছানোর পর রাজার সাথে মোলাকাত ও প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে তারা এখানকার স্থানীয় কুঠিতে দূতের মাধ্যমে কী কী আলোচনা হয়েছে সেগুলো জানিয়ে খবর পাঠায়। সেখানে তারা উল্লেখ করেছিল রাজাসাহেব কী একটা ব্যাপারে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করেছে। এই বিষয়ে তারা রাজার সাথে আরো কয়েকদফা আলোচনা সেরে ফিরতি পথে রওনা দেয়ার কথা। কিন্তু এরপর তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।”

“এরপরে দুইদিন চলে যাবার পর রাজাসাহেবের কাছে খবর পাঠানো হলে উনি জানান কোম্পানির সৈন্যরা আগেই চলে গেছে। তখন চারপাশে খোঁজ-খোঁজ রব ওঠে। রাজাসাহেব কোম্পানির দূতকে নিয়ে চারপাশে খবর লাগানোর পর জানা যায় কোম্পানির সৈন্যরা এখান থেকে রওনা দেয়ার পর তাদেরকে শেষবারের মতো বেগুনবাড়ির জঙ্গলের কাছে ক্যাম্প করতে দেখা গেছিল এরপর তাদের আর কোন খোঁজ নেই। সেই ক্যাম্পের জায়গাতেই তুমি আজ গেছিলে,” ম্যাকফি জোনাথনের দিকে ইশারা করলো।

“এরপর কোম্পানির ছোট একটা দল এসে তাদের খোঁজ লাগানোর পরও তাদের আর কোন খবর পওয়া যায়নি। এরপরেই পাঠানো হয় আমাদেরকে। আচ্ছা, আগে যা বলছিলাম। এই পুরো ব্যাপারটাতে বড়-বড় কয়েকটা ঘাপলা আছে। প্রথম ঘাপলা হলো, কোম্পানির সাথে চুক্তি করার জন্যে এখানকার রাজাসাহেবই নিজে থেকে আগ্রহ দেখিয়েছিল। এরপর সে নিজেই কোম্পানির সৈন্যদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। তার আয়ত্বের ভেতর থেকেই কোম্পানির সৈন্যরা গায়েব হয়েছে। এরা গায়েব হবার পর সে অনেক খোঁজ খবর করেছে। একটা পর্যায়ে ওদেরকে খুঁজে বের করতে না পেরে আমাদের এই বিশেষ দলের জন্যে সেই আবেদন করেছে। তবে

এখানে প্রশ্ন হলো এই রাজা কি আসলেই জানে না ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, নাকি মুখে যতোই বলুক সে ও আসলে বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোম্পানির বিরোধিতাই করতে চাইছে, এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।"

"অন্যদিকে কোম্পানির সৈন্যদের হারিয়ে যাবার পেছনে সত্যি-সত্যি যদি রাজার কোন হাত না থেকে থাকে তবে তাদেরকে এভাবে কে গায়েব করে দিলো এইটা বের করাটা একটা জটিল ব্যাপার হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে প্রতিপক্ষ আছে তিনজন," বলে ম্যাকফি একটা হাত তুললো। "প্রথমত, রাজাসাহেব নিজেই এদেরকে গায়েব করে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এই এলাকার দ্বিতীয় প্রভাবশালী তালুকদার পরিবার। তাদের সাথে স্থানীয় রাজার সম্পর্ক খুবই খারাপ। আচার্য আর তালুকদারদের ভেতরে শক্তির ভারাসাম্য এখন সমানে সমান। কোম্পানি যদি আচার্যদের সাথে হাত মেলায় তবে তালুকদারদের শক্তি অনেকটাই কমে যাবে। তাই এটা ঠেকানোর জন্যে তারাও এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। যদি এই দুই প্রতিপক্ষের ভেতরে কেউ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবুও আমাদের কাজ কঠিন হবে কিন্তু সম্ভব হবে। আমাদের তৃতীয় সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হতে পারে কোন স্থানীয় ডাকাত কিংবা জলদস্যুদের দল। যদি এরকম কেউ কাজটা করে থাকে তবে তাদেরকে খুঁজে বের করে মোকাবেলা করাটা অনেক কঠিন হবে। কারণ যারা কোম্পানির সৈন্যদের গায়ে হাত দেয়ার সাহস রাখে তাদের মোকাবেলা করাটা সহজ হবে না। এবার জোনাথন বলো তুমি কি বের করেছো?"

"তুমি যা বললে মোটামুটি এইরকমই খবর রটেছে চারপাশে। তবে মানুষজন আতঙ্কে আছে। এতোদিন আচার্য আর তালুকদাররা নিজেদের ভেতরে বিবাদ করেছে। এখন তাদের সাথে যোগ দিয়েছে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকজন, স্থানীয়রা এটা নিয়ে খুবই শঙ্কায় আছে। বিশেষ করে এই এলাকাতে ইংরেজদের প্রবেশ কেউই ভালোভাবে দেখছে না," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমাদের কাজটা আসলে কি? সৈন্যদের পরিণতি খুঁজে বের করা, তাদের সন্ধান বের করা, নাকি যারা তাদের ক্ষতি করেছে তাদেরকে খুঁজে বের করা? নাকি তাদের মোকাবেলা করা?"

"এই ব্যাপারটা আমার কাছেও পরিষ্কার না। আমাদেরকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে মনে রেখো এখানে আমরাই সবদিক থেকে বিপদে আছি। কারণ আমরা জানি না আমাদেরকে কেন ডেকে আনা হয়েছে। আমাদেরকে কি শিকারী হিসেবে ডেকে পাঠানো হয়েছে নাকি শিকার

হিসেবে সেটাই প্রথমত পরিষ্কার না। দ্বিতীয়ত, যদি সত্যি-সত্যি শিকারী হিসেবে ডেকে আনা হয়ে থাকে তবে আমরা আমাদের শিকারকে কিভাবে খুঁজে বের করবো সেটাও আমরা জানি না। এটা হলো স্থানীয় সমস্যা। এরপর মনে রেখো আমাদেরকে যারা পাঠিয়েছে তারা আমাদেরকে মাদ্রাজ থেকে বিদায় করে বেঁচেছে। এরা আমাদেরকে খুব বেশি সহায়তা করবে না। আবার ভারতবর্ষে এই প্রথম যুদ্ধবস্থা ছাড়া এভাবে কোম্পানির সৈন্যদেরকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। এই ব্যাপারটা এখন পুরো ভারতবর্ষ তো বটেই এমনকি ইংল্যান্ডের রাজ প্রশাসন পর্যন্ত চলে গেছে। কাজেই এতে ব্যর্থ হলে আমাদের মুন্ডু চিবিয়ে খাবার মতো লোকের অভাব হবে না। কাজেই বুঝতেই পারছো পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে।”

“সর্বনাশ! আমি তো এতোকিছু ভাবিইনি। এখন তো বেশ ভয়-ভয় লাগছে,” বলে খিক-খিক করে হাসতে লাগলো জোনাথন। তার হাসির সাথে সাথে সুর মেলালো মহাবীর সিং। জোনাথন হাসাতে কোন সমস্যা হয়নি কিন্তু মহাবীর সিং হাসতে শুরু করার সাথে সাথে গাড়ির কাঠের একটা অংশ মৃদু কাঁপতে লাগলো। ওদের হাসি দেখে পাইপ নামিয়ে রেখে তাতে সুর মেলালো ম্যাকফি।

তিনজনের হাসি দেখলে যে কেউ ভাববে তারা কোন উৎসবে চলেছে। আরো কিছুক্ষণ চলার পর কাচোয়ান চিৎকার করে জানালো সামনে এক ঘোড়সওয়ার গাড়ি থামাতে বলছে। ম্যাকফি ইশারা করতেই মহাবীর সিং তাকে চিৎকার করে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিলো।

মহাবীর সিং আর জোনাথনের দিকে তাকিয়ে ম্যাকফি বলে উঠলো, “চলো দেখি সামনের পথ আমাদের জন্যে কি অপেক্ষায় রেখেছে।”

অধ্যায় সাত

বর্তমান সময়

কতোয়ালি মডেল থানা, ময়মনসিংহ

অপেক্ষা করতে-করতে আরেকবার ঘড়ি দেখলো বাশার। আধাঘন্টার ওপরে ওসির রুমের সামনে বসে আছে ও। হাতে কিছু কাগজপত্র। এগুলোতে সই করাতে হবে। কাগজগুলো পাশে রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পরা আংটিটা মোচড়াতে লাগলো। এই জিনিসটা সবসময় ওকে মনে করিয়ে দেয় ওকে স্থির থাকতে হবে, ধীরে ধীরে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে যতো পিছিয়েই পড়–ক না কেন, সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আলস্যভরে সোফায় হেলান দিয়ে আশেপাশে ফিরে তাকালো। আজ সকাল-সকাল থানায় বেশ ব্যস্ততা। অন্যান্য দিন এই সময়ে থানার দিনই শুরু হয় না কিন্তু আজ ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে আরো ঘন্টাখানেক আগে থেকেই। কারণ থানায় আজ এসপিসাহেব এসেছেন। একদিকে তার নিয়মিত ভিজিটের সময় এগিয়ে আসছিল, অন্যদিকে গতকাল ওই পুকুরের মাঝখানে গাড়িটা আর ডেডবডিটা খুঁজে পাবার পর প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। সে-কারণেও এসপিসাহেব এসে থাকতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে বাশারের কাছে। গতকাল শানকিপাড়া শেষ মোড়ে পুকুরের মাঝখান থেকে টেনে তোলা গাড়িটাতে মৃতদেহটা খুঁজে পাবার পর ঘটে গেছে অনেককিছুই।

গাড়ির ভেতরে মৃতদেহটা আবিষ্কার করার পর বাশার প্রথমেই সাঈদ আলী আর তার লোকদেরকে চার্জ করে বসে। কেন তারা এই ব্যাপারটা লুকানোর চেষ্টা করছিল। সাঈদ আলী সাথে সাথে ব্যাপারটা অস্বীকার করে, সে জানায় সে আর তার লোকদের কোন ধারণাই ছিল না গাড়ির ভেতরে কোন মৃতদেহ আছে। সাঈদ আলীর জবাব শুনে বাশার হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। কারণ এরচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কোন পাঁচ বছরের বাচ্চাও

দিতে পারবে। মৃতদেহটা আবিষ্কার করার সাথে-সাথে বাশার ওর ফোর্স নিয়ে পুরো এলাকা সিল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কন্ট্রাকটার সাঈদ আলী প্রথমে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, তারপর তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বড় অঙ্কের ঘুষ অফার করে, তাতেও বাশার রাজি না হলে এক পর্যায়ে সে রেগে ওঠে। রেগে গিয়ে সে প্রথমে তার চাকরি খেয়ে ফেলবে, তাকে বদলি করিয়ে দিবে, এসব হুমকি দিতে থাকে। তারপরও কাজ না হবার কারণে সে তাকে জানে মেরে ফেলবে এরকম হুমকিও দিতে শুরু করে।

এক পর্যায়ে বাশার রেগে ওঠে। সে কন্সট্রাকশনের সমস্ত জিনিসপত্র ভেতরে রেখেই পুরো পুকুর এলাকা সিল করে দেয়। সাঈদ আলীর দলের লোকজন কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে। বাশার অবশ্য একজন পুলিশকে জনসম্মুখে হুমকি দেয়ার অপরাধে সাঈদ আলীকেও গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ততোক্ষণে আরো জলঘোলা হয়ে যায়। খবর পেয়ে জায়গামতো পৌছে গেছে সাংবাদিকসহ আরো অনেকেই। আর গন্ডগোলের সুযোগে লোকজনও জমা হয়ে গেছে অনেক বেশি। সাঈদ আলীর থেকে নজর সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হবার আগেই বাশার জায়গাটা সিল করে পুলিশের টো-ট্রাক আনিয়ে গাড়ি আর লাশ সরিয়ে ফেলে ওখান থেকে।

ওর কাছে তখন মনে হয়েছে সাঈদ আলীকে গ্রেপ্তার করার চেয়ে পরিস্থিতি সামলানোটা বেশি জরুরি ছিল। আর তাছাড়া সাঈদ আলীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে মূল ব্যাপারটা ভন্ডুল হবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিতে পারতো। তাই পরিস্থিতি যেভাবে সামলানো যায় সে-ব্যবস্থাই নিয়েছে ও।

ওখানকার কাজ শেষ করে খুঁজে পাওয়া গাড়ি আর লাশ জায়গামতো পৌছে দিয়ে থানায় ফিরে রিপোর্ট লিখতেই সন্ধ্যে পার হয়ে যায়। ডিউটি টাইম শেষে ক্লান্ত-অভুক্ত শরীরে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গোসল সেরে কোনমতে খেয়ে একটু দ্রুতই শুয়ে পড়ে ও। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় ওসি মল্লিক রাতের বেলা চার-পাঁচবার কল করেছিল। গভীর ঘুমের ভেতরে সে টেরই পায়নি। ও কলগুলো দেখতে পেলেও সকালবেলা আর কলব্যাক করেনি বরং জলদি ফ্রেশ হয়ে ইউনিফর্ম পরে চলে আসে থানায়। ওর নিয়ত ছিল কল না করে সরাসরি ওসির সাথে দেখা করবে। যদিও এতো সকালে ওসির থানায় আসার কোনই সম্ভাবনা নেই।

তবে ও থানায় পৌছে বেশ অবাক হয়ে যায়। কারণ সকালবেলাই থানা বেশ সরগরম। এমনকি ওসিও উপস্থিত। ব্যাপার কিছুই না, থানায় এসপিসাহেব আসছেন। শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসে পড়ে ও। গতকালের কিছু ঘটনাসহ অন্যান্য আরো কিছু জরুরি কাগজ গুছিয়ে ওসির সাথে দেখা করতে যায়। ওসির অ্যাসিসট্যান্ট তাকে জানায় যেকোন মুহূর্তে এসপিসাহেব চলে আসতে পারেন তাই ওসি ব্যস্ত আছে। তাকে পরে ডাকা হবে।

নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে সকালের নাস্তা সেরে পত্রিকা পড়তে শুরু করে ও। প্রায় সবক'টা স্থানীয় পত্রিকা সহ কয়েকটা জাতীয় দৈনিকে বেশ ফলাও করে খবরটা প্রচার হয়েছে। দুয়েকটাতে আবার ছাপা হয়েছে ছবিসহ।

পুকুরের নিচ থেকে কঙ্কালসহ গাড়ি উদ্ধার তো আর রোজকার ঘটনা নয়। ওকে আইটি সেকশনের জুনিয়র এক অফিসার জানায় খবরটা নাকি অনলাইন পোর্টাল সহ ফেসবুকেও বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জুনিয়র অফিসারের কথা শুনে বড় ক'রে একটা হাইম ছেড়েছে সে। মনে-মনে ভেবেছে, খবর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তো আমার কি। আমার কাজ আমি করেছি। থানার মেসেঞ্জারকে ডেকে চা আনতে বলে ও। চা খেতে-খেতে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করে।

বাশার আগে মোটেও এরকম ছিল না। মানুষ কখন কিভাবে বদলে যায় সে নিজেই জানে না। মায়ের মৃত্যু তাকে বদলে দিয়েছিল আর কর্মক্ষেত্রে এতো বড় একটা ধাক্কা তাকে করে তুলেছে নিরাসক্ত। যেখানে তার এখন হওয়া উচিত সদা সতর্ক, সদা সচেতন, নিজের হারানো অবস্থান ফিরে পাবার জন্যে সোচ্চার; সেটা না হয়ে কেমন জানি ভাবলেশহীন হয়ে গেছে ও।

সকালবেলা চা পানের সময়টা হচ্ছে মনের ভেতরের ফিলোসফি কপচানোর সবচেয়ে উত্তম সময়। সে মনে-মনে জীবনের ফিলোসফি কপচাচ্ছিলো এমন সময় এক মেসেঞ্জার এসে জানায় ওসি ডাকছে। ও কাগজগুলো গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চায় এসপিসাহেব চলে গেছেন কিনা। মেসেঞ্জার ছেলেটা জানায়, এসপি স্যারও আছেন ভেতরে। অগ্নি পরীক্ষার সময় উপস্থিত বুঝতে পারে বাশার। সে টুপিটা পরে নিয়ে রওনা দেয় ওদিকে।

এরপর ওসিসাহেবের রুমের সামনে আসার পর আধাঘন্টা হয়ে গেছে, সে বসেই আছে। এখনো ভেতর থেকে কোন খবর আসেনি। বসে থেকে-থেকে

বিরক্ত হয়ে কেসটা নিয়ে ভাবতে লাগলো ও। সাঈদ আলীকে সে ভয় পায় না। কেয়ারও করে না। তার কাজ বন্ধ হয়েছে তো ওর কি। বাশার ¯ফে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। তবে প্রশ্ন হলো, এই গাড়িটা পুকুরের মাঝখানে এল কিভাবে আর এই গাড়ির ভেতরের মানুষটাই বা কে। কতো আগের ঘটনা কে জানে। এসব খুঁজে বের করতে জান বেরিয়ে যাবে। এই জায়গাটাতেই একটু দ্বিধান্বিত বোধ করছে। ওর ক্যারিয়ারের যে বাজে অবস্থা তাতে এই কেস ওর ওপরে আসাতে পরিণতি আরো খারাপ হবে কিনা কে জানে। তবে উল্টোও হতে পারে।

“স্যার, আপনাকে ভেতরে ডেকেছে।”

সোফা থেকে ফাইলটা তুলে নিয়ে ভেতরের দিকে রওনা দিলো ও। ওসির রুমের দরজাটা পার হয়ে ভেতরের দিকে ঢুকতে গিয়ে আরেকটু হলে পাতলা-লম্বা মানুষটার সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলো বাশার। মানুষটাকে সরি বলতে গিয়েও থেমে গেল ও। সাথে-সাথে এক পা পিছিয়ে এসে স্যালুট ঠুকলো, “স্যার।”

“আরে বাশার তুমি,” ওকে দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়েছে এসপি আমজাদ আনোয়ার। “ওহহো, তাহলে ওই ঘটনার পর তোমাকে এখানে পোস্টিং দেয়া হয়েছে। আশ্চর্য কান্ড, আমি তোমার লেটার ইস্যু করেছি অথচ ব্যাপারটা খেয়ালই ছিল না আমার। তা কেমন আছো তুমি?”

“জি, স্যার। ভালো,” আমজাদ আনোয়ার ওর প্রথম বস ছিলেন। তার অধীনে কাজ করেই সে আজ থেকে তিন বছর আগে প্রমোশন পেয়েছিল। সে নিজে যেমন মানুষটাকে পছন্দ করে তেমনি উনিও তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।

“কি ব্যাপার মল্লিক,” এসপি আমজাদ ওসির দিকে ফিরে জানতে চাইলেন। “তুমি তো আমাকে জানাওনি বাশার তোমার অধীনে কাজ করছে।”

ওসি কাঁচুমাচু হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই বাশারের দিকে তাকিয়ে এসপি আমজাদ বলে উঠলেন, “শোন, আমি এই মুহূর্তে ব্যস্ততার ভেতরে আছি। পরে তোমার সাথে আমি বিস্তারিত কথা বলবো। ওই সাঈদ আলীর কেসটার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে। ওটা যে গোলমেলে কেস দেখলাম, মনে হয় ওটার সমাধান করার জন্যে তুমিই সেরা লোক,” বলে উনি যাবার জন্যে রওনা দিয়ে আবার ফিরে তাকালেন। “মাই বয়, যা হয়েছে হয়েছে সেসব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করো। আর যেকোন ব্যাপারে

সরাসরি আমার সাথে কথা বলবে," শেষ কথাটা ¯েœহের সুরে বলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন এসপি আমজাদ।

উনি বেরিয়ে যেতেই ওসি মল্লিক কথা বলে উঠলো, "বাশারসাহেব, কেসটার ব্যাপারে কথা বলতে হবে।" বাশার সামনে এগিয়ে একটা চেয়ার টেনে দাঁড়িয়ে রইলো। ওসি না বলা পর্যন্ত সে বসতে পারে না। দাঁড়িয়ে থেকেই সে গতকাল লেখা রিপোর্টটা এগিয়ে দিলো ওসির দিকে। "স্যার, এখানে সব বিস্তারিত বলা আছে।"

রিপোর্টটা নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলো ওসি। "শুনলাম আপনি সাঈদ আলীর কন্সট্রাকশন সাইটের কাজ বন্ধ করে পুরো এলাকা সিল করে দিয়েছেন," ওসি এখনো বসতেও বলেনি ওকে, রিপোর্ট থেকে চোখও ওঠায়নি। সে রিপোর্টে চোখ বুলাতে বুলাতে অনেকটা আনমনেই বলে উঠলো কথাটা। ঠিক প্রশ্নও না আবার মন্তব্যও না।

"জি, স্যার। ওটা একটা ক্রাইম সিন। আর তাছাড়া ওই সাইটের লোকজন বিশেষ করে সাইদ আলী আর তার লোকেরা তথ্য লুকানোর চেষ্টা করেছে। এমনকি সে আমাকে প্রকাশ্যে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করেছে, পরে হুমকিও দিয়েছে। আমি তাকে আর তার আরো লোকজনকেও গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরিস্থিতির কারণে পারিনি। তবে স্যার, আপনি চাইলে আমি এ-ব্যাপারে এখনো একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি, শুধু আপনার অনুমতি লাগবে।"

ওসি মল্লিক এতোক্ষণ রিপোর্টে মনোযোগ দিয়ে চোখ বুলাচ্ছিলো, বাশারের শেষ কথাটা শুনে সে ঝট করে চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো। "আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আপনি সাঈদ আলীকে গ্রেপ্তার করতে চান। এর পরিণতি কী হবে জানেন?" সাঈদ আলীর সাথে ওসির যে বেশ ভালো একটা সম্পর্ক আছে বাশার সেটা ভালোভাবেই জানে আর সে জন্যেই খোঁচা দেয়ার উদ্দেশ্যই কথাটা বলেছে ও। জানতো এই কথাটা শুনলেই ওসি নিজেকে সামলাতে পারবে না।

"স্যার, আমি তো..." মুখে কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করলেও মনে-মনে হাসছে সে।

"বাদ দিন, সাঈদ আলীকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। তার ব্যাপারটা আমি দেখবো। আপনি কেসের দিকে মনোযোগ দিন। ব্যাপারটা এমনিতেই যথেষ্ঠ গোলমেলে তার ওপরে আবার সব মিডিয়াতে ফলাও করে

প্রচার হচ্ছে। ওপরওয়ালারা কাল থেকে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। আপনি অফিসিয়ালি এই কেসের দায়িত্বে থাকবেন। তবে এখানে অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো পুরোপুরি আমাদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমরা সিআইডি আর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন মানে পিবিআইয়ের সাহায্য নিবো। পুলিশ, সিআইডি আর পিবিআইয়ের যৌথ ব্যবহারের জন্যে নতুন বাজারে একটা বড় ফরেনসিক ল্যাব বসানো হয়েছে। যদিও ওটা পিবিআইয়ের দায়িত্বে আছে তবুও আমাদের যেকোন প্রয়োজনে আমরাও ওটা ব্যবহার করতে পারবো। ল্যাবটা বসানোর কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। এইমুহূর্তে ঢাকা থেকে আসা কয়েকজন এক্সপার্ট আছে ওখানে।"

"জি স্যার, আমি জানি। পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার করে গাড়িটা ওখানেই পাঠানো হয়েছে।"

"হ্যা, ওখানে একটা চমৎকার মেডিক্যাল ল্যাবও বসানো হয়েছে। গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ডেডবডি প্রথমে চরপাড়া মেডিকেলে পাঠানো হলেও ওখান থেকে ফরেনসিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ওখানে এখনো কোন নিয়মিত ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়নি। তবে ভিজিটিং ডাক্তার পোস্টমর্টেম করে কাগজপত্র সব ঠিক করে রাখার কথা," বলে ওসি একটু থামলো। "আপনাকে তো জানালামই এই কেসের অফিসিয়াল দায়িত্বে থাকবেন আপনি। আপনার সাথে থাকবে রমিজ দারোগা আর কন্সটেবল আবদুল্লাহ। আপনাকে সার্বিক সহায়তা করবে ওরা। আর ফরেনসিক ল্যাবের অফিসে আমি বলে দিচ্ছি। আপনি রমিজ দারোগাকে নিয়ে ওখানে চলে যান," এই পর্যন্ত বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমাকে আপডেট জানাবেন।"

"অব্যশই স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকেও আপডেট জানাবো, সেইসাথে এসপি স্যার যেহেতু নির্দেশনা দিয়ে গেলেন ওনাকেও আমি আপডেট জানাবো আপনার পক্ষ হয়ে। ধন্যবাদ স্যার," বলে ও পা ঠুকে বেরিয়ে এল রুম থেকে। রুমের বাইরে বেরিয়ে ও হাসি চেপে নিজের ডেস্কের দিকে এগোল। শেষ কথাটা বলে ও আর ওসির মুখের দিকে তাকায়নি।

তাকালে অবশ্যই দেখতো পেতো হয় তার মুখের রঙ রাগে লালচে হয়ে গেছে আর না হয় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আপন মনে হাসতে হাসতেই সে নিজের ডেস্কে বসে ম্যাসেঞ্জারকে দিয়ে ডেকে পাঠালো রমিজ দারোগাকে।

বাশার তখনো আপন মনেই হাসছিল যখন রমিজ দারোগা তার ডেস্কের সামনে এসে সালাম ঠুকে জানালো সে রমিজ দারোগা। মানুষটার পরিচয় পাবার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল বাশারের মুখের হাসি।

ও যখন একেবারে ছোট, তখন ওর বাবা মারা গেছিল। কিছু আবাছা-আবছা স্মৃতি বাদ দিলে বাবার প্রায় কোন স্মৃতিই ওর মনে নেই। তবে ও নিশ্চিত ওর বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তবে তার বয়স হোত সামনে দাঁড়ানো মোটাসোটা বিশালদেহী এই মানুষটার সমান। এতো বয়ষ্ক একজন মানুষকে দেখে সাথে-সাথে ওর মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। ওর এই মুহুর্তে দরকার, একজন চটপটে পরিশ্রমী মানুষ। আর তাকে কিনা ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এরকম এক বৃদ্ধকে। লোকটা কাছাকাছি আসার পর বাশার নিশ্চিত হলো এই লোক মোটেই তার বাবার বয়সি নয়। ওর বাবা বেঁচে থাকলে নিশ্চিত এই লোকের চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হতেন।

পান চিবুতে-চিবুতে মানুষটা এসে ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে গেল। অনুমতিরও তোয়াক্কা করলো না। বাশার এতোটাই অবাক হয়েছে কিছুই বললো না ও।

“বুচ্ছুইন স্যার, আমি কিন্তু ইট্টু অন্যরহমবাবে কাম করি। আমি এই থানার বেহের চেয়ে বড় কিনা তাই সবাই আমারে মাইন্য করে। আর করতো না কেইল্লেইগ্গা কইন। আমি বেহেইরে সব কামে সাহাইয্যই করি। আর এই মুল্লুকে ইরম কেউই নাই যে আমারে চিনে না। ধইরালাইন, আমি কেউর লগে থাহুন মানে হের কাম অর্দেক হইয়া গেছে। হে হে হে,” খুবই সদালাপী ভঙ্গিতে যেন চায়ের দোকানে বসে গল্প করছে এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে সে হাসতে লাগলো।

“আপনিই রমিজ দারোগা? আপনি...”

“জি, স্যার। আমি এই থানার সবচেয়ে পুরান মানুষ। ওসি স্যার কইন, এসপি স্যার কইন হেরাও তো আমার জুনিয়র। আর হেরাও আমারে অনেক মাইন্য করে। ওসি স্যার তো আমার কথা ছাড়া কুনো কামই করবার চায়না। হে হে হে।”

লোকটা কথা বলে যেতে লাগলো আর বাশারের মনের ভেতরে আতঙ্ক প্রতিনিয়ত বাড়তে লাগলো। “জি, এই থানায় আসার পর থেকেই আপনার কথা শুনেছি,” ও আসলে লোকটার সামনে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশি জীবনে বহু মানুষের সাথে মিশেছে কিন্তু এরকম কোন মানুষ সে পায়নি যে

তার সিনিয়রের সাথে অবলীলায় জুনিয়রের মতো আচরণ করে যাচ্ছে। তবে এ-কথা সত্য সে এই থানায় আসার পর থেকে কারো না কারো কাছে রমিজ দারোগার কথা শুনেছে। তার মতো অলস, ফাঁকিবাজ আর চাপাবাজ লোক নাকি অত্র মুল্লুকে আর নেই।

"...স্যার আমার কতা তো হুনবাইনি। বিশেষ কইরা আমার ভাতিজা গফরগাঁওয়ের এমপি ওউনের পর থেইক্কা তো... ও আইন্নেরে তো কওয়াই অয় নাই আমার বাড়ি ওইলো গফরগাঁও। গফরগাঁওয়ের..."

"মি. রমিজ," যেকোন মূল্যে এই লোকটাকে থামাকে হবে। এই লোককে এভাবে কথা বলা চালিয়ে যেতে দিলে ওর খবর আছে। "যে-কেসটাতে আমরা একসাথে কাজ করবো কেসটা কিন্তু বেশ সিরিয়াস। আর এই কেসে অনেক..."

লোকটা আবারো ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আগেই বলতে শুরু করলো। "আরে স্যার, এইডা মমিসিং টাউন। এনু কুনো কেইসে আমি আছি মাইনে এইডা কুনো বিষয়ই না," সে কথাগুলো বলে একটা হাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলো।

"ঠিক আছে, সেটা সময় হলে দেখা যাবে," লোকটার হামবড়া কথাবার্তায় প্রচন্ড বিরক্ত লাগছে ওর। আলসের ধারি এই লোকটাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিতে পারলে সবদিক থেকেই ভালো হোত কিন্তু সে উপায় নেই। ওসির কাছে এই মুহূর্তে কিছু বলতে গেলেই ঝামেলায় পড়তে হবে। পারলে ওর ব্যাপারে আবারো কোন না কোন বিচার দিয়ে দিবে এসপি স্যারের কাছে। তারচেয়ে এই লোকটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। আর না হলে নিজেই করতে হবে সব। "আচ্ছা রমিজসাহেব, আমাদেরকে এখন বেরুতে হবে। জিপ বের করতে বলেন। আপনি ড্রাইভ করতে পারেন।"

"আরে না স্যার। কি যে কন আমি গাড়ি চালামু ক্যান। আবদুল্লাহ আছে। ওই পিচ্চি পোলাও তো আছে আমাগো দলে। ওরে ডাইক্কা পাডাইতাছি," বলে ওরা বাইরে বেরুতে বেরুতে রমিজ দারোগা চিৎকার করে আবদুল্লাহকে ডাকতে লাগলো। ওরা থানার দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় কন্সটেবলের পোশাক পরা এক ছেলে দৌড়ে এল।

রমিজ দারোগাকে দেখে একবার বাকরুদ্ধ হয়েছিল বাশার। কন্সটেবল আবদুল্লাকে দেখে একেবারেই বাকশক্তি লোপ পেল ওর। রমিজ দারোগা যতোই প্যাচাল পারুক একটা কথা ভালো বলেছে সে। এই ছেলে আসলেই

পিচ্চি। একেবারেই ফর্সা গোলগাল চেহারার লম্বা পাতলা এক যুবক। মুখে দাড়ি-গোঁফের ঘনত্ব খুবই কম। তার ওপরে আবার সম্ভবত নিজেকে একটু বড় দেখানোর জন্যে সে গোঁফ রাখার একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছে। ফর্সা গোল মুখে নাকের নিচের সরু গোঁফটা তার চেহারাকে ভারিক্কি করে না তুলে বরং চেহারাটাকে করে তুলেছে আরো বাচ্চা-বাচ্চা। বাশারের সামনে এসে সে স্যালুট ঠুকে সালাম জানালো। বাশার ছেলেটাকে দেখে আপন মনে মাথা নাড়লো একবার। মনে হচ্ছে ময়মনসিংহ সদর কতোয়ালি থানার সব বাতিল জিনিসগুলো ওর সাথে গছিয়ে দিয়েছে মল্লিক।

“স্যার, আমি আবদুল্লাহ। আমিও এই কেসে আপনার সাথে আছি,” স্যালুট ধরা হাতটা সে এখনো কপালের পাশেই ধরে রেখেছে।

“হ্যা, সে তো বুঝতেই পারছি। হাত নামাও,” বলে বাশার জানতে চাইলো। “কতোদিন হলো ফোর্সে জয়েন করেছো?”

“স্যার, এক বছর।”

তারমানে দেখতে যতোটা বাচ্চা লাগে অতোটা বাচ্চা সে আসলে নয়। “গাড়ি চালাতে পারো?”

“স্যার, সব পারবো। আপনি নির্দেশ দিবেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো,” নাহ ছেলেটা দেখতে একেবারে শিশু শিশু হলেও গলায় জোর আছে। মনে হচ্ছে একেবারে খারাপ হবে না সে। অন্তত রমিজ দারোগার চেয়ে ভালো হবে বলেই মনে হলো বাশারের কাছে। “ঠিক আছে, গাড়ি বের করো। আমি আসছি।”

অফিসিয়াল কিছু কাজ শেষ করে রমিজ দারোগাকে নিয়ে জিপে উঠলো বাশার। সামনে বসা পিচ্চি কন্সটেবল আর পাশে বসা বৃদ্ধ দারোগাকে নিয়ে ফরেনসিকের দিকে রওনা দিলো ও। খারাপ পরিস্থিতি থেকেই নাকি ভালো কিছুর উত্থান ঘটে। দেখা যাক ভাগ্য সামনে কী রেখেছে ওদের জন্যে।

অধ্যায় আট

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

বেগুনবাড়ি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া কিংবা ভাগ্যকে দোষারোপ করার মতো মানুষ ম্যাকফি নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সে নিজের ভাগ্যকেই সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করছে।

কাজ শুরুর আগেই যদি বার-বার এভাবে বাঁধা আসতে থাকে তবে ভাগ্যকে দোষারোপ না করে উপায় কি। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজার সাথেই দেখা করতে পারলো না। ওরা রাজার বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখতে পায় রাজার কয়েকজন সৈন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের গাড়ি থামাতেই অপেক্ষারত সৈন্যরা জানায় রাজা তার নতুন নির্মিতব্য বাড়ি পরিদর্শন করতে গেছে। ম্যাকফিরা চাইলে রাজার বাড়িতে অতিথি হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে।

আগত সৈন্যের প্রশ্নের জবাবে ম্যাকফি জানতে চায় রাজাসাহেব ফিরবেন কখন। তখন সৈন্যরা জানায় দুপুরের আগে নয়। সাথে-সাথে ম্যাকফি সিদ্ধান্ত নেয়, সে অপেক্ষা করবে না বরং রাজাসাহেব যেখানে গেছে সেখানেই গিয়ে দেখা করবে তার সাথে। সৈন্যদের কাছ থেকে পথের নির্দেশনা জানতে চাইলে ওদের সাথে একজনকে দূত হিসেবে দিয়ে দেয়া হয় পথ দেখানোর জন্যে। এখন ওরা রাজাসাহেবের নতুন নির্মিতব্য প্রাসাদের দিকে চলেছে।

এই অযাচিত দেরির জন্যে ম্যাকফির মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। অকারণেই একটা বেলা নষ্ট। ম্যাকফির দুশ্চিন্তা অন্য জায়গায়। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা গায়েব হয়ে যাবার পর ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। যতো সময় অতিবাহিত হচ্ছে ঘটনাটার রহস্য উন্মোচন করার সুযোগ ওদের জন্যে ততোই কমে যাচ্ছে। ওদের জন্যে এই মুহূর্তে যতো

দেরি ততো বিপদ। ম্যাকফি বাইরের জঙ্গল দেখতে-দেখতে আপন মনেই সে ফিরে তাকালো ওদের সাথে বসে থাকা রাজাসাহেবের সৈন্যটার দিকে। বেশ বয়স্ক একজন মানুষ। মুখে হালকা খয়েরি রঙের দাড়ি। কপালের একপাশে একটা কাটা দাগ। এই বয়সেও সে এখনো সৈনিক পদেই রয়ে গেছে, তার মানে সৈনিক হিসেবে খুব একটা দক্ষতা দেখাতে পারেনি।

“তোমার নাম কি?” মুখ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে সে সৈন্যটার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলো।

“সমীর দাস, হুজুর,” একেবারে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষটা ম্যাকফি প্রশ্ন করাতে একেবারে মাথা নিচু করে ওর দিকে ফিরে জবাব দিলো। এইসব সহজ-সরল লোকজন এখনো সাদা চামড়ার মানুষ আর রাজ-রাজাদের ব্যাপারে কী ধরণের মনোভাব লালন করে ব্যাপারটা চিন্তা করে ম্যাকফি অবাক না হয়ে পারলো না।

“সমীর দাস, তুমি এভাবে মেঝেতে না বসে ওপরে উঠে বসতে পারো,” ম্যাকফি ইশারায় নিজের পাশের আসনটা দেখালো। বয়স্ক একজন মানুষ মাটিতে বসে আছে ব্যাপারটা ওর কাছে বিব্রতকর মনে হচ্ছিলো এতোক্ষণ।

“ছি-ছি, হুজুর একি কইলেন আপনে। আমরা হলাম নিচু জাত ছি-ছি,” লোকটা কথা বলতে বলতে মাথা নাড়তে লাগলো প্রবল বেগে। ম্যাকফি লোকটার একটা হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে দিলো। ভারতবর্ষে এইসব জাত-ফাতের ব্যাপারে সে খুব ভালো ধারণা রাখে। এক জাতের লোকজন আরেক জাতের লোকজনের সাথে এক আসনে বসার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে।

“শোন সমীর দাস, জাত-ফাত তোমরা মানতে পারো, আমি এসব ব্যপারকে পরিত্যাজ্য মনে করি। ঠিক কিনা?” শেষ কথাটা সে বলেছে তার নিজের দুই সাগরেদ মহাবীর সিং আর জোনাথনের দিকে তাকিয়ে। দুজনেই সমস্বরে হেসে উঠলো ওর প্রশ্ন শুনে।

“আমরা জাতের বিষয়ে আমলে নেই শুধুমাত্র ন্যয়-অন্যায় দিয়ে,” বলে নিজের তলোয়ারে হাত বুলাতে বুলাতে মহাবীর সিং আবারো গাড়ি কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো। তার হাসি শুনে সমীর দাস আরো গুটিয়ে এল। ম্যাকফি তার দিকে তকিয়ে জানতে চাইলো। “আচ্ছা সমীর দাস, তুমি তো জানো আমরা এই এলাকায় নতুন এসেছি। আমাদেরকে এই এলাকা, রাজাসাহেব

আর তার শাসন নিয়ে একটু ধারণা দিতে পারবে। যদি পারো তবে আমাদের জন্যে উপকার হবে।”

ম্যাকফির পাশে বসার পর থেকেই মানুষটা একেবারে মাথা নিচু করে আছে। ওর শেষ কথাটা শুনে সে মাথা তুললো ওপরের দিকে। ওদের সবার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে হাতের বর্শাটা একপাশে রেখে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে দুইহাত মুখের সামনে তুলে অস্‌ফুট সুরে কথা বলে উঠলো, “হুজুর আমরা নিচু জাতের মানুষ। উঁচু জাতের কেউর লগে কথা কউনেরও চিন্তা করতে পারি না। পাশে বউন তা দূরে থাক। আইন্নেরা আমারে এমুন সম্মান দিছুইন এই সম্মানের মান কেমনে রাহি। হুজুর কি জানবার চাইন, কইন।”

“রাজাসাহেব, নতুন বাড়ি যেখানে বানাচ্ছেন সেটা এখান থেকে কতোদূরে?” ম্যাকফি জানতে চাইলো।

“হুজুন এইনতে আর চাইর-পাঁচ মাইল দূরে ওবো।”

তারমানে ঘোড়ার গাড়িতে করে ওখানে পৌছাতে ওদের আরো আধা ঘন্টার ওপরে লাগবে। এই সময়টা যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে ও। এখানে আসার আগে এখানকার লোকজন সম্পর্কে যতোটা খোঁজ-খবর নিতে পেরেছে তাতে ওর মনে হয়েছে এই এলাকার লোকজন এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির। সহজে বাইরের মানুষের সাথে মিশতে চায়না। আর সাদা চামড়ার লোকজন দেখলে তো কথাই নেই। তাই তাদের কাছ থেকে তথ্য বের করেত অনেক কষ্ট হবে। তবে এই লোকটাকে বেশ কাজের মনে হচ্ছে। “তুমি নিজের কথা বলো। তুমি কি এই এলাকার লোক নাকি তোমরাও স্থানীয় রাজাসাহেবের মতো বাইরে থেকেই এসেছো?”

“হুজুর আমরা এই এলাকার আদি বাসিন্দা। মধুপুর ওদিকে আমার পূবপুরুষের তালুক আছিল। জমি-জমাও খারাপ আছিল না। বাপ-দাদাগর কাছে হুনছি এই রাজাসাইবরা এনু আয়ুনের আগে এই এলাকার সবচেয়ে বড় পরিবারগুলার ভিতরে আমগোর পরিবার আছিল একটা। এরপর আসলো হেই দূর্ভিক্ষ। পর-পর কয়েক বছরের খরা আর দূর্ভিক্ষে পুরা এলাকা সাফা হইয়া গেল। তহন আমার জন্মই অয়নাই। আমার বাপে ছোট। হেই ঘটনার পরপরই বগুড়া থেইক্কা এই রাজাসায়েবগর পরিবার এই এলাকায় আইসা বসতি স্থাপন করলো। খরা আর দূর্ভিক্ষে এইহানকার পরিবারগুলার অবস্থা তহন খুবই খারাপ। জমিতে ফসল নাই, গরে খাউন

নাই, অনেক পরিবার সব হারায়া নিঃস্ব। তহন এই জমিদারেরা আউনের পরে মানুষ খুব খুশি হইছিল। হেরা এনু আইয়া রাজবাড়ি বানাইলো। নদীর তীরে হাট-বাজার বানাইলো, কঠের কল বসাইলো। মানুষে কাম পাইলো। মরা এলাকা আবারো জমজমাট হয়া গেল।"

"তয় মানুষরে এতোকিছু দেয়ার বিনিময়ে হেরা নিজেগর সুবিধা বুইজ্জা লইলো। মানুষের অভাবের সুযোগে পানির চাইয়াও কমদামে মাইনষের জমি নিজেগর নামে লেহায়া লইলো। এক অর্থে কইতে গেলে হেরা এই এলাকায় জীবন ফিরায়া আনছে কিন্তু মানুষ জানে বাঁচতে পারলেও হেরা সব হারায়া জমিদারগো পুষা প্রাণী হইতে বাইধ্য হইছে। হেরা এক পুরুষ ধইরা এইহানে বসতি স্থাপন করে। এরপরে শুরু হয় হেগো শাসন। এই এলাকায় একটা কুত্তাও হেগো অনুমতি ছাড়া লেজ লড়াইতে পারে না। এইডা লইয়া তালুকদারগো লগে হেগর গন্ডগুলও কম না। আমাগো পরিবারও এই একিভাবে সব হারাইছে। এরপরে আমি নানা ঘাটে ধাক্কা খাইতে খাইতে জমিদার বাড়িতে কাম পাইছি।"

"এটা কতো বছর আগের ঘটনা?"

"আইজ থাইক্কা পঁচিশ বছর আগের।"

"তুমি কি তখন থেকেই সৈনিক হিসেবে কাজ করছো?"

ম্যাকফির প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধ সৈনিক বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। "নাহ, হুজুর। আমি আরো বড় পদে চাকরি করতাম। বাপের কাছ থাইক্কা বহুত ঝামেলা কইরা জমিদারি পাউনের পরে এহনকার রাজা হের নিজের মানুষগরে উপরে তুইল্লা হের বাপের-ভাইয়ের অধীনে যারা কাম করতো হেগোরে নিচে নামায় দিছে। কারণ হেয় আমগরে বিশ্বাস করে না।"

"বিশ্বাস করে না কেন?" অন্যপাশের সিট থেকে জোনাথন আধা ইংরেজি-আধা হিন্দি আর অল্প কিছু বাংলা মিশিয়ে প্রশ্ন করলো। ওরা তিনজনই এর আগে দীর্ঘদিন কোলকাতায় ডিউটি করার কারণে অল্পবিস্তর হলেও বাংলা আর হিন্দিটা জানে।

"কারণ হেয় তো জমিদারি পাইছে জুর কইরা।"

"জোর করে মানে?"

লোকটা অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকালো। “আপনেরা জানুইন না!” সে বেশ অবাক হয়েছে। “আমরা তো মনে করি সাদা চামড়ার মানুষেরা সব জানে। হেয় জমিদারি জুর কইরা দহল করছে কারণ হেয় তো রাজার দ্বিতীয় ঘরের ছোড পোলা। জমিদারি তো ছিল হের বড় বাইয়ের।”

“এরকম কেন হলো?” ম্যাকফি বেশ কৌতুহলবোধ করছে। এখানে আসার আগে তাকে যে-রিপোর্ট দেয়া হয়েছে সেটাতে এরকম কিছু লেখা ছিল না।

“হুজুর, এইহানে ধর্মীয় বিবাদ আছে। এই এলাকায় জমিদারেরা বহুত কিছু বদলাইয়া দিছে। হেরা যা যা বদলাইছে তার মদ্যে অন্যতম একটা ছিল পূজার ধরণ। হেরা এইহানে কালী পূজা আমদানি করছিল। অহনকার রাজার বড় ভাই আর তার মায়ে করতো কালী পূজা। তো এইডা লইয়া বাপ আর দুই পুলার ভিতরে বহুত গন্ডগোল অইছে। বাপে ক্ষমতা দিছিল হের বড় পুলারে। বাপ মরুনের পরে বড় ভাইরে সরায়া অহনকার রাজা ক্ষমতা দহল করছে। হেয় তার বড় ভাইরে খালি ক্ষমতা ছাড়াই করে নাই, দেশ ছাড়াও করছে... হুজুর আমরা আইসা পড়ছি,” কথা শেষ না করেই সে বাইরে দেখালো।

ম্যাকফি জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখলো বিরাট এলাকা জুড়ে কর্মযজ্ঞ চলছে। কাজের ব্যাপ্তি দেখে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এতো বিরাট কিছু আশা করেনি ও।

গাড়ির ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে ম্যাকফি জোনাথন আর মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে সমীর দাসকে উদ্দেশ্য করে বললো, “সমীর, তোমার সাথে আরো কথা বলতে পারলে ভালো লাগতো,” এই মানুষটার সাথে কথোপকথনটা পুরোপুরি শেষ হলোনা দেখে একটু খারাপ লাগছে। কারণ বাপ-ছেলে-ভাইয়ের রাজনীতিটা ওর আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার ছিল।

“হুজুর, আপনারা এতো বড় মানুষ তারপরও যে-সম্মান আমারে দিছুইন, আমি জীবনে ভুলতাম না। তয় আপনেগো একটা কথা কই, আপনেরা বিপদে আছেন। সবধানে থাইকেন। এইহানে সবাই আপনেগো শত্রু,” শেষ কথাটা সে খুব আস্তে বললো। “হুজুর, ছুড়ু মুহে বড় কথা কইলাম মাফ কইরা দিয়েন।”

গাড়িটা ইতিমধ্যেই থেমে গেছে। সমীর দাস মাথা নিচু করে গাড়ি থেকে নেমে ওদেরকে পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। ওরা গাড়ি থেকে নেমে

সামনের বিরাট কর্মযজ্ঞের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। এরকম প্রায় জঙ্গুলে এলাকার ভেতরে এতো বিরাট আয়োজন দেখতে পাবে ওদের কল্পনাতেও আসেনি। একপাশে বিরাট গর্ত খুঁড়ে চলছে কর্মযজ্ঞ। সেই গর্তের আকার কম করে হলেও একটা মাঠের সমান হবে। অন্যদিকে বিরাট এলাকা জুড়ে চলছে ইট বানানোর কাজ। ওখান থেকে সারি সারি চুল্লি দেখা যাচ্ছে। অন্যপাশে সারি-সারি টিনের ঘর দেখতে পেল ওরা। ওখানে কী হয় কে জানে। তার ডান দিক থেকে একাধারে ছোট-ছোট ঝুপড়ি ঘর চলে গেছে। এই মুহূর্তে অন্তত হাজারের কাছাকাছি মানুষ কাজ করছে। দূরে তাকিয়ে দেখতে পেল চোখের দৃষ্টির বাইরেও আরো অনেকগুলো ছোট ছোট ভবনের সারি দেখা যাচ্ছে। সেইসাথে ওদের দৃষ্টির ভেতরে বিদ্যমান নাম না জানা অনেক ধরণের যন্ত্রপাতি। পুরো আয়োজন দেখে ম্যাকফির মনে হতে লাগলো এখানে বিরাট আকারের কোন প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

“স্যার, আপনি ঠিকই ভাবছেন এখানে আসলেই একটা প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।”

ম্যাকফি একটু চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকালো। তবে যাকে দেখতে পেল এরকম কাউকে আশা করেনি সে। রাজা ভাবতেই এতোদিন ম্যাকফি দেখে এসেছে ঝোলা জোব্বা ধরণের পোশাক, গলায় কানে, হাতে নানা ধরনের অলঙ্কার আর দামি রতেœর মালা। এই লোক মোটেই সেরকম কিছু পরে নেই। তার বদলে সে যা পরে আছে সেটা এরকম জায়গায় বেশ অবাক করার মতোই বটে। মানুষটার গায়ে ঘিয়ে রঙের থ্রি-পিস সামার স্যুট, ভেতরে আকাশি রঙের শার্ট আর পায়ে ডার্ক-ট্যান রঙের পাম্প সু, মাথায় স্যুটের রঙে একই রঙের হ্যাট। হঠাৎ দেখলে মনেই হয় না গ্রীষ্ম অঞ্চলের কোন কন্সট্রাকশন সাইটে দাঁড়িয়ে আছে সে বরং মনে হয় ছুটি কাটানোর জন্যে কোন সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বেড়াতে এসেছে।

“আমি এই বৃহত্তর মুক্তাগাছা-মধুপুর-বেগুনবাড়ি এলাকার রাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরি। আপনি নিশ্চই ক্যাপ্টেন জেমস ম্যাকফি, ফ্রম বৃটিশ আর্মি। প্লেজার টু মিট ইউ,” বলে সে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ম্যাকফির দিকে। তার ইংরেজি যেকোন বৃটিশের মতোই শুদ্ধ প্রায়।

“প্লেজার,” ম্যাকফি লোকটার সাথে হাত মেলাতে মেলাতে তাকে ভালোভাবে খেয়াল করলো। পোশাকের ব্যাপারটা আগেই খেয়াল করেছে। মানুষটা সুদর্শন, তবে ছোটখাট। তার আয়োজনের কোন কমতি নেই। মাথার ওপরে বিরাট একটা ছাতা ধরে আছে একজন। পাশেই বিশাল

আকৃতির কালো মুশকো দেখতে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বিরাট একটা তলোয়ার। নিশ্চিত রাজার বডিগার্ড। তাদের পেছনে অন্যান্য লোকজন তো আছেই। “আপনার ইংরেজি তো অসাধারণ,” বলে ও রাজাসাহেবের পোশাকের দিকে তাকালো। “আর আপনার পোশাকও।”

“হা-হা-হা,” ম্যাকফির কথার জবাবে বেশ জোরেই হেসে উঠলো সে। “আমি ছোটবেলা থেকে আমার জীবনের একটা বড় সময় আপনাদের দেশেই কাটিয়েছি। এমনকি আমার পড়ালেখাও ওখানে। তাই আমি নিজেকে বৃটিশ ভাবতেই পছন্দ করি। আর চলাফেরাও সেভাবেই করার চেষ্টা করি। বহুবছরের অভ্যাস।”

“আর আমি নিজেকে ভারতীয় ভাবতেই পছন্দ করি। আমি এদেশেই জন্মেছি বড়-হয়েছি কিনা,” বলে ম্যাকফিও হাসলো।

রাজা সূর্যকান্ত একটু অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। কোন সাদা চামড়ার মানুষের মুখ থেকে এরকম কথা শুনবে সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি মনে হয়। ম্যাকফির হাসির জবাবে সেও হেসে উঠলো। তবে হাসির মাত্রাটা আগের চেয়ে একটু ¤ø◌ান হয়ে গেছে। ম্যাকফি রাজাসাহেবেরে সাথে জোনাথন আর মহাবীর সিংয়ের পরিচয় করিয়ে দিলো। রাজাও নিজের লোকদের পরিচয় জানিয়ে দিলো একে-একে।

“আসুন, আগে আপনাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি,” বলে সে ওদেরকে পথ দেখিয়ে কাপড় টাঙিয়ে বানানো একটা ছাউনির মতো জায়গায় নিয়ে এল। সেখানে কিছু পেতে রাখা চেয়ারে এসে বসলো ওরা। বসার একটু পরেই লেবু দেয়া পানি পরিবেশন করা হলো ওদেরকে। স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পরিবেশন করা বরফ দেয়া পানীয়টা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল ম্যাকফি। এমন একটা জায়গায় ওরা এসব আয়োজন করলো কিভাবে, আর বরফই বা পেল কোথায়।

ম্যাকফির অবাক ভাবটা বেশ উপভোগ করলো রাজা সূর্যকান্ত। “জীবনটা এমনই, মিস্টার ম্যাকফি। উচ্চাশা বদঅভ্যাস তৈরী করে, আর বদঅভ্যাস ধীরে-ধীরে অভ্যাসে বদলে যায়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন,” বলে সে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের দিকে ইশারা করলো। “এসবই আমার উচ্চাশা আর বিলাসিতার ফল,” বলে সে হাসতে লাগলো।

একটানে গ্লাশের পানীয়টা শেষ করে সেটা আর্দালিকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পাইপ বের করে ধরাতে-ধরাতে ম্যাকফি জানতে চাইলো, “আমরা কাজের কথায় আসতে পারি। কী ঘটেছিল বলুন তো। এভাবে আপনার এলাকা থেকে এতোগুলো বৃটিশ সৈন্য হারিয়ে গেল কিভাবে?”

কথাটা শুনে একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রাজাসাহেব। “কি আর বলবো ক্যাপ্টেন, এরচেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। আমার দাওয়াত করে আনা মেহমানদেরকে আমি নিরাপত্তা দিতে পারলাম না। সত্যি কথা হলো, আমার পরিবার এই এলাকাতে গোড়াপত্তনের পর থেকেই আমরা চেষ্টা করে আসছি এলাকার মানুষদের মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু কোননা কোন কারণে আমাদের পরিবার এই ব্যাপারে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি কিংবা বৃটিশদের সাথে সহযোগিতা করেনি। কিন্তু আমি রাজা হবার পর প্রথমই আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কারণ বহু বছর ইংল্যান্ডে পড়ালেখা করে আমি অনেককিছু শিখেছি। তাই এই এলাকার শাসনভার নিয়েই আমি ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠাই।”

“হয়েছিল কি আসলে?” ম্যাকফি লোকটার বোলচাল মার্কা রাজনৈতিক কথাবার্তায় বেশ বিরক্ত। আর এসব বিষয়ে ওর কোন আগ্রহও নেই। ওর দরকার হারিয়ে যাওয়া সৈন্যদের হদিস বের করা।

“তো যেটা বলছিলাম। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রথমবারের মতো আমি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদেরকে নিজের এলাকায় নিমন্ত্রণ জানাই। দুইদিন তারা আমার এখানে অতিথি হিসেবে থাকে। আমরা নিজেদের ভেতরে উপহার বিনিময় করি, এমনকি আমাদের প্রাথমিক আলোচনাও বেশ সফলই ছিল। এরপর তারা বিদায় নেয়ার সময়ে আমার লোকেরা তাদেরকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। তবে আমি যে-পথে তাদেরকে ফেরত যেতে বলেছিলাম তারা সেই পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ অন্যপথে রওনা দেয়। শেষবার আমার জানামতে তারা নদীর তীরে পুরনো মন্দির এলাকাতে ক্যাম্প করেছিল। এরপর আর তাদের কোন হদিস নেই।”

“তারা শেষবারের মতো পুরনো মন্দির এলাকাতে ক্যাম্প করেছিল এটা আপনারা জানলেন কিভাবে?” ম্যাকফি নিজের কপালের পাশের কাটা দাগটাতে হাত বুলাচ্ছে।

“এটা আমি লোক মারফত শুনেছি,” রাজা অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসলো। সে এভাবে কথায় ধরা পড়ে যাবে বুঝতে পারেনি। তবে ম্যাকফি বুঝতে

পেরেছে ঘটনাটা।

রাজার লোকেরা সৈন্যদেরকে এগিয়ে দিয়ে এলেও ওদের ওপরে নজর রাখা হচ্ছিলো। প্রশ্ন হলো, তাদের কি হয়েছে এটা কি রাজার লোকেরা দেখেছিল। নাকি ওরা সৈন্যদেরকে ক্যাম্প করতে দেখেই ফেরত চলে আসে। রাজা অস্বস্তিতে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে ম্যাকফি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো। কারণ প্রথম দিনই রাজার সাথে দ্ব›েদ্ব জড়ানোটা ঠিক হবে না। এই মুহূর্তে লোকটার সহায়তা খুব দরকার। “রাজাসাহেব, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি এই ঘটনার ফলে খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। আমি আপনাকে যথা সম্ভব সহায়তা করতেই এসেছি। তবে আপনাকেও আমার সাথে একাগ্রভাবে কাজ করতে হবে। আমাকে সব ধরণের সহায়তা করতে হবে।”

ম্যাকফির কথা শুনে হঠাৎ রাজা এমন একটা কাজ করে বসলো ম্যাকফি অবাক হয়ে গেল। সে ইশারা করে তার সব লোকদেরেক ছাউনি থেকে বের করে দিলো। এরপর আচমকাই ম্যাকফির একটা হাত চেপে ধরলো।

“আরে! আরে! করেন কি, রাজাসাহেব!” ম্যাকফি রাজার এই অযাচিত আচরণে একেবারে চমকে গেছে।

“ক্যাপ্টেন, আমি আপনাকে পূর্ণ সহায়তা দিবো। আপনি যা চান আমি দিবো। এমনকি আপনি আর আপনার দলের লোকদেরকে আমি এতো সম্পদ দিবো আপনারা ভাবতেও পারবেন না, কিন্তু আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করুন। এটা আমার এলাকা আর আমার এলাকাতে আমার মেহমানদের গায়ে কে বা কারা হাত দিয়েছে আমি বের করতে পারছি না এর চেয়ে অপমানজনক আর কিছু হতে পারে না। তাও এমন এক সময়ে যে-সময়ে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজে হাত দিয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন সত্যি করতে চলেছি। আমার রাজত্ব আর আমার লোকদেরকে আমি ভালোবাসি আর একারণেই আমি রাজত্ব ধরে রাখতে চাই। এটা ধরে রাখতে গেলে কোম্পানিকে আমার প্রয়োজন। আর কোম্পানির বন্ধুত্ব পেতে হলে আপনাদেরকে আমার প্রয়োজন।”

ম্যাকফি লোকটার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো। “রাজাসাহেব, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। আপনার জন্যে আপনার মেহমানদের হদিস বের করাটা যতোটা জরুরি আমার জন্যেও তাই। তবে আপনাকে কথা দিতে হবে। আপনি আমার কাছ থেকে কিছু লুকাবেন না। আর আমাকে সব ধরণের সহায়তা করবেন। তবেই আমি আমার সবটুকু দিয়ে আপনাকে

সহায়তা করতে পারবো। আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।”

“অব্যশই অবশ্যই,” ম্যাকফির সাথে-সাথে সেও উঠে দাঁড়িয়েছে।

“আজ আমরা উঠবো রাজাসাহেব। আমরা আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিচ্ছি। দেখা যাক কি দাঁড়ায় পরিস্থিতি। তবে এই ঘোড়ার গাড়ির বদলে আমাদের তিনজনকে তিনটে ঘোড়া দিলে ভালো হয়। যাতায়াতে সুবিধে হবে। আর আমাদের একজন সার্বক্ষণিক লোক দরকার যে এই এলাকা খুব ভালোভাবে চেনে। অন্য যেকোন প্রয়োজনে আমি আপনাকে জানাবো।”

“অবশ্যই,” বলে সে তার লোকদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিলো। “আজকে এখানে তো আপনাদেরকে আপ্যায়ন করতে পারলাম না। আরেকদিন আমার নিজের বাড়িতে আসুন। বাঙাল মুল্লুকের আপ্যায়ন কি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিবো।”

একটু পরে ওরা তিনজনে তিনটে ঘোড়া নিয়ে ওখান থেকে রওনা দিলো। ওদের সাথে আছে শঙ্কর নামে রাজার বিশ্বস্ত এর লোক। এই শঙ্করই হবে ওদের গাইড আর যোগাযোগকারি। আর ওদের থেকে একটু পেছন পেছনে আসছে ভীষণ চিকন আর লম্বা এক লোক। রাজার লোকদের ভেতরে এই লোকই নাকি অত্র এলাকা সবচেয়ে ভালোভাবে চেনে, সেই নাকি এই এলাকার সবচেয়ে দক্ষ শিকারি। আর একারণে সে যেকোন পায়ের ছাপও ভালোভাবে খুঁজে বের করতে পারবে। তাছাড়া এই লোক ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি আর হিন্দিও বোঝে কাজেই সে ওদের সাথে কথাও বলতে পারবে প্রয়োজনমতো। ওরা রওনা দেয়ার একটু পরেই লোকটা ওদের পেছন পেছন আসতে শুরু করে। কিছুদূর এগিয়ে পাশাপাশি ঘোড়া চালাতে-চালাতে জোনাথন ওর কাছে জানতে চাইলো, “বস, কেমন দেখলে রাজাকে?”

“হয় লোকটা অতি উচ্চমার্গের চালাক, আর না হয় বোকা। তবে কোনটা এখনো ধরতে পারিনি,” ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। তবে ওর জবাব শুনে খিক-খিক করে হেসে উঠলো মহাবীর সিং। দুজনেই অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে, এই কথায় হাসির কী আছে।

“লোকটা যখন চট করে উঠে তোমার হাত ধরলো না। ব্যাটাকে একটা মুরগীর বাচ্চার মতো দেখাচ্ছিলো। কোম্পানির সৈন্যদেরকে খুঁজে বের

করতে না পারলে ওর খবর আছে," বলে সে আবারো খিক-খিক করে হাসতে লাগলো। তার সাথে গলা মেলালো জোনাথন।

তবে ওদের হাসিতে যোগ দিতে পারলো না ম্যাকফি। কারণ ও জানে কোম্পানির সৈন্যদের খুঁজে বের করতে না পারলে রাজার পরিণতি যতোটা না করুণ হবে তারচেয়ে বেশি বাজে অবস্থা হবে নিজেদের। চিন্তিত মুখে কপালের পাশের কাটা দাগটা ঘসতে লাগলো সে। হঠাৎ পেছন ফিরে সে শঙ্করকে সামনে আসার জন্যে ইশারা করলো। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল একটা ধূসর রঙের ঘোড়া এগিয়ে এসে ওর পাশে থামলো। ঘোড়ার ওপরে বসা লোকটা কোনমতে ঘোড়া সামলে প্রায় ঝুঁকে বসে ওকে কুর্নিশ করলো।

ম্যাকফি ইশারায় তাকে সোজা হয়ে বসার নির্দেশ দিয়ে পেছনে ফিরে দেখলো ভীষণ চিকন আর লম্বা লোকটাকে দেখে মনে হলো সে ঘোড়ার ওপরে বসে ঘুমাচ্ছে।

"এই ব্যাটার নাম কি, শঙ্কর?"

"হুজুর, ওর নাম ডুম্বুর আলী। এই এলাকার সবচেয়ে ভালো সহিস আর হেয় খুব সহজে কাউরে খুঁইজা বাইর করতে পারে।"

"হট হট," লোকটা এগিয়ে আসতেই নিজের ঘোড়াটাকে দাবড়ানি দিতে দিতে নিজের লোকদেরকেও তাড়া দিলো সে। "এই জলদি আগে বাড়ো। যেখানে কোম্পানির সৈন্যরা শেষবারের মতো ক্যাম্প করেছিল সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই," বলে ও ডুম্বুরের দিকে ফিরে তাকালো।

"ডুম্বুর আলী, তুমি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে ওখানে নিয়ে চলো।" লোকটা যেন ঝিমুতে ঝিমুতেই একবার ওকে দেখলো, কী বুঝলো কে জানে ওদের থেকে খানিকটা এগিয়ে ওদেরকেও ইশারা করলো সামনে এগোনোর জন্যে। লোকটার পিছু যেতে যতে জোনাথনকে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকফি, "সময় কম আমাদের হাতে। ও ঠিক পথে যায় কিনা খেয়াল রেখ তুমি। জায়গামতো পৌছে আমাদেরকে বুঝতে হবে, ব্যাপারটা কি।"

অধ্যায় নয়

বর্তমান সময়

নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

জায়গামতো পৌছে গেছে কিন্তু সঠিক ভবনটা বের করতে পারছে না কন্সটেবল আবদুল্লাহ। “পথ তো ঠিকই আছে মনে আছে, তাইলে বিল্ডিংটা গেল কই?” আপনমনেই নিজেকে প্রশ্ন করলো কন্সটেবল ছেলেটা। স্থানীয় উচ্চারণের সাথে শুদ্ধ বাংলা মিলিয়ে খুব অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলে সে।

চরম বিরক্তির সাথে তার দিকে ফিরে তাকালো বাশার, “এই ছেলে, তুমি না আসার সময়ে বললে জায়গাটা তুমি চেনো। তাহলে এখন চিনতে পারছো না কেন?”

“এইদিগেই তো অছিল,” ছেলেটা জানালা দিয়ে মাথা বের করে অস্থির হয়ে ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে বলতে লাগলো।

“এই ছেমড়া, তুই না নাসিরাবাদ কলেজে পড়ালেহা করছোস, তুই নতুন বাজার এলাকা চিনস না?” গজ-গজ করতে করতে বলতে লাগলো রমিজ দারোগা।

“আপনি তো মনে হয় ওর জন্মের আগে থেকে এই এলাকায় আছেন,” এই রমিজ দারোগা লোকটার কথা-বার্তা আচার-আচরণ সবকিছুই বিরক্তিকর লাগছে বাশারের কাছে। “আপনি চেনেন না কেন?”

বাশারের কথার জবাবে একটু হকচকিয়ে গেল সে। জিপের পেছনের খোলা অংশ দিয়ে বাইরে মাথা বের করে আশেপাশে তাকাতে-তাকাতে বলতে লাগলো, “এনুই আছে।”

বিরক্তির সাথে একবার মাথা নেড়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে গুগল ম্যাপ ঘাঁটতে লাগলো বাশার। “এই আবদুল্লাহ, জিপটা একদিকে সাইড করো,” থানার কন্সটেবল ছেলেটা যেভাবে বর্ণনা করেছিল সেভাবেই অবস্থানটা দেখে নিয়ে আবারো নির্দেশ দিতে লাগলো ও। “আমরা বেশি সামনে চলে এসেছি জিপটা ঘুরিয়ে উল্টোদিকে যেতে হবে।”

আবদুল্লাহ ছেলেটা ওর নির্দেশমতো আবারো জিপটাকে পেছনে নিয়ে নতুনবাজার মোড়ের ডানদিকে চলে এল।

“ওইতো, সামনের কনফেকশনারিটা পার হয়ে বামদিক দিয়ে ঢুকতে হবে।”

ম্যাপ অনুযায়ি কনফেকশনারিটা পার হয়ে সামনে এগোতেই ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে লেখা দেখতে পেল ওরা; ‘পিবিআই’। “হ্যা, এদিক দিয়েই।” সাইনবোর্ডটা দেখেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে ও, এখানেই হবে। ওদের জিপ বাম দিক দিয়ে ঢুকে কয়েকটা বাড়ি আর দুটো গ্যারাজ পার হতেই সামনে চোখে পড়লো পুরনো দিনের একটা বেশ বড় ভবনে রেনোভেশনের কাজ চলছে। বাইরে বড় একটা সাইনবোর্ড লাগানো। তাতে লেখা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন। শুধু এই কথা তিনটেই লেখা আর কিছু লেখা নেই। সাইনবোর্ডটাও সামান্য বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে।

ব্যাপার কি? শুনলাম এখানে বিশাল আয়োজন চলছে। পুলিশ, সিআইডি আর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন তিনটে ফোর্সের ব্যবহারের জন্যেই কমন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট খোলা হচ্ছে, এই তার নমুনা।

গেটের সামনে জিপটা থেমে যেতেই বাশার বেরিয়ে এল ওটার ভেতর থেকে। আবদুল্লাহকে জিপটা পার্ক করতে বলে রমিজ দারোগাকে নিয়ে ভেতরের দিকে এগোল ও। গেটের কাছে যেতেই দু’জন দারোয়ানের একজন জানতে চাইলো ওরা কারা, কার সাথে দেখা করতে এসেছে। বাশার নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো কার রেফারেন্সে এসেছে। একটা ভিজিটর বইতে সই করার পর ওদেরকে গেটের সাথেই লাগোয়া রিসিপশনে বসানো হলো।

রিসিপশন কক্ষটা ছোট হলেও চমৎকার দেখতে। রুমের ইন্টেরিওর খুবই সুন্দর। ওরা ভেতরে বসার সাথে সাথে রমিজ দারোগা ওকে কিছু একটা বলতে চাইছিল তাকে এক কথাতেই চুপ করিয়ে দিয়ে সোফা থেকে উঠে এল বাশার।

পুরো রিসিপশন রুমটাই কাঁচের তৈরী। রিসিপশন রুমের কাঁচের দেয়ালের ভেতর থেকে ও সম্পূর্ণ বাড়িটা দেখতে লাগলো । বাড়িটা পুরনো আমলের কোন সন্দেহ নেই। বিশাল এলাকা নিয়ে অবস্থিত বাড়িটার বাউন্ডারিটাও উঁচু করা হচ্ছে। সামনের অংশের কাজ শেষ হয়ে গেলেও এখনো পেছনের অংশের কাজ চলছে। এ’কারণেই সামনের সাইনবোর্ডের এ-অবস্থা।

বাউন্ডারিটার ভেতরে বাড়িটার অবস্থান একপাশে। অন্যপাশটা পুরোটাই ফুলের বাগান। পুরনো দিনের বাড়িটা লাল ইটের তৈরী।

“স্যার, আমার নাম মিলন। আপনি কি বাশার স্যার?” পেছন থেকে ভেসে আসা পরিমিত কণ্ঠস্বরটা শুনে ফিরে তাকালো ও। রিসিপশন রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক সুদর্শন যুবক। তার পরনে কালো প্যান্ট আর ঘিয়ে রঙের শার্ট, সুন্দর পরিপাটি করে আচড়ানো চুল, চোখে বেমানান রকম মোটা কাঁচের চশমা।

“হ্যা, আমিই বাশার,” সামনে এগিয়ে ছেলেটার বাড়িয়ে ধরা হাতটা ধরে মৃদু ঝাঁকি দিলো। “আর উনি মিস্টার রমিজ,” বলে সে রমিজ দারোগার দিকে দেখালো ও।

“এই পোলা, তুমার চশমার যে পাওয়ার দেকতাছি তুমারে তো পরায় কানাই কউন যায়। তুমি পুলিশে চাকরি পাইলা কেমনে?” বলে সে হাসতে লাগলো।

হঠাৎ রমিজ দারোগার এমন কথা শুনে মিলন নামের ছেলেটা বেক্কেল হয়ে গেল। হতভম্ভ হয়ে একবার রমিজ দারোগার দিকে তাকালো, তারপর ফিরে তাকালো বাশারের দিকে।

“মিস্টার মিলন, আপনি হয়তো জানেন আমরা একটা বিশেষ কেসের কাজ নিয়ে এসেছিলাম,” প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে সাথে-সাথে বলে উঠলো বাশার।

“জি, স্যার। অবশ্যই। আপনারা আসুন আমার সাথে,” বলে ছেলেটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো। রমিজ দারোগার দিকে একবার চোখ রাঙিয়ে ছেলেটার পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলো বাশার।

“সরি স্যার, আপনাদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম। আসলে আমরা প্রচন্ড চাপের ভেতরে আছি। একদিকে ভবনটার রেনোভেশনের কাজ চলছে, অন্যদিকে আবার ল্যাব বসানো থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ শেষ করার জন্যে ওপর মহল থেকে চাপ। সব মিলিয়ে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা।”

“আপনাদের এই কমন ফরেনসিকের ব্যাপারটা আসলে কি? আমি বেশি কিছু জানি না এখনো,” বাশার খুব আগ্রহ নিয়ে বাড়িটা দেখছে। ওরা ইতিমধ্যেই বাগান পার হয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছে। একসময়

বাড়িটা নিশ্চিত কারো বাসভবন থাকলেও এখন সেটাকে পূর্নাঙ্গ একটা অফিসে রূপ দেয়ার কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছে।

মিলন ছেলেটা পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। “স্যার, আপনি জানেন হয়তো শুধুমাত্র মার্ডার কেস নিয়ে ডিল করার জন্যে দেশে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কেসে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ব্যাপক সাফল্যে ওপর মহল থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে হোমিসাইডের শাখা বৃদ্ধি করা যায় কিনা। সেটা অনেক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে হোমিসাইড আর পিবিআইয়ের তত্বাবধানে একটি করে কমন ফরেনসিক ল্যাব বাসানো হবে। যেখানে পোস্টমর্টেম থেকে শুরু করে যেকোন ধরণের ফরেনসিকের কাজ করার ব্যবস্থা থাকবে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া এসব জায়গার সাথে সাথে আমাদের ময়মনসিংহেও বসানো হচ্ছে এই অত্যাধুনিক ল্যাব। যদিও কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরো সময় লাগবে। তবে প্রাথমিকভাবে কাজ চালানোর মতো সেটআপ হয়ে গেছে। ”

বাশার আর রমিজ দারোগাকে পাশে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ভেতরের দিকে চলে এলো সে।

“স্যার আমরা চলে এসেছি। এখানেই আপনাদের উদ্ধার করে আনা সেই গাড়িটা আছে। আর ভেতরে আমাদের নিয়মিত কর্মকর্তা আশরাফ স্যার তো আছেনই। আর ঢাকা থেকে আসা একজন এক্সপার্টও আছেন। গুড লাক স্যার,” বলে ছেলেটা দরজাটা মেলে ধরলো ওদের জন্যে।

রমিজ দারোগাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে একবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস-ফিস করে তাকে ধামকি দিয়ে দিলো বাশার। “আপনার মুখটাকে একটু সাবধানে চালাবেন। উল্টা-পাল্টা কিছু বলবেন না দয়া করে।”

কিসের হুমকি, কিসের কি, বাশারের কথা শুনে তার মুখে ফুঁটে উঠলো এক ধরণের তৈলাক্ত হাসি, “আরে কি যে ...”

“হ্যালো, আপনি নিশচই ইন্সপেক্টর বাশার। আমি মুহাম্মদ আশরাফ। সিনিয়র ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট,” ফরেনসিকের ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট একটা চেহারা ভেসে ওঠে এই লোক সেরকম কিছু না। পরনে ফরমাল শার্ট প্যান্ট।

মাথায় পাতলা হয়ে আসতে থাকা চুল, তাতে রূপালি ঝিলিক। চোখে অদ্ভুত একটা চশমা।

“জি আমিই বাশার। ওই শেষ মোড়ে পুকুরের তলা থেকে যে গাড়ি আর কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেই কেসের তদন্তকারী অফিসার,” বলে সে লোকটার সাথে হাত মেলালো। “আর ইনি আমার সাথে কাজ করছের। মিস্টার রমিজ,” সে রমিজের দিকে দেখালো। আশরাফসাহেব তার দিকে হাত মেলানোর সময় সে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে আমুদে ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো বাশারের কড়া দৃষ্টি দেখে থেমে গেল।

“ওহ্, আপনার কেসটা সত্যি ইন্টারেস্টিং। আমাদের এই ল্যাব বসানোর পর থেকে প্রায় কোন কেসই এখনো আসেনি, এরকম ইন্টারেস্টিং কেসতো দূরে থাক।”

“এইডা ক্যামুন ল্যাব? আমার কাছে তো গ্যারেজ মনে অইতাছে,” আনমনেই বলে উঠলো রমিজ দারোগা। বলেই সে বাশারের চোখ রাঙানির ভয়ে অন্যদিকে ফিরে তাকালো।

তবে রমিজ দারোগার কথার সাথে বাশারও খুব বেশি দ্বিমত নয়। এই ল্যাবটা অনেকটা গ্যারাজের ওয়ার্কশপের মতোই লাগছে দেখতে। একপাশে কম্পিউটার আর মাইক্রোস্কোপিক ইক্যুইপমেন্টগুলো বাদ দিলে পুরো ল্যাবটাই অনেকটা ওয়ার্কশপের মতো।

“হা-হা, উনি ভুল বলেন নি,” বলে আশরাফসাহেব হাসতে লাগলো। “আমরা এই ওয়ার্কশপগুলোকে গ্যারাজ-ল্যাব বলেও ডাকি মাঝে মাঝে। যা বলছিলাম। এভাবে পুকরের তলা থেকে আস্ত একটা গাড়ি তাও আবার লাশসহ উঠে আসার কথা আমি এই ময়মনসিংহ শহরে কখনো শুনিনি। তবে অবাক করা ব্যাপার হলো, এতোদিন যাবৎ এই গাড়িটা পুকুরের তলায় পড়ে আছে কেউ টেরও পায়নি এটা কেমন কথা।”

“এর পেছনে একটা কারণ হলো এই পুকুরটা নিয়ে অনেকদিন ধরে বিবাদ চলছিল। যেকারণে কেউই এটা ব্যবহার করতো না। স্থানীয় কিছু লোকজন গোসল করা আর মাঝে-মাঝে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা ছাড়া অনেকদিন ধরেই এই পুকুরের আর কোন ব্যবহার ছিল না। যেকারণে কেউ এর নিচেও নামেনি আর টেরও পায়নি এর নিচে এরকম কিছু একটা পড়ে আছে।”

“হুম, সেটা হতে পারে। আপনাদের কেসটা আমরা ল্যাবওয়ার্কের হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আপনার গাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটা আমরা দেখছি। আর গাড়ির ভেতরে পাওয়া ডেডবডির ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন আমাদের গেস্ট ডক্টর মনিকা। আসুন আপনাদের গাড়িটার কাছে নিয়ে যাই,” বলে সে ওদেরকে নিয়ে ল্যাব কাম ওয়ার্কশপটার এক কোনায় নিয়ে এল।

সেখানে একটা অদ্ভুত দর্শন চারকোনা স্ট্যান্ডের ওপরে গাড়িটাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আগে যেরকম শ্যাওলায় ঢেকে ছিল এখন সে-অবস্থায় নেই, তবে এখনো ওটার অবস্থা খুবই খারাপ। মাছ কাটার সময়ে যেভাবে মাছের পেটের ভেতর থেকে নাড়ি-ভুড়ি সব বের করে আনা হয় ঠিক সেইভাবে গাড়ির ভেতর থেকে সিট, স্টিয়ারিং, ইঞ্জিনসহ সবকিছু বের করে আনা হয়েছে। সেগুলোও সাজিয়ে রাখা হয়েছে গাড়ির পাশেই একটা ওয়ার্কবেঞ্চের ওপরে।

বাশার মনোযোগ দিয়ে গাড়িটার দিকে তাকালো। শ্যাওলা আর কাদায় ঢেকে থাকার কারণে প্রথমবার দেখার পর ও ভেবেছিল গাড়িটা বোধহয় সাদা রঙের কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে একসময় গাড়িটার রঙ কালো ছিল।

“গাড়িটাকে যতোটা পারা গেছে ঠিক-ঠাক মানে পরিষ্কার করা হয়েছে, ভেতরে যা-কিছু ছিল সবই বের করে ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়েছে,” ওদেরকে ওয়ার্কবেঞ্চের সামনে নিয়ে এল আশরাফ সাহেব।

“আচ্ছা গাড়িটার ব্যাপারে কি কি জানা গেছে?” বাশার প্রশ্ন করলো। আশরাফকে প্রশ্নটা করে ও রমিজ দারোগাকে নির্দেশ দিলো, “রমিজসাহেব, আমাদের ভেতরের যা-যা কথা হবে নোট করে নিন।”

রমিজ দারোগা ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে একটা ছোট সরকারি সিল দেয়া নোট বই বের করাতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো বাশার। ও ভয় পাচ্ছিলো লোকটার কাছে আদৌ নোটবই ব’লে কিছু আছে কিনা। যাক লোকটাকে যতোটা খারাপ ভাবছিল ও অতোটা অকর্মা মনে হয় সে না।

“গাড়িটা আবিষ্কার হবার পর গতকাল আমরা সেটা স্পট থেকে উদ্ধার করে আনি। আনতে-আনতে অবশ্য বিকেল হয়ে যায়। উদ্ধার করে আনার সময়ে আমাদের একটা দল পুকুরসহ সমস্ত জায়গাটা জরিপ করে আসে। ওখান থেকে প্রায় কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে যা-যা ওখানে আছে সেসবের

একটা তালিকা করা হয়েছে। যাবার সময়ে একটু মনে করবেন আপনাকে একটা কপি দিয়ে দিবো। গাড়িটা নিয়ে আমাদের মেকানিকেরা কাজ শুরু করে কাল রাত থেকে। পরিষ্কার ও শুকোনোর কাজ চলে প্রাথমিকভাবে। আর ভেতরটা ক্লিয়ার করা হয়েছে আজ। একটা ব্যাপার অমরা বুঝতে পেরেছি গাড়িটা অনেক দিন এই পুকুরের তলায় পড়ে ছিল। একেবারে S^2 অ্যানালিসিস না করলেও এটা পরিষ্কার যে অন্তত দশ-বারো বছর ধরে ওটা পানির তলায়ই ছিল।"

"এই, মেশিন ওঠাও মেশিনও ওঠাও, যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি," হঠাৎ কোন একজন মানুষের ভোঁতা গলা ভেসে এল খুব কাছে থেকে।

আশেপাশে তাকিয়েই কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হলো বাশার। পাশ থেকে রমিজ দারোগাকে বিড়-বিড় করে বলতে শুনলো, "আরে, বুতে কতা কয়নি?"

"আহ্, যা ভাবছিলাম, আমাকে আর বলতে হবে না, ঢাকা থেকে এভিডেন্স টিমের এক্সপার্ট এসেছিলেন ল্যাব সেট-আপের কাজ করতে। উনিই আপনাদের বাকিটা বলতে পারবেন," কথা বলতে-বলতে আশারাফ গাড়ি রাখা সেই অদ্ভুত দেখতে স্ট্যান্ডটার পাশে গিয়ে একটা সুইচ টিপে দিতেই দিতেই গাড়িসহ সেটা ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। কিছুদূর উঠে থেমে গেল মেশিনটা। ওটার নিচ থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত দেখতে একজন মানুষ।

"আরে! আপনি কি আমাকে মেশিনের নিছে ফেলে মারতে চাচ্ছিলেন নাকি?" মানুষটা এক গড়ান দিয়ে মেশিনের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে হাতের ময়লা মুছতে-মুছতে বলতে লাগলো। "উফ্, একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবে যা পেয়েছি তার তুলনায় কষ্টটা কিছুই না," নিজের মনেই হাত মুছতে মুছতে কথাগুলো বলছিল, হঠাৎ আশরাফের সাথে আরো দুজনকে দেখে থেমে গেল সে। "ওহ্, সরি আমি ভেবেছিলাম এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।"

"আমি, ইন্সপেক্টর আহমেদ বাশার," বলে ও মানুষটার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। ছোট-খাট গোলগাল মানুষটার পরনে একটা খাকি হাফপ্যন্ট- যেটা এই মুহূর্তে ময়লা হয়ে আছে- ওপরে সবুজ রঙের টি-শার্ট-হাফপ্যান্টকে যদি ময়লা বলা হয় তবে টি-শার্টটার কোন বর্ণনার দরকার নেই। ছোটখাট মানুষটার শরীরের মাঝামাঝি বেশ সুন্দর গোলচে একটা ভুঁড়ি আর মুখে

খোঁচাখোঁচা দাড়ি। টকটকে লাল দুচোখ দেখে বাশার অনুমান করলো মনে হয় সারারাত ঠিকমতো ঘুমায়নি সে। “আমি এই কেসের তদন্তকারী অফিসার।”

“আমি টমি, টমি পোদ্দার,” নিজের নাম বলে সে তার কলিঝুলি মাখা হাতটা বাশারের দিকে বাড়িয়ে দিয়েও সরিয়ে নিলো। “আমি আসলে হাত মেলানোর মতো অবস্থায় নেই। দেখতেই পাচ্ছেন।”

টমি পোদ্দার, এ কেমন নাম! মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছু বললো না বাশার।

“কিয়ের ‘দার’?” রমিজ দারোগার খিক-খি হাসি আর প্রশ্ন শুনে বোকা বনে গেল বাশার। কঠিন দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো তার দিকে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে আশরাফ ওদেরকে টমির পরিচয় জানালো। “টমি স্যার এভিডেন্স আর সাইবার ম্যাটেরিয়ালের ব্যাপারে এক্সপার্ট। উনি ঢাকা থেকে এসেছিলেন মূলত আমাদেরকে ল্যাব কাম ওয়ার্কশপটা সেট-আপ করতে কিন্তু এর মধ্যেই আপনাদের কেসটা চলে আসাতে স্যারই কেসটা নতুন ল্যাবে ইন্সটল করতে বলেন। আর এ’কারণেই গাড়িটা প্রথমে থানায় নিলেও এখানে নিয়ে আসা হয়। একইভাবে গাড়িতে পাওয়া ডেড বডিটাও প্রথমে চরপাড়া মেডিকেলে নেয়া হলেও পরে এখানে নিয়ে আসা হয়।”

“বুঝতে পেরেছি,” বাশার রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে নোট নেবার বদলে পকেট থেকে মোবাইল বের করে টেপাটেপি করছে। আনমনেই একবার মাথা নেড়ে নিজের মোবাইল বের করে রেকর্ডার অন করে সেটটা বুক পকেটে রেখে দিলো ও।

“আপনাদের টাইমিংটা ভালো হয়েছে। আমি কাজ অনেকটাই গুছিয়ে এনেছি। যদিও কাল রাত থেকে প্রায় ঘুমুতেই পারিনি এজন্যে,” বলে টমি তার দুই হাত ওপরে তুলে শরীরটাকে টান-টান করে দিলো একবার। “আসুন আগে আপনাদেরকে গাড়িটার ব্যাপারে বলি,” ওরা আবার গাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। একটা লম্বা তারের সাথে লাগানো রিমোটের মতো দেখতে একটা জিনিসে সুইচ টিপতেই স্ট্যান্ডসহ গাড়িটা একটু ওপরে উঠে গেল।

“গাড়িটা লম্বা সময় ধরে পানির নিচে ছিল- সেটাতো আপনারা জানেনই। অতিরিক্ত সময় ধরে ওটা পানির নিচে পড়ে থাকার ফলে অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। গাড়িটা একটা শেভ্রোলে সেডান গাড়ি-”

“কতোদিন এটা পানির নিচে পড়ে ছিল...?” টমির কথার মাঝখানে প্রশ্ন করলো বাশার আর তাকে কথা শেষ করতে দিলো না রমিজ দারোগা।

“কয়দিন আর ওবো... দেইখা তো মনে অয়...” রমিজ দারোগা কথা শেষ করার আগেই তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো বাশার, আর ওদের দুজনার দিকে কড়া দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো টমি।

“বলছি, ভাই,” তার মৃদু ধমক শুনে দুজনেই চুপ মেরে গেল। “এতো অস্থির হলে চলে। সারারাত ধরে কাজ করেছি। একটু সময় নিয়ে তো বলতে দিবেন, নাকি?”

“সরি, ভাই। প্লিজ, ক্যারি অন,” বাশার একটা হাত তুলে এই বেমক্কা আচরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো।

“তো যা বলছিলাম,” টমি এবার তার হাফপ্যান্টের কোমরে গুঁজে রাখা একটা ডায়েরি বের করে সেটা দেখে বলতে শুরু করলো। “গাড়িটা একটা কালো রঙের শেভ্রোলে সেডান। এই মডেলগুলো জার্মানিতে ম্যানুফেকচার করা হয়েছে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। এই গাড়ি বাংলাদেশে খুব কমনও না আবার একেবারে পাওয়া যায় না এমনও নয়। গাড়িটার ইঞ্জিন বের করে ওটার নম্বর মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু মরিচা পড়ে ওটার ইঞ্জিনের নম্বর গেছে মুছে। ফলে ওখান থেকে খুব বেশি সুবিধে পাওয়া যায়নি। এরপর আমরা অ্যানালিসিস শুরু করি গাড়ির ভেতরে যা-যা পাওয়া গেছে সেগুলো নিয়ে,” বলে সে ওদেরকে নিয়ে গাড়িটার পাশেই একটা ওয়ার্ক বেঞ্চের দিকে চলে এল।

“একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে সেতো আপনারা জানেন। সত্যি কথা হলো ডেডবডি বলতে শুধু একটা কঙ্কাল বাদে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই ওটাতে। আর সাথে যা যা জিনিসপত্র ছিল সবই অতিরিক্ত সময় ধরে পানিতে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এখান থেকেও তেমন কিছু বের করা যায়নি,” বল সে হাতে গ্লাভস পরে নিয়ে একটা একেবারেই পড়ে যাওয়া জিনিস তুলে দেখালো। আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে একসময় ওটা মানিব্যাগ ছিল কিন্তু এখন একতাল শুকনো কাদার মতো দেখাচ্ছে।

“আরেকটা বাতিল জিনিস হলো এটা,” বলে সে নাটকীয় ভঙ্গিতে বেঞ্চের ওপর রাখা একটা পাতলামতো জিনিস উপুর করে দেখালো।

“নম্বর প্লেট,” চরম স্বস্তির সাথে শব্দগুলো বাশারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

“হ্যা, নম্বর প্লেট,” বলেই সে জিনিসটা ঘুরিয়ে দেখাতেই বাশার গুঙিয়ে উঠলো। প্রায় সব নম্বরই মুছে গেছে। দুয়েকটা বোঝা গেলে যেতেও পারে। তবে সেটাতে কতোটা কাজ হবে বলা মুশকিল।

টমি পোদ্দারের হাতে নম্বর প্লেট দেখে বাশার খুশি হয়ে গেছিল এরপর সে আবার হতাশ হয়ে শেষ কথাটা শুনে আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

“যদি দুটো নম্বর মিসিং থাকতো প্লেটে তবুও হয়তো আমি সফটওয়ারে এন্ট্রি দিলে ঘন্টাখানেকের ভেতরে নম্বরটা বের করে ফেলতে পারতাম কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটের বেশিরভাগ নম্বরই মুছে গেছে, কাজেই এটা থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না,” বলে সে প্লেটটা ওয়ার্ক বেঞ্চের ওপরে ছুঁড়ে দিলো।

বাশার একটু হতাশ হয়েই ওয়ার্ক বেঞ্চের কাছে এসে একটা জিনিস হাতে তুলে নিলো সে। লোহার তৈরী জিনিসটাতে লম্বা ডান্ডার মাথায় অষ্টভূজাকৃতির একটা প্রায় গোল বৃত্ত বসানো। জিনিসটা নেড়ে-চেড়ে দেখে সে টমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “এটা কি?”

“বুঝতে পারছি না। গাড়ির কোন পার্টস কিংবা মেরামতের জিনিস হতে পারে।”

“হুম্, বুঝতে পেরেছি,” বলে বাশার জিনিসটা বেঞ্চের ওপরে নামিয়ে রাখলো।

“আরেকটা জিনিস ছিল গাড়ির ভেতরে কিন্তু এটার অবস্থাও খুবই খারাপ,” বলে বেঞ্চের ওপর থেকে কাপড়ে মোড়ানো ধাতব কিছু একটা বের করে তুলে ধরলো টমি পোদ্দার।

“একটা পিস্তল,” বাশার আগ্রহী হয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু মরিচা পড়ে ওটার অবস্থা খুবই খারাপ। “এটা কোন মডেলের পিস্তল সেটাই বোঝা যাচ্ছে না,” হতাশ সুরে বলে উঠলো বাশার।

“হ্যা, তবুও এটা ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে যদি অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা কিছু বের করতে পারে।”

“আচ্ছা গাড়িটা পানির নিচে থাকার একেবারে সঠিক সময়টা কি বের করা সম্ভব?”

“সব হতাশার মাঝে এইখানে একটু আশার আলো আছে। আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই,” বলে সে ওদেরকে নিয়ে এল ল্যাবের মতো দেখতে জায়গাটার সামনে। “এই ব্যাপারটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তবে আশার কথা হলো কাজটা শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছি। মানে গাড়িটা কতোদির যাবৎ পানির নিচে ছিল সেটা বের করতে পেরেছি।”

টমি পোদ্দার আবার বয়ান শুরু করবে বুঝতে পেরে বাশার তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই রমিজ দারোগা জানতে চাইলো, “ক্যামনে বাইর করলেন এইডা?”

সাথে-সাথে টমি খুশি হয়ে উঠলো। তার মুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে এতোক্ষণে রমিজ দারোগার কথাটা তার পছন্দ হয়েছে। “প্রক্রিয়াটা খুবই কঠিন কিন্তু মজা আছে। বলছি,” বলে সে একটা চেয়ারে বসে ল্যাব মেশিনের সাথে লাগানো কম্পিউটারের কী-বোর্ডে কিছু একটা লিখতে শুরু করলো।

“মানে আমি সংক্ষেপে জানতে চাচ্ছিলাম-” বাশারকে ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে টমি ¯ফে একটা হাত নাড়লো। “আরে, পুরোটা শোনেন। মজা পাবেন।”

বাশার চাচ্ছিলো যতোটা পারা যায় সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরে এখানকার কাজ সেরে মূল কাজে নামতে কিন্তু এই লোক যেভাবে লেকচার দেয়া শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে না খুব সহজে সে ওদেরেকে ছেড়ে দিবে। বাশার অসহায়ভাবে একবার আশরাফের দিকে তাকালো। আশরাফ ¯ফে একবার কাঁধ নাড়লো।

“এই ব্যাপারটা একেবারে কাটিং এজ টেকনোলজি। সত্যি কথা হলো এটা আসলে আমাদের দেশে কাটিং এজ হলেও বিশ্বব্যাপি অনেকদিন ধরেই চলছে। এটাকে বলা হয়ে থাকে ন্যানো-টেকনলজি,” বলে সে মনিটর ঘুরিয়ে ওদেরকে কী-সব দেখালো।

“তো এটা দেখে কিভাবে বুঝতে পারলেন যে গাড়িটা কতোদিন ধরে পনির নিচে ছিল?” টমির ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে বাশারও একটু আগ্রহি হয়ে উঠেছে।

“এইখানেই তো মজা। আপনাকে বললাম না কাল রাত থেকে কাজ করছি এটা নিয়ে। ব্যাপারটা হলো এটাতে গাড়িটার গায়ে জন্মানো জলজ উদ্ভিদ থেকে শুরু করে গড়ির বিভিন্ন পার্টের অবস্থাসহ সমস্ত ভিজ্যুয়াল ডেটা সহ সবকিছু ইনপুট আকারে দিতে হয়। ডেটা ইনপুট ঠিকমতো দিলে পরে সিস্টেম সেই ডেটা নিয়ে অ্যানালিসিস শুরু করে। প্রথম সমস্যা হলো ডেটার ইনপুট। কোন জায়গার ডেটা কিভাবে দিতে হবে কিংবা কোনটা একটু উল্টোপাল্টা হলেই সর্বনাশ। সিস্টেম সেটার এন্ট্রি নিবে না। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তো এভাবে টানা কয়েকবার চেষ্টা করার পর গতকাল প্রায় মাঝরাতের দিকে ঠিকভাবে ডেটা ইনপুট দিতে সমর্থ হই অমরা। তো এরপর থেকে সিস্টেম সেটা অ্যানালিসিস শুরু করে। এটাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ”

“তাহলে কখন পাওয়া যাবে এই অ্যানালিসিসের আউটপুট?” বাশার একটু অধৈর্য হয়েই জানতে চাইলো।

“এখুনি। কারণ টানা কয়েক ঘন্টা ধরে অ্যানালিসিস করার পর আপনারা আসার একটু আগেই আমি আউটপুট বের করে রেখেছি,” বলেই টমি তার বত্রিশ দন্ত প্রদর্শন করলো ওদেরকে।

বাশার রাগের সাথে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। এই লোকটা এতোক্ষণ ধরে অকারণেই পাকাচ্ছিলো ওদের সাথে। তবে টমি এবার বেশি ঝামেলা করলো না। কম্পিউটার কিবোর্ডের নিচ থেকে একটা স্বচ্ছ ফাইল বের করে বাশারের হাতে ধরিয়ে দিলো।

বাশার ফাইলটা খুলে দেখলো তাতে টানা কয়েক পৃষ্ঠা ধরে বিভিন্ন ধরণের অ্যানালিসিস লেখা। “কই, এখানে তো সব দেখতে পাচ্ছি সায়েন্টিফিক ডেটা,” পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বাশার অবাক বললো। “কোন সময় তো দেখতে পাচ্ছি না। ওহ আচ্ছা,” বাশার শেষ পৃষ্ঠায় চলে এসেছে। এখানে সমস্ত হিসেব-নিকেশ শেষ করার পর ফলাফল দেখাচ্ছে। “এগারো বছর? মানে এগারো বছর ধরে এই গাড়িটা পুকুরের তলায় পড়ে ছিল?” বাশার অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

“এগারো বছর। দিন তারিখ কিংবা সময়ের ব্যাপারটা বলা সম্ভব নয় তবে এটা একেবারেই ঠিক যে গাড়িটা এগারো বছর ধরে পানির নিচে পড়ে ছিল,” টমির মুখে মিটিমিটি হাসি।

***

“মনিকা ম্যাডাম, মানে উনি কি এই লাইনের এক্সপার্ট?” বাশার জানতে চাইলো।

ওয়ার্কশপ ল্যাবের কাজ শেষ করার পর রমিজ দারোগাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে বাশার আর টমি এখন চলেছে মেডিকেল ল্যাবে। ওখানেই ডেডবডিটা রাখা আছে। মিলন ছেলেটা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারনে টমিই বাশারকে এগিয়ে দিতে এসেছে।

বাশারের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললো টমি। “উনি এক্সপার্টদেরও এক্সপার্ট। মনিকা ম্যাডাম এই লাইনে বিশ্বসেরাদের একজন। উনি আসলে আমাদের নিয়মিত মানুষও নন। উনি ইয়েলে নিজের পোস্ট ডকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় পারিবারিক কাজে দেশে এলে উনার এক বন্ধুর অনুরোধে আমাদেরকে কিছু ব্যপারে সহায়তা করার প্রতিশ্রæতি দেন। আপনি এক অর্থে খুবই লাকি, কারণ এই কেসে উনার মতো সাপোর্ট আর কেউই দিতে পারবেন না,” ওরা একটা করিডরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। “আপনি এটা ধরে সামনে চলে গেলেই শেষ মাথায় দেখতে পাবেন একটা স্টিলের দরজা। ওটাই মনিকা ম্যাডামের অফিস। আপনি উনার সাথে কাজ শেষ করে যাবার সময়ে আমার কাছ থেকে গাড়িটার ব্যাপারে বিস্তারিত ও ফাইনাল রিপোর্ট নিয়ে যাবেন।”

বাশার আপাতত তাকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। করিডরের শেষ মাথায় এসে স্টিলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার টোকা দিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবারো হাত ওঠাতে যাচ্ছিলো তার আগেই ভেতর থেকে সুরেলা কণ্ঠে ডাক ভেসে এল, “কাম ইন, প্লিজ।”

স্টিলের দরজাটা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো বাশার। এই ল্যাবের ভেতরটা অনেকটা হাসপাতালের মতো। তবে হাসপাতালের ওয়ার্ডের চাইতে বরং এর সাথে হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারের বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। কক্ষটার অন্য প্রান্তে কয়েক সারি স্টিলের ক্যাবিনেট। বাশার অনুমান করলো সম্ভবত ওগুলোর ভেতরেই লাশ রাখা হয়। কেবিনেটগুলোর সামনে প্লাস্টিকের শিট দিয়ে মোড়ানো খালি দুটো বেড। আর রুমের ঠিক মাঝখানে অপারেশার থিয়েটারের মতো দেখতে একটা টেবিল। ওপরে বিরাট আকারের গোল একটা লাইট একেবারে নিচে নামানো।

বেডটার ওপরে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে কিছু।

পুরো রুমে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাশার ফিরে তাকালো রুমের প্রবেশপথের কাছেই বসানো সুন্দর গোছানো টেবিলটার দিকে। এই মুহূর্তে ওটার ওপরে রাখা একটা ল্যাপটপের ওপরে ঝুঁকে আছে একজন মানুষ। ওর সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর এগিয়ে আসতে লাগলো ওর দিকে।

মুহুর্তের ভেতরে বাশারের মনে হলো সে এই কড়া অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধে ভরা কোন মর্গে দাঁড়িয়ে নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের শেষ বিকেলে পড়ন্ত রোদ এসে পড়া কোন পার্কের সবুজ ঘাসের ওপরে। ওর মনের কোনে বেজে উঠলো কোন গান। আর সামনে এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটাকে মনে হলো 'নটিং হিল' সিনেমার জুলিয়া রবার্টস কিংবা 'টার্মিনাল' সিনেমার ক্যাথরিন জেটা জোন্সের মতো কেউ।

"হ্যালো, আমি মনিকা। আপনি নিশ্চই ইন্সপেক্টর বাশার?" খানিকটা হেসে সে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো বাশারের দিকে।

সাথে-সাথে বাশারের মনে হলো নিজেকে একটা চড় লাগায়। বেহায়ার মতো এতোক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল ও।

"জ্বি...জি আমি বাশার। আপনি ডক্টর মনিকা?" প্রশ্নটা করে আবারো নিজেকে মনে-মনে গালি দিলো ও। কারণ ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যেই নিজের পরিচয় দিয়েছে।

"জি," ধূসর চোখের সুন্দরি কপালের ওপরে চলে আসা এক গাছি মধুরঙা চুল কানের পিছনে গুঁজে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। মহিলার চোখ দেখেই বাশার বুঝলো তাকে প্রথমবার দেখার পর পুরুষ মানুষের এই অভিব্যক্তির সাথে মহিলা মোটেই অপরিচিত নয়। "আপনার কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আসুন দেখাচ্ছি। তবে আগে এগুলো পরে নিলে ভালো হবে। আর এই বিশেষ মাস্কটাও পরে নিন প্লিজ।"

বাশার দ্রুত গতিতে মুখে মাস্ক আর হাতে প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে নিলো। ডক্টর মনিকা ওকে নিয়ে রুমের মাঝখানের বড় টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপরে থেকে প্লাস্টিকের শিটটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল ওটার ওপরে কুৎসিত দেখতে একটা কঙ্কাল রাখা। এই কঙ্কালটাই ওরা পুকুরের নিচের সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার করেছিল। কঙ্কালের ওপরের স্তর থেকে চামড়া আর মাংস তো গায়েব হয়েছেই সেই সাথে হাড়ও ক্ষয় হয়ে গেছে জায়গায়-জায়গায়। পুরো কঙ্কাল জুড়ে হালকা সবজে ধরণের জলজ উদ্ভিদের মতো স্তর। পলিথিনের শিটটা সরাতেই বিশ্রী একটা গন্ধ ভক করে

এসে বাড়ি মারলো নাকে। মুখে উন্নত মানের মাস্ক পরে থাকার পরও উদ্ভট পচা গন্ধটা যেন মগজের ভেতরে গেঁথে যেতে লাগলো বাশারের।

অন্যদিকে ডক্টর মনিকা গ্লাভস পরা হাতে খুবই অভ্যস্ত আর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ওকে দেখাতে লাগলো কঙ্কালটার বিভিন্ন অংশ।

“মিস্টার বাশার, আমি আজ সকাল থেকে এটা নিয়ে কাজ করছি। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে খুব বেশি কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কারণ এতো লম্বা সময় ধরে পানির নিচে থাকলে আসলে তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তবে প্রাথমিক কিছু জিনিস পাওয়া গেছে যেগুলো হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে। আপনার হাতের ডানপাশে টেবিলের ওপরে একটা ক্লিপবোর্ডের সাথে লাগানো এক পাতার একটা রিপোর্ট আছে। ওটাতে চোখ বুলাতে পারেন, সাথে আমি ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছি।”

বাশার টেবিলের ওপর থেকে ক্লিপবোর্ডটা তুলে নিলো। বোর্ডের ওপরে ক্লিপ দিয়ে একটা কাগজ আটকানো। সেটাতে বুলেট পয়েন্টের আকারে কিছু কিছু তথ্য লেখা আছে। খুব বেশি কিছু নেই অবশ্য।

“প্রাথমিক মেডিকেল পরীক্ষায় যা যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো; সাবজেক্ট একজন পুরুষ। উচ্চতা অনুমানিত পাঁচ ফিট নয় বা দশ ইঞ্চি। বেঁচে থাকাকালীন সময়ে বেশ চওড়া একজন মানুষ ছিল। হাড়ের গঠন থেকে শুরু করে অন্যন্য আরো কিছু বিষয় পরীক্ষা করে আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি সাবজেক্ট এই দেশের মানুষ না। সম্ভবত সে একজন ককেশীয়ান।”

“মানে সাদা চামড়ার মানুষ?” বাশার অবাক হয়ে রিপোর্ট থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলো।

“সঠিকভাবে বলতে গেলে সম্ভবত ইউরোপের অরিজিন। মানে সে যে দেশেরই নাগরিক হোকনা কেন তার পূর্ব পুরুষ উত্তর ইউরোপের। হাড়ের গঠন অন্তত তাই বলে।”

“লোকটা কতোদিন আগে মারা গেছে?”

“মৃতদেহের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হয়েছে দশ বছরের বেশি সময় আগে,” বলে সে বাশারের দিকে তাকালো। “হ্যা, এখানে টমির সাথে আমার মতামত অনেকটাই মিলে যাচ্ছে।”

“তারমানে এটা ধরেই নিতেই পারি গাড়ি ও সাথে এই মৃতদেহ এগারো বছর ধরেই পানির নিচে পড়ে ছিল?”

“হুম, তা বলা যেতে পারে।”

“এই মানুষটার ব্যাপারে আর কিছু কী বের করা সম্ভব?” বাশারের মনের ভেতরে খেলা চলছে। একজন বিদেশী এগারো বছর ধরে ময়মনসিংহ শহরের এক পুকুরের তলায় পড়ে আছে, ব্যাপারটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আবার এটা নিয়ে কোন আলোড়ন হয়নি এটাও অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

“হ্যা, সম্ভব,” মনিকা একটু হেসে জবাব দিলো। মাস্কের আড়ালে তার হাসিটা না দেখা দিলেও চোখের উজ্জ্বলতাটুকু ঠিকই নজরে পড়লো। এই বদ্ধ ঘরে এরকম অবস্থাতেও যেকোন পুরুষ মানুষের বুকের ভেতরে ধুকপুকানি সৃষ্টির জন্যে এই চাহনি যথেষ্ঠ। বাশার মুগ্ধ হয়ে মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে যেতে বসেও নিজেকে শক্ত করে একটা ঢোক গিললো।

“সম্ভব, কারণ আমরা নতুন অনেক কিছুই আমাদের দেশের ফরেনসিক মেডিসিনে পরিচিত করার চেষ্টা করছি,” বাশার বিমোহিত সৌন্দর্যের সামনে নিজেকে সামলানোর জন্যে সংগ্রম করছে তবে মনিকার সে-ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তার মতো যান্ত্রিক সুরে বলে চলেছে। “তবে ব্যাপারগুলো এখনো খুবই প্রাথমিক লেভেলে আছে। আর তাছাড়া ব্যাপারগুলো উদ্ধার করাটা একটু সময়সাপেক্ষও বটে।”

“এই মানুষটার ব্যাপারে আর কি কি বের করা সম্ভব?”

“প্রথমত তার চেহারা। একেবারে হুবুহ না হলেও ফরেনসিক সিজিআইয়ের মাধ্যমে তার চেহারার একটা ইমেজ তৈরী করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত তার পরিচয়। তার ডিএনএ স্যাম্পল এরই মধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছি। সেটাকে এখন ঢাকায় আমাদের সেন্ট্রাল ডাটাবেইজে এন্ট্রি দিয়ে খোঁজ করে দেখতে হবে। এ-ক্ষেত্রে তার পরিচয় বের করার একটা সম্ভাবনা আছে।”

“কেমন সময় লাগতে পারে এতে?” মনিকার পিছু নিয়ে বাশার ওর অফিসরুমে চলে এসেছে। মনিকা বাশারের হাত থেকে নিয়ে ক্লিপবোর্ডের ওপরের রিপোর্টটাতে কিছু একটা লিখছে।

“ভালোই সময় লাগবে এতে ইন্সপেক্টর। কারণ ফেসিয়াল সিজিআইয়ের সমস্ত ইনপুট আর ডিএনএ স্যাম্পল আমাকে ঢাকায় পাঠাতে হবে। সেখানে নিয়ে ইনপুট দেয়ার পর সঠিকভাবে বলা সম্ভব কতোক্ষণ লাগতে পারে। আপাতত আপনাকে এই রিপোর্টটার একটা কপি দিচ্ছি।”

“ধন্যবাদ, ডক্টর।”

“ইউ আর ওয়েলকাম,” বলে সে একটা চশমা পরে নিয়ে রিপোর্টটাতে আরেকবার চোখ বুলাতে লাগলো। “কি জানি একটা বলবো ভেবেছিলাম আপনাকে। ও আচ্ছা, লোকটার মৃত্যুর কারণটা কিন্তু আমি বের করতে পেরেছি। ”

“কেন, সে পানিতে ডুবে মারা যায়নি? যেহেতু গাড়িটা পানিতে ডুবে ছিল আমি তো ভেবেছিলাম তার পানিতে ডুবেই মরার কথা,” বাশার একটু অবাক হয়েছে মনিকার কথা শুনে। কারণ এই ব্যাপারটা ওর মাথাতেই আসেনি।

আবারো মৃদু হাসলো মনিকা। আগের মতোই বাশারের বুকে আরেক দফা আলোড়ন বয়ে গেল। “আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম কিন্তু পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে আবিষ্কার করি অন্য ব্যাপার। মানুষটা পানিতে ডুবে থাকলেও তার মৃত্যু পানিতে ডুবে হয়নি। তাকে মারা হয়েছিল ঘাড় ভেঙে।”

সাথে সাথে বাশারের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। এটা একটা বোমা ফাটানো তথ্য। “মানে কি? আপনি বলতে চাইছেন লোকটাকে মেরে পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছিল?”

“সেটা একেবারেই সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে খুব জোর সম্ভাবনা সেটাই।”

“কিন্তু এমনও তো হতে পারে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে পানিতে পড়ার আগেই লোকটার ঘাড় ভেঙে গেছিল। তারপর হয়তো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটা পানিতে পড়ে যায়।”

“গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়েছে না অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়েছে সেটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে লোকটার ঘাড় অ্যাক্সিডেন্টে ভাঙেনি। এটা আমি নিশ্চিত। কারণ অ্যাক্সিডেন্টে ঘাড় ভাঙা সাবজেক্ট এর আগেও

আমি দেখেছি। ওটার ধরণ এমন নয়। এই লোকটাকে খুন করা হয়েছিল," বলে ডক্টর মনিকা একটু থামলো।

"... তাকে খুন করা হয়েছিল গলায় ফাঁস দিয়ে।"

অধ্যায় দশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর, ময়মনসিংহ

“এটাই তো সেই জায়গা নাকি?” প্রশ্নটা ম্যাকফির।

ওরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে সেই ক্যাম্প সাইটে যেখান থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা গায়েব হয়েছে। জমিদারের ওখান থেকে রওনা দিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর এখানে এসে পৌছায় ওরা। কিন্তু এখানে এসে একটু হতাশ হয়ে পড়েছে ম্যাকফি। কারণ জায়গাটাতে বিশেষ কিছুই নেই। সাবধানে মূল জায়গাটা এড়িয়ে ঘোড়াগুলোকে রেখে নেমে আসতে বললো ও সবাইকে।

নিজের ঘোড়াটাকে একটা ছোট গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে সে নিজে এসে দাঁড়ালো জায়গাটার কাছে। বড় ক’রে নিঃশ্বাস নিলো একবার। বাতাসে ভেজা গন্ধ। তারমানে নদী এখান থেকে একেবারেই কাছে। “এখান থেকে কি নদী কাছেই নাকি?” সে প্রশ্ন করলো জোনাথনের উদ্দেশ্যে।

“ওই যে,” বলে জোনাথন হাত তুলে একদিকে দেখালো।

জোনাথনের নির্দেশিত জায়গায় তাকিয়ে নিজেকে বোকা মনে হলো ম্যাকফির। আরে ওইতো গাছপালার ফাঁক দিয়ে পানির রূপালি ঝিলিক চোখে পড়ছে। নদী এতো কাছে আরো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল ওর। ম্যাকফি পুরো জায়গাটার একটা আকৃতি দাঁড় করানোর চেষ্টা করলো। মূল রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদীর খুব কাছেই জঙ্গুলে এলাকার শুরুতেই জায়গাটা। ক্যাম্প করার জন্যে একেবারেই আদর্শ।

“ক্যাম্প করার জন্যে জায়গাটা দারুণ তাইনা, বস?”

“হুম,” জোনাথনের প্রশ্নের জবাবে ম্যাকফি সামান্য মাথা নাড়লো। “একারণেই ওরা এখানে ক্যাম্প করেছিল। একদিকে রাতের গরমে নদীর ঠান্ডা হাওয়া আসবে। অন্যদিকে মূল রাস্তা আর নদীপথের মাঝ বরাবর। কারো চলাচলের পথেও পড়বে না আবার ওরা নিজেরাও যেকোন সময়ে ক্যাম্প গুটিয়ে মূল রাস্তায় চলে যেতে পারবে। কিন্তু,” কি জানি একটা ব্যাপার ম্যাকফির মাথায় আসি-আসি করেও আসছে না।

“কিন্তু কি?” জোনাথন জানতে চাইলো।

“বুঝতে পারছি না। একটা ব্যাপারে কোথায় যেন সামান্য গোলমাল আছে। চলো ক্যাম্পটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। জোনাথন তুমি সবকিছু খুব ভালোভাবে দেখবে আর ওই ব্যাটা গেল কোথায়?” বলেই সে রাজার পাঠানো সহিসটার খোঁজ করলো।

ভীষণ চিকন আর লম্বা লোকটার কি জানি নাম বলেছিল রাজা মশাই কে জানে। ও ডুম্বুর। এ কেমন নাম। ভারতবর্ষে এতো বছরের অভিজ্ঞতায় বহু ধরণের আজব নাম ম্যাকফি শুনেছে কিন্তু এরকম অদ্ভুত নাম এর আগে শুনেছে ব’লে মনে পড়লো না। লোকটার দিকে ফিরে তাকালো ম্যাকফি। এই শুকনো হাড়ের দোকানকে দিয়ে কতোটুকু কাজ হবে কে জানে।

“জোনাথন, রাজা মশায় কি একটা লোক ধরিয়ে দিলো আমাদেরকে!” ম্যাকফির গলায় চরম বিরক্তি। “শোন, আমি মোটেও এর ওপরে ভরসা করতে পারবো না। তুমি কাজ করো, আর একে পাশে রাখো।”

“ঠিক আছে,” বলে জোনাথন মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো ডুম্বুরকে নিয়ে আসতে। সবাই মিলে ওরা ক্যাম্পের ভেতরের দিকে এগোল ।

ঝোপ-ঝাঁড় কেটে বেশ অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছিল তাঁবু বসানোর জন্যে। তাই গোল একটা আকৃতি পেয়েছে ক্যাম্পটা। এখানে ওখানে টুকি-টাকি কিছু জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো থাকলেও তাঁবু থেকে শুরু করে মূল্যবান কোন জিনিসই অবশিষ্ট নেই।

“এখানে কি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না?” জানতে চাইলো ম্যাকফি।

“না থাহুনের মতোনই,” ওদের সাথে আসা শঙ্কর বললো। “যা আছিল ওইগুলা খুবই সামাইন্য জিনিস। দামি কিছুই না।”

“তারপরও যা আছে সেগুলো আমাকে দেখতে হবে। হয়তো ওখান থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যেতে পারে,” ম্যাকফি অনেকটা আনমনেই বলে উঠলো কিন্তু ওর দিকে খেয়াল নেই জোনাথনের, সে তার পিঠ থেকে নামিয়ে বিরাট বন্দুকটা ধরিয়ে দিয়েছে মহাবীর সিংয়ের হাতে। পুরো জায়গাটা তিনশ ষাট ডিগ্রী ঘুরে একবার দেখে নিয়ে বলতে শুরু করলো, “এই জায়গাটায় রাখা ছিল ওদের ঘোড়াগুলো।”

“কয়টা হতে পারে?” ম্যাকফি জানতে চাইলো কিন্তু সাথে-সাথে তাকে থামতে বললো জোনাথন।

“সংখ্যায় পরে আসছি। আগে মোটা দাগে বলে নেই,” বলেই সে আবারো আঙ্গুল তুললো। “এখানে সারি দিয়ে বসানো হয়েছিল পরপর তিনটে তাঁবু। সম্ভবত দুটোতে সৈন্যরা ছিল আর একটাতে ওদের সহিস আর রান্নার লোকেরা,” বলে সে ঘোড়াগুলো রাখার জায়গাটায় চলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলো। সম্ভবত সাত বা আটটা ঘোড়া ছিল। আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না।”

“আর মানুষ? কতোজন মানুষ ছিল সেটা কি আর বলা সম্ভব?”

তাঁবুগুলোর কাছে এসে জোনাথন অনেক্ষণ ঘাঁটাঘাটি করে দেখেও কিছু বুঝতে পারলো না। “আমার পক্ষে তো সম্ভব না-ই কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। কারণ এই জায়গাটার ওপর দিয়ে এতো বেশি ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে এখন আর সঠিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব না।”

“কিছুই না?” একটু হাতাশায় গুঙিয়ে উঠলো ম্যাকফি। ও আশা করেছিল এখান থেকে অন্তত বিশেষ কিছু না কিছু তো পাওয়া যাবেই। অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো জোনাথন। ঝাঁকিয়েই সে অবাক হয়ে ফিরে তাকালো উল্টোদিকে। “আরে, এই ব্যাটা আবার কি করে?”

ডুম্বুর হঠাৎ যেন একটা ঝটকা দিয়ে জেগে উঠেছে। হাতে একটা মোটা সূতোর মতো দেখতে কী জানি নিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। কুকুর যেভাবে মাটি শুঁকে-শুঁকে শিকারের অনুসন্ধান করে ঠিক সেভাবেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে হাতে ধরা সুতোটো ধরে টান দিচ্ছে। একবার লম্বা করে ধরছে ওটাকে আরেকবার ছোট করছে মাটিতে টান-টান করে দিচ্ছে কিন্তু মাটিতে লাগাচ্ছে না সূতোটা। এরকম প্রায় ফুট বিশেক জায়গা ঠিক একইভাবে মাপতে-মাপতে যেখানে ক্যাম্পের লোকজন ঘোড়া রেখেছিল বলে

জানিয়েছিল জোনাথন ঠিক সেই জায়গাটায় গিয়ে থামলো। সেখানে কিছুক্ষণ এটা-সেটা করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ঝটকা দিয়ে।

শেয়াল গোত্রের প্রাণী যেভাবে মুখ উঁচু করে ডাক ছাড়ে সেও নিজের সরু চিকন মুখটাকে উঁচু করে বাতাসে টেনে নিলো নাকের ফুঁটো দিয়ে। তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে এসে ম্যাকফি আর জোনাথনের সামনে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসি দিলো একটা। দুবার মুখ নাড়লো কিন্তু কিন্তু কথা বেরুলো না।

“এই ব্যাটা, কথা বলিস না ক্যান?” খেকিয়ে উঠলো ওদের সাথে আসা শঙ্কর । “কি কি দেখলি?”

শঙ্করের ধমক খেয়ে তার হাসি একটু ¤øান হয়ে গেল। অভিযোগের ভঙ্গিতে একবার হাত নেড়ে সে আবারো মুখ খুললো। এবার তার সরু গলা দিয়ে বেরিয়ে এল অস্বাভাবিক ভারি আওয়াজ। “হুজুর দেহুইন নেংটিডা কিরম করে?” বলে সে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে একবার মারের ভঙ্গি করলো। ডুম্বুরের মুখে ‘নেংটি’ শব্দটা শুনে সাথে-সাথে কালো হয়ে গেল শঙ্করের মুখ। ম্যাকফি অনুমান করলো এটা নিশ্চই স্থানীয় ভাষায় কোন গালি হবে। ডুম্বুরের এদিকে কোন খেয়াল নেই, সে বলে চললো তার আবিষ্কার।

“হজুর আইন্নের অনুমান ঠিকই আছিল তয় পুরাডা না। অইহানে ঘুড়া আছিল মোড নয়ডা। ছয়ডা ছিল সাহেবগর ঘুড়া। আর অন্য তিনডা এইহানের মাইনসের।”

“তুমি কি নিশ্চিত?” ডুম্বুর একেবারে স্থানীয় ভাষায় বললেও ম্যাকফির বুঝতে সমস্যা হয়নি। অন্যদিকে ম্যাকফির ভাঙা বাংলাও ডম্বুর মোটামুটি বুঝে নিলো।

নিজের ময়লা নখ খুঁটতে-খুঁটতে বলতে লাগলো। “আমি ঠিকয় বুচ্ছি। সাহেবগর ঘুরার খুরের নাল অন্যরহম আর এনুর মাইনষের নাল অন্যরহম। তয় হেই তিনটা ঘুড়ার নালই আছিল না। আর সেই তিনডা ঘুরা আইছিলও পরে।”

“মানে ও বলতে চাইছে, কোম্পানির সৈন্যদের ঘোড়াগুলো আগে থেকেই ছিল এরপরে ওদের সাথে আরো তিনটে নাল ছাড়া স্থানীয় ঘোড়া এসে যোগ দেয়,” এই পর্যন্ত বলে ম্যাকফি থেমে যায়। পুরনো অস্বস্তিটা এসে ভর

করেছে কী জানি একটা বুঝেও বুঝতে পারছে না। ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। কপালের পাশের কাটা দাগটা ঘসতে লাগলো হাত দিয়ে। এই ডুম্বুর লোকটা তো বেশ কাজের, মনে-মনে ভাবলো সে। একে আবারো কাজে লাগাতে হবে দেখা যাক কী বের করতে পারে সে।

“ডুম্বুর?” ম্যাকফি ডাক দিয়ে দেখলো সে আর আগের জায়গাতে নেই। সে আবারো কাজে নেমে গেছে। এবার জোনাথন আর ডুম্বুর দুজনে মিলে যেখানে তাঁবুগুলো ছিল সেখানে বসে মাপ-জোখ শুরু করেছে। এদিকে সেদিকে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করলো দুজনে। ম্যাকফি, মহাবীর সিং আর শঙ্কর ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ছায়ার ভেতরে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব কিন্তু অন্যান্য জায়গায় রোদের তেজ মাথা খারাপ করে দেবার মতো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে এল জোনাথন।

“কি খবর? কিছু বুঝতে পারলে?” ম্যাকফি জানতে চাইলো।

“অসম্ভব একটা ব্যাপার। কারণ একে তো ঘটনা ঘটার পর এখানে বহু লোকের সমাগম ঘটেছে তারপর আবার কেন জানি আমার কাছে মনে হলো যারাই এখানে ছিল তারা নিজেদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। তবে এই লোকটা অসাধারণ। আমি ওর তুলনায় ট্র্যাকিংয়ে নস্যি। ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার সাধ্যে এরচেয়ে বেশি আর কিছু সম্ভব না।”

“হুজুর, ছোট মুখে বড় কতা কই,” শঙ্কর ছেলেটা কি মাথা সোজা করে কথা বলতেই পারে না নাকি। মনে মনে প্রশ্ন জাগলো ম্যাকফির। আবারো ওদের সাথে কথা বলার সময়ে শঙ্করেরমাথা নিচু হয়ে গেছে।

“হুজুর, এইহান থাইকা যদি কেউ কিছু বাইর করতে পারে তয় সেইটা ডুম্বুরই পাইরবো। হেয় কিন্তু কাবেল লোক। পাগল অইতে পারে তয় কাবেল। হের নাম আছিল দেলোয়ার আলী। দেলোয়ার থাইক্কা ডুম্বুর। একসময় হেয় আছিল এই এলাকার সেরা সহিস, সৈনিক আর শিকারী। আসাম রাজার সেনাবাহিনীতি আছিল। হেইহানেই ভূপালের যুদ্ধের সময় হের বউ আর বাচ্চাডারে হের চোখের সামনে খুন করার পরে পাগল অইয়া যায়। এহন রাজা সাইবের বাড়িতেই থাহে, ঘুইরা বেড়ায় আর পাগলামি করে। তয় এহনো হেরে ছাড়া রাজা সাইব শিকারে যায় না। লোকে কয় হের নাকি দিব্য আছে। হেয় নাহি অনেক কিছু দেখতে পারে। হেয় নাকি একবার...”

হঠাৎ মাটিতে প্রায় শুয়ে শুয়ে মাপ-জোখ করতে থাকা ডুম্বুর শিস দেয়ার মতো শব্দ করে উঠলো। সবাই চমকে উঠে ফিরে তাকালো ওর দিকে। ম্যাকফি এগিয়ে গেল ওর দিকে। বাকি সবাইও অনুসরণ করলো। ডুম্বুর লোকটা মাটিতে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। দেখতে দেখতেই রীতিমতো আর্তনাদ করে উঠলো, "খারাপ! খুব খারাপ!"

"কি ব্যাপার? কিছু পেলে?" ম্যাকফি চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো। লোকটার এই অদ্ভুত আচরণের কোন মানে বের করতে পারছে না।

"এনু খুব খারাপ কিছু অইছে। বুঝতাছি না। অনেক মানুষ আসছিল কিন্তুক সব মুইচ্ছা গেছে," এই পর্যন্ত বলে সে হঠাৎ মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো। ম্যাকফি একবার জোনাথনের দিকে তাকালো এরপর ফিরে তাকালো শঙ্করের দিকে।

"হুজুর ও পাগল অইতে পারে কিন্তু ওর কামে গলদ নাই। মনে অয় কিছু বুজাইতে চাইতাছে। বুজলে আইন্নেগরই লাভ," শঙ্কর এখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে আসছে। প্রতিবার আর আগের মতো মাথা নিচু করে কথা বলে না।

ম্যাকফি মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সতর্ক থাকার ইশারা করে জোনাথনকে নিয়ে পিছু নিলো ডুম্বুরের।

কারো দিকে খেয়াল নেই তার। একমনে মাটিতে দেখছে একবার, একটু পর পর একটা পাতা, একটা কাঁটাঝোপ উল্টে দেখছে। শিকারি কুকুর যেভাবে ছোট-ছোট ইঁদুর কিংবা খোরগোসের পিছু নেয় ঠিক সেভাবেই যেন একটা শিকারি কুকুরের মতোই ছুটে চলেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। ম্যাকফির পক্ষে তো সম্ভবই না, জোনাথন দুয়েকবার চেষ্টা করে দেখলো কিছু বোঝা যায় কিনা। কিছুই বুঝতে পারলো না, মানুষটা আসলে কি দেখে কিসের পিছু নিচ্ছে।

ওরা এই মুহূর্তে জঙ্গুলে এলাকা থেকে বের হয়ে অনেকটা বন্ধ একটা টিলার মতো জায়গায় এসে পৌছেছে। এখান থেকে জায়গাটা একটা ঢালের মতো নেমে গেছে নিচের দিকে। ঢালের নিচের অংশে নদীর একটা পাশ দিয়ে প্রবেশ করা পানি ছোট একটা নালার মতো সৃষ্টি করেছে। নালাটা পার হলেই অন্যপাশে ছোট একটা ঢাল। ঢালের ওপাশ থেকে নেমে গেছে বিস্তৃত বালুচর। বালিময় চরটাকে দেখতে লাগছে সমুদ্র সৈকতের মতো। বালিময় জায়গাটা পার হলেই শুরু হয়েছে বিপুলা ব্রহ্মপুত্র। ম্যাকফি জঙ্গুলে

জায়গাটা পার হয়ে একবার বিস্তৃত বারিধারার দিকে দেখে নিয়ে আবারো ফিরে তাকালো ডুম্বুরের দিকে।

মাটির দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ছটফট করছে লোকটা। ছোট একটা কাঠি দিয়ে বার বার মাটিতে খোঁচা দিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে সে। জোনাথনও বোঝার চেষ্টা করছে। দুজনে ফিসফিস করে কথাও বলছে কিন্তু ধীরে ধীরে ডুম্বুরের অস্থিরতা বাড়তে লাগলো। জোনাথনের দিকে তাকিয়ে ম্যাকফি ইশারায় জানতে চাইলো লোকটা কি করছে।

জোনাথন ওর দিকে তাকিয়ে একবার অসহায়ভাবে কাঁধ নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই আবারো ডুম্বুর মৃদু চিৎকার দিয়ে উঠলো। হাতের ছোট কাঠিটা ফেলে দিয়ে দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরেছে এখন।

লোকটার এই অবিরাম পাগলামিতে একটু বিরক্ত ম্যাকফি একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলো তার আগেই সে আবারো কথা বলে উঠলো। “হুজুর, খারাপ, খুব খারাপ। ওই লোকগুলো...”

“লোক মানে করা?” জোনাথন বলে উঠলো।

“অনেকগুলো মানুষ... সাহেবরা না, রাজারাও না, অন্য কেউ,” ডুম্বুরের চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। “ওরা খালি পায়ে আসছিল... আসছিল...”

“তারপর?”

“অনেক খারাপ, খারাপ,” সে আবারো ছট-ফট করতে শুরু করলো। “কিন্তুক কিন্তুক ওরা এই পজ্যন্ত আইছিল। কিন্তুক এরপরে গেল কই...? কই গেল?” বলে সে কেমন জানি বিহŸল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। একবার ম্যাকফিকে দেখছে আরেকবার জোনাথনকে দেখতে লাগলো।

ম্যাকফির একাধারে রাগ হতে লাগলো আরেকদিকে লোকটার অবস্থা দেখে একটু মায়াও হলো। রাগ লাগছে কারণ এখানে এসে প্রায় তেমন কোন কাজই হয়নি। অন্যদিকে এই লোকটার জন্যে মায়াও লাগছে কারণ সে তার সাধ্যের চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে। না পারলে এখন কিছুই করার নেই। ম্যাকফি বড় করে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে জোনাথনের দিকে তাকিয়ে ওকে

উঠতে বললো। শেষবারের মতো একবার জায়গাটাকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওরা রওনা দিলো যেখান থেকে এসেছে সেদিকে।

ডুম্বুর কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেছে। আর থেকে থেকে বিড়বিড় করছে, "কেডা এরুম আইতে পারে। এরুম তো অয় নাই..."

"তারমানে ব্যাপারটা হলো, যে বা যারাই এখানে এসে থাকুক এরা খুবই বিপজ্জনক। নিজেদের ট্র্যাক এরা এমনভাবে মুছেছে যে এর মতো লোকও সেটা বের করতে পারছে না," জোনাথন আনমনেই বলে উঠলো। সে একহাতে ডুম্বুরকে ধরে রেখেছে।

"হুম্," ম্যাকফি ডান হাতের একটা আঙ্গুল কপালের পাশে ঘসছে। ওর ভেতরে আবারো পুরনো অস্বস্তিটা ফিরে এসেছে। কি জানি একটা ধরা পড়ি-পড়ি করেও ধরতে পারছে না। "কিন্তু সমস্যা হলো আমি ভেবেছিলাম এখানে এসে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই কিন্তু কিছুই তো পাওয়া গেল না। এবার কোনদিক দিয়ে কাজ এগোবে বুঝতে পারছি না।

"স্থানীয় লোকজনের সাথে আরো বিশদভাবে কথা বলে দেখা যেতে পারে।"

"তোর কি মনে হয় রাজার লোকেরা সেটা করেনি। ওতে খুব বেশি কাজ হবে না। তারচেয়ে আরেক কাজ করা যেতে পারে। এই ক্যাম্প থেকে যা যা পাওয়া গেছে সেগুলো ঘেঁটে দেখা যেতে পারে। ওখান থেকে কিছু একটা পাওয়া গেলে যেতেও পারে। "

"এটা একটা কাজের কথা। "

ওরা প্রায় চলে এসেছে ক্যাম্পের কাছে। দূর থেকেই দেখতে পেল মহাবীর সিং আর শঙ্কর দাঁড়িয়ে আছে। জোনাথন এগিয়ে গিয়ে ঝিমিয়ে থাকা ডুম্বুরকে নিয়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

"হুজুর, কুছ মিলা?" শঙ্কর দূর থেকেই ওদেরকে দেখে জানতে চাইলো।

"নাহ, ডুম্বুর তো কিছুই বের করতে পারলো না।"

ম্যাকফির কথা শুনে শঙ্করের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। "ডুম্বুরও কিছু কইতে পারলো না। তাইলে দুশমন বহুত চালাক।"

“হুম, তুমি একে ধরো। বেচারা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ও অনেক চেষ্টা করেছে, না পারলে কিছু করার নেই। অর্ধ-চেতন ডুম্বুরের মাথা ঝুলে আছে নিচের দিকে। থেকে থেকে বিড়-বিড় করছে।

জোনাথনের কথা শুনেই শঙ্কর এক পা পিছিয়ে গেল, “হুজুর, আমি ওরে ধইরতে পারবো না।”

ম্যাকফি জোনাথন দুজনেই অবাক হয়ে গেছে ওর কথা শুনে। এমনকি মহাবীর সিংও একটু অবাক হয়ে তাকালো ওদের দিকে।

“হুজুর আমি কায়স্থ। শুদ্র কোন হিন্দুরে ধরলেও আমার জাত যাবে আর ও তো মুসলমান,” বলেই সে দুই হাত তুলে নিজের কান ধরে অপারগতা প্রকাশ করলো।

সাথে সাথে মুখ বাঁকা হয়ে গেল ম্যাকফির। আবারো সেই প্রকট বৈষম্য।

“হোয়াট?” তীব্র রাগের সাথে জোনাথন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো ম্যাকফি তাকে থামিয়ে দিলো।

“এই নিরীহ লোকটার ওপরে রাগ দেখিয়ে লাভ কি। ও যদি একে ধরে তাহলে ওর জাত যাবে, ওর পরিবারকে একঘরে করা হবে, ও কাজ হারাবে। ওর জীবন নরকময় হয়ে উঠবে, কাজেই ঝামেলা করে লাভ নেই। মহাবীর সিং তুমি ওকে ঘোড়ায় তোল। চলো আমাদেরকে যেতে হবে।

শেষবারের মতো জায়গাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ম্যাকফি। তেমন কোন কাজ হলো না এখানে এসে। তবে যা-যা পাওয়া গেছে এখানে এসে সেগুলো মনে-মনে গুছিয়ে নিয়ে কাজে নামতে হবে। তবে সেটা আরো দুরূহ হবে। সবাই ইতিমধ্যেই ঘোড়ায় উঠে বসেছে। সে ঘোড়ার কাছে এসে ঘোড়াটার বাঁধন খুলতে লাগলো। ঘোড়ায় উঠে ওরা রওনা দিলো জঙ্গুলে পথ ধরে। ম্যাকফির মনের ভেতরে ঝড় চলছে। কি জানি একটা ব্যাপার মনের কোনে ধরা পড়ি-পড়ি করেও পড়ছে না। ওরা ক্যাম্পের এলাকা ছেড়ে পায়ে চলা পথে প্রবেশ করেছে।

সময়টা দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে চলেছে এখন। জঙ্গুলে পথে সুন্দর ঝিরি-ঝিরি হাওয়া বইছে। কিছু খাবার সাথে করে আনা হলেও সেটা গ্রহণ করা হয়নি। পেটের ভেতরে ক্ষুধার পরিষ্কার ডাক টের পাওয়া যাচ্ছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ঘোড়া থামালো জোনাথন।

“বস, আমরা এখানে থামতে পারি। বিশ্রামও নেয়া হলো সেইসাথে দুপুরের খাওয়াটাও সেরে নেয়া যাবে।”

ম্যাকফি ওর কথা না শুনেই সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মাথায় একটা জট খুলতে শুরু করেছে। যে-ব্যাপারটা ধরা পড়ি পড়ি করেও পড়ছিল না সেটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন।

“বস,” আবারো ডাক দিলো জোনাথন।

“হ্যা,” ঘোড়া থামিয়ে দিলো ম্যাকফি। “এই জায়গাটাই ভালো হবে,” বলে ও ঘোড়াটাকে একপাশে থামিয়ে নামতে লাগলো। অন্যরাও একে একে নেমে আসতে লাগলো। ঘোড়াটাকে একটা পাতলা গাছের সাথে বাঁধতে যাবে হঠাৎ একটু আগে ডুম্বুরের কথা মনে পড়ে গেল ওর। যেখানে কোম্পানির সৈন্যদের ক্যাম্পের কাছে ঘোড়া বেঁধে রাখা ছিল সেখানে প্রথমে কিছু ঘোড়া ছিল তারপর সেগুলোর সাথে আরো ঘোড়া এনে রাখা হয়। এই জায়গাটাতেই ওর খটকা লাগছিল প্রথম। সেইসাথে এটা মনে পড়ার সাথে-সাথে মনের ভেতরে দলা পাকিয়ে থাকা আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল।

কোম্পানির সৈন্যরা রাজার ওখান থেকে রওনা দিয়ে যেখানে ক্যাম্প করার কথা ছিল রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ওদের অবস্থান করার কথা ছিল যতোক্ষণ তারচেয়েও প্রায় একদিন বেশি সময় ধরে অবস্থান করছিল। তারমানে অবশ্যই ওরা কারো সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কোম্পানির সৈন্যদের অধিক সময় অবস্থান আর ডুম্বুরের ঘোড়া কাহিনী দুটো মিলিয়ে তারমানে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে, কোম্পিানর সৈন্যরা কারো সাথে দেখা করেছিল। আর ওদের গায়েব হবার পেছনে নিশ্চই ওদের কোন না কোন ভূমিকা আছে।

সে ঘোড়া থেকে নেমে এখনো ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা যার-যার মতো নিজেদের কাজে লেগে গেছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হতেই ও জোনাথনের দিকে ফিরে তাকালো, কথাটা এখুনি ওর সাথে শেয়ার করতে হবে। ও জোনাথনকে ডাক দিতে যাবে তার আগেই চিৎকার করে উঠলো ডুম্বুর। অন্যরা ঘোড়া থেকে নেমে গেলেও ঘোড়ার ওপরে মাথা নিচু করে বসে ছিল সে।

হঠাৎ ঝট করে সোজা হয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে কিছু একটা বলে উঠলো। কথাটা সে স্থানীয় বাংলায় বলেছে ফলে একেবারে পরিষ্কার বুঝতে পারলো

না ম্যাকফি। কিন্তু ও বোঝার আগেই পাশ থেকে ওদের ফেলে আসা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো শঙ্কর । “হুজুর কই হামারা পিছা কার রাহে হ্যায়।”

সাথে সাথে শঙ্করের নির্দেশিত দিকে ফিরে তাকালো ম্যাকফি আর জোনাথন। সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়ে অপসৃয়মান মানব আকৃতিটাকে না দেখতে পাবার কোনই কারণ নেই।

“এই, থাম থাম,” বলে তীব্র এক চিৎকারের সাথে ওদিকে দৌড় দিলো মহাবীর সিং, আর তার পেছন পেছন শঙ্কর।

অধ্যায় এগারো

বর্তমান সময়

শানকিপাড়া শেষমোড়, ময়মনসিংহ

“আবদুল্লাহ, গাড়ি থামাও,” হঠাৎই বলে উঠলো বাশার। রাস্তার এই জায়গাটা আশ্চর্যজনকভাবে বেশ ফাঁকাই ছিল। তাই প্রায় অক্লেশেই জিপটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ফেললো আবদুল্লাহ।

বেলা এখন পড়তির দিকে। মধ্য দুপুরের ঝাঁঝালো ভাবটা একটু কমে গিয়ে সূর্য একটু পরেই বিকেলের দিকে গড়াতে শুরু করবে। এই সময়টা হলো দিনের এমন একটা সময় যখন সবকিছু স্থবির হয়ে যায়। কোন কাজ করতে ইচ্ছে করে না। বরং দুপুরের খাবার পর বেশ ঘুম-ঘুম একটা অলস ভাব বিরাজমান থাকে চারপাশে। তাই মনে হয় এই সময়টাকে বলা হয়ে থাকে ভাত ঘুমের সময়।

বাশারদের জিপটা নতুন বাজার থেকে কতোয়ালী থানার দিকে রওনা দিয়েছে একটু আগে। গাঙ্গিনাপাড়ের কাছাকাছি এসে জ্যামে বসে আছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে অস্থির হয়ে বারবার হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে বাম হাতের আংটিটাতে মৃদু বাড়ি মারছে বাশার। লাঠিটার ডগায় লাগানো সামান্য স্টিলের পাতের সাথে আংটির ধাতব শরীরের সংঘর্ষে নির্দিষ্ট একটা বিরতি দিয়ে টুঙ-টুঙ-টুঙ করে শব্দ হচ্ছে একটু পর পর।

বাশারের অবশ্য এসবে খেয়াল নেই। সে ডুবে আছে নিজের ভাবনার জগতে। ডক্টর মনিকার কাছে পুরো ব্যাপারটা শোনার পর থেকে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছে ওর ভেতরে।

প্রথমে মনে হচ্ছিলো গাড়ির ভেতরে থাকা লোকটা অ্যাক্সিডেন্ট করে হয়তো গাড়ি নিয়ে পড়ে গেছিল পুকুরের ভেতরে। কিন্তু ডক্টর মনিকার কথা শুনে মনে হচ্ছে এমনও হতে পারে লোকটাকে মেরে গাড়িসহ তাকে ফেলে

দেয়া হয়েছিল পুকুরের তলায়। কিন্তু এতো জায়গা থাকতে এই পুকুরের তলা কেন। তারমানে কি কোনভাবে এই ঘটনার সাথে এই পুকুরের মালিক পক্ষ জড়িত। কিন্তু এই ব্যাপারটাও মেলে না। কারণ একটু আগে ডক্টর মনিকার সাথে কথা শেষ করে সে আবারো ফিরে যায় টমি আর আশরাফের সাথে কথা বলতে। যে-ব্যাপারটা ও জানতে চাচ্ছিলো সেটা হলো, গাড়িটাতে কি কোন ধরণের বড় আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। ও আসলে বুঝতে চাইছিল গাড়িটা কিভাবে পানিতে পড়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট করে নাকি কোনভাবে ওটাকে জোর করে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে।

দুজনেই একবাক্যে একই জবাব দেয়, ওটার সামনের ডানপাশের দরজার একটু সামনে ইঞ্জিনের ঠিক পাশে দিয়েই গাড়ির বডি অনেকখানি তুবড়ে যাবার একটা আলামত আছে। টমি ওকে নিশ্চিত করে বলেছে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেই পানিতে পড়েছিল।

বাশার ভাবছে যদি টমির কথা ঠিক হয় তবে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে পানিতে পড়েছে। অন্যদিকে যদি ডক্টর মনিকার কথা ঠিক হয় তবে লোকটাকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে পানিতে ফেলা হয়েছে। দুটো ব্যাপার ঠিক মিলছে না। কারণ তাকে কেউ মেরে ফেলে থাকলে সেটা অ্যাক্সিডেন্ট হবার কথা নয়। অন্যদিকে তাকে মেরে পানিতে ফেলা হলে সেক্ষেত্রে যে মেরেছে তারও সাথে-সাথে পানিতে পড়ে যাবার কথা কিন্তু সেটাও হয়নি। তবে সবকিছুও ওপরে প্রশ্ন হলো, একজন সাদা চামড়ার মানুষ আজ থেকে এতো বছর আগে ময়মনসিংহ শহরে এসে কী এমন করলো যে শেষ পর্যন্ত তার স্থান হলো পুকুরের তলায়। ব্যাপারটা যথেষ্ঠ ঘোলাটে। যদি ডক্টর মনিকা তার ডটাবেজ থেকে লোকটার চেহারা আর পরিচয় উদ্ধার করতে পারে তবে অনেক কিছু বোঝা যেতে পারে। তবে ডক্টর মণিকার কাছ থেকে কিছু পেতে সময় লাগবে। এর মধ্যে ওর অন্যকাজ করতে হবে।

“স্যার, গাড়ি তো থামাইলুম, কিছ্ বলতেছেন না যে,” আবদুল্লাহ একবার রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে দ্বিধার সাথে বলে উঠলো।

“গাড়ি ঘোরাও। শানকি পাড়া শেষ মোড়ে চলো।”

ওর দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি ঘোরানোর উদ্যোগ নিতে লাগলো আবদুল্লাহ।

“স্যার, অহন আবার হেনু যাবাইন। ওসি স্যারে তো...” রমিজ দারো রাগাকে কথা শেষ করতে দিলো না বাশার। একটা আঙ্গুল তুলে তাকে থামিয়ে দিলো। ও খারাপ অবস্থানে থাকতে পারে তবে ওসির চাকর না। ওকে ওর মতো কাজ করতে হবে। কারণ মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। ওকে ঘটনাস্থলটা আরেকবার দেখতে হবে। এর আগের অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে জায়গামতো গেলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায় অনেক সময়।

***

“কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না,” কথাটা আনমনেই বলে উঠলো বাশার। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো। শেষ বিকেলের দিকে রোদ অনেকসময় খুব কড়া হয়ে ওঠে, ওরকমই কড়া রোদের ভেতরে দাঁড়িয়ে সামনের পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে ও। একসময়ের চমৎকার গভীর রূপালি পানির পুকুরটা এখন মড়া লাশের মতো পড়ে আছে।

ছোটবেলা থেকে দেখে আসা আগের সেই সুন্দর রূপালি পানিতে ভরা পুকুরটা আর আজকের এই আধা শুকনো কাদায় ভরা নোংরা পুকুরটার ভেতরে কতো পার্থক্য। মানুষ আসলে এমন এক প্রাণী যে সবকিছুকেই ধ্বংস করতে চায়। এর বিনিময়ে সে যে আসলে কি চায় নিজেও জানে না।

ও এখানে এসেছিল একটা পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু এসে তেমন একটা লাভ হয়নি। এখানে আসার আগে একবার ভেবেছিল সাঈদ আলীর লোকদের নিয়ে কোন ভয় আছে কিনা কিন্তু পুকুর পাড়ে এসে ওদের কাউকে সে দেখতেই পায়নি। প্রাণহীন অর্ধ-শুকনো কাদাটে পুকুরটা পড়ে আছে মরা লাশের মতো। ওটার কিনারায় ড্রেজিং মেশিন থেকে থেকে শুরু করে কন্সট্রাকশনের অনেক জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। ওগুলো সহই পুলিশ সিল করা হয়েছিল পুরো এলাকা। তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই সিল খোলা হবে না। গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করে আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে ও চলে আসে পুকুর পাড়ে। চোখের দৃষ্টিতে একবার রাস্তাটা দেখে আরেকবার মাপ-জোখ করতে শুরু করে ও।

পুকুরের ঠিক কোন জায়গা থেকে গাড়িটা উদ্ধার করা হয়েছে ও জানে না। তবে ও দু'টো ব্যাপার আন্দাজ করার চেষ্টা করলো। অবশ্যই গাড়িটা মূল রাস্তা ধরে এসেছিল, তারপর যেকোনভাবেই হোক সেটা পুকুরে পড়ে যায়। তারমানে গাড়িটা সম্ভাব্য দুটো দিক থেকে আসতে পারে। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে হয় ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে। যদি ডান দিক থেকে এসে থাকে তবে সেটা বামে ঘুরে পানিতে পড়েছে আর যদি বাম দিক থেকে এসে থাকে তবে সেটা ডানে ঘুরে পড়েছে।

তবে বাশার অনুমান করলো গাড়িটা বাম দিক থেকে আসার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ বামে এলে শহর থেকে এসে মূল হাইওয়েতে বেরিয়ে যাবার জন্যে সুবিধে হবে। মনে হয় গাড়িটা মূল হাইওয়েতে উঠতে চাচ্ছিলো। প্রশ্ন হলো, ওটা পানিতে পাড়লো কিভাবে। আর গাড়ির আরোহীকে যদি খুন করে ফেলা হয়ে থাকে তবে হয় কেউ সেটাকে ইচ্ছে করেই ফেলেছে আর না হয় সে নিজেও ওটার সাথে সাথে পড়ে যাবার কথা।

কিন্তু এখানে মাপ-জোখ করে অবশ্য খুব বেশি কিছু বোঝা সম্ভব নয়। জিপের দিকে এগিয়ে গেল ও।

"স্যার, কিছু পাইলেন?" ওকে ঘর্মাক্ত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে আবদুল্লাহ জানতে চাইলো।

"না রে, হুদাহুদি কষ্ট," ওর জবাব শুনে কিছু না বলে খিক করে হেসে উঠলো রমিজ দারোগা। তার ভাবটা অনেকটা এরকম, আমিতো আগেই কইছিলাম।

তাকে কড়া ভাষায় কিছু একটা বলার জন্যে মাথা ঘোরালো বাশার কিন্তু তাকে কিছু বলার আগেই রাস্তার অন্যপাশের একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ওপরে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। আচ্ছা এই দোকানটা তো বেশ পুরনো। দোকানদারের সাথে কথা বলে দেখা যেতে পারে কিছু পাওয়া যায় কিনা। ও আবারো রাস্তা পার হয়ে চলে এল অন্যপাশে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে পড়লো ছোটবেলায় জিলা স্কুলে পড়ার সময়ে এই দোকানটা ছিল ওর অন্যতম প্রিয় একটা দোকান। কারণ এখানে বিভিন্ন ধরণের স্টিকার পাওয়া যেতো। ছোটবেলায় ওর প্রিয় শখ ছিল স্টিকার সংগ্রহ করা আর এই দোকানটাতে রবিন হুড, সিন্দাবাদ, হারকিউলিস থেকে শুরু করে মোগলি পর্যন্ত এমন কোন স্টিকার নেই যা পাওয়া যেতো না।

পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করতে-করতেই ভেতরে প্রবেশ করলো ও। আগে দোকান ছিল অনেক ছোট। আর আগের তুলনায় এখন অনেক বড় হয়েছে। দোকানটাকে এখন মুদি দোকান বলা যাবে না বরং অনেকটা ছোট আকারের সুপারশপের মতো দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে ও মনে-মনে আগের চেহারাগুলো খুঁজলেও সেরকম কাউকে পেল না। ওকে দেখে একটা ছোট ছেলে এগিয়ে এসে জানতে চাইলো কি দরকার ওর। ও জানালো মালিকের সাথে কথা বলতে চায়। ছেলেটা ওকে কাউন্টারে নিয়ে গেল।

কালো শার্ট গায়ে মোটাসোটা এক লোক বসে আছে কাউন্টারে। একটা ছেলে ক্রেট থেকে মাল নামিয়ে গুছিয়ে রাখছিল তাকে নির্দেশনা দিচ্ছিল মোটু, ওকে দেখে সেটা থামিয়ে তাকিয়ে রইলো। চোখে প্রশ্ন। বাশার এগিয়ে গেল তার দিকে।

“আমি দোকানের মালিকের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।”

“বলেন, আমিই মালিক,” বলে সে আবারো ছেলেটাকে নির্দেশনা দিতে লাগলো।

“না মানে এখানে একজন চাচা বসতেন উনি নেই?”

কথাটা শুনে ওকে আরেকবার ভালো করে দেখলো সে। “না, উনি মারা গেছে আইজ পাঁচ বছরের উপ্রে।”

“ওহহো, আচ্ছা চাচার একজন ছেলে ছিল, চিকন করে লম্বা। রুবেল নাম। উনিও নেই?”

মোটু একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকালো বাশারের দিকে। “আপনে কেডা, কইনছেন দেহি। এতো কতা জিগান কে? দরকার কি, হেউডা বলেন। আমিই রুবেল।”

“কি?” এবার চমকানোর পালা বাশারের। সেই চিকন লম্বা সিল্কি চুলের হাসিখুশি ছেলেটাকে কোনভাবে গোমড়া মুখের এই মোটুর সাথে মেলাতে পারলো না ও। সময় মানুষকে কিভাবে বদলে দেয় মানুষ নিজে যদি সেটা টের পেত।

“রুবেল, আমি বাশার। কলেজ রোডে থাকতাম জামিলদের বন্ধু। নিল রঙের একটা সাইকেলে আসতাম, স্টিকার কিনতাম তোমার কাছ থেকে। মাঝে

মাঝে তোমার আব্বারে না বইলা বাকি দিতা আমারে, মনে নাই?”

এবার মোটু হা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। সম্ভবত পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করার চেষ্টা করছে সে। “আরে তুমি তুমি, হ হ চিনছি। এইহানে আইসা মাঝে মধ্যে ব্যাডমিন্টন খেলতা। মিল্লাতগর লগে বিরাট মারামারি হইছিল একবার তুমগর। ঠিক?”

স্বস্তির হাসি হাসলো বাশার। “হুম, এই তো চিনতে পারছো।”

“সর্বনাশ, কতো বছর পরে, এই পিচ্চি চেয়ার দে। আর একটা ঠান্ডা আইন্না দে। হায় হায় কতোদিন পরে। তুমি সেই যে মমিসিং ছাড়লা আর দেখলামই না। তুমি তো দেহি পুরা বদলাইয়া গেছ। হা হা,”

মোটুর অবয়বের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে সে হাসছো। সম্ভবত ওর মনের ভাবনা বুঝতে পেরে মোটুও হেসে উঠলো। “হ অনেক মুডা অই গেছি। একসময় মনে করতাম কেমনে মুডা অমু কেমনে মুডা অমু। আর যহন মুডা অউন শুরু অইলো। আর কি কমু। তা তুমার খবর কি কউ। তুমি কি পুলিশে আছো নি?”

“হ্যা, এখানে একটা কাজে এসেছিলাম,” একটু আগে দেখা দুই পিচ্চির একজন ওর হাতে একটা কোকের বোতল ধরিয়ে দিলো। স্ট্র’টা সরিয়ে বোতলে চুমুক দিলো ও। “ওই পুকুরটা যে ভরাট করতে যাচ্ছিলো সাঈদ কন্ট্রাকটারের লোকেরা।”

“ভরাট আর করতে পারলো কই। অইডা লইয়া তো মহা কেলেঙ্কারি। পুস্কুনির ভিতরে নাকি একটা গাড়ি পাইছে, হেই গাড়ির ভিতরে নাকি লাশ আছিল। এক পুলিশে নাহি কাম বন্ধ কইরা দিছে সাঈদ কন্ট্রাকটার তো মহা খাপ্পা। এই জমি হের বহুদিনের স্বপ্নের জমি। এতো কষ্ট কইরা পাউনের পরে এইরম অবো হেয় তো ভাবতেও পারে নাই। হেয় নাকি ঠিক করছে যারা এইডা বন্ধ করছে হেই পুলিশরে দেইখা লবো।”

“হা-হা, সেই পুলিশটা আমিই।”

“কউ কি, তুমি এট্টু সবধানে থাইক্কো। হেই ব্যাডার কিন্তু সবখানে নিজের লুক আছে। পুলিশের ভিতরেও,” বলে সে কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেনসন সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। চোরের মতো আশেপাশে

একবার দেখে নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “খাও নাকি? তুমি তো কলেজে থাকতে সিগারেট খোরগো দুই চক্ষে দেখতে পারতা না।”

“এখন খাই,” বলে খুলে ধরা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগালো বাশার।

আবারো একবার দুইপাশে দেখে নিলো রুবেল। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো, “গেল বছর হার্টে একটা বøক ধরা পড়ছিল হের পর থাইক্কা চুমকির মায়ে কঠিন নিষেধ কইরা দিছে। এহন খাইতে দেখলে খবর আছে,” বলে ঠোঁটে ধরা সিগারেটে আগুন লাগিয়ে আগুনটা বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে।

ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মনে মনে বাশার ভাবলো চুমকি নিশ্চই রুবেলের মেয়ে। ওর বন্ধু-বান্ধব সবাই বিয়ে করে বাচ্চা-কাচ্চার বাপ হয়ে বেশিরভাগই সুখি আর ও কিনা এখনো সব থাকার পরও বাউন্ডুলের মতো জীবন-যাপন করছে। আনমনেই নিজের হাত চলে গেল বাম হাতের আংটিটায়। ওটা ধরে মৃদু নাড়া দিয়ে কাজের কথায় ফিরে আসার চেষ্টা করলো ও। “আচ্ছা রুবেল আমাকে একটা ব্যাপারে তথ্য দিতে পারবে?”

“কি বিষয়ে? কউ দেহি,” সে এমনভাবে ধোঁয়া ছাড়ছে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন অভুক্ত থাকার পর হঠাৎ করে চরম সুস্বাদু কোন খাবার তুলে দেয়া হয়েছে তার মুখে।

“তুমি তো বহুবছর ধরে এখানেই আছো?”

“বহু বছর না, জন্মের পর থেইক্কা আমি এইহানেই আছি। মনে হয় বাকি জীবনও এইহানেই থাকা লাগবো,” বলে সে হো-হো করে হেসে উঠলো।

“তাহলে হয়তো তুমি কোন না কোনভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারতে পারবা। এই পুকুরটা তো একেবারে তোমার দোকানের সামনেই। যে-গাড়িটা এটার নিচে পাওয়া গেছে এইটার ব্যাপারে কখনো কিছু শুনছিলা বা তোমার নজরে আসছিল নাকি?”

রুবেল একটু ভেবে বললো, “নাহ, কুনো সময়ই তো এই বিষয়ে কিছু শুনি নাই। বা কিছু দেহিও নাই। সাঈদ কন্ট্রাকটার যার কাছ থেইকা এই জায়গা কিনছে সেই ছেলের বাপে আছিল এর আসল মালিক। হেই চাচা

বদমেজাজি লুক আছিল। আমার সাথে সম্পর্ক ভালা আছিল না। তয় সে লুক খারাপ ছিল না। হেয় এইরকম কিছু করার কথা না।"

"আমাদের অ্যানালিসিস থেকে একটা ধারণা পেয়েছি আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। ওই সময়ে এই এলাকায় কিংবা এই পুকুরের আশেপাশে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল বলে তোমার মনে পড়ে?"

রুবেল প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটের মোথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। "আইজ থাইক্কা এগারো বছর আগে। এগারো বছর আগে ওই সময়ে আব্বা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমাদের ভাইদের ভেতরে জমি-জমা ভাগ করে দেয়। আমার ভাগে পড়ে এই দোকান। ওই বছরই আমি এই দোকানে নিজের ব্যবসা শুরু করি। আমি তখন সবেমাত্র দোকানের ভার নিজে নিলাম। বইনের বিয়া... নাহ তেমন কিছু মনে পড়তাছে না।"

রুবেলের জবাবে একটু হতাশ হয়ে পড়েছে বাশার। এমন সময় আবারো বলে উঠলো রুবেল। "আমি না পারলেও কলিম চাচা পারতে পারে। হেয় বহু বছর এই এলাকার পাহারাদার আছিল। এহন বুড়া অইয়া যাওয়াতে আর কাম-কাইজ করে না। একটা ছেলে বিদেশ থাকে, হেয় টেহা পাডায়, হের টেহায় চলে।"

"লোকটা থাকে কোথায় ?"

"এইহানেই থাকে। তুমি বও। আমি তারে ডাকায়া আনানোর ব্যবস্থা করতাছি। এই আকবর, আকবর, এদিকে আয়," বলে সে দোকানের একটা ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে দিলো কাকে ডেকে আনতে হবে।"

"বেশি দেরি হবে?" বাশার জানতে চাইলো।

"আরে নাহ। এই দুই বাড়ি পরেই থাকে হেয়। কাম-কাইজ নাই কতা কউনের সুযোগ পাইলে খুশিই অইবো।"

মুখে যতোই বলুক বাশারের ধারণা ছিল অন্তত এক ঘন্টা না হলেও চল্লিশ-পয়তাল্লিশ মিনিটের আগে লোকটা আসবে বলে মনে হয় না। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে মাত্র পনেরো মিনিটের মাথায় নীল রঙের লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক এক লোক এসে হাজির হলো আকবরের সাথে। এধরণের পেশার লোকজন যেমন রিকশাওয়ালা, ভ্যান চালক, নাইট গার্ড;

এরকম লোকজন যখন আর কাজ করতে পারে না তখন এদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা দেখাশোনা করে না, কাজও করতে পারে না। তবে এই লোককে দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না। তার পরিষ্কার পলেস্টারের পাঞ্জাবি আর মাথার তেল দেয়া চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিদেশ থেকে ছেলে তাকে ভালো টাকাই পাঠায়। ওদেরকে দেখতে পেয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মানুষটা।

“কলিম চাচা, ও আমার বন্ধু। আপনারে কিছু জিজ্ঞাস করবো। আপনি জানলে উত্তর দিবাইন,” রুবেল বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো।

“কুনো সমইস্যা অইছে নি, বাবা? আমি বুড়া মানুষ...”

“না চাচা, কোন সমস্যা হয়নি। আপনার কাছে একটা ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। বসেন না,” বলে ও রুবেলের দিকে তাকাতেই রুবলে দোকানের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একটা হাঁক ছাড়লো।

“এই চাচারে একটা টুল আইন্না দে,” ওর হাঁক শুনে নুরু আকবর দৌড়ি গিয়ে একটা টুল এনে দিলো বুড়ো দারোয়ানকে।

“আচ্ছা আপনি তো দীর্ঘদিন এই এলাকাতে পাহারাদার ছিলেন। কতোদিন হতে পারে?”

“তা পরায় চল্লিশ বছরের উপরে তো অইবোই,” লোকটা একটু ভেবে বললো। “সংগ্রামের কয়েক বছর পর থাইক্কাই আমি এইহানে আছি।”

“ওরে বাপরে! আমাদের এতো বছর দরকার নেই। আমি আপনার কাছে মোটামুটি এগারো বছর আগের একটা ঘটনা জানতে চাইবো। ঠিক ঘটনা বললে ভুল হবে। আপনি একটু ভেবে বলেন তো আজ থেকে এগারো বছর আগে এই এলাকায় কিংবা এই রাস্তায় অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা। কোন তাড়াহুড়া নেই। ভাবেন, ভেবে বলেন।”

“বাপজান, কিরকম ঘটনা ঠিক বুজতে পারলাম না। ”

“আসলে আমি আপনাকে কি বোঝাবো নিজেই তো বুঝতে পারছি না ঠিক কি জানতে চাইবো আপনার কাছে। আসলে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি এগারো বছর আগে আপনি তো নিয়মিত ডিউটি করতেন ঠিক কিনা।”

“হ।”

“আপনার ডিউটিকালীন সময়ে এই এই রাস্তায় কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল ব’লে আপনার মনে পড়ে? আপনাকে খুলেই বলি। আপনি তো জানেন কয়েকদিন আগে এই পুকুরে নিচে একটা গাড়ি খুঁজে পাওয়া গেছে যেটার ভেতরে আবার একটা লাশও ছিল। আমরা ধারণা করছি এই গাড়িটা আজ থেকে এগারো বছর আগে কোন এক সময় এই পুকুরের নিচে,” এই পর্যন্ত বলে ও একটু থেমে গেল। কি বলবে পুকরের নিচে গাড়িটা কিভাবে গেছে সেটা তো জানে না। “মানে পুকুরের তলায় পেয়েছে। তাই আমি জানতে চাচ্ছি ওই সময়ে কোনদিন রাতে বা দিনে এই এলাকায় বা রাস্তায় বা পুকুরের আশেপাশে আপনার কোন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিল কিনা?”

“এগারো বছর, এগারো বছর,” লোকটা ভাবছে আর তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশার।

“বাপজান এই বয়সে কাইল রাইতের গটনা মনে থাহে না। এতো আগের কতা কেমনে কমু,” বুড়োর মুখে অসহায়ত্বের হাসি।

“হুম্,” এটাই স্বাভাবিক, মনে মনে ভাবলো বাশার। “আচ্ছা কি আর করা তাও চেষ্টা করে দেখেন যদি মনে পড়ে।”

“আমি আপনেরে সাহাইয্য করি,” এতোক্ষণ ধরে মোবাইল টিপছিল রুবেল হঠাৎ সে মোবাইল থেকে চোখ তুলে বলে উঠলো। বাশার ওর মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওতে ক্যালেন্ডার ওপেন করে রাখা। ও অনুমান করলো রুবেল সম্ভবত এতোক্ষণ মোবাইলে ক্যালেন্ডার দেখছিল। “ওই বছরই আমি নিজে এই দুকান শুরু করি। মানে আব্বা আমগো ব্যবসা বুঝায়া দিলো। এইটা অবশ্য আপনের জানার কতা না। আরে, ওই বছরই তো মিলি আপার বিয়া অইলো। আপনের উপরে খাবারের দায়িত্ব আছিল। মনে নাই আপনের?”

“হ হ বিয়ার কতা মনে পড়ছে। লাইট-মাইট সব লাগানের পরে কারেন্ট গেল গা। হেউডা লইয়া তুমার আব্বা কি খেপা।”

“হ, কারেন্টের খাম্বা ভাইঙ্গা ট্রান্সমিটার নষ্ট অইয়া তিনদিন কারেন্ট নাই। বিয়া বাড়িত কারেন্ট নাই, কি এক বিপদ আপনেরে দিয়াই তো জেনারেটর ভাড়া কইরা আনা অইলো।”

কিন্তু রুবেলের শেষ কথাটা লোকটা শোনেনি, সে মনোযোগ দিয়ে কী জানি একটা ভাবছিল, হঠাৎ বাশারের দিকে মুখ তুলে বলে উঠলো, “বাবা ওর বড় বইনের বিয়ার কথায় একটা ব্যাপার মনে অইলো। ওর বইনের বিয়ারে লাইগা লাইট মাইট দিয়া বাড়ি সাজানি অইছিল। কিন্তু ওইদিন রাইতেই একটা কারেন্টের খাম্বা ভাইঙ্গা ট্রান্সিমিটার নিচে পইরা যায়। এরপরে তিনদিন কারেন্ট আছিল না।”

“হ্যা সেটাতো শুনলাম,” লোকটা একইকথা রিপিট করায় বাশার একটু বিরক্ত।

“যেদিন রাইতে খাম্বা ভাঙ্গে ওইদিন অন্যরহম একটা ব্যাপার ঘটছিল। আমিতো এমনে রাস্তায় ডিউটি করি। ওইদিন রুবেলের বইনের বিয়ার লাইগা ওর আব্বা কইছিল বাড়ির উপরেও নজর রাখতে। কারণ বিয়া বাড়ি চুর-মুর আইলে তো বিপদ। তো রাস্তাত ডিউটি দিয়া ওগোর বাড়ির গলির ভিতরে ডুকছি সব ঠিক আছে কিনা দেহুনের লাইগা হঠাৎ শুনি বিকট শব্দ। দৌড়ায়া গলি থাইক্কা বাইর অইতাছি এমন সময় মনে অইলো পানিত কি জানি পরুনের শব্দ পাইলাম। দৌড়ায়া গলি থাইক্কা বাইর ওয়ুনের আগেই পুরা এলাকা আন্ধার অইয়া গেল। লাইট জ্বালায়া বাইর অইয়া দেহি ওইহানে আগে একটা খাম্বা আছিল,” সে রাস্তায় একটা জায়গা নির্দেশ করলো।

“অনেক পুরান, জং ধরা খাম্বা। আমি বাইর অইয়া দেহি হেই খাম্বা পুরা কাইত অইয়া রাস্তার ওপরে পইরা আছে। হেইডার উপরের ছুডো একটা ট্রান্সমিটার মাডিত পইরা ভাইঙ্গা গুড়া-গুড়া। হেইডাতে আগুন জ্বলতাছে। তহন তো ওইডা লইয়া ব্যস্ত অইয়া গেলাম। লুকজনের দৌড়াদৌড়িতে খেয়াল করতে পারি নাই তয় একবার পুষ্কুনির দিকে লাইট মারছিলাম দেহি পানিত বড় ঢিল মারলে যেরম লড়াচড়া অয় ওইরম কিছু একটা। এরপরে আমি কয়েকজনরে কইছি এই পানির কতা, কেউ বিশ্বাস করে নাই। পরে আমিও বুইল্লা গেছিলাম, অহন মনে পড়লো।”

পুরো ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে শুনলো বাশার। লোকটার কথা শেষ হতেই মনে-মনে হিসেব করতে শুরু করলো ও।

তারমানে ডিভিশনের অ্যানালিসিস আর এই দারোয়ানের কথা যদি ও একসাথে করে তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় আজ থেকে এগারো বছর আগে কোন এক সময় রাতের বেলা এখানে একটা গাড়ি রাস্তার পাশের ইলেকট্রিক পোলের সাথে বাড়ি খেয়ে পোলটাকে ভেঙে দিয়ে পানিতে পড়ে

যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, তবে গাড়ির লোকটাকে খুন করলো কে। তাও আবার গলায় ফাঁস দিয়ে। নাকি ওই লোকটাই আহত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে পোলের সাথে বাড়ি খেয়ে পুকুরের পানিতে পড়ে গেছিল। দ্বিতীয়টা হবার সম্ভবনাই বেশি। এখন খোঁজ লাগাতে হবে এগারো বছর আগে ওই সময় কী ঘটেছিল। তবে তার আগে তারিখটা বের করতে হবে।

“রুবেল তুমি কি আমাকে ওই ঘটনার তারিখটা বের করে দিতে পারবে?”

“কি কও পাইতাম না ক্যা? খারাউ মিলি আপারে একটা কল দিয়া হের বিয়ার তারিখটা জানলেই অইবো,” বলে সে হাতে ধরা মোবাইলটা নিয়ে ডায়াল করতে লাগলো।

একটু পরে হাতে একটা চিরকুটে তারিখটা লিখে সে রুবেল আর কলিম চাচা দুজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দোকানের ভেতর থেকে। এটা একটা বিরাট অগ্রগতি। ও ঘটনার তারিখ ও সম্ভাব্য সময়টা বের করতে পেরেছে। এবার দেখতে হবে কী ঘটেছিল ওই সময়ে। সেইসাথে ওই সময়ে ময়মনসিংহ শহরে অবস্থানরত সমস্ত বিদেশী লোকজনের ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে।

সময়টা বিকেলের শেষ ভাগ হলেও গ্রীষ্মের সূর্য তার শেষ দাপট দেখাচ্ছে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে কোমর থেকে টকিটা বের করে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হতে লাগলো ও। কথা নেই বার্তা নেই আরেকটু হলেই বাম দিক থেকে ধেঁয়ে আসা ট্রাকাটা পিষে দিতো ওকে, চালক হর্ন না বাজালে সম্ভবত তাই হোত।

চমকে উঠে একটু পিছিয়ে এল বাশার। ট্রাকটা চলে গেল তবে অপসৃয়মান ট্রাকটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো বাশারের। সেই একই স্মৃতি সেই একই দৃশ্য যেন উঠে এল স্মৃতির অতল থেকে। এইরকমই একটা ট্রাক ছিল ওটা। তীব্র যন্ত্রণার সাথে ও অনুভব করলো চারপাশের রোদেলা আবহাওয়া বদলে গিয়ে যেন ঢল বৃষ্টি নেমে এসেছে। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো সবকিছু। শরীরটা আর নিজের নিয়ন্ত্রণের ভেতরে নেই। হঠাৎ করেই যেন পাকা রাস্তাটা উঠে এল উপরে।

আসলে বাশারই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো রাস্তার ওপরে।

অধ্যায় বারো

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

দূর্গা মন্দির, ব্রহ্মপূত্র নদীর তীর

কেউ ওদের পিছু নিয়েছে ব্যাপারটা অনুধাবন করার পর ম্যাকফিই সবচেয়ে বেশি মাথা ঠান্ডা রাখলো। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ম্যকফি অনুমান করলো এভাবে দৌড়ে ধরা যাবে না লোকটাকে। সে নিজের ঘোড়াটার সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। হালকা এক লাফের সাথে উঠে বসলো ঘোড়ার ওপরে। লোকটাকে যেদিকে দেখা গেছে সেদিকে ঘোড়া ছোটানো সম্ভব নয় তারচেয়ে বরং একটু উল্টো ঘুরে সেদিকের পথ ধরলো ম্যাকফি।

খানিকটা এগিয়ে মূল রাস্তা থেকে বামে কাটতেই প্রথমবারের মতো পরিষ্কার দেখতে পেল পলায়নরত লোকটাকে। পায়ে চলা পথটা ধরে প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে সে। পরনে খাটো সাদা ধূতির মতো পোশাক। খালি উর্দ্ধাঙ্গ আর মাথায় একটা সাদা পাগড়ি। পায়ে চলা পথ ধরে হরিণের বেগে দৌড়াচ্ছে মানুষটা। দৌড়াতে দৌড়াতেই একবার পেছন ফিরে তাকালো সে। ম্যাকফি দেখতে পেল লোকটার মাথার সাদা পাগড়ির একটা অংশ দিয়েই আড়াল করে রাখা হয়েছে চেহারাটা। মুহূর্তের ব্যাবধানে একজোড়া কালো চোখ দেখতে পেল ম্যাকফি। মানুষের চোখ এতো গভীর কালো হতে পারে না। নিশ্চই কোন ধরণের কালি ব্যাবহার করে কালো করা হয়েছে চোখের চারপাশ। লোকটা প্রাণপনে দৌড়ালেও সে তো মানুষ, নিশ্চই ঘোড়ার গতিবেগের সাথে তার পেরে ওঠার কথা নয়।

ম্যাকফি দেখলো আর মিনিটখানেক এভাবে দৌড়ালেই লোকটাকে ধরে ফেলতে পারবে ও। চিৎকার শুনে বুঝতে পারলো অন্যপাশ থেকে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে মহাবীর সিং আর শঙ্কর। ঘোড়ার গতিবেগ বাড়িয়ে একেবারে লোকটার পেছনে চলে এল ও। আর একটু।

লোকটা জান দিয়ে দৌড়াচ্ছে। শত্রু এতো কাছে চলে এসেছে তার কোন বিকার নেই। ম্যাকফি আরেক ধাপ এগিয়ে নিজের শরীটাকে কাত করে

একটা হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটাকে ধরার জন্যে। পেছনে না তাকিয়েই কিভাবে যেন বুঝে ফেললো লোকটা। শরীরটাকে একটা বাউলি দিয়ে এড়িয়ে গেল ম্যাকফির হাত। চট করে ঢুকে পড়লো ডান পাশের জঙ্গলে।

শরীরটাকে বাঁকা করে ফেলাতে আরেকটু হলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়া নিয়ে উল্টে পড়তে যাচ্ছিলো ম্যাকফি। কোনমতে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো। লোকটা ডান পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেছে আর এদিকে মহাবীর সিং আর শঙ্কর ও পায়ে চলা পথটাতে এসে থামলো। দুজনেই পাগলের মতো হাঁপাচ্ছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা কোন দিকে গেছে এক ঝলক ইশারা করে সে ঘোড়া নিয়ে ঢুকে পড়লো জঙ্গুলে জায়গাটার ভেতরে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে একটু অবাক হয়ে গেল ও। এই জঙ্গলটা অন্য জঙ্গলগুলোর তুলনায় বেশ গভীর। ভেতরে ঘন ঝোপ-ঝাড়। ঘোড়া নিয়ে অল্প-অল্প করে এগোতে লাগলো ও।

লোকটার ছায়াও দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে কোথাও। ওর পিছু পিছু মহাবীর সিং আর শঙ্কর ও এসে প্রবেশ করেছে ছোট ঘন জঙ্গলটায়। ওরা তিনজনই চুপ করে শোনার চেষ্টা করছে আশেপাশে কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। কিন্তু কোন শব্দ বা কিছুই নেই। শঙ্কর হঠাৎ মহাবীর সিংয়ের একটা হাত খামচে ধরলো, ইশারায় দেখালো একটা ঝোপের ভেতর থেকে সাদা ঝিলিক ভেসে আসছে। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ম্যাকফি ঘোড়া ছোটালো ওদিকে। এক হাতে লাগাম সামলে অন্য হাতে বের করে আনলো পিস্তল। ও ঝোপের কাছ পর্যন্ত পৌছানোর আগেই সাদা রঙের বকের মতো দেখতো এক জোড়া পাখি উড়ে গেল ঝোপের ভেতরে থেকে। পাখি দুটো উড়ে যাবার সাথে সাথেই অন্যপাশে নড়ে উঠলো আরেকটা ঝোপ। কাঠবিড়ালির মতো বাউলি কেটে ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মানুষটা। মুহূর্তের জন্যে ম্যাকফির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মুখের আবরণটা সরে গেছে তার। কিশোর বয়সের একটা ছেলে। ম্যাকফি তার দিকে পিস্তল তোলার আগেই ঘন জঙ্গুলে ঝোপের আড়ালে লাফিয়ে সরে গেল সে। ঘন জঙ্গল হবার কারণে ম্যাকফি ঘোড়া নিয়ে খুব বেশি সুবিধে করে উঠতে পারছে না। ওর আগেই খালি পায়ে ছেলেটাকে অনুসরণ করলো মহাবীর সিং আর শঙ্কর। ওদেরেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো ও গাছের ঘন পাতার আড়ালে। ঘোড়া নিয়ে ধীর গতিতে জায়গাটা পার হয়ে দেখতে পেল নদীর পাড়ের খোলা জায়গার রীতিমতো নাটক জমে উঠেছে।

ছেলেটাকে একটা পায়ে চলা পথের কিনারায় একদিক থেকে আগলে আছে মহাবীর সিং আর শঙ্কর । অন্যদিক থেকে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে জোনাথন আর ডুম্বুর। ছেলেটা কোনাকুনি জায়গার মাঝামাঝি আটকে আছে। জলদি ঘোড়া ছোটালো ও। কাছে এগিয়ে পিস্তল মাথার ওপরে তুলে ভয় দেখানোর জন্যে ফাঁকা ফায়ার করলো শূণ্যে। কিন্তু এতে উল্টো ফল হলো। ছেলেটা চমকে গিয়ে কোনাকুনি রাস্তার ঢাল বরাবর গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল।

“শিট,” চিৎকার করে উঠলো ম্যাকফি। বাকিদেরকে ঢাল বেয়ে নামার আদেশ দিয়ে ও আর জোনাথন ঘোড়া ছোটালো পথের শেষ প্রান্তের দিকে। ঘোড়া নিয়ে ওদিক দিয়ে নামা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ওরা ঘোড়া নিয়ে বেশ অনেকটা পথ ঘুরে এসে দেখতে পেল ছেলেটা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে নদীর পাড় ধরে, আর তার পেছনে দৌড়াচ্ছে মহাবীর সিং আর শঙ্কর। ওরা পৌছানোর আগেই আবারো ছেলেটা নদীর পাড়ের ঘন ঝোপ-ঝাড়ময় জঙ্গুলা জায়গাটা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ওরা সবাই মিলে অনুসরণ করলো। ঝাড়ময় জায়গাটা পেরোতেই সামনে চোখে পড়লো একটা বটগাছ। আর সেই বটগাছের পেছনে বিরাট এক মন্দির। মন্দিরের প্রঙ্গনে লোকজনে ভরপুর। কিছু একটা হচ্ছে এখানে। ঘোড়ার ওপরে বসেই সাদা পাগড়িকে খুঁজলো ও। ভিড়ের ভেতরেই দেখতে পেল সাদা পাগড়ি তাড়াহুড়ো করে মানুষজনের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে প্রাঙ্গনের পেছন দিকে।

ঘোড়া নিয়ে আর সামনে এগোনো সম্ভব নয়। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে। একে তো ঘোড়া নিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গনে ঢুকেছে দ্বিতীয়ত সাদা চামড়ার লোকজন মন হয় খুব বেশি নেই এদিকে অনেকেই নিজেদের কাজকর্ম বাদ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ম্যাকফির সঙ্গিরাও ইতিমধ্যে চলে এসেছে। পিস্তলটা হাতে ধরাই ছিল সেটা নিয়ে ম্যাকফি প্রঙ্গনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই শঙ্কর দৌড়ে এসে ওর একটা হাত ধরে ফেললো শক্ত করে।

“হুজুর, ওইহানে যাবেন না।”

“আরে, ওই সাদা পাগড়িকে আমি এখানেই ঢুকতে দেখেছি,” ম্যাকফি একটু অবাক হয়ে গেছে শঙ্করের আচরণে। যে লোক মাথা সোজা করে কথাই বলে না সে কিনা ওর হাত জাপটে ধরেছে তাও আবার একজন খ্রিস্টানের

হাত। ঘটনা কি। “শঙ্কর, আমাদেরকে ভেতরে যেতে হবে। ওই লোকটাকে ধরতে হবে। অমাকে জানতে হবে কেন সে আমাদের পিছু নিয়েছিল।”

“হুজুর, সেটা কুনোভাবেই সম্ভব না।”

“কেন?” অবাক হয়ে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো ম্যাকফি। “কেন সম্ভব নয়?”

“হুজুর, এইটা ডোংরু মহারাজের ডেরা। দেবী দূর্গার মন্দির। এনে আমরা কেউই প্রবেশ করতে পারতাম না। তার উপরে এখন এখানে যজ্ঞের আয়োজন চলতাছে। এহন কিছু করতে গেলে মহা অনর্থ হয়া যাবে।”

“ডোংরু মহারাজটা আবার কে?” ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জোনাথন।

“হুজুর ডোংরু মহরাজের ডেরায় তার কথাই আইন। ওরা ইংরেজ সরকার কিংবা কোম্পানির আইন মানে না। আর লোকজনও হেগো কথা শুনে। ডোংরু মহারাজ হইলো এই অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় কাপালিক ব্রা²ণ, ধর্ম গুরু। ওরা এই এলাকার আদি বাসিন্দাদের মতোন দেবী দূর্গার পূজা করে। তার ওপরে আমরা হলাম নিচু জাত, ও হইলো মুসলমান আর আপনারা হইলেন খ্রিস্টান। আমরা যদি মন্দিরে ঢুকি অনর্থ লাই¹া যাবে। আবার এখন চলছে যজ্ঞের আয়োজন। যজ্ঞ পন্ড হইলেই অনর্থ। হুজুর দয়া করেন। ”

“আমি এতোসব বুঝি না। আমি একটা চোরকে পালিয়ে মন্দিরে ঢুকতে দেখেছি ওকে আমার চাই,” বলে ম্যাকফি বীরদর্পে প্রবেশ করলো মন্দিরের প্রাঙ্গনের ভেতরে। ওকে অনুসরণ করলো জোনাথন আর মহাবীর সিং। শঙ্কর আর ডুম্বুর বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্করের প্রবেশ করার সাহস নেই, আর ডুম্বুরের নেই ইচ্ছে।

ওরা মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতেই মৃদু একটা গুঞ্জন করে উঠলো কয়েকজন। ‘রাম’ ‘রাম’ শব্দটাও শুনতে পেল ওরা। ভিড়ের দিকে এগোতেই সামনের ভিড়টা একরকম সরে গেল। কেউ নিজেদের গা বাঁচাতে চাইছে কেউ আবার ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। জোনাথন আর মহাবীর সিংকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

“ব্যাস, আর আ¹াইন না যে হুজুর,” ম্যাকফি দেখতে পেল পরনে মাটি রঙের পোশাক, কপালে তিলক আঁকা দুই ব্যক্তি সামনের দিকে হাত তুলে

ওদেরকে থামতে বলছে। “এনু যজ্ঞ অইবো। বিধর্ম্মী কেউর ভিত্রে ঢুকা নিষেদ।”

“কে ভেতরে যাবে না যাবে সেটা বলার তুমি কে?” হাত তুলে রাখার পরও ম্যাকফি আরেক ধাপ সামনে এগিয়ে গেল। “আমরা আইনের লোক, আর এখানে একজন অপরাধি প্রবেশ করেছে। তাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে। প্রয়োজনে আমি ভেতরে তো ঢুকবোই...”

“খবরদার হুজুর, আইন্নেরা আইনের মানুষ অইতে পারেন আমরাও ধম্মের মানুষ। আর ধম্মের উপ্রে কিছু নাই। দেবী সব দেহে। কাজেই বাড়াবাড়ি কইরেন না। কেউর লাইগাই বালা অইতো না।”

ম্যাকফি আরেক ধাপ এগোতেই লোকটার সঙ্গি এগিয়ে এসে বুকে হাত দিয়ে ওকে দাড়ঁ করিয়ে দিলো। আর এগোতে দিবে না। মুহূর্তের ভেতরে ম্যাকফি হাতে ধরা পিস্তলটা ওপরে তুলে শূণ্যে গুলি ছুঁড়ে দিলো।

চারপাশের প্রতিটা মানুষ চমকে উঠেছে। অনেকে ভয়ের চোটে শুয়েও পড়েছে মাটিতে। এদের মধ্যে হয়তো অনেকেই প্রথমবারের মতো পিস্তলের গুলির শব্দ শুনেছে। দুয়েকজনের অবস্থা হয়েছে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো। ম্যাকফির বুকে হাত দিয়েছিল যে-লোকটা সে হাত তো নামিয়ে নিয়েছেই এই মুহূর্তে তার চেহারা হয়েছে দেখার মতো। মরা মাছের উল্টোপিঠের মতো সাদা হয়ে গেছে তার মুখ।

“এখনো বাঁধা দেবে আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে?”

“এই, কি হচ্ছে এখানে?” বেশ জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সাথে-সাথে থেমে গেল প্রায় সব গুঞ্জন। মন্দিরে উপস্থিত লোকদের প্রতিক্রিয়া দেখে ম্যাকফি অনুমান করার চেষ্টা করলো তার প্রতি মানুষের ভক্তির মাত্রা কতোটা গভীর হতে পারে। বেশিরভাগ হিন্দু ধর্মগুরুদেরকে ম্যাকফি হলুদ রঙের চেয়ে আরেকটু গাঢ় রঙের পোশাক পরতে দেখেছে। এই প্রথম একজনকে দেখতে পেল একেবারে সাদা পোশাক পরে আছে। সাদা ধূতির ওপরে সাদা চাদরের মতো কিছু একটা জড়ানো। কাপড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে টকটকে ফর্সা চেহারা তার। নেটিভদের ভেতরে এতো ফর্সা লোক খুব কমই দেখা যায়।

মানুষটা মন্দিরের সিঁড়ি থেকে প্রাঙ্গনে তাকাতেই দেখতে পেল ওকে। তাকে মন্দিরের সিঁড়িতে দেখামাত্রই শিষ্যদের বেশিরভাগ বলতে গেলে মাটিতে

শুয়ে পড়লো। হঠাৎ করে বাতাসের ঝলক বয়ে গেলে যেরকম অনুভূতি হয় ঠিকরকমভাবে ‘গুরুজি’ ‘গুরুজি’ শব্দের একটা মৃদু হলকা বয়ে গেল জায়গাটার ওপর দিয়ে। ম্যাকফি তাকিয়ে দেখলো ওরা ক’জন বাদে আর সবাই ভক্তিভরে গুরুকে সম্মান করছে। এমনকি ওদের সাথে থাকা শঙ্কর পর্যন্ত মাথা একেবারে নুইয়ে ফেলেছে।

“শ্রী শ্রী মহাদেভা। এ যে দেখছি একেবারে গরীবের বাড়িতে বাঘের পদক্ষেপ,” বলে লোকটা যেন একটু মুখ টিপে হাসলো। “আমি ডোংরু মহারাজ, হুজুরের সেবায় নিয়োজিত দাস,” বলে সে দুই হাত তুলে নমষ্কার করলো। আর লোকটার শেষ কথাগুলো শুনে একেবারে চমকে উঠলো ম্যাকফি। বিশুদ্ধ প্রাদেশিক উচ্চারণে বলা ইংরেজি কথাগুলো শুনলেই বোঝা যায় লোকটা উচ্চশিক্ষিত।

“জি, হুজুর। আপনি যা ভাবছেন তা সত্যি,” বলে সে আবারো অভিবাদন করলো। এবার জোনাথনের দিকে তাকিয়ে। মহাবীর সিং আর অন্যদের দিকে এমনকি তাকালোও না। “আমি কালা পানি পাড়ি দিয়েছি। আমি আপনাদের দেশ দেখেছি। তাই জানি কাকে সম্মান করতে হবে, আর কাকে হবে না। একই জিনিস আপনাদের কাছ থেকেও আশা করবো। ”

লোকটার কথা শুনে চমকে উঠলেও নিজেকে সামলে নিলো ম্যাকফি। উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ এই অজ-পাঁড়াগায়ে এসে ধর্মগুরু সেজে বসেছে। লোকটার অতি-বিনয়ী চেহারার সামনে নিজের হাতে ধরে থাকা পিস্তলটা একবার নেড়ে ও বলে উঠলো, “এসব চালবাজি রাখো। তোমার এখানে একটা চোর প্রবেশ করেছে তাকে আমার দরকার।”

“হুজুর, দেবতার ঘরে সবাই সমান। এখানে কে চোর আর কে রাজা সেটার প্রমাণ হয় দেবতার প্রতি ভক্তি দিয়ে, কর্ম কিংবা সামাজিক অবস্থানের কোন গুরুত্ব নেই এখানে।”

“তাই নাকি! এখানে সবাই সমান!” মানুষটার তেলতেলে কথা শুনে মেজাজ একটু খারাপ হয়ে গেল ম্যাকফির। “তাহলে তোমার লোকেরা যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্যে একাধিক সারি তৈরী করেছে কেন,” বলে ও যজ্ঞের সামনে প্রস্তুত বাঁশ দিয়ে তৈরী লাইনগুলো দেখালো। যার যার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ি এখানে দাঁড়াতে হবে। কোনভাবেই যেন এক বর্ণের লোকের সাথে অন্য বর্ণের লোকের এমনকি স্পর্শও না লাগে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

“হুজুর, আপনারা জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুষের সাথে তর্ক করতে নেই,” বলে সে তার লোকদেরকে হাতের ইশারায় আগের অবস্থায় ফিরে যেতে যেতে বললো। সাথে-সাথে এতোক্ষণ মাথা নিচু করে থাকা লোকগুলো উঠে বসে যার যার কাজে ফিরে গেল। “জ্ঞানী মানুষেরা ইশারায়ই অনেক কিছু বুঝতে পারে,” তার অঙ্গুলি হেলানে যে এখানে সব হয় সেটার প্রতি ইঙ্গিত করলো বলে মনে হলো ম্যাকফির কাছে। তার পেছনের চ্যালাদের সাথে আরো কয়েকজন যোগ হয়েছে এখন। লোকটা কি ওদের কোন ক্ষতি করতে চাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করলো ম্যাকফি।

“দেখো ডোংরু মহারাজ কিংবা যাই হোক তোমার নাম। তুমি এদের কাছে দেবতার প্রতিনিধি হতে পারো কিন্তু আমার কাছে নয়। আমার কাছে নিজের কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মন্দিরে এমন একজন প্রবেশ করেছে যাকে আমার দরকার। কাজেই তাকে খুঁজে বের করার জন্যে আমি সব করতে রাজি আছি,” বলে আরেক পা এগিয়ে গেল ও ডোংরু মহারাজের দিকে। “আমি ঝামেলা করতে চাই না কিন্তু তোমরা আমাকে সাহায্য না করলে আমি সেটাই করবো।”

“তোমরা সাদা চামড়ার মানুষেরা ভাবছো কি। যহন খুশি এখানে এসে যা খুশি করতে পারবা?” এবার ডোংরু মহারাজ না তার পেছন থেকে আরেকজন চেঁচিয়ে উঠলো। “ওই আচার্য জমিদার তোমগরে যতোই চাটুক না ক্যান আমরা তা হইতে দিবো না,” এমনকি ডোংরু মহারাজের সামনেই লোকটা মারমুখি হয়ে উঠেছে। তার সাথের অন্যদের চেহারাও খুব বেশি ভালো দেখাচ্ছে না।

“দেখো...” ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আরেকজন চেঁচিয়ে উঠলো।

“আপনেরা শাসক হইতে পারেন কিন্তু দেবতার মন্দির অপবিত্র করার অধিকার কেউর নাই...”

‘নাই’ ‘নাই’ ‘নাই’ ‘এগুলারে বাইর কইরা দেও’ ‘মহারাজরে অপমান করার চেষ্টা করছে! কতোবড় সাহস’ ‘ওই জমিদার আমগো ধম্ম নষ্ট করার জন্যেই এগো পাঠাইছে’

এধরণের কথাবার্তা ভেসে আসতে লাগলো। ম্যাকফির আঙ্গুল শক্ত হলো তলোয়ারের বাটে। ও দেখলো জোনাথন আর মহাবীর সিং দুজনেই যার যার অস্ত্র আঁকড়ে ধরেছে। ম্যাকফি ডোংরু মহারাজের দিকে তাকিয়ে দেখলো

লোকটা মুখে মিটিমিটি হাসছে ঠিকই কিন্তু তার চোখের গভীরে দুঃশ্চিন্তার ছায়া।

“বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে...” ম্যাকফি কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার আগেই ডোংরু মহারাজ একটা হাত তুললো। সাথে-সাথে থেমে গেল সব গুঞ্জন।

“উনারা দেবতার মন্দিরে আর দাঁড়াবে না। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি,” ডোংরু মহারাজ বলে উঠলো।

“তোমার এতোবড় সাহস...” ম্যাকফি কথা শেষ করার আগেই পাশ থেকে শঙ্কর বলে উঠলো, “হুজুর মেনে নিন। তা না হলে...”

“খামোশ, ইতরের বাচ্চা! নিচু জাত, বড়দের কথার মাঝে কথা বলে,” ডোংরু মহারাজ ভীষণভাবে ধমকে উঠলো শঙ্করকে। বলে সে ম্যাকফির দিকে তাকিয়ে আবারো দুই হাত তুলে নমষ্কারের ভঙ্গিতে জোড় করলো।

“হুজুর আপনিও শিক্ষিত আর আমিও তাই। কিন্তু এইখানে সবকিছুর হিসেব হয় অন্যভাবে। হয়তো এতোক্ষণে সেটা বুঝতে পেরেছেন। আমি নিজে আপনাকে বলছি আপনারা যার পিছু নিয়ে এখানে এসেছেন তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর যদি সেই মানুষটা মন্দিরে প্রবেশ করেও থাকে এতোক্ষণে পেছনের পথ দিয়ে সে পালিয়েছে অথবা নদীপথে পালিয়েছে। কাজেই দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করে তাকে অপবিত্র করে কোন লাভ হবে না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের উভয়ের জন্যেই সেটা হবে বিপর্যয়। আপনারা দেবতাকে সম্মান জানালে আমরাও আপনাদের সসম্মানে যেতে দিবো।”

লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো ম্যাকফি। চালবাজ একটা লোক কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যা বলেছে এটাই সেরা সমাধান। যে লোকটাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখেছিল সে নিশ্চই এতোক্ষণ ভেতরে বসে নেই। ডোংরুর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের লোকদের ইশারা করলো ম্যাকফি বেরিয়ে যাবার জন্যে। ও নিজেও পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলো।

“ধন্যবাদ হুজুর,” ডোংরু মহারাজের বিদায় সম্ভাষণ শুনে ফিরে তাকালো ম্যাকফি। “দেবতাকে সম্মান করলে সেও অন্যদের সম্মান করে,” লোকটার মুখে প্রথমের সেই চালবাজির হাসিটা ফিরে এসেছে। “হুজুর, মনে রাখবেন

দেবতা যেমন তার সন্তানদের সাথে বেঈমানি করে না ঠিক তেমনি দেবতার বাহন তার অনেক কিছুরই পরিচায়ক। দেবতার বাহনও কখনো তার সাথে বেঈমানি করে না। যেখানে যায় পেছনে দাগ রেখেই যায়," বলে লোকটা হাসতে লাগলো।

চিন্তিত মুখে নিজেদেরে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ওরা।

"এবার কি?" জোনাথন প্রশ্ন করলো ম্যাকফিকে। "অকারণে দৌড়াদৌড়িই সার। কাজের কাজ তো কিছুই হলো না। এভাবে ওখান থেকে চলে আসাটা কি ঠিক হলো?"

ম্যাকফি জবাব দেয়ার আগেই শঙ্কর বলে উঠলো, "হুজুর ডোংরু মহারাজের ডেরা থেকে জান নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি এটাই বেশি। তার সাথে উল্টোপাল্টা করলে কেউই রক্ষা পায় না।"

"নাহ, আমাদের এভাবে ছেড়ে দেয়াটা উচিত হয়নি," মহাবীর সিংয়ের মতো গম্ভীর লোকও কথা বলে উঠলো।

"তাহলে এবার কি। আবার কোথা থেকে শুরু করবো আমরা?"

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ম্যাকফি কোন জবাব দিলো না। "এবার দুপুরের খাওয়া, খেতে খেতে ভাবা যাবে কোথা থেকে শুরু করবো," নিজের ঘোড়াটার কাছে ফিরে এসে ওটার গায়ে হাত বুলাতে লাগলো ম্যাকফি। ঘোড়াটার শরীরের একটা বিশেষ জায়গায় হাত পড়তেই চমকে উঠলো ও। যেকোন মালিক তার ঘোড়ার গায়ে নিজের একটা চিহ্ন একে রাখে। বিশেষ করে কোম্পানির লোকেরা এ-ক্ষেত্রে কোম্পানির লোগো ব্যবহার করে। একটু আগে ডোংরু মহারাজের শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল ওর।

'দেবতার বাহন কখনো বেইমানী করে না। যেখানে যায় পেছনে দাগ রেখেই যায়' এই কথাটার মানে কি। লোকটা কি ¯ফে মজা করছিল নাকি মজার ছলে অথবা বিদায় সম্ভাষণের আদলে আসলে কিছু একটা বলতে চাইছিল ওকে। দেবতার বাহন, ঘোড়া। ও ঝট করে ফিরলো শঙ্করের দিকে।

"আচ্ছা, অন্যান্য এলাকার মতো এই এলাকার লোকজনের প্রধান বাহন নিশ্চই ঘোড়া?"

“হ, হুজুর। ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি মানুষ বহনের লাই¹া আর মাল টানুনরে জইন্যে গাধা আর খচ্চর। গরীবেরা চলাচলের জইন্যে ব্যবহার করে গরুর গাড়ি, আর না অয় পায়ে হাডে।”

“তারমানে এখানে নিশ্চই। গরু, ঘোড়া, গাধা খচ্চর এগুলোর কোন বাজার আছে?”

“অবশ্যই আছে হুজুর। অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় গরু-ঘোড়ার হাট বসে এই এলাকাতেই। পনেরো দিন পর পর।”

“আবার কবে বসবে সেই হাট?”

“হুজুর আমি সঠিক বলতে পারবো না। তবে হাট বসে প্রতি এক বুধবার পর পর।”

ম্যাকফি মনে মনে হিসেব করে দেখলো আজ সোমবার। তারমানে যদি হাট বসে তবে পরশু বসবে। “কোথায় বসে এই হাট?”

“এখান থেকে একেবারে কাছেই হুজুর। খাগড়হর নামে একটা বাজার আছে ওইখানের এক বড় মাঠেই বহে এই বিরাট হাট।”

জোনাথনের দিকে ফিরে ম্যাকফি উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো, “এই হাটে যেতে হবে আমাদের। আমার বিশ্বাস ডোংরু মহারাজ লোকটা আমাদের সাথে মজা করছিল না। সে একটা সূত্র দিয়েছে আমাকে ইশারায়। আমার ধারণা এই হাটে গেলে আমরা কিছু না কিছু বের করতে পারবোই।”

অধ্যায় তেরো

বর্তমান সময়

ময়মনসিংহ পুলিশ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ সদর

“স্যারে এমনে আতকা গিয়ান হারায়া ফালাইলো ক্যান?” প্রশ্নটা নবীন কন্সটেবল আবদুল্লার। “ডাক্তারে তো কইলো তেমন কিছু না। তাইলে এমন জোয়ান একটা মানুষ হুদাই অজ্ঞান অইয়া গেল?”

আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা এই মুহূর্তে বসে আছে ময়মনসিংহ পুলিশ হাসপাতালের বাইরে। একটু আগেই খানিক অসুস্থ বাশারকে ভেতরে রেখে এসেছে ওরা। শেষ মোড়ের ওখানে বাশার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটার ভেতরে যাবার পর ওরা গাড়িতেই বসে অপেক্ষা করছিল হঠাৎ দেখতে পায় বাশার দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে থেমে গেল। রাস্তা পারাপাররত বাশারের সামনে দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাবার পরেই দেখে রাস্তার ওপরে পড়ে আছে সে। সাথে-সাথে আঁতকে উঠে দুজনেই জিপ থেকে নেমে দৌড় দেয় ওদিকে।

রাস্তার ওপরে একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বাশার। হাতের ছড়ি, আর মাথার ক্যাপ পড়ে গেলেও সানগ্লাসটা তখনো চোখেই ছিল। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা প্রথমে ভেবেছিল তাদের স্যার হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কিন্তু প্রাথমিক চেক করেই বুঝতে পারে সে আহত না। দুজনে মিলে কোনমতে ধরে তাকে সোজা নিয়ে আসে পুলিশ হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে অবশ্য অনেকটাই ঠিক হয়ে যায় সে। তবে পুরোপুরি সচেতন ছিল না। আর থেকে থেকেই বিড়-বিড় করে কিছু একটা বলছিল। ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ডিউটি ডাক্তার প্রাথমিকভাবে চেক করে জানায় গুরুতর কিছু নয়, সম্ভবত হিট-স্ট্রোকে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওদেরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে রোগিকে ভেতরে নিয়ে যায়।

হাসপাতালের লবিতেই অপেক্ষা করছিল ওরা এমন সময় বাশার রমিজ দারোগার মোবাইলে কল করে জানায় ও ঠিক আছে একটু পরেই বেরিয়ে আসবে, ওরা যেন জিপে গিয়ে অপেক্ষা করে।

“হুন, তুই যে-কতা জিগাইছোস এইডার উত্তর দিতে হইলে ডেরাইভার অইয়া লাভ নাই, এইডার উত্তর জানতে অইলে পাইলট দরকার,” রমিজ দারোগা ফিচকি হাসি দিয়ে পকেটে হাত ঢুকালো।

“মানে কি, পাইলট পাইবেন কই?” আবদুল্লাকে হতভম্ভ দেখাচ্ছে।

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে রমিজ দারোগা পকেট থেকে পাইলট সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে ঠোঁটে সিগারেট লাগালো। আবদুল্লার দিকে দেখিয়ে প্যাকেটটা নেড়ে বললো, “পাইলট, বুঝছোস? হা-হা।”

“ও পাইলট সিগারেট, হেইডা কইলেই তো হইতো।”

“শুন, মাইনষের জীবনডা বহুত আজিব কিসেমের। ” বলে সে একগাদা ধোঁয়া ছাড়লো।

পাইলট সিগারেটের কটু গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আবদুল্লার। কোনমতে কাশি চেপে চুপচাপ বসে রইলো সে।

“ক্যান আজিব কইতাছি, জীবনে চাহিদার শেষ নাই আবার কোনকিছু আর্জনের যন্ত্রণারও শেষ নাই। যেমন ধর, তুই এহন কন্সটেবল। তোর জীবনে বড় একটা অর্জন হইলো তুই পুলিশে চাকরি পাইছোস। জানিনা ক্যামনে পাইছোস, গেরামের বাড়িত কয় বিগা জমি বেচছোস, তয় পাইছোস। এহন তোর স্বপ্ন অইলো জীবনে আরো বড় অইতে অইবো। এহন তুই কন্সটেবল, কয় বছর পরে যদি তুই প্রমোশন না পাস তাইলে এই কন্সটেবলের পোস্ট তোর বিরক্ত লাগবো। আবার যদি তুই প্রমোশন পাস তাইলে আবার হের উপরে ক্যামনে উডবি হেই চিন্তায় পাইড়া যাবি। মানে যন্ত্রণার শেষ নাই আরকি,” বলে সে আবারো ভুরি দুলিয়ে হাসতে লাগলো। তার ঠোঁটের ফাক দিয়ে বেরিয়ে আসা কটুগন্ধ যুক্ত ধোঁয়া, টিটকারির হাসি আর নিকোটিনের প্রভাবে তৈরী হওয়া হাসি আর কাশি মিলেমিশে একাকার।

আবদুল্লাহ মনে-মনে বললো, জিগাইলাম কি, আর এই লোক বক-বক করতাছে কি।

“তয়,” ধোঁয়া ছাড়া শেষ করে আবারো শুরু করলো রমিজ দারোগা। “জীবনে এমন কিছু সময় আহে যখন সবকিছু, সবকিছু মানে স...ব-কিছু ব্যর্থ অইয়া যায়। তোর জীবনের শুরু থাইক্কা শেষ পর্যন্ত তুই যা করছোস যেই উদ্দেশ্য নিয়া করছোস তোর কাছে ব্যর্থ মনে অইবো, তোর কাছে বাইচ্চা থাহার কোর কারণ থাকবো না, কাছের পত্যেকডা মানুষ দুরে সইরা যাইবো। বুঝছোস? ধনী আর গরিব নাই এমন সময় সবার জীবনেই আহে, একবার অইলেও আহে,” বলে সে সিগারেটের মোথাটা জিপের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে নিজের মুখটা আবদুল্লার আরেকটু কাছে নিয়ে এল, “আমাগো বাশার স্যারের দেখছোস? হেয় এহন এইরহম একটা সময় পার করতাছে। হের চোক্ষের দিকে চাইয়া দেহিস, তোর নিজের চোখ যদি ঠিক থাহে তাইলে বুজতে পারবি হেয় অইলো ডুবন্ত মানুষ। যে কিনা শেষ আশা হিসেবে এই মরা-ধরা কেইসটারে আকড়াইয়া ধরতে চাইতাছে। বুঝছোস?” সে মুখটা আরেকটু বাড়িয়ে দিলো আবদুল্লার দিকে।

আবদুল্লাহ ভয়ে মুখটা পিছিয়ে নিলো খানিকটা। “সেইটা আপনে বুঝলেন ক্যামনে, আপনে এতো নিশ্চিত ক্যামনে কন?”

কঠিন দৃষ্টিতে আবদুল্লার দিকে তাকালো রমিজ দারোগা। “আমার বয়স কতো? মানে আমারে দেখলে কতো মনে অয়?”

একটু দ্বিধার সাথে আবদুল্লাজ জবাব দিলো, “পঞ্চাশের উপরে, ষাইটের কাছে।”

“তাইলে আমি এহনো এই পোস্টে কি করি?”

আবদুল্লাহ কোন উত্তর দিলো না।

“তোর বাশার স্যারে এহন যে-অবস্থায় আছে আমি গত দশ বছর ধইরা হেই অবস্থার ভিতরে বাস করতাছি। এহন বুঝছোস?”

আবদুল্লাহ কোন উত্তর দেয়ার আগেই জিপের জানালায় টোকা পড়লো। বাশার ফিরে এসেছে। ওকে দেখে দুজনেই নেমে এল জিপ থেকে।

“সরি, আমি আসলে হঠাৎ তীব্র গরম আর কাজের চাপে অসুস্থ বোধ করছিলাম।”

“স্যার, এহন ঠিক আছেন?” আবদুল্লাহ জানতে চাইলো। প্রশ্নটা করার সময়ে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রমিজ দারোগার দিকে।

“হ্যা, একদম ঠিক, চলো রওনা দেয়া যাক,” বলে ও জিপের সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসলো। রমিজে দারোগা পেছনে উঠে বসতেই জিপ ছেড়ে দিলো আবদুল্লাহ।

“স্যার, আপনারে কি বাসায় নামায়ে দিবো নাকি থানায় যাবেন?”

“হুম?” ওসি ডেকেছে কাজেই থানায় যেতেই হবে। “থানায় চলো,” বলে বাশার আবারো ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল। ও মুখে যতো যাই বলুক না কেন ভেতরে ভেতরে জানে কিছুই ঠিক নেই। আজ বিকেলের ঘটনাটা ওর শরীরে কোন প্রভাব সৃষ্টি না করলেও মনের ভেতরে তীব্র ভীতি জাগিয়ে তুলেছে। কারণ ও জানে আজ বিকেলে ও শারীরিক কোন দূর্বলতা বা অসুস্থতার কারণে অজ্ঞান হয়নি, হয়েছে মানসিক কারণে। আর এও জানে একবার যেহেতু ঘটেছে ব্যাপারটা, কাজেই এই ঘটনা আবারো ঘটতে পারে। এখানেই ওর ভয়।

সব নষ্টের গোড়া ওই ট্রাকটা, আজ বিকেলে দেখা একটা ট্রাক। সেদিনও এরকমই একটা ট্রাক ছিল, জায়গাটাও ছিল উন্মুক্ত এক হাইওয়েতে। আজকের ঘটনার সাথে পার্থক্য শুধু একটাই ওইদিন ছিল তীব্র বৃষ্টি আর আজ বিকেলে ছিল রোদ। আজ বিকেলের ঘটনা ফেলে আসা অতীতের সেই বাজে সময়টার ‘দেজা ভূ’ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিটে হেলান দিয়ে ডানহাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বাম হাতের আংটিটা ধরে মোচড়াতে লাগলো। আংটিটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলো বাশার। এই হাত, এই হাতটাই সবকিছুর সাক্ষি। এই হাত দিয়ে নিজের মাকে কবর পর্যন্ত দিতে পারেনি, এই হাত দিয়েই সেই বৃষ্টির রাতে গুলি করে মেরেছিল ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু, সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে। সেই অন্ধকার বৃষ্টির রাত, সেই পাহাড়ি রাস্তা, সেই ট্রাক দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছিল আজ বিকেলে।

“স্যার, থানায় চইল্লা আইছি,” আবদুল্লার কথায় হুঁশ ফিরে এল বাশারের।

“হুম, জিপটা পার্ক করে ভেতরে অপেক্ষা করো। আমি ওসি সাহেবের সাথে কথা শেষ করে তোমাদেরকে পরবর্তী কাজের নির্দেশনা জানাবো,” বলে ও জিপ থেকে নেমে থানার মূল দরজার দিকে রওনা দিলো। দু-কদম এগিয়েই

আবারো ফিরে এল জিপের কাছে। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধার সাথে বলে উঠলো, “ইয়ে, তোমাকে ধন্যবাদ আবদুল্লাহ, আর আপনাকেও রমিজসাহেব। আজ বিকেলে তোমরা না থাকলে আমার হয়তো আরো বেশি সমস্যা হতে পারতো,” বলে ও অস্বস্তি কাটানোর জন্যে মৃদু কাশি দিয়ে বললো, “আর আজ বিকেলের ব্যাপারটা থানায় জানানোর কোন দরকার নেই। বুঝেছো?” বলে ও ভেতরের দিকে রওনা দিলো।

ওর শেষ প্রশ্নের জবাবে আবদুল্লাহ মাথা নাড়লেও রমিজ দারোগা চুপ মেরে রইলো।

বাশার সোজা চলে এল থানার ভেতরে। ওসির রুমের দিকে এগোতে যাবে দায়িত্বরত আইটি অফিসার তৌফিক পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, “আরে বস নাকি অসুস্থ হয়ে গেছিলেন?” এই থানায় ডিউটির অল্প কয়েকদিনে এই ছেলেটার সাথেই ওর সবচেয়ে ভালো সখ্যতা গড়ে উঠেছে।

ছেলেটার প্রশ্ন শুনে গুঁঙিয়ে উঠলো বাশার। এই হয়েছে আজকের যুগের সমস্যা মানুষ পৌছানোর আগেই খবর পৌছে যায়। এটা নিশ্চিত, এটা রমিজ দারোগার কাজ। এ’কারণেই ব্যাটা তখন চুপ করে ছিল।

কোনমতে মুখে খানিকটা হাসি ফুঁটিয়ে তুললো বাশার। “আরে নাহ, তেমন কিছু না। গরমে হঠাৎ একটু খারাপ লাগছিল তাই আরকি। আচ্ছা ওসিসাহেব...” ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলো কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টর তা হতে দিলো না।

“আরে কি বলেন! আমি তো শুনলাম হাসপাতাল পর্যন্ত নাকি যেতে হয়েছিল।”

“ধূর মিয়া! কী যে বলো না,” অনেক মনের জোর খাটিয়ে মুখের হাসিটা ধরে রেখেছে বাশার। “ওই আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা জোর করে নিয়ে গেল। আর আমিও ভাবলাম গ্যাস্ট্রিকটা অনেকদিন ধরে ভোগাচ্ছে, এই সুযোগে একটু দেখিয়ে আসি।”

“ও আচ্ছা, তাই বলেন। আমি তো আরো ভাবলাম কি না কি। তা কাজের কি অবস্থা? কোন অগ্রগতি হলো?” তৌফিক নামের সুদর্শন ছেলটার হাতে একটা কলম সেটার কোনায় বাঁধিয়ে মাথা থেকে পুলিশি টুপিটা খুলে ফেললো সে। জেল দেয়া ঘন চুল কপালের সাথে একেবারে লেপ্টে আছে।

“অগ্রগতি বলতে তেমন কিছু না তবে কিছুটা স্পেসিফিকেশনের দিকে এগিয়েছি। আচ্ছা ওসি মল্লিক আমাকে ডেকেছিল। তোমার সাথে পরে কথা বলছি। আগে তার সাথে দেখা করে আসি,” বলে বাশার ঘুরতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে তৌফিক বলে উঠলো, “আরে বস, এতো তাড়াহুঁড়ার কিছু নাই। সে কখন বেরিয়ে গেছে।”

“বেরিয়ে গেছে?” একটু বোকা হয়ে গেছে বাশার। “অহ, তাহলে আমাকে যে বললো... মানে আমাকে খবর পাঠালো অবশ্যই যেন আমি আজকের ঘটনা মৌখিকভাবে রিপোর্ট করে তাকে জানাই আর কেসের সমস্ত অগ্রগতি লেটেস্ট আপডেট জানাই। আমি আরো বাসায় না গিয়ে দৌড়ে এলাম,” বলে বাশার একবার কাঁধ ঝাঁকালো।

“হা-হা, বস, আপনি এখানে নতুন এসেছেন তো তাই ওসিস্যারের ব্যাপারে জানেন না,” বলে সে তার মুখটা বাশারের একেবারে কাছে নিয়ে এল। “শুনুন বস, ওসিস্যারের ব্যাপারে আপনাকে একটা গোপন ফর্মূলা জানাই। এই ফর্মূলা মানলেই আপনি একমাত্র তার সাথে ভালোভাবে চলতে পারবেন। ওসিস্যার যে-কাজটা বেশি সিরিয়াসলি করতে বলবে সেটা করবেন না, আর যেটা সে মোটেই গুরুত্ব দিয়ে বলবে না সেটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করবেন,” বলে সে ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো।

বাশার এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইলো তৌফিকের দিকে, তারপর দুজনেই প্রায় একসাথে হেসে উঠলো।

“ভালো বলেছ,” বলে ও টুপিটা আবারো মাথায় পরে নিয়ে রওনা দিয়েই আবারো ঘুরে তাকালো। “তৌফিক?”

“জি, বস।”

“তুমি তো এই থানার আইটিতে কাজ করো তাইনা?”

“হ্যা, বস।”

“আচ্ছা,” বলে ও থেমে গেল। “তোমার ডিউটি টাইম আর কতোক্ষণ আছে? মানে তুমি অফিসে আছো আর কতোক্ষণ?”

“বস ডিউটি তো আজকের মতো শেষ তবে থানায় আছি আরো ঘন্টাখানেক। আজ আমার আবার স্পেশাল ডেট আছে,” বলে সে আবারো

বাশারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো।

বাশার মনে মনে ভাবলো এই ছেলেটা এভাবে কথায় কথায় চোখ টিপে কেন। মুদ্রাদোষ নাকি।

“তোমার আজ ডেট আছে! ডেট থাকলে সবাই আগে-ভাগে বাসায় গিয়ে পোশাক বদলে ডেটে যায় আর তুমি দেরি করে যাবে মানি কি?”

“আরে বস, এইটাই তো মজা। আমার আবার এই পোশাকে ডেটে যেতে বেশি ভালো লাগে, হা-হা। সবাই বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।”

বাশার আবারো কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকালো। “দুনিয়াতে কতো পাগল দেখবো। যাই হোক তুমি ডেস্কে থাকো। আমি আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে ছুটি দিয়ে আসছি। তোমার সাথে আমার কাজ আছে।”

“ওকে বস।”

বাশার দ্রুত পায়ে চলে এল বাইরে। বাইরে এসে দেখলো আবদুল্লাহ জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছে। আর রমিজ দারোগাকে দেখা গেল না আশে-পাশে কোথাও। নিশ্চিত বিড়ি টানতে গেছে। এই লোক বিড়ি ছাড়া এক দন্ড টিকতে পারে না।

“আবদুল্লাহ।”

“জি, স্যার,” বাশারের ডাক শুনে সাথে সাথে পিঠ সোজা করে দাঁড়ালো ছেলেটা।

“শোন, আজকের মতো তোমার আর থাকতে হবে না। কাল সকাল থেকে আমরা কাজ শুরু করবো। কাল তোমার ডিউটি টাইম কয়টায়?”

ছেলেটার কাছ থেকে ডিউটি টাইম শুনে বিদায় নিয়ে চলে আসছিল বাশার পেছন থেকে আবদুল্লাহ জানতে চাইলো, “স্যার, আপনি এহন ঠিক আছেন?”

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জবাব দিলো বাশার। “হ্যা, ঠিক আছি,” বলে ও চলে এল থানার ভেতরে।

মূল করিডরটা পার হয়ে চলে এল আইটি সেকশনে। বাশার রুমের সামনে গিয়ে নক করতে গিয়ে দেখতে পেল রুমের দরজা একেবারে হাট করে খোলা। ও নক করার জন্যে হাত উঠিয়েও নামিয়ে নিলো। ঢুকে পড়লো সরাসরি।

ভেতরে একটা বেশ বড় ডেস্কটপ কম্পিউটার। একপাশে সিসিটিভির ফুটেজ দেখা যাচ্ছে একটা বড় মনিটরে। আর অন্যপাশে একটা বড় রেডিও মেশিন। এটার মাধ্যমে ওরা সবধরনের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করে। গতদিনের দেখা আইটি রুম আর আজকের দেখা আইটি রুমের মাঝে আকাশ-পাতাল ফারাক না, মহাশূণ্য আর মহাতলের ফারাক।

এতোসব জিনিসপত্রের ভিড়ে ছোট একটা চেয়ার পেতে ডেস্কটপটার সামনে বসে আছে আইটি সেকশনের প্লেবয় তৌফিকুর রহমার।

ওকে দেখতে পেয়ে হেসে উঠলো সে। “আরে বস, আসেন-আসেন গরীবের সার্কাসে হাতির পাড়া। আপনার আগমনে কী যে আবেগ আপ্লুত!”

“ওই মিয়া, ফাইজলামি করো!” বাশারের কপট রাগ দেখে সে আরো জোরে হেসে উঠলো।

“বস, আপনেরে কইযে বসতে দেই,” বলে সে মিটি-মিটি হাসতে লাগলো। তার ভেতরে বসতে দেয়ার কোন ইচ্ছেই চোখে পড়ছে না।

“আজাইরা কথা ছাড়ো, আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি।”

“কি বলেন। এতো তাড়াতাড়ি এই আখাম্বা কেসের লিড বাইর করলেন কেমনে?”

“এটা দেখো,” বলে ও তৌফিকের দিকে একটা ছোট কাগজ বাড়িয়ে দিলো। “এখানে একটা তারিখ, সাল আর সম্ভাব্য সময় লেখা আছে,” এই সময়টাই ও পুরনো বন্ধু রুবেলের কাছ থেকে বের করেছিল। “আমি ধারণা করছি এই সময়টাতেই গাড়িটা পানিতে পড়েছিল।”

“তাই নাকি!” কাগজটা হাতে নিতে-নিতে বলতে লাগলো তৌফিক। একেবারে নির্দিষ্ট তারিখ কিভাবে বের করলেন? ওই নতুন ল্যাবের ওদের মাধ্যমে?”

“আরে নাহ! ওইসব ল্যাব-ফ্যাব দিয়ে পুরো কাজ হয় নাকি। আসল দুনিয়ার কাজ ল্যাবে হয় না বুঝেছো?” বলে বাশার একটা টেবিলের ওপরে উঠে বসলো। “তবে প্রাইমারি লিড ওখান থেকেই পেয়েছিলাম। ওটা না হলে একেবারে নির্দিষ্ট সময়টা বের করা যেত না।”

“আপনি কি এই দিন তারিখের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত?”

“পুরোপুরি নিশ্চিত বলে তো আর কিছু নেই তবে প্রায় নিশ্চিত।”

“আচ্ছা, তাহলে এখন কি করতে চান?”

“তোমার কাছে আমি দু’টো ব্যাপার জানতে চাই, প্রথমত ওইসময়ে ময়মনসিংহ শহরে কয়জন বিদেশি নাগরিক অবস্থান করছিল। আদৌ করছিল কিনা, এই ব্যাপারটা কি বের করা সম্ভব?”

তৌফিক একটু ভাবলো, “সম্ভব। তবে এইটা আমার সেকশন না। ওইটা লিয়াজো অফিসার আনাম ভাইরে দিলে সে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে। হয় ফরেন মিনিস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আমি যতোটুকু জানি ওদের এই ধরণের একটা ডাটাবেইজ থাকে। কোনদেশি কয়জন নাগরিক কোথায় আছে, কোন শহরে অবস্থান করছে, কি পারপাসে আছে এসবের একটা রেকর্ড থাকে। সেটা ফরেন মিনিস্ট্রিতে না এনএসআই না ডিবি না ডিজিএফআই সেইটা বস আমি জানি না। তবে আনাম ভাই এইটা বের কইরা দিতে পারবে। আর পরের টা?”

“পরেরটা হলো, যে-সময়টা এখানে লেখা আছে সেই সময়ে বা সেই সময়ের আশেপাশের সময়ে কোন কিছু ঘটেছিল কিনা। মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেই সময়ে এই ময়মনসিংহ শহরে বড় ধরণের কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা?”

“একেবারে এই সময়টাতেই?”

“না-না, এই সময়টার আশেপাশে। মানে এই দিন-তারিখটার এক সপ্তাহ রেডিয়াসের ভেতরে কিছু ঘটেছিল কিনা আমার জানা দরকার,” বলে ও একটু থামলো। “প্রশ্ন হলো, এই থানার পুরনো রেকর্ড কি সফট কপিতে মানে কম্পিউটারে রাখা হয় নাকি হার্ড কপিতে?”

“আরে বস, কি যে বলেন, এইসব জায়গায় এখনো পুরোপুরি সফট কপি মানে ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করতে আরো সময় লাগবে। আমরা সরকারি লোকজন এখন হয়া গেছি পুরনো কৌতুকের মতোন। যেখানে ওস্তাদের লাঠি অর্ধেক পানিতে পড়ছিল আর অর্ধেক পড়ছিল ডাঙ্গায়। আর তাই লাঠির অর্ধেক হয়া গেছে বাঘ আর বাকি অর্ধেক হয়া গেছে কুমির। আমরা মুখে-মুখে হয়ে গেছি ডিজিটাল। কিন্তু কাজে এখনো আধা ‘ডিজি’ আর আধা ‘টাল’,” বলে সে হাসতে লাগলো।

তৌফিকের কথা শুনতে-শুনতে বাশারের নাক কুঁচকে উঠলো। এই ছেলেটার সব ভালো কিন্তু সমস্যা একটাই, অতিরিক্ত কথা বলে। “তোমার হাসি শেষ হয়েছে? তাহলে এখন কাজের কথা বলো।”

“ওহ, শিওর বস। মাইন্ড করলেন নাকি?”

“না, এখনো করিনি। এই থানায় রেকর্ড কিভাবে রাখা হয়?”

“বেশিরভাগ রেকর্ড এখনো ফাইল আকারে হার্ড কপিতেই রাখা হয়। ধীরে-ধীরে সব হার্ড কপিকে সফট করে ফেলা হবে। তবে এখন পর্যন্ত হার্ড কপিতেই রাখা আছে। গত তিন বছর পর্যন্ত সমস্ত কেস ফাইল সফটে নেয়া হয়েছে কিন্তু এর আগ পর্যন্ত সব কেস এখনো কাগজের ফাইলেই রাখা।”

“আচ্ছা তাহলে, আমার এগারো বছর আগের কেস ফাইল দরকার। ওটা এই মুহূর্তে আছে কোথায়?” বাশার জানতে চাইলো।

“ওটা এই থানার আর্কাইভেই রাখা আছে। থানার পেছনের ভবনে একটা স্টোর রুম আছে। পুরনো সব কেস ফাইল ওই স্টোর রুমেই রাখা থাকে। আরে ওই স্টোর রুমের দায়িত্ব তো রমিজ দারোগার ওপরেই।”

“অহ্ হো, ওই ব্যাটা আবার চলে গেল কিনা কে জানে,” বাশার আনমনেই ঘড়ি দেখলো। “পুরনো ফাইল দেখতে চাইলে নিয়ম কি?”

“নিয়ম তো অনেক কড়া কিন্তু এর ভিতরে ব্যবস্থা আছে। প্রথমে আবেদন করতে হয়। অনুমতি মিললে একটা ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়ে দায়িত্বরত অফিসারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে একজন অফিসার সহ ওখানে যেতে হয়। তবে এতো কাহিনী করার দরকার পড়ে না। আপনি রমিজ দারোগারে বললেই সে আপনারে একটা ফর্ম দিবে সেটা ফিলাপ করলেই চাবি দিয়ে দিবে আপনারে।”

“ঠিক আছে, তাহলে দেখি রমিজ দারোগা আছে কিনা। আর তোমার সময় থাকলে তুমিও চলো, আমার সাহায্য লাগতে পারে।”

বাশারের প্রস্তাব শুনে একবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো সে, “ডেট আছিল বস। আচ্ছা যাউকগা। শালী একটু অপেক্ষা করলে মইরা যাবে না। চলেন।”

দুজনে মিলে থানার মূল প্রবেশ দরজার কাছে চলে এল। দরজার কাছে বসে থাকা সেন্ট্রিকে প্রশ্ন করবে তার আগেই দেখতে পেল একটা জিপের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে আর দুই কন্সটেবলের সাথে আলাপ করছে রমিজ দারোগা। বাশার দূর থেকেই তাকে ডাক দিলো। বাশারের ডাক শুনে সে সিগারেটটা এমনভাবে ফেলে দিলো যেন ওটা একটা পচা মাছ। সিগারেট বিদ্যুৎ গতিতে ফেললেও সে এগোল খুব ধীর গতিতে। তার যথারীতি লশকরী চালে সে এগিয়ে এল বাশারের দিকে।

“স্যার, ডাকছিলেন?”

“রমিজসাহেব। আপনি এখনো আছেন দেখছি?” বাশার তার উপস্থিতিতে একটু অবাকই হয়েছে।

“জি, স্যার। ভাবলাম যদি আপনের কোন দরকার পড়ে,” বলে সে তেলতেলে একটা হাসি দিলো।

লোকটার জবাব শুনে গা জ্বলে উঠলো বাশারের। এই লোক মুহূর্তের ভেতরে এতো সুন্দর মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে পারে, সত্যিই তুলনাহীন। “বুঝতে পেরেছি। শোনেন এই থানার আর্কাইভের চাবি কি আপনার কাছে থাকে?”

“না-না স্যার কি যে কইন। আমারটাইন থাকবো ক্যারে। এইহানের অফিসো জমা থাহে। আমার দায়িত্বে আরকি।”

“ওই এক কথাই। আমার একটু আর্কাইভে ঢুকতে হবে। আপনি ব্যাবস্থা করেন তো,” বাশার দ্রুত কাজ সেরে বাসায় ফিরতে চাচ্ছে। হঠাৎই খুব ক্লান্তি লাগছে ওর।

“স্যার, এতো রাইতে অহন এই ঝক্কি। এইডা তো বহুত ঝামেলা আর...”

হঠাৎই রাগের পারদ চট করে ওপরে উঠে গেল বাশারের। বিকেলের ঘটনাটার পর লোকটার প্রতি একটু দূর্বলতা কাজ করছিল হঠাৎই সেটা উবে গিয়ে চট করে রাগ উঠ গেল ওর। কড়া চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে শক্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই বাজে ঘটনাটা ঘটার হাত থেকে ওকে আর রমিজ দারোগা দুজনকেই উদ্ধার করলো তৌফিক ছেলেটা।

“আরে ভাই! কি যে বলেন। ঝামেলা তো কি হইছে। স্যারের এখন দরকার মানে দরকার। খুলতে হবে,” বলে সে একহাতে রমিজ দারোগাকে ধরে টানতে-টানতে ভেতরের দিকে নিয়ে চললো।

হঠাৎ ভেতর থেকে উঠে আসা রাগের মাত্রাটাকে সামলানোর জন্যে চুপচাপ কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো বাশার। এভাবে হুট-হাট রেগে যাওয়া ব্যাপারটাকে ও নিজে সবসময় খুব ঘৃণা আর বিরক্তির চোখে দেখে এসেছে। পুলিশের চাকরিতে অনেককেই অকারণে মেজাজ হারাতে দেখে নিজে প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছে। আর এখন নিজেই কিনা প্রায় কারণ ছাড়াই চট করে রেগে উঠছে। খারাপ, খুব খারাপ। এভাবে হুট করে জ্ঞান হারানো, চট করে রেগে ওঠা, এসব হলো নিজের ওপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারানোর লক্ষণ। এভাবে বার-বার নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকলে কখন কোথায় টক্কর খেয়ে জীবনের মোড় ভীষণ খারাপ একটা দিকে ঘুরে যাবে কে জানে।

শেষ কথাটা মনে হতেই মনে-মনে ও হেসে উঠলো। এখন যে-অবস্থায় আছে এরচেয়ে খারাপ অবস্থা আর কি হতে পারে? চাকরিতে ডিমোশন, মান-সম্মান হারানো, পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মাকে হারানো, বন্ধুকে হারানো... সবই তো শেষ, এরচেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে। ভাবতে-ভাবতেই থানার ভেতরে দিকে রওনা দিলো ও। ভাবনাগুলো কতোটা ভুল এ-ব্যাপারে কোন ধারণাও নেই ওর। সময় আরো কতোটা খারাপ হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারলে এতোকিছুর পরেও নিজেকে ওর সুখিই মনে হোত ।

ভেতরে ঢুকে রমিজ দারোগার ডেস্কের সামনে এসে বাশার দেখতে পেল ওরা ফর্ম আর চাবি নিয়ে প্রায় প্রস্তুত। ফর্মটা ফিলাপ করে জমা দিয়ে ওরা

রওনা দিলো আর্কাইভের দিকে। থানার মূল ভবনের পেছনে ঘাসে ঢাকা ছোট্ট আঙ্গিনাটা পার হয়ে চলে এল তিনতলা ভবনের পেছনের অংশে। এই ভবনটা মূলত অফিসারদের থাকার মেস হলেও একটা অংশ এখনো নানা ধরণের অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করা হয়। এরই একটা ভাগ হচ্ছে আর্কাইভ।

মাত্র সন্ধ্যে হলেও জায়গাটা বেশ অন্ধকার। মোবাইলে টর্চ জ্বেলে ওরা তালা দেয়া রুমটার সামনে চলে এল। টর্চের আলোতে পুরনো তালাটাতে একটার পর একটা চাবি মিলিয়ে দেখতে লাগলো রমিজ দারোগা আর তৌফিক। বাশার অপেক্ষা করছে। তালাটা দেখে ওর ভীষণ হাসি পাচ্ছে। জোরে একটা বাড়ি দিলেই ভেঙে পড়বে যে-তালা সেটা খোলার জন্যে কতোই না আয়োজন। বাশারের মনে হলো. এই তালা আসলে তালা না, এই তালা হলো দেশের সরকারি আমলাতন্ত্রের প্রতীক।

“স্যার, খুলে গেছে। চলেন ভিতরে যাই,” রমিজ দারোগা যেন তালা খোলাতে ভীষণ প্রীত হয়ে উঠেছে।

বাশার একবার ভালোভাবে লোকটার দিকে দেখলো। ওর ধারণা এই লোক মোটেই নিশ্চিত ছিল না এই চাবিগুলো দিয়ে তালাটা খুলবে কিনা। “শেষবার কবে এই রুমের তালা খুলেছিলেন আপনি?” লোকটার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলো বাশার। সাথে সাথে উজ্বল হাসিটা যেন একটু ¤øান হয়ে গেল। “স্যার, স্যার,” মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভ্যাবলা হাসি দিলো সে। “স্যার, মনে নাই।”

“হুম্, বুঝতে পেরেছি। চলেন কাজে নেমে পড়ি,” বলে ও অন্ধকার রুমের ভেতরে পা রাখলো। ঝড়ের বেগে ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো রমিজ দারোগা। ঝড়ের বেগেই সে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলো।

“ধন্যবাদ,” রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উঠলো সে। সাথে-সাথে ভীষণ গদ-গদ হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো সে তার আগেই তৌফিককে ভেতরে ঢোকার ইশারা করে রুমের ভেতরে পা রাখলো ওরা।

একটা থানার আর্কাইভ হিসেবে রুমটা আরো অনেক ভালো হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভেতরেটা যথেষ্ঠ নোংরা না হলেও অবস্থা বেশি সুবিধেরও না। দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা সারি-সারি স্টিলের র‍্যাকের ভেতরে ফাইল স্তুপ করে রাখা। সুইচ দেয়ার পরেও ভেতরেটা এখন মোটামুটি আলোকিত

কিন্তু তারপরও এতো বড় কক্ষের আন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে হলে আরো অনেক বেশি বাল্বের প্রয়োজন।

র‍্যাকের সারিগুলোর দিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠলো তৌফিক। তার বিস্মিত ভাব দেখে বাশার অনুমান করলো এই ছেলে এর আগে কখনো এখানে আসেনি।

“কি মজা লাগছে দেখে?” মজার ছলেই ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো বাশার।

“এখানকার অবস্থা এইরকম হবে আমি জীবনেও কল্পনা করিনি।”

“ওয়েলকাম টু রিয়েল ওয়ার্ল্ড বয়, অ্যাপার্ট ফ্রম ইয়োর ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড,” বলে হাসিমুখে র‍্যাকের সারির দিকে এগিয়ে গেল।

তৌফিক একটা ফাইল তুলে ধরতেই সেটা থেকে একরাশ ধূলো ঝড়ে পড়লো। “চ্যাহ! কতোদিন পর-পর এখানে সব কেস ফাইল রাখা হয়?”

“উম্, বছরে একবার বেশি অইলে দুইবার,” রমিজ দারোগা দরজার কাছ থেকেই উত্তর দিলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে ওদের সাথে কাজে যোগ দিতে আগ্রহী।

বাশার স্টিলের র‍্যাকের সাথে নম্বর মিলিয়ে দেখলো। প্রতিটা র‍্যাকে কোন বছরের ফাইল রাখা আছে সেই সাল দেয়া আছে। তবে কোন মাসের নাম দেয়া নেই। বাশার নম্বর মিলিয়ে নির্দিষ্ট র‍্যাকের সামনে এসে দাঁড়ালো। বিরাট লম্বা র‍্যাক। ও এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তৌফিককে ডাক দিয়ে অন্য প্রান্ত থেকে শুরু করতে বললো।

“রমিজসাহেব, আপনিও হাত লাগান আমাদের সাথে। আমি এই প্রান্ত থেকে দেখবো। তৌফিক, তুমি অন্য প্রান্ত থেকে দেখবে। আর রমিজ উদ্দিন আপনি মাঝখানের ফাইলগুলো চেক করবেন,” বলে ও নির্দিষ্টি মাস আর তারিখ বলে বুঝিয়ে দিলো কোন সময়ের কেস ফাইলগুলো ওদের দরকার।

পুলিশের কাজের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষ তাদের ডিউটি আর অ্যাকশনগুলোর খবর রাখে কিন্তু এর বাইরেও পুলিশি পেশার আরেকটা বড় অংশ রয়েছে, সেটা হলো ফাইল ওয়ার্ক।

প্রতিটি থানায় কাজ যেমনই হোক সেই কাজের ফাইল জমা হবে পাহাড় সমান। এখানেও একই অবস্থা। নির্দিষ্ট বছরটার নির্দিষ্ট মাস আর সপ্তাহের ফাইলটা খুঁজে বের করার জন্যে একের পর এক ফাইল ঘেঁটে চললো তিনজনে। টানা আধা ঘন্টা ফাইল ঘাঁটার পর হঠাৎ রমিজ দারোগা একটা ফাইল ঝপাত করে র‍্যাকের মধ্যে রেখে দুই হাতে জোরে একটা তালি দিয়ে উঠে বললো, “আমার এইখানে নাই। থাকলে আইন্নেগো ওইখানে থাকতে পারে।”

কেউ তার কথার জবাব দিলো না। বাশারের মনে একটাই চিন্তা, ফাইলটা খুঁজে বের করা। আর তৌফিকের মনেও একটাই চিন্তা কিভাবে নির্দিষ্ট ফাইলটা বের করে সে ডেটিঙে যাবে। কাজ সে-ই আগে শেষ করলো।

“বস আমার এখানেও নেই। থাকলে আপনার ওখানেই আছে।”

বাশার একটু অবাক হয়েই নিজের হাতের শেষ ফাইলটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে বোকার মতো তাকালো দুজনার দিকে।

“কি ব্যাপার, কি হলো?” তৌফিক অবাক হয়ে জানতে চাইলো। “আপনার কি আবারো শরীর খারাপ লাগছে নাকি?”

“নাহ, আমি ঠিক আছি কিন্ত আমি ফাইলটা পেলাম না। তোমরাও পেলে না, তাহলে সেটা গেল কোথায়?”

“এটা কিভাবে সম্ভব?”

“আমারো সেটাই প্রশ্ন, এটা কিভাবে সম্ভব? রমিজসসাহেব আপনি ফাইলগুলো ঠিকমতো চেক করেছিলেন তো নাকি? নাকি মাঝেমাঝে বাদ গেছেন?”

“কি যে কইন স্যার? আমি...”

“আমাদেরকে আবোরো সবগুলো ফাইল দেখতে হবে,” অনেকটা ঘোষণার সুরে বলে উঠলো বাশার।

ওর কথা শুনে প্রায় গুঙিয়ে উঠলো দ’ুজনেই।

“কিছু করার নেই। এবার চেক করতে হবেই সেইসাথে সিরিয়ালি সাজাতে হবে ফাইলগুলো। চলো শুরু করি। যতো আগে শুরু ততো আগে শেষ। কাজেই লেটস্ স্টার্ট,” বলে ও একটা ফাইল টেনে নিলো।

আরো প্রায় দেড় ঘন্টা টানা কাজ করার পর ওরা নির্দিষ্ট বছরের প্রায় সবগুলো কেসওয়ার্কের ফাইলগুলোকে এক সিরিয়ালি সাজাতে সক্ষম হলো। আর সেটা করার পর বোকা বনে গেল উপস্থিত তিনজনেই।

ওই নির্দিষ্ট বছরের প্রায় পুরোটা সময়ের সবগুলো কেসওয়ার্ক আছে কিন্তু যে-তারিখটা ওরা খুঁজছে সেই তারিখের দুইদিন আগে থেকে সাত দিন পরে পর্যন্ত, অর্থাৎ মাঝখানের নয়দিনের কোন রেকর্ড নেই। ওরা দুই বার তিনবার চেক করে নিশ্চিত হলো রেকর্ডগুলো আসলেই নেই।

“এর মানে কি? এটা কিভাবে সম্ভব?” তৌফিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো। তার জেল দেয়া চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। গরমের ভেতরে টানা কাজ করতে-করতে লাল দেখাচ্ছে ফর্সা চেহারা।

“ইরম কাহীনি তো হুনি নাই, মায়েরে বাপ,” মোটাসোটা রমিজ দারোগাও কুল-কুল করে ঘামছে।

ওদের কারো কথার জবাব না দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো বাশার। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে সে।

“এর মানে খুবই সহজ; হয় কেউ রেকর্ডগুলো চুরি করেছে, আর না হয় কারো নির্দেশে ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে,” বলে ও একটু থামলো।

“কেউ একজন চায়নি ওই সময়ে কী ঘটেছিল সেটা জানাজানি হোক কিন্তু ঘটনাচক্রে পুকুরের নিচ থেকে গাড়িটা বেড়িয়ে পড়াতে আমরা এমন কোন ঘটনাটার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি যেটাকে অতীত থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।”

অধ্যায় চোদ্দ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

খাগডহর বাজার, ময়মনসিংহ

নির্মাণাধীন রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের পাক্ষিক হাটের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাকফি।

ঘোড়া প্রাণীটা ওর খুব পছন্দের হলেও এই মুহূর্তে কেন জানি খুব বিরক্ত লাগছে ঘোড়ার হাটে এসে। একদিন আগে শঙ্করের কাছে যখন শুনলো এই এলাকাতে ঘোড়ার হাট বসে, সে ভেবেছিল এই দূরবর্তী এলাকার হাট আর কতোই বা বড় হবে কিন্তু সেটা যে কতোবড় ভুল ভাবনা ছিল সেটা ভেবে ও একটু অবাকই হচ্ছে এখন।

হাটের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছে এ'তো রীতিমতো মহাযজ্ঞ। "বস, তুমি যা খুঁজে বের করতে চাইছো এখান থেকে সেটা খুঁজে বের করা তো রীতিমতো দুরূহ একটা ব্যাপার," ম্যাকফির পাশে দাঁড়ানো জোনাথন শিস দিয়ে উঠলো হাটের আয়তন দেখে।

"সেটাই তো মনে হচ্ছে," বলে ও দলের সবার দিকে ফিরে তাকালো। "বাজারটা এতো বড় হবে আমি ভাবতেও পারিনি।"

"হুজুর, এই হাট অত্র এলাকার সবচাইতে বড় হাটগুলার একটা। এই মুল্লুকের সবচেয়ে ভালা ঘোড়াগুলা পওয়া যায় এইহানে। চট্টগ্রাম, মেঘালয় এমনকি রেঙ্গুন থাইকা ব্যাপারি আসে, ক্রেতা-বিক্রেতা আসে, এইখানে ঘোড়ার সদাই খরিদ করতে," শঙ্করের গলায় গর্বের সুর।

"কারণ কি? দূরের শহর ফেলে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেন আসে লোকজন?" জোনাথন জানতে চাইলো।

"হুজুর, কারণ আর কিছুই না, মেঘালয় আর আর আসামের চালান আসে এই বাজারে, যেইডা অন্য কোনহানে পাইবেন না আপনে," জোনাথনের

প্রশ্নের জবাবটা দিলো ডুম্বুর। সে এখন ওদের সাথে অনেকটাই সহজ হয়ে উঠেছে। “ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়া খুব সহজেই মেঘালয় আর আসাম থাইক্কা মাল আহে। মানে ঘুড়া আহে আরকি। আমি আসাম রাজার লগে কাম করনের সময় মাজে মইদ্দে আমারেও দায়িত্ব দিতো হের এলাকা থাইক্কা ঘুড়া আনুনের।”

“সেটাতো বুঝলাম কিন্তু এখন কাজ করবো কিভাবে?” ম্যাকফির কাছে জানতে চাইলো জোনাথন।

ম্যাকফি চিন্তিত মুখে বাজারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর প্রাথমিক পরিকল্পনা পুরোপুরি মাঠে মারা যেতে বসেছে সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এখনো আশা আছে। দেখা যাক।

ওর পরিকল্পনাটা ছিল খুব সহজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের ক্যাম্প থেকে সব জিনিসপত্র খোয়া যাবার সাথে এমন একটা জিনিসও সম্ভাব্য খুনি বা অপহরণকারীরা নিয়ে গেছে যেটার ব্যাপারে একমাত্র হদিস বের করা সম্ভব এই বাজার থেকে। জিনিসটা আর কিছুই না কোম্পানির সৈন্যদের ঘোড়া।

কোম্পানির সৈন্যদের অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে ওদের ক্যাম্প থেকে ঘোড়াগুলোও গায়েব হয়েছে। যে বা যারাই এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকুক না কেন নিশ্চিভাবেই বলা যায় নিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো তাদের পক্ষে বেশিদিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ ঘোড়াগুলোর গায়ে কোম্পানির চিহ্ন আঁকা রয়েছে। একদিন আগে ডোংরু মহারাজের ডেরা থেকে ফেরার পর নিজের ঘোড়ায় ওঠার সময়ে এই ব্যাপারটাই ম্যাকফির মাথায় আসে ডোংরু মহারাজের কথার ইঙ্গিত থেকে। কোম্পানির প্রতিটি ঘোড়ার গায়ে বিশেষ একটা চিহ্ন-একটা গোল চাকতির ভেতরে দুপাশ থেকে ক্রশ করে থাকা দুটা চাবি পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে-এরকম একটা লোগো লোহা গরম করে একেবারে গভীরভাবে চামড়ায় বসিয়ে দেয়া থাকে। আগে হোক পরে হোক ঘোড়াগুলোকে তাদের বিক্রি করতেই হবে আর সেটা করতে হলে এই বাজারই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। ম্যাকফির ধারণা ছিল ছোট এলাকা, এখানে এলে সহজেই বাজারে নতুন ওঠা ঘোড়াগুলোকে পরীক্ষা করে ওরা কিছু একটা বের করতে পারবে। কিন্তু এখন এখানে এসে বাজারের ব্যাপকতা দেখে একটু চুপ মেরে গেছে ও।

“সবাই মন দিয়ে শোন, যদিও আমরা প্রাথমিক পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারছি না কিন্তু পিছিয়ে যাবার কোন কারণও আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমরা সম্পূর্ণ বাজার খুঁজে দেখবো। এই মুহূর্তে আমরা দলে আছি পাঁচজন। জোনাথন আর ডুম্বুর থাকবে একদলে, মহাবীর সিং আর শঙ্কর থাকবে আরেক দলে। আর আমি একাই বেরুবো। তিনদলে ভাগ হয়ে আমরা বাজারে ছড়িয়ে পড়বো। সম্পূর্ণ বাজার পরীক্ষা করে ফিরে আসবো আস্তাবলের কাছে।”

“আর যদি আমরা কিছু খুঁজে পাই তবে কি করবো?”

“ব্যবস্থা আছে,” বলে মহাবীর সিংয়ের দিকে ফিরে ইশারা করলো ম্যাকফি। ওর ইশারার সাথে সাথে মহাবীর সিং নিজের কোমরে ঝোলানো থলে খুলে ওটার মুখ হাতের তালুতে উপুর করে ধরতেই ভেতর থেকে সবুজ রঙের কয়েকটা জিনিস বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে দিলো সে।

সবাই জিনিসটা নেড়ে-চেড়ে দেখছে, ম্যাকফি আবারো বলতে শুরু করলো, “এটা নারকেল পাতা দিয়ে তৈরী বিশেষ বাঁশি। এটাতে জোরে ফুঁ দিলে এক ধরণের পাখির শিসের মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসে। যেটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে,” বলে সে ফুঁ দিয়ে দেখালো। “সবাই এটা সাবধানে রাখবে। কোন বিপদ হলে বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখলে সাথে-সাথে ফুঁ দিবে এটাতে। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন সাথে সাথে শব্দের উৎসের কাছাকাছি পৌছানোর চেষ্টা করবো। বোঝা গেছে?”

সবাই মাথা নাড়লো।

“গুড, তবে আরেকটা ব্যাপার বলে নেই। কী খুঁজবে মনে আছে তো। কোম্পানির ছাপ দেয়া আছে এ’রকম ঘোড়া, সেই সাথে সন্দেহজনক যেকোন কিছু। বিশেষ করে সবাই খেয়াল রাখবে ওইদিন যে-লোকটার পিছু নিয়েছিলাম তাকেও দেখা যেতে পারে। যদি কেউ তোমাদের পিছু নেয় সেই ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে। এই বাজারে বিভিন্ন ধরণের লোক আছে কাজেই তাদের ভিড়ে মিশে গিয়ে কাজ উদ্ধার করতে খুব বেশি ঝামেলা হবার কথা নয়। চলো, সবাই এগোই।”

ওরা বাজারে প্রবেশ করে আস্তাবলের দিকে এগোল। নিজেদের ঘোড়াগুলো আস্তবলে রেখে আধা-আনি পয়সা পরিশোধ করলো ঘোড়াগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে। তারপর কথামতো তিনদলে ভাগ হয়ে গেল।

“জোনাথন আর ডুম্বুর তোমরা দু’জনে ডান দিয়ে এগোবে। শঙ্কর আর মহাবীর সিং তোমরা বামে দিয়ে। আর আমি বাজারের মাঝামাঝি এগোব। সবাই সাবধানে থাকবে। সন্দেহজনক কিছু দেখা মাত্রই বাঁশিতে ফুঁ দিবে, যাতে একজনের বিপদে অপরজন এগিয়ে আসতে পারি। ঠিক আছে, সবাই এগোও,” ম্যাকফির কথা শেষ হতেই ওরা যার-যার মতো সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

ম্যাকফি তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে বাজারের মাঝ বরাবর হাঁটতে লাগলো। ছোটবেলা থেকে ভ্রমণের ওপরে থাকার কারণে মানুষের পরে যে-প্রাণীটার সাথে ওর সবচেয়ে বেশি সখ্যতা সেটা হলো ঘোড়া। কে জানি বলেছিল যুদ্ধের ময়দানে মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু তার বাহন। সেটাও হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে সে যুদ্ধের সময়ে।

এখন পর্যন্ত নিজস্ব তিনটে ঘোড়ার মালিক ছিল সে। যারা ঘোড়া ব্যবহার করে তারা জানে একটা ঘোড়ার সাথে তার মালিকের সম্পর্ক কেমন হয়। কর্তব্যের সময়ে, যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধুতে পরিণত হয় একটা ঘোড়া। নিজেকে এতোদিন ভারতীয় ঘোড়ার বিশেষজ্ঞ মনে করলেও এই বাজারে ঘুরতে-ঘুরতে ওর মনে হলো ঘোড়া বিষয়ে অজ্ঞ লোক সে।

চারপাশে এতো ধরণের মাদী আর মদ্দা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছে ও কোনটা কোন জাতের পুরোপুরি ওর পক্ষে তো বলা সম্ভব নয়ই। এমনকি ঘোড়াগুলোর রঙের আর আকারেরও বাহুল্যও প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করছে ওকে। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল আসামের ঘোড়া, মেঘালয়ের ঘোড়া। ভারতের নানা প্রদেশের ঘোড়া থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের আর ইরানের ঘোড়াও দেখতে পেল। সবকিছুরুই দেখা পেল কিন্তু যা খুঁজছিল সেটার দেখা মিললো না।

ঘোড়া দেখতে-দেখতে কোন দিক দিয়ে সময় পার হয়ে যেতে লাগলো টেরও পেল না ও। হাঁটতে-হাঁটতে বাজারের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ও। ব্যাপার কি, অন্যরা কোথায়। সময়টা চমৎকার কাটলেও কাজের কাজ হয়নি। যা খুঁজছিল সেটা তো পায়নি সেইসাথে তীব্র গরমে অসহ্য লাগছে। বাজারের শেষ প্রান্তে এসে একটু থামলো ও। কাছেই একটা ছোট পুকুরের মতো আছে। সেটার পাড়ে বিরাট একটা বটগাছ। বটগাছের নিচে সুন্দর গোল একটা ছায়াঘেরা জায়গা। সেই ছায়াঘেরা জায়গাটায় বেশ কিছু লোকজন জটলা করে আছে। ম্যাকফি সেদিকে এগিয়ে গেল।

এখানে বহু জায়গার বহু ধরণের লোক আসলেও সাদা চামড়ার মানুষ খুব বেশি আসে না বললেই চলে। তাই ম্যাকফিকে দেখে ভিড়ের ভেতরেও লোকজন সরে গিয়ে ওকে জায়গা করে দিলো। ভিড় ঠেলে সামনে এগোতেই দেখতে পেল সামনে সাপ আর দড়ির খেলা চলছে। একজন বয়স্ক মানুষ আর তার সাথে ছোট-ছোট দুটো ছেলে। ছেলে দুটোর চেহারায় আশ্চর্য মিল। আসলে মিল বললে ভুল হবে, দুজনার চেহারা হুবুহু একইরকম। জমজ।

দড়ির খেলা দেখানো মানুষটার চেহারাও দেখার মতো। হালকা-পাতলা মানুষটার মখে প্রায় দেড় ফিট লম্বা দাড়ি। শীর্ণ মুখটাতে বিরাট একজোড়া গোঁফ। এরকম গোঁফ রাজস্থানের মরু এলাকার লোকজনকে রাখতে দেখেছে ও। লোকটার পোশাক-আশাকও খুবই জবরজং। পায়ে কোঁচানো ধূতি। ভারতীয়রা ধূতি পরে সাধারণত এক রঙের, এর ধূতি রঙবেরঙের। গায়ে কাফতানের মতো একটা পোশাক তাতে অসংখ্য পট্টি। মানুষটার গলায় বিভিন্ন ধরণের পুতির মালা আর হাতে হল্যোদ রঙের মোটা বালা। নড়াচড়ার সাথে সাথে গলার পুতি আর হাতের মোটা বালায় বাড়ি লেগে টুংটাং শব্দ করে উঠছে। টকটকে লাল দুই চোখের মাঝখানে ততোধিক লাল রঙের কিছু একটা দিয়ে টিকা লাগানো। তার এই জররজং চোহারার তুলনায় তার ছেলেদের চেহারা অনেক সাদামাটা। দুটো ছেলেরই পায়ে সাদা ধূতি পরা। খালি গা, আর মাথায় পাগড়ি। বারো-তের বছর বয়সের ছেলে দুটোই বয়য়ের তুলনায় বেশ লম্বা, সেইসাথে শরীরেও পাকানো দড়ির মতো পেশী।

বাপ আর ছেলেদের মানিক জোড়কে লক্ষ্য করতে করতেই ম্যাকফি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন সময় সেই লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

“এসাব খেল তো বহুত দেখলিয়া। সাপোকা খেল ভি বহত দেখলিয়া আব গায়েবিকা খেলা দেখনা হ্যায়। সাপকা বাপ,” বলে সে হাত তালি দিয়ে উঠলো। সাথে-সাথে তার দুই ছেলের একজন মোটা মটকির মতো গোল একটা জিনিস মেলে ধরলো। হাততালি দিয়ে উঠলো লোকজন।

ম্যাকফি শুনতে পেল লোকজন ফিসফাস করছে ‘দড়ির খেলা দেখানো হবে দড়ির খেলা’। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল কোন একদিন তার এক ইংরেজ সহকর্মি আলোচনা করছিল সে নাকি ভারতবর্ষের কোথায় এক দূর্ধর্ষ এক ম্যাজিক ট্রিক দেখেছে। স্থানীয়রা নাকি এটাকে বলে ‘রাশ্‌শি কা খেল’। ওর সহকর্মি খেলাটাকে যে নামে ডাকছিল সেটাও মনে পড়ে গেল

‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক’। এটা কি সেই খেলা নাকি, সে মনে মনে কৌতুহল নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। একবার ভাবলো আশেপাশে কাউকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু দড়ির খেলা দেখানো লোকটার কাছেই জবাব পেয়ে গেল।

“হাজারো বরস ধরে আমারে পূর্ব লোগনে এ খেল দিখাকে আ রা রাহে হ্যায়, জিছে দেখ কার ইংরেজ লোগভি হ্যায়রান হো গেয়ে। অর ও লোগ ইস খেলকো বুলাতে হ্যায় ‘গেরেট ইন্ডিয়ার রোপ টিরিক’,” সে এই পর্যন্ত বলতেই চারপাশে তালির বন্যা বয়ে গেল।

“দেখিয়ে ইস মাটকিমে রাশ্শি হ্যায় ¯ফে রাশ্শি। চাইয়ে তো ছুঁকার দেখিয়ে,” বলে সে মটকি হাতে ছেলেটার দিকে ইঙ্গিত করলো। ছেলেটা দড়ি ভর্তি মটকিটা নিয়ে সবার সামনে দিয়ে ঘুরতে লাগলো। সবাই উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ম্যাকফিও কৌতুহল দমন করতে না পেরে মটকির ভেতরে উঁকি দিলো। ভেতরে বেশ মোটা অতি সাধারণ চেহারার পুরনো একটা দড়ি রাখা। ওর পাশেই দাঁড়ানো একজন মটকিতে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। ওদের আলোচনায় সেও বুঝলো ভেতরে ¯ফে দড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। আর দড়িটাও খুবই সাধারণ দড়ি। একটু মোটা এই যা।

উৎসূক দর্শকদের সামনে দিয়ে মটকি ঘোরানো শেষ হতেই সেটাকে নিয়ে রাখা হলো লোকটার সামনে। লোকটা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে মন্ত্র বা এই জাতীয় কিছু একটা পড়ে মটকিটাকে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখলো নিজের শরীর দিয়ে, এরপর উঠে এসে নিজের কোমরে ঝোলানো থলের ভেতর থেকে বের করে আনলো বাঁশীর মতো দেখতে একটা জিনিস। সাধারণ বাঁশির সাথে ওটার একটা মূল পার্থক্য হলো জিনিসটার দুই পাশ সরু হলেও মাঝখানটা পেটমোটা। জিনিসটাকে বের করে এনে ওটার একটা পাশ মুখে লাগালো লোকটা। একটু পরেই চিকন সুর বেরিয়ে এল ওটা থেকে। ম্যাকফি ভাবতে লাগলো এই তামাশা বাদ দিয়ে আবারো কাজে নামবে কিনা হঠাৎই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করলো।

মটকির ভেতরে থেকে দড়ির একটা মাথা ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। সাপ যেভাবে ওই বিশেষ বাঁশির সুরে সুরে মাথা নাড়িয়ে বাক্স কিংবা অন্যকিছুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ঠিক সেভাবেই দড়ির একটা মাথা বেরিয়ে আসতে লাগলো মটকির ভেতর থেকে। দড়ির মাথাটা দেখা যাওয়া

মাত্রই উপস্থিত জনতার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের মৃদু গুঞ্জন বেরিয়ে এল। সাথে সাথে দুই ছেলের একজন ইশারায় চুপ থাকতে বললো সবাইকে।

ম্যাকফি অবাক হয়ে দেখলো সেই একঘেঁয়ে চিকন সুরে বেজে চলেছে তী² বাঁশীর মতো আর ঠিক যেন ওটার সাথে তাল মিলিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে মটকির ভেতর থেকে মাথা তুলে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসছে দড়ি। এই খেলা আগেও দেখেছে ম্যাকফি। তবে সেটা ছিল সাপের খেলা। কিন্তু এই খেলাতে সুরের তালে-তালে মাথা নাড়ছে এক টুকরো নিষ্প্রাণ দড়ি। দর্শকদের ভেতরে আরেক দফা গুঞ্জণ বয়ে গেল। কারণ সুরের তালে নড়তে থাকা দড়িটা ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ম্যাকফি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো ওপর থেকে কোন ধরণের সূতো দিয়ে বেঁধে টেনে তোলা হচ্ছে কিনা ওটাকে কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়লো না।

হঠাৎ ম্যাকফির মনে হলো এভাবে বোকার মতো বাজারে ঘুরে-ঘুরে ঘোড়ার সন্ধান না করে যেখানে হিসেব করে কোষাগারে টাকা জমা দিয়ে ঘোড়াগুলোকে বাজারে ঢোকানো হচ্ছে আগে সেখানে খোঁজ নিলেই তো সন্ধান পাওয়াটা আরো সহজ হোত। ও ঘুরে দাঁড়াতে যাবে ভিড়ের অন্যপাশে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো।

বেশিরভাগ মানুষই একদৃষ্টিতে খেলার দিকে তাকিয়ে আছে। তেমন কেউই নড়ছে না বললেই চলে। তাই অন্যপাশের লোকটাকে খুবই সহজে চোখে পড়ে গেল ওর। ও তাকাতেই মানুষটাও থেমে গেল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ম্যাকফিও থেমে গেল। মুহূর্তের জন্যে দুজনেই তাকিয়ে রইলো একে অপরের দিকে।

ব্যাপার কি, এই ব্যাটাকে চেনা চেনা লাগছে কেন। হঠাৎই ও বুঝতে পারলো কোথায় দেখেছে ওকে। আর সাথে-সাথে উপস্থিত জনতার করতালিতে চমকে উঠলো ও। লোকটার দিক থেকে মনোযোগ হারিয়ে দড়ির খেলার দিকে ফিরে তাকালো ও। নড়তে থাকা দড়িটা এখন সবার মাথা ছাড়িয়ে প্রায় বিশ ফিটের মতো সটান উপরে উঠে গেছে। শক্ত লোহার একটা ডান্ডার মতো সোজা হয়ে থাকা দড়িটা বেয়ে দুই ছেলের একজন উঠতে শুরু করেছে। সেটা দেখেই করতালি আর উচ্ছাসে ফেটে পড়ছে জনতা। ক্ষণিকের জন্যে ওদিকে তাকিয়েই লোকটা যেখানে ছিল সেখানে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো ম্যাকফি। লোকটা নেই সেখানে। দৃষ্টি ঘুরিয়েই দেখতে পেল দ্রুতগতিতে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে লোকটা।

ভিড়ের একেবারে সামনে আছে ও। এই ভীষম ভিড় ঠেলে পেছনে যাবার উপায় প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে লোকটাও দ্রুত সটকে পড়ছে। একে ধরতেই হবে। তাই চট করে সিদ্ধান্ত নিয়েই ও পেছন থেকে সামনে চলে এল। সামনে আর আশেপাশে থাকা দু-চারজনকে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়লো খেলা দেখানোর চক্রের ভেতরে। সাথে-সাথে হই-হই করে উঠলো লোকজন। দড়ির বুহ্যের ভেতরে ওর ঢুকে পড়া আর লোকজনে চেঁচামেচিতে খেলা দেখাতে থাকা সেই জোব্বা পরা লোকটার মনোযোগ সরে গেল। সাথে সাথেই শূন্যে ভেসে থাকা দড়িটার নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেল। চিৎকার করে মাটির দিকে পড়তে শুরু করলো দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকা ছেলেটা। ছেলেটা পড়তে শুরু করতেই থেমে গেল ম্যাকফি। মুহূর্তেও জন্যে থেমে গিয়ে হাতে বেরিয়ে আসা পিস্তলটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে সামনে লাফ দিলো ছেলেটাকে ধরার জন্যে। কিন্তু সামান্য গড়মিল হয়ে গেল ওর হিসেবে। লাফ দেয়ার প্রায় সাথে সাথে ছেলেটাকে ধরে ফেলতে পারলেও নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজনেই ছিটকে পড়লো মাটিতে।

যেভাবে মাটিতে পড়েছিল তাতে দুইহাত আর কোমড়ের হাড় অন্তত কয়েক জায়গায় ভাঙা উচিত কিন্তু বালুময় নরম মাটি বাঁচিয়ে দিলো দুজনকেই। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ম্যাকফির মনে হলো নড়তে পারছে না। দম নিয়ে কোনমতে উঠে বসলো ও। প্রথমেই খোঁজ করলো পিছু নেয়া লোকটার। কিন্তু হট্টগোলের ভেতরে প্রথমে খুঁজে পেল না মানুষটাকে। ও ভেবেছিল ঝামেলার সুযোগ নিয়ে পালিয়েছে ব্যাটা কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো লোকটাও হতভম্ভ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে তাকাতে দেখেই দৌড়াতে শুরু করলো সে।

কোনমতে মাটি থেকে উঠে পিস্তলটা খুঁজলো। আছে, ওর থেকে কয়েক ফিটের ব্যবধানে মাটিতে পড়ে আছে ওটা। যতোটা দ্রুত সম্ভব ওটা তুলতে যাবে তার আগেই দৌড়াতে থাকা একজনের পায়ে লেগে সরে গেল খানিকটা তফাতে। আবারো এগিয়ে মাটি থেকে তুলে আনতে যাবে আবারো সরে গেল। অবশেষে ওটাকে মাটি থেকে তুলে ফিরে তাকালো দৌড়ে পালাতে থাকা লোকটার দিকে।

যদিও মাটিতে পড়ে ব্যাথা পেয়েছে তবুও দ্রুতই লোকটার দিকে এগোনোর চেষ্টা করলো ম্যাকফি। লোকটাও মানুষের দৌড়াদৌড়িতে বেশি দ্রুত এগোতে পারছে না। তবে এখনো লোকটার থেকে বেশ পিছিয়েই আছে ম্যাকফি। একে তো ওর পরনে ইউনিফর্ম তার ওপরে আবার ভারি অস্ত্র বহন করছে ও, তার ওপরে এই এলাকা তার খুব একটা চেনা নেই। সামনে

পলায়মান লোকটা যেন উড়ে চলেছে। লোকটা এতোটাই মনোযোগের সাথে দৌড়াচ্ছে পেছনেও ফিরে দেখছে না একবারও। ম্যাকফি দৌড়াতে দৌড়াতেই পিস্তলটা গুলি করার জন্যে প্রস্তুত করে ফেললো। দৌড়রত অবস্থাতেই লোকটা পেছনে তাক করলো। লোকটার গায়ে গুলি করার ইচ্ছে নেই বরং একেবারে কান ঘেঁষে গুলি করতে পারলো ভয় পাবে সে। পিস্তল তাক করতে করতেই লোকটা একটা ছোট টিলার অন্যপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ম্যাকফিও পিছু নিয়ে টিলার ওপরে উঠে থেমে গেল। হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগলো। বাপরে বাপ, দৌড়াতে জানে বটে, মনে-মনে ভাবলো সে। কিন্তু ব্যাটা গেল কই। টিলাটার ওপর থেকে আশপাশ পুরোটা দৃশ্যমান কিন্তু একটু আগেও দৌড়ে টিলার ওপরে ওঠা লোকটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। টিলা থেকে বরারবর সামনে আর বাম দিকে খোলা প্রান্তর। সেখানে কারো টিকিও দেখা যাচ্ছে না। কাজেই বাকি রইলো ডান দিকে। ডান দিকে একটু জংলামতো জায়গা আর জংলাটুকুর পরেই টিনের চালা দেয়া লম্বা একটা ঘরের মতো দেখা যাচ্ছে। লোকটা নিশ্চই ওদিকেই গেছে।

ম্যাকফি একটু দম ফিরে পেতেই দ্রুত পায়ে ওদিকে এগোল। ছোট একটা বাঁশের ঝাড় আর বাঁশ ঝাড়ের পরেই শুরু হয়েছে টিনের চালা দেয়া লম্বা ঘর। বাঁশ ঝাড়টা পার হতেই স্কুল ঘরের মতো লম্বা ঘরের প্রান্তে চলে এল। আওয়াজ শুনে আগেই বুঝতে পেরেছিল তবে ঘরের ভেতরে চোখ পড়তেই একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল, জায়গাটা আসলে আস্তাবল। দৌড়ে পালিয়ে আসা লোকটা আশেপাশেই আছে। কারণ আশেপাশে এই জায়গাটা ছাড়া লুকানোর মতো আর কোন জায়গা চোখে পড়ছে না।

ম্যাকফি সাবধানে পিস্তল হাতে ভেতরে প্রবেশ করলো। নিশ্চয়ই বাজারের জন্যে নিয়ে আসা ঘোড়াগুলোকে মজুদের জন্যে এখানেই রাখা হয়ে থাকে। কারণ চালার ভেতরে বাঁশ দিয়ে ছোট ছোট খোপের মতো বানানো হয়েছে। এক-একটা খোপের ভেতরে ঘোড়াদের থাকার ব্যবস্থা। তবে এই মুহূর্তে ভেতরে তেমন একটা ঘোড়া নেই কারণ বেশিরভাগ ঘোড়া হাটে নিয়ে তোলা হয়েছে। তবে ম্যাকফি একটু অবাক হয়ে খেয়াল করলো আস্তাবলটার এক প্রান্তে কয়েকটা ঘোড়া রাখা। খানিকটা কৌতুহল নিয়েই সেদিকে এগিয়ে গেল ও।

বৃটিশ আর্মি সাধারণত ভারতের বিশেষ কয়েকটা এলাকার নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারির কাছ থেকে বিশেষ প্রজাতির ঘোড়া কিনে থাকে। এদের ভেতরে

বেশিরভাগ ঘোড়াই হয়ে থাকে মাদ্রাজের আর না হয় দক্ষিণ ভারতের। তাই দূর থেকেও খানিকটা অনুমান করা গেলেও কাছে এসে ও একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল এগুলো কোম্পানির সৈন্যদেরই ঘোড়া। কারণ এদের গায়ে ও পরিষ্কার কোম্পানির লোগো দেখতে পাচ্ছে। মালিক নিশ্চই কোম্পানির লোগো এখনো নষ্ট করার সময় পায়নি।

ও এতোই মনোযোগ দিয়ে ঘোড়া দেখছিল যে এখানে কেন আর কিভাবে এসেছে ভুলেই গেছিল তাই পেছন থেকে এগিয়ে আসা শব্দটাকে গ্রাহ্যের ভেতরে আনেনি। কিন্তু শব্দটা একেবারে কাছে চলে আসার পর যখন চমকে উঠে পেছন ফিরলো ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও দেখতে পেল অদ্ভুত পোশাক পরা লম্বা এক লোক কিছু একটা ছুঁড়ে মারলো ওর দিকে। আর সেটা সরাসরি এসে ওর গলাতে পেঁচিয়ে গেল। লোকটা ছুঁড়ে মারা জিনিসটা ধরে বিশেষ একটা কায়দায় টান মারতেই মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারালো ম্যাকফি।

অধ্যায় পনেরো

বর্তমান সময়,

বড়বাজার এলাকা, ময়মনসিংহ

“কিছুই বের করা গেল না এ-কেমন কথা?” রাগের চোটে বাশারের মনে হচ্ছে ও আবারো অজ্ঞান হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে আছে ময়মনসিংহ শহরের সবচেয়ে বড় পাবলিক লাইব্রেরির রিডিং রুমে। তার সামনে বসে আছে লাইব্রেরির অ্যাসিসটেন্ট এক ছেলে। মেঝেতে ছড়ানো বেশ কিছু পুরনো পত্রিকা। বাশার একটু রাগের সাথেই ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললো, “আরেকবার দেখতে সমস্যা কোথায়?”

ছেলেটা একটু অসহায় দৃষ্টিতেই ওর দিকে মুখ তুলে তাকালো। পুলিশের লোক কিছু বলতেও পারছে না, আবার কাজটাও করতে ইচ্ছে করছে না। “স্যার, দুইবার দেখলাম। যেইডা নাই তো নাই। আরেকবার দেখলে ক্যামনে পামু, কইন।”

বাশার আবারো ধমকের সুরে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো। নিজের অসহায়ত্বের দ্বায়ভার এই ছেলেটার ওপরে চাপানোর কোন মানে হয়না। নিজেকে সংযত করে বরং ছেলেটাকে ইশারা করলো আরেকবার পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। ও নিজেও জানে ফলাফল শূণ্য হবে।

আগের দিন থানার রেকর্ড রুমে ঢুকে নিদিষ্ট সময়ের কোন রেকর্ড না পেয়ে তাজ্জব হয় যায় ওরা। সাথে-সাথে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় ব্যাপারটা, কিন্তু কেউই সঠিকভাবে কলতে পারছে না কিভাবে থানার ভেতর থেকে রেকর্ড হারিয়ে গেছে। ওপর মহলে যোগাযোগ করে খুব একটা সুবিধে করতে না পেরে, আবদুল্লাহ আর রমিজকে নিয়ে সকাল থেকে কাজে নেমে যায় ও।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে বাশার কিছুদিন পত্রিকায় সাংবাদিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সেই সূত্রে ও জানে প্রায় প্রতিটা পত্রিকা অফিসেই পুরনো কাগজের রেকর্ড থাকে। প্রশ্ন হলো এতো পুরনো কাগজের রেকর্ড থাকবে কিনা। প্রথমেই ওরা যায় স্থানীয় একটা পত্রিকার অফিসে। সেখানে

গিয়ে এতো পুরনো রেকর্ড খুঁজে বার করতে পারেনি। এরপর আরেকটা পত্রিকার অফিসে গিয়ে সেখানেও খুব বেশি লাভ হয়নি। কারণ ওদের কাছে পুরনো পত্রিকার রেকর্ড থাকলেও রেকর্ড রুমে ঢুকে দেখা যায় সেখানে পুরনো পত্রিকা সব পোকায় কেটে শেষ করে ফেলেছে। পুরনো পত্রিকা কারো প্রয়োজন না হওয়াতে কয়েক বছরের ভেতরে পুরনো রেকর্ড রুম খোলাও হয়নি আর ব্যাপারটাও কেউ টের পায়নি। ওখান থেকেও ব্যর্থ মনোরসে বের হয়ে ওরা থানার দিকে যাচ্ছিলো এমন সময় বাশারের মনে হয় আরেকটা জায়গাতে পত্রিকা রাখা হয়ে থাকে।

সেটা হলো লাইব্রেরি।

লাইব্রেরিতে গেলে পুরনো পত্রিকা পাওয়া যেতে পারে। সেই হিসেবে ওরা জিপ ঘুরিয়ে চলে অসে বড় বাজারে অবস্থিত পাবলিক লাইব্রেরিতে। এখানে এসে আবদুল্লাহ আর রমিজকে জিপে অপেক্ষা করতে বলে ও চলে যায় ভেতরে। ভেতরে এসে পুরনো পত্রিকার রেকর্ড দেখতে চাইলে লাইব্রেরির এই অ্যাসিসটেন্ট ছেলেটাকে সাথে দিয়ে পুরনো রেকর্ড রুমে চলে আসে ওরা। সেখানে এসে নির্দিষ্ট বছরের পত্রিকা খুঁজে বের করে একে একে দেখতে শুরু করে। নির্দিষ্ট মাসের রেকর্ডের কাছে আসতেই বাশার আর সাথে আসা ছেলেটা অবাক হয়ে আবিষ্কার করে সব পত্রিকা থাকলেও বাঁধাই করা রেকর্ডের ভেতরে বাশার যে-সময়ের পত্রিকা খুঁজছে সেই সময়ের কোন কাগজ নেই।

ব্যাপারটা দেখে যতোটা না তাজ্জব হয় তার চেয়ে বেশি বোকা বনে যায় বাশার। এর মানে কি? এটা কিভাবে সম্ভব? ছেলেটাকে নিয়ে আবারো চেক করতে বসে ও। এবার নিজেও হাত লাগায় বাশার। অবাক হয়ে আবিষ্কার করে পুরো মাসের পত্রিকা আছে শুধুমাত্র যে-সময়টা সে খুঁজছে সেই সময়ের দু সপ্তাহের পত্রিকা গায়েব। সাথে-সাথে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায় ওর। থানার রেকর্ড খুঁজে না পেয়ে ওর মনের ভেতরে একবারের জন্যে খটকা লাগছিল। মনে হচ্ছিলো হয়তো ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট। হয়তো রেকর্ড রুম সরানোর সময়ে বা অন্য কোনভাবে রেকর্ডটা হারিয়ে গেছে কিন্তু এখন যা দেখলো তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ একজন ইচ্ছে করেই ওই সময়ের সমস্ত রেকর্ড সরিয়ে ফেলেছে। তার মানে ও যা ভাবছে ব্যাপারটা তাই।

ওরা পুকুরের পানির নিচে যে-গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে সেটা আসলে বড় কোন ঘটনার বিচ্ছিন্ন অংশ। মূল ঘটনা আসলে ভিন্ন কিছু। ওই সময়ে

নিশ্চই এমন কিছু ঘটেছিল। যেটা কেউ বা কারা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

“স্যার, নাইকা।”

“হুম?” নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়ে ও ভুলতে বসেছিল যে ছেলেটাকে আবারো পত্রিকাগুলো চেক করে দেখতে বলেছে। “নেই না?”

“হ, স্যার। আমি তো আপনেরে আগেই কইছিলাম,” বলে ছেলেটা গজ-গজ করতে করতে পত্রিকার বান্ডিল গুছিয়ে রাখতে শুরু করলো।

“সেইটাই,” বলে ও পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। ছেলেটা একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার তাকাচ্ছে বাড়িয়ে দেয়া নোটটার দিকে। নিবে কিনা বুঝতে পারছে না।

“কি হলো? নে।”

বাশার ধমক দিতেই ছেলেটা খপ করে নিয়ে নিলো সেটা। এখনো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। নোটটা হাতে নিয়েও দেখতে লাগলো। “স্যার, আপনে আসলেও পুলিশ তো?”

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ছেলেটার মন্তব্য শুনে হেসে ফেললো বাশার। একগাল হেসে নিজেকেই শুনিয়ে বললো, “পুরোপুরি আর হতে পারলাম কই?” লাইব্রেরির গেট দিয়ে বের হবার সময়ে মোবাইলটা বের করে আনলো পকেট থেকে।

এদিকে কোন অগ্রগতি তো হলো না, দেখা যাক টমি পোদ্দারের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যায় কিনা। মোবাইলে নম্বর বের করতে করতে নিচে নেমে এসেছে এমন সময় একজনের সাথে ধাক্কা লাগলো। আরেকটু হলেই ওর হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যাচ্ছিলো। একটু বিরক্ত হয়েই ফিরে তাকালো লোকটার দিকে।

রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগে লোকটাই কথা বলে উঠলো। “এই যে ভাই পুলিশ হইছেন দেখে কি...?”

নীল শার্ট পরা লোকটা কথা শেষ না করেই থেমে গেল। বাশারও একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ও কিছু বলার আগে লোকটাই বলে উঠলো, “আওে, বাশু না? তুই এতোদিন পরে?”

মুহূর্তের জন্যে বাশারের স্মৃতি ঝলসে উঠলো মনের ভেতরে। চকিতে মনে পড়ে গেল চেহারাটা। “জামিল, তুই!”

“বন্ধু, কতোদিন পর,” বলে ওকে জড়িয়ে ধরলো ছোটবেলার জামিলের সেই মোটা ভার্সন। “তুই মমিসিং আইছোস আমি শুনছি। আজব কান্ড, কারো সাথে যোগাযোগ না, কারো সাথে দেখা করলি না। শালা মস্তবড় অফিসার হয়া গেছ!”

নিজেকে জামিলের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হলো বাশার, “আরে না, ওরকম কিছু না। হঠাৎ এমনভাবে চলে এলাম আসলে কারো সাথেই যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। তুই এরকম মোটা হয়েছিস কিভাবে! আজব কান্ড।” বাশারের মনে পড়ে গেল ও আর জামিল একই এলাকায় থাকতো, ওরা একসাথে স্কুলে যেত। ও ছিল ভীষণ মোটা আর জামিল ছিল ভীষন শুকনো। এই নিয়ে ওদের দুজনকেই ছোটবেলা বহুত দুষ্টামির শিকার হতে হয়েছে।

“হা-হা, তুই ছিলি মোডা, আমি ছিলাম হুগনা। এহন তুই হুগায়া গেছস। আর আমি বাগুনের মতোন মোড়া অয়া গেছি। হা-হা। চল-চল এই বিল্ডিঙের তিনতালায় আমার ছোট-খাট একটা অফিস আছে, চল। রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা করি আমি।”

“আজ না বন্ধু, আজ খুব ঝামেলায় আছি। আরেকদিন আসবো। তোদের বাসায়ও যাবো। ডলি আপা কেমন আছে?” জামিলের বড় বোন ডলিআপা ওকে খুব আদর করতো।

“ডলিআপাতো কানাডা চলে গেছে পরিবারসহ। আসে, তিন-চার বছর পরে-পরে একবার আসে। চল অফিসে না গেলেও বাইরে চা খাই। তুই কি বিড়ি খাস?”

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো বাশার।

“শালা, কলেজে থাকতে নিজে তো বিড়ি খাইতাই না আমরা ধরাইলে তেজ দেখাইতা। এখন কেমন লাগে,” দুজনেই হেসে উঠলো ওরা। লাইব্রেরি

ভবনটার বাইরেই চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ালো দুজনে। একহাতে চা নিয়ে অন্যহাতে সিগারেট ধরিয়ে কথা বলতে লাগলো।

“অন্তু, উজ্জ্বল ওরা সবাই ভালো আছে?” বাশার পুরনো বন্ধুদের কথা জানতে চাইলো।

“হ্যা, সবাই ভালো আছে। তুই তো কারো খবরই রাখস নাই?” বলে চায়ে চুমুক দিলো জামিল, “আচ্ছা তোরে একটা কথা জিগাই। তোর হঠাৎ হইলো কি তুই সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ কইরা দিলি। আমার মনে আছে তুই যখন বিদেশ ছিলি তখনো আমগো সবাইরে নিয়মিত কল দিতি। এরপর তোর হইলো কি?”

বাশার কিছু না বলে সিগারেটে টান দিলো। কি বলবে, কথা হাতড়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় আবারো জামিলই প্রশ্ন করে উঠলো। “আচ্ছা রাজু নাকি মারা গেছে?”

বাশার মনে-মনে খাবি খেল। ও জানতো এই প্রসঙ্গটা আসবে। চায়ের কাপ থেকে মুখ উঠিয়ে জামিলের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়লো।

“আন্টি মারা যাবার সময়ে তুই নাকি ছিলি না, এরপর আবার রাজু মারা গেছে শুনলাম। আরো অনেক কথাই হুনছি। আসলে ব্যাপারটা কি, বল দেখি?” জামিলের চোখেমুখে কৌতুহল।

বাশার কিছু না বলে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। কী বলবে আসলে বুঝতে পারছে না। ও ভেবেছিল গত কয়েক বছরে যা-যা ঘটে গেছে সেগুলো খুব বেশি ছড়ায়নি কিন্তু জামিলের কথা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারলো সবাই সব জানে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা দোকানিকে ফিরিয়ে দিয়ে জামিলের কাঁধে একটা হাত রাখলো ও। “দোস্ত আসলে অনেক কিছুই ঘটে গেছে...” কথা শুরু করার সাথে-সাথেই চোখে পড়লো ব্যাপারটা।

একটা গাড়ি।

আর দশটা সাধারণ গাড়ি থেকে আলাদা করে লক্ষ্য করার কোন কারণই ছিলনা কিন্তু তারপরও ওর চোখে পড়লো গাড়িটা। কারণ আর কিছুই না গাড়ির ভেতরে বসে থাকা মানুষটা।

বাংলাদেশে সাধারণত সাদা চামড়ার লোকজন কমই দেখা যায়। আর একারণেই পথে-ঘাটে হাজারো মানুষের ভিড়ে দু-চারটা সাদা চামড়ার মানুষ দেখলে সহজেই চোখে পড়ে সেটা। এখানেও ব্যতিক্রম কিছু নয়। বাশার গাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল ভেতরে একজন বিদেশী বসে আছে। মানুষটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাশার ফিরে তাকানোর পরও লোকটা দৃষ্টি সরালো না। মধ্যবয়ষ্ক মানুষটার নীল চোখের দৃষ্টি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো ওর ওপরে, তারপর সাঁই সাঁই করে উঠে গেল জানালার কাঁচ, সেইসাথে পিছিয়ে যেতে শুরু করলো গাড়িটা।

জামিলের দিকে তাকিয়ে বাশার বলে উঠলো, “দোস্ত, অনেক কথা আছে। এখন বলতে পারবো না। আমি সব জানাবো তোদের। একটু সময় দে আমাকে,” বলে ও বিল দিতে চাইতেই হা-হা করে উঠলো জামিল। বাশার দৌড়ে চলে এল গাড়িটা যেখান থেকে পেছন দিকে গেছে সেখানে। ওটা এখন মূল রাস্তায় উঠে যাচ্ছে। গাড়িটা দেখার পর বুঝতে না পারলেও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। কারণ এই গাড়িটাই গত কয়েকদিন যাবৎ ওর পিছু নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে। সরাসরি কিছু না দেখলেও পথে আসতে যেতে থানার সামনে বার-বার একটা সাদা গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ও। সাদা রঙের গাড়ি পথে-ঘাটে প্রচুর আছে কিন্তু এর আগেও দিনও একটা সাদা গাড়িকে ও জিপের পেছনে আসতে দেখেছে যেটার সামনের একটা লাইট ভাঙা ছিল। এই গাড়িটারও একটা লাইট ভাঙা।

বাশার খানিকটা দৌড়ে এসে থেমে গেল। গাড়িটা গলি থেকে মূল রাস্তায় উঠে গেছে। ও কি করবে ভেবে ঠিক করার আগেই আবদুল্লাহ জিপ নিয়ে এসে ওর পাশে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো। “স্যার, স্যার আহেন।” এক লাফে উঠে বসলো ড্রাইভারের পাশের সিটে।

“ওই রাস্তায়,” ও কোনদিকে যেতে হবে দেখাতেই আবদুল্লাহ জিপ ছেড়ে দিলো। গলি থেকে মূল রাস্তা বেশি দূরে না। তবে ওদের কপাল খারাপ একটু এগোতেই গলির মুখে দুটো রিকশা একটা আরেকটাকে ক্রশ করতে গিয়ে দুই চাকায় লাগিয়ে বসলো। একটার স্পোকের সাথে আরেকটার কোনা লেগে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। ওটা ঠিক করে দুই রিকশা সরিয়ে মূল রাস্তায় উঠে দেখলো লাইট ভাঙা সাদা গাড়িটার কোন অস্তিত্বই নেই।

“ধূর,” বিরক্তির সাথে বলে উঠলো বাশার।

“স্যার কি কেউরে ধরবার চাইছিলাইন নাকি?’ রমিজ দারোগা জানতে চাইলো।

“আর সেটা বলে কি লাভ?” বাশার মনে মনে ভাবছে কে এই বিদেশী আর সে কি আসলেই ওদেরকে ফলো করছে নাকি পুরো ব্যাপারটাই ওর মনের ভুল। এখন আর বোঝার উপায় নেই।

আবদুল্লাহ জিপটাকে মূল রাস্তায় তুললেও এখন ওটাকে সাইড করে রেখেছে। “স্যার, কোনদিকে যাবো?”

“দাঁড়াও বুঝে নেই,” বাশার আসলে বুঝতে পারছে না ওর কি করা উচিত।

“লাইবেরির ভিত্রে কিছু পাইলেন, স্যার?” আবদুল্লাহ জানতে চাইলো।

“নাহ, সেখানেও পেলাম না,” বাশার আফসোসের সুরে বললো। ও মোবাইল বের করে টমির নম্বর খুঁজছে।

“মানে কি? এতো আগের পত্রিকা নাই?”

“সব পত্রিকা অছে, শুধু আমাদের যে-সময়ের দরকার সে-সময়েরটা নেই,” বলে ও রমিজ দারোগার দিকে ফিরে বললো। “থানায় যেমন কেউ রেকর্ড নষ্ট করেছে ঠিক তেমনি এখানেও একই কাজ করেছে কেউ একজন। ওই সময়ের রেকর্ড নষ্ট করেছে।

“সর্বনাশ! এইডা তো...”

“আচ্ছা ময়মনসিংহ শহরে আর কোথায় পুরনো পত্রিকা পাওয়া যেতে পারে?” ও রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

“স্যার, মুসলিম ইন্সটিটিউটে গেলে পাইতে পারেন। ওইহানে দেখছি এইরকম পত্রিকা-টত্রিকা রাহে।”

বাশার মোবাইলটা নামিয়ে নিলো। ভালো একটা জায়গার কথা বলেছে রমিজ দারোগা। মুসলিম ইন্সটিটিউটের কথা ওর আগেই মনে আসা উচিত ছিল। “গাড়ি ঘোরাও। নতুন বাজারের দিকে চলো।”

ও মনে মনে ঠিক করে ফেললো, টমিকে কল দিয়ে লাভ নেই, তারচেয়ে মুসলিম ইন্সটিটিউটে যেতে চাইলে নতুন বাজার হয়েই যেতে হবে। কাজেই

ওখানে একেবারে গেলেই হবে। “নতুন বাজারে ওইদিন গেছিলাম যে ওই অফিসে চলো।”

আবদুল্লাহ জিপ ঘুরিয়ে রওনা দিলো নতুন বাজারের দিকে। আর বাশার ডুবে গেল নিজ ভাবনায়। পরিস্থিতি শুধু জটিল থেকে জটিলতরই হয়ে চলেছে। মুসলিম ইন্সটিটিউটে গিয়েও কিছু না পায় তবে ঢাকাতে যোগাযোগ করবে ও। পুরনো সাংবাদিক বন্ধুদের কাউকে ধরতে হবে ওই সময়ে কি ঘটেছিল সেটা জানার জন্যে। কেউ না কেউ তো জানবেই আসলে কী ঘটেছিল সেই সময়ে। তবে তার আগে কল দিতে হবে টমি পোদ্দারকে। ইতিমধ্যে সে নিশ্চই কিছু না কিছু বের করেছে।

কিন্তু কল করে তাকে পাওয়া গেল না। মোবাইল বন্ধ। বাশারও আর ডায়াল করলো না। কারণ ওরা নতুন বাজারের কাছাকাছি চলে এসেছে।

ল্যাবের কাছাকাছি এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো জিপ। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে রিসিপশনে বসিয়ে ল্যাবে প্রবেশ করলো বাশার।

সেই একই সিকিউরিটি, একই রকম নতুন রঙ আর অ্যান্টিস্যাপ্টিকের গন্ধ পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে কাউকে দেখতে পেল না ও। আগের দিনের মতোই পুরো টেবিলের ওপরে জিনিসপত্র ছড়ানো। একপাশে গ্যারাজের মতো জায়গায় রাখা গাড়িটা। ওটাকে আরো খুলে খুলে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। অন্যপাশে কম্পিউটার খুলে রাখা কিন্তু টমির ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। বাশার কম্পিউটার টেবিলটার সামনে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। পকেট থেকে বের করলো ডায়েরিটা। এর আগের দিন ল্যাবে এসে কি কি দেখেছে সেগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলানোর জন্যে নির্দিষ্ট পাতায় আসার আগেই পেছন থেকে অকৃত্রিম গলা ভেসে এল টমির। “আরে ভাই, কি অবস্থা? গতকাল থেকে আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না!” ঠিক অভিযোগ নয় অনেকটা অনুযোগের সুরে বলে উঠলো সে।

তাজ্জব হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো বাশার। হাতের ডায়েরিটাও বন্ধ করতে ভুলে গেছে। “আশ্চর্য কান্ড! আমি আপনাকে কল করে পেলাম না আর আপনি আমাকে দোষারোপ করছেন। একটা কল দিলেই তো পারতেন। গতদিনই তো আপনাকে আমার নম্বর দিয়েছিলাম।”

“ওহ হো, আপনাকে কল দিলেই তো হোত,” বলে সে একটু মাথা চুলকালো। “এটা মাথায়ই আসেনি।”

আবারো বোকার মতো তাকিয়ে রইলো তার দিকে বাশার। লোকটা কি ওর সাথে মজা করছে নাকি বুঝতে পারলো না।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো টমি।

“তা বলেন কাজের অগ্রগতি কি? নতুন কিছু পেলেন?”

“কাজের অগ্রগতি তো অবশ্যই হয়েছে। বরং বেশ ভালো অগ্রগতিই হয়েছে বলা চলে। একটা একটা করে বলছি,” বলে সে টেবিলের ওপরে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলো। “কি কি ব্যাপারে আপনার সাথে আলোচনা করবো সেটা কোথায় জানি লিখে রেখেছিলাম,” সে কাগজপত্র এদিক-সেদিক করছে কিন্তু নির্দিষ্ট কাগজটা পাচ্ছে না। “কি যন্ত্রণা! গেল কোথায়। আমার তো আবার কিছুই মনে নেই,” বলে সে কাগজ ঘাঁটা বাদ দিয়ে আবারো মাথা চুলকাতে লাগলো। “আরে! ওগুলো তো লিখেছিলাম ট্যাবে, কাগজ পাবো কোথা থেকে!” বলে সে বাশারের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে ডেস্কটপের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ট্যাব বের করে আনলো। “হুম, এইযে। প্রথমত, মনিকা ম্যাডাম গলায় ফাঁস দিয়ে ভিক্টিমের মৃত্যুর ব্যাপারটা কনফার্ম করেছেন।”

ডক্টর মনিকার চেহারাটা মনে পড়তেই বাশারের মস্তিষ্কে অ্যাড্রেনালেনের প্রবাহ একটু বেড়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার লাস্যময়ী হাসি। জোর করে মন থেকে সেটা দূর করে ও জানতে চাইলো, “সেটা তো উনি সেদিনই বলেছিলেন।”

“সেদিনের ব্যাপারটা অনুমান ছিল। এখন অফিসিয়াল প্রমাণ পাওয়া গেছে,” বলে সে ড্রয়ার থেকে কাগজটা বের করে বাড়িয়ে দিলো বাশারের দিকে। বাশার ওটা হাতে নিয়ে দেখলো ওটাতে জায়গামতো পরিষ্কার লেখা আছে ব্যাপারটা। রিপোর্টটা নামিয়ে আবারো চোখ তুলে তাকালো টমির দিকে।

“দ্বিতীয়ত, ঢাকায় আরেকটা জিনিস পাঠিয়েছি আমি খবর নেয়ার জন্যে। যদিও এটার পেছনেও মূল কৃতিত্ব ডক্টর মনিকার। এদিকে দেখুন,” বলে সে মনিটরটা বাশারের দিকে ঘুরিয়ে দিলো। “এটাকে আসলে কি নামে ডাকা হয় আমি জানি না তবে আমরা এটাকে বলি ‘ফেস রিকভারি’। এই বিশেষ সফটওয়্যারটা দিয়ে যেকোন ধরণের মানুষের চেহারা আবিষ্কার করা হয়ে থাকে।”

“চেহারা আবিষ্কার করা হয়ে থাকে মানে কি?” বাশার একটু অবাক যেমন হয়েছে তেমনি আগ্রহও বোধ করছে। “চেহারা কি আবিষ্কার করার জিনিস নাকি?”

“কখনো-কখনো চেহারাও আবিষ্কার করার জিনিস,” বলে বাশারের দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যময় হেসে টমি পোদ্দার কি-বোর্ড আর মাউজ নিয়ে নড়াচড়া শুরু করে দিলো। “এই দেখুন,” বলে সে মনিটরের দিকে ইশারা করলো। “এটা হলো যে-মানুষটার কঙ্কাল, যেটা আমরা পেয়েছি পনির নিচে গাড়ির ভেতরে। আর এটা হলো তার খুলির হলোগ্রাফিক চিত্র। এটাকে ইনপুট দিয়ে তার শারিরীক গঠন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য এন্ট্রি দেয়ার পর এই সফটওয়্যার মোটামুটি আনুমানিক একটা চেহারা দাঁড় করিয়ে দিতে পারে।”

“তাই নাকি? দেখিতো এই লোকের চেহারা কেমন ছিল,” এতোক্ষণে বাশার পুরোপুরি আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে।

“ডিটেইলিং আসলে ডক্টর মণিকার করা। আর উনি যেহেতু এই লাইনেরই অভিজ্ঞ মানুষ কাজেই বলা চলে যে-চেহারাটা পাওয়া গেছে সেটা আসলের প্রায় কাছাকাছিই হবে,” বলে সে মাউজে ক্লিক করে একটা ইমেজ ফাইল ওপেন করলো। “সব প্রস্তুত করে ইনপুট দেয়ার প্রায় তিন ঘন্টা পর সফটওয়্যার এই চেহারাটা উপহার দিয়েছে আমাদেরকে,” বলে সে মনিটরটাকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিলো বাশারের দিকে।

বাশার তাজ্জব হয়ে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো বাকশক্তি হারিয়েছে। একটু স্থির হয়ে সে ছবিটার দিকে তাকিয়েই কথা বলে উঠলো, “চোখ দুটো ঠিক হয়নি,” বলে সে ফিরে তাকালো টমির দিকে। আপনারা সম্ভবত ইউরোপিয়ান মনে করে নীল চোখ বসিয়েছেন। কিন্তু মানুষটার চোখ আসলে নীল না। পিঙ্গল রঙের।”

এবার টমির তাজ্জব হবার পালা। “আপনি জানলেন কিভাবে? এই লোককে চিনতে পেরেছেন নাকি?”

“চিনতে পারিনি আবার পেরেছিও। তার পরিচয় না জানলেও আজ সকালেই এই লোকের সাথে দেখা হয়েছে আমার পাবলিক লাইব্রেরির সামনে। একটা সাদা রঙের গাড়িতে করে আমাকে অনুসরণ করছিল সে,” টমি পোদ্দারের হা হয়ে থাকা মুখের সামনে দাঁত বের করে একটা তিক্ত হাসি দিলো বাশার।

অধ্যায় ষোল

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

খাগডহর বাজার, ময়মনসিংহ

ঘটনাচক্রে যে-ব্যাপারটা বুঝতে ম্যাকফির বেশ সময় লেগেছিল সেই ব্যাপারটা জোনাথন আর ডুম্বুর আরো আগেই অনুধাবন করতে পেরেছে। তবে ওদের দ্রুত অনুধাবন করতে পারার পেছনে একটা কারণ আছে।

ওরা বাজার পরিদর্শনের শুরুতেই তিন দলে যখন তিনদিকে রওনা দেয় তখন জোনাথনরা রওনা দিয়েছিল বাজারের বাম দিক, মানে উত্তর-পূর্ব দিকে। রওনা দেয়ার সময়ে সঙ্গি হিসেবে ডুম্বুরকে পেয়ে জোনাথন প্রথমে বেশ বিরক্ত হয়েছিল। কারণ এই লোকটাকে শুরু থেকেই ওর বেশি সুবিধে মনে হচ্ছে না। কেমন জানি ঝিমায় আর মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব শব্দ করে ওঠে।

ওরা দুজনে মিলে উত্তর-পূর্ব দিকে রওনা হওয়ার একটু পরেই একেবারে ভিন্ন একটা কাজ করলো জোনাথন যেটা সে কখনোই করে না। নিজের বিরাট আকারের বন্দুকটা ধরিয়ে দিলো লম্বুর হাতে। সাধারণত নিজের বন্দুক সবসময় সে নিজের কাছে রাখে কিন্তু অতিরিক্ত গরমে আর ধুলোয় চূড়ান্ত বিরক্ত জোনাথনের বন্দুকটা ভারি মনে হচ্ছিল। বন্দুকটা ধরিয়ে দিয়ে শরীরটা টান-টান করে দিলো ও।

“এই ব্যাটা কোনদিকে যাবো আমরা বল,” প্রশ্নটা ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলো সে। ডুম্বুর লোকটা ওর প্রশ্নের জবাব দিলো না। জবাব অবশ্য জোনাথন আশাও করেনি। কিছু একটা বলা দরকার তাই বলেছে। ডুম্বুর এক হাতে বন্দুকটা ধরে রেখে অন্য হাতটাতে একটা ছোট কাঠি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিচ্ছে। জোনাথন মনে-মনে বিরক্ত বোধ করতে লাগলো। এই ব্যাটা কি কখনোই ওপরের দিকে দেখে না নাকি। সারাক্ষণ তার দৃষ্টি নিচের দিকেই, মনে হয় মাটির দিকে দেখতে দেখতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে।

“এই ব্যাটা, চল। আমাদেরকে পুরো বাজার দেখতে হবে। এখানে বসে থাকলে হবে না। যেতে হবে এখন,” বলে সে ডুম্বুরের দিকে তাকিয়ে ইশারা

করলো। তবে তার ইশারা শোনার বা দেখার মতো মুডে থাকলে তো সে। এক হাতে জোনাথনের বন্দুক শক্ত করে ধরে সে মাটিতে খোঁচা দিতে দিতে একমনে এগিয়ে চলেছে অন্যদিকে। জোনাথন দেখলো ডুম্বুর বাজারে প্রবেশের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

“এ তো দেখি একবারে উল্টো দিকে চলেছে। কি যন্ত্রণা!” সে ডুম্বুরের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো বাজারের উত্তর পূর্ব দিকে। যেদিকটা ওদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে। ডুম্বুরকে পাশে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো জোনাথন। যদিও বন্দুকটা ডুম্বুরের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তবুও পিস্তলটা প্রস্তুত রেখেছে। কারণ বিপজ্জনক পেশায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলে বিপদ কখন কোনদিক থেকে আসবে কেউই বলতে পারে না। ওরা বাজারের যে-অংশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে সেখানে মূলত সবচেয়ে ভালো আরা দামি ঘোড়া-যেগুলো দেশেই বাইরে থেকে আনা হয়েছে-সেগুলোই বিক্রি করা হচ্ছে।

বাঁশ পুঁতে সারি তৈরী করা হয়েছে। খদ্দেরেরা আসছে আর তাদের পছন্দমতো ঘোড়াগুলো দরদাম করছে। জোনাথন হাঁটতে-হাঁটতে ঘোড়া বিক্রির জায়গাটা পার হয়ে এলো।

চলতে-চলতে ভীষণ বিরক্ত বোধ করছে জোনাথন। এই সারি-সারি ঘোড়া দেখতে-দেখতে ক্লান্ত লাগছে ওর চোখ। আর এইসব প্রাণী নিয়ে ওর কোন আগ্রহও নেই। ওর একমাত্র আগ্রহ অস্ত্র নিয়ে তাও দূর পাল্লার অস্ত্র নিয়ে। কাজেই এই ঘোড়ার বাজারে ওর বিরক্ত লাগাই স্বাভাবিক।

“কি রে কিছুই তো পেলাম না। বাজার তো প্রায় শেষ হতে চললো,” ডুম্বুরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো জোনাথন। ওর দিকে তাকিয়ে বার-বার পেছনে দেখাতে লাগলো ও আর স্থানীয় ভাষায় কিচির-মিচির করে কিছু একটা বলে বোঝানোর চেষ্টা করছে সে। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো জোনাথন। “কোন লাভ নেই, যাই বলিস না কেন পুরো বাজারে চক্কর না দিয়ে আমরা যেতে পারবো না। বসের নির্দেশ মানতেই হবে। ”

কি বুঝলো কে জানে ওর কথা শুনে চুপ মেরে গেল ডুম্বুর। ওর পেছন পেছন হাটতে লাগলো বন্দুকটা হাতে নিয়ে। ঘোড়া বিক্রির অংশটা পার হয়ে ওরা চলে এল বাজারের প্রায় শেষ প্রান্তে। এখানে ঘোড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র বিক্রি করা হয়। মোটা-চিকন নানা ধরণের দড়ি, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার নাল, কাঠের তৈরী, চামড়ার তৈরী বিভিন্ন

ধরনের জিন, নানা ধরণের মুখাবরণ থেকে শুরু করে ঘোড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হেনতম কোন জিনিস নেই যা নেই এখানে। এই অংশটাও পেরিয়ে ওরা বাজারের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এল।

বাজারের এই অংশে এসে এতোক্ষণ ধরে ঘোড়া আর ঘোড়া দেখতে দেখতে ত্যাক্ত-বিরক্ত জোনাথন এবার একটু ভালো বোধ করলো। কারণ বাজারের এই অংশে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র বিক্রি হচ্ছে। যদিও কোন ধরণের আগ্নেয় অস্ত্র নয় বরং নানা-ধরণের স্থানীয় অস্ত্র। জোনাথনের আগ্রহ মূলত আগ্নেয় অস্ত্রের প্রতি হলেও অন্যান্য অস্ত্রও ওর ভালো লাগে। তবে ওর আফসোস হচ্ছে মহাবীর সিংয়ের জন্যে। মহাবীর সিং হলো ছুরি-চাকুর ওস্তাদ।

ঘুরতে ঘুরতে ও মহাবীর সিংয়ের জন্যে একটা স্থানীয় ছুরি কিনলো। জোনাথন দাম চুকিয়ে ছুরিটা নিয়ে কোমরে গুঁজলো।

ওখান থেকে সামনের দিকে এগোচ্ছিল হঠাৎ ছুরি বিক্রেতার একটা কথা ওর কানে বাজতে লাগলো। বাজারে জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করতে হলে বাজারের কোষাগারে টাকা জমা দিতে হয়। তারমানে যে-কোন ব্যবসায়ি পণ্য নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই তাকে বাজারের দায়িত্বে যারা আছে তাদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে তারপর বাজারে প্রবেশ করতে হয়। তারমানে যারা ঘোড়া ব্যবসায়ি তাদেরকেও এই একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। আর যেহেতু তাদেরকেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তারমানে বাজারের লোকজনের কাছে সকল ঘোড়া ব্যবসায়ি আর সব ঘোড়ার তালিকা আছে। সেটা করতে পারলে খুব সহজেই জানা যাবে কে কোথাকার ঘোড়া কোথা থেকে এনেছে।

কথাটা মনে হতেই সে থেমে গেল। কিছুটা ইংরেজি আর কিছুটা স্থানীয় ভাষা মিলিয়ে সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো ডুম্বুরকে। ডুম্বুর কি বুঝলো কে জানে তবে সে মাথা নেড়ে সাথে-সাথে জোনাথনের একটা হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে লাগলো কোন একদিকে। জোনাথনও পিছু-পিছু যেতে লাগলো ডুম্বুরের। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগলো এই পাগলটা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে, এর পিছু পিছু যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা সেটাও বুঝতে পারছে না তবে ওর আসলে কিছু করার নেই। কারণ এখানে না সে কাউকে চিনে, না ঠিকমতো সে কারো ভাষা জানে। কোমরে রাখা বাঁশিটাতে একবার হাত বুলালো সে। একবার ভাবলো ওটাকে ফুঁ দিবে কিনা তবে কী মনে করে থেমে গেল। দেখা যাক এই পাগলটা ওকে জায়গামতো নিয়ে যেতে পারে কিনা। একটু পরেই এক জায়গায় এসে থেমে গেল সে।

জোনাথন প্রথমে বুঝতে পারলো না এখানে এসে থেমে গেলে কেন, তারপর ওর দিকে তাকিয়ে একদিকে ইশারা করতেই জোনাথন দেখতে পেল বাজারের এক ধারে কয়েকজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। মনে-মনে ও খুশি হয়ে উঠলো ডুম্বুরের ওপরে। নাহ লোকটাকে যতোটা পাগল ভেবেছিল আসলে ততোটা পাগল নয়।

প্রহরীদের কাছে গিয়ে যা জানতে চাইছে সেটা বলার চেষ্টা করলো জোনাথন। ওর কথা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও একজন প্রহরী ওকে সাথে নিয়ে চলে এল বাজারের মূল কাচারি ঘরের কাছে । সেখানে বসে থাকা এক হিসেব রক্ষক জানালো ওরা যদি বাজারের ব্যবসায়ি আর ঘোড়ার তালিকা পেতে চায় তবে ওদেরকে আস্তাবলের মূল সহিসের সাথে দেখা করতে হবে। একমাত্র তার কাছেই পরিপূর্ণ তালিকা আছে।

আস্তাবলটা কোনদিকে আছে সেটা প্রহরিদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ডুম্বুরকে নিয়ে সেদিকে রওনা দিলো ও। বাজারের মূল ফটক আর কোষাগারের মূল ভবনের কাছ থেকে অনেকটা সরে এসে ছোট টিলার মতো একটা জায়গার ওপরে এসে উঠলো দুজনে। এখান থেকে জঙ্গলের কিনারায় ঢালের কাছটায় লম্বা সারি দিয়ে বানানো টিনের আস্তাবলটা দেখা যাচ্ছে।

ওরা দুজনেই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো। ঢালটার ঠিক কিনারায় অনেকটা জায়গা সমান করা হয়েছে। সম্ভবত এদিক দিয়েই ঘোড়াগুলোকে ঢোকানো হয় আস্তাবলে, আর অন্যদিক দিয়ে বের করে নেয়া হয় বাজারে। এমন একটা জায়গায় আস্তাবলটা বানানোর পেছনে আরেকটা কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারলো জোনাথন। এখানে একটামাত্র পথ দিয়ে ঘোড়াগুলোকে প্রবেশ আর বের করে নিতে হবে। এতে করে প্রহরীদের হিসেব রাখতে সুবিধে হবে। মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলো জোনাথন। যাক এখানে কিছু একটা পাওয়া গেলে যেতেও পারে।

ওরা আস্তাবলের একেবারে সামনে চলে এল। দুজন প্রহরি ঘাসের ওপরে কাপড় পেতে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জোনাথন কিছুক্ষণ তাদেরকে ডাকলো কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। ও অনুমান করলো ব্যাটারা সম্ভবত নেশা করছে।

জোনাথন প্রহরিদেরকে জাগাতে না পেরে ডুম্বুরের দিকে ফিরে তাকালো। সে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে কি জানি দেখছে একমনে আর হাতের কাঠিটা

দিয়ে নেড়ে-চেড়ে মাপ-জোখ করছে।

আবার শুরু হয়েছে এই ব্যাটার তাথ-ঝাখ, মনে মনে বললো জোনাথন। তীব্র বিরক্তি নিয়ে সে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই ডুম্বুর ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ওপরে দুই আঙ্গুল রেখে চুপ থাকতে বললো। জোনাথন ডুম্বুরকে ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল। কেন জানি ওর মনে হচ্ছে লোকটা কিছু একটা পেয়েছে। সে কয়েকবার মাপ-জোখ করে হঠাৎ জোনাথনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "ম্যাকফি," বলে সে চারপাশে ইশারা করলো তারপর যা বললো সেটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও জোনাথন এটা বুঝতে পারলো লোকটা বলতে চাইছে ক্যাপ্টেন এখানে এসেছিল আর সে কোন একটা ঝামেলায় পড়েছে ও কিছু একটা বলার আগেই ডুম্বুর আবারো ওকে চুপ থাকতে বলে আবারো মাটিতে দেখতে লাগলো। লোকটার ভাব-ভঙ্গি দেখে খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না জোনাথনের। ডুম্বুর মাটিতে দেখার সময়ে ওর বন্দুকটা টিনের চালার সাথে ঠেস দিয়ে রেখেছিল। ওটা হাতে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াতেই সাথে-সাথে চমকে উঠলো দুজনেই।

বাঁশির শব্দ। ওরা বিপদে পড়লে একে অপরকে ডাকার জন্যে আজ সকালে যে-বাঁশি দেয়া হয়েছে সেই বাঁশির শব্দ ভেসে এল। শব্দটা এতোই হালকা আর হঠাৎ হয়েছে যে মুহূর্তের জন্যে জোনাথনের মনে হলো শব্দটা কি সে সত্যিই শুনেছে নাকি শ্রæতিবিভ্রম। বন্দুকটা হাতে নিয়ে ও ডুম্বুরের দিকে তাকালো। সেও মাটি থেকে মাথা তুলে কান পতে আছে। তারমানে শব্দ সত্যি হয়েছে। দু'জনে দু'জনার দিকে ফিরে তাকালো। দু'জনেই খানিকটা দ্বিধান্বিত আর ঠিক তখুনি আবারো শুনতে পেল শব্দটা। আর এবার একেবারে পরিষ্কার শোনা গেল। অনেকটা পাখির ডাকের মতো তবে তী² আর কর্কশ।

এবার দু'জনেই চমকে উঠে ফিরে তাকালো আস্তাবলের দিকে। শব্দটা ওটার ভেতর থেকেই এসেছে। বন্দুক হাতে জোনাথন দৌড়ে ঢুকতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই এক লাফে এসে ওকে চেপে ধরলো ডুম্বুর। হাতের ইশারায় পাঁচটা আঙ্গুল দেখালো ওকে। মানে কি, কী বোঝাতে চাইছে লোকটা। ভেতরে পাঁচজন মানুষ আছে। কিন্তু থাকলেই কি, নিশ্চই ওদের কেউ বিপদে পড়েছে ভেতরে, তা-না হলে বাঁশি বাজানোর কথা নয়।

"আমাদেরকে ভেতরে যেতে হবে," জোনাথন নিজেকে ডুম্বুরের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে উদ্যত হতেই ডুম্বুর ইশারা করলো ওর

পেছনে থাকতে। জোনাথন একবার ওর দিকে ইশারা করে পেছনে এসে বন্দুক বাগিয়ে ধরতেই ডুম্বুর এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ওর ঠিক পেছনেই বন্দুক হাতে রওনা দিলো জোনাথন।

আস্তাবলটা এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত লম্বা । এর ভেতরে বাঁশ দিয়ে ছোট ছোট খোপ। এই খোপগুলোর ভেতরেই রাখা হয় ঘোড়া। পুরো জায়গাটা একেবারেই খালি বলা চলে। বাজারের সময় হওয়াতে প্রায় সব ঘোড়াই বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওরা ভেতরে ঢুকে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে আসতেই খুব সহজেই আস্তাবলের শেষ প্রান্তে দৃষ্টি চলে গেল।

সেখানে মাটিতে পড়ে আছে একজন আর তার চারপাশে ভিড় করে আছে আরো তিনজন মানুষ। দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের একজন মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটাকে লাথি মারলো। আর অন্য একজন ওখান থেকে সরে গিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে এগোতেই ওরা পরিষ্কার দেখতে পেল মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটা আর কেউ নয়, ক্যাপ্টেন ম্যাকফি।

জোনাথন খুব দ্রুত পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিলো। এইবার অন্তত ডুম্বুরের অনুমান ভুল হয়েছে। ভেতরে ঢোকার আগে ও ইশারায় বলেছিল ভেতরে মানুষ আছে পাঁচজন কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনজনকে। দুজন দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেনের সামনেই, আর অন্যজন সরে গিয়ে একটা দড়ির টুকরো নিয়ে আসছে, মনে হয় ক্যাপ্টেনকে বেঁধে ফেলতে চাইছে। ওরা দুজন আর প্রতিপক্ষ তিনজন। ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে আর ওদের কাছে সাধারণ অস্ত্র ছাড়া আর কিছু আছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

জোনাথন বন্দুকটাকে ঠিক করে নিয়ে কোমর থেকে পিস্তলটা নিয়ে বাড়িয়ে দিলো ডুম্বুরের দিকে। ও ভেবেছিল ডুম্বুর লোকটা হয়তো নিতে চাইবে না অথবা নিলেও দ্বিধা করবে। কিভাবে ধরতে হবে কিভাবে চালাতে হবে সেটা দেখিয়ে দিতে হবে কিন্তু সেরকম কিছুই করতে হলো না। অস্ত্রটা হাতে ধরিয়ে দিতেই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সে ওটা পরীক্ষা করে তাক ঠিক করে নিলো। জোনাথন ডুম্বুরের দিকে ইশারায় তিন আঙ্গুল দেখিয়ে তারপর নিজেদেরকে দেখালো। বুঝিয়ে দিলো কী করতে হবে। ডুম্বুর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে অস্ত্রটা ধরলেও সে কোথায় যেন একটু দ্বিধা করছে ব'লে মনে হলো জোনাথনের কাছে। অতোকিছু দেখার সময় নেই।

এবার ডুম্বুরকে পেছন-পেছন আসতে বলে অস্ত্র সামলে সাবধানে ঘোড়াদের জন্যে রাখা একটা খড়ের স্তুপের আড়ালে এসে দাঁড়ালো ওরা

দুজনে সামনে বন্দুক হাতে জোনাথন, ওর ঠিক পেছনেই পিস্তল হাতে ডুম্বুর। বন্দুক বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো জোনাথন, “হল্ট।”

সাথে সাথে লোকগুলো যে-যার জায়গায় জমে গেল। দু’জন দাঁড়িয়ে ছিল মাটিতে পড়ে থাকা ক্যাপ্টেনের একেবারে শিয়রে, অন্যজন দড়ি হাতে এগোচ্ছিল ক্যাপ্টেনের দিকে। তিনজনই মুর্তির মতো জমে গেল। জোনাথন আরো দুইপা এগিয়ে গেল। এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সবাইকে। লোক বললে ভুল হবে, একজন বেশ জবরজং পোশাক পরা-বয়স্ক মানুষ। আর অন্য দুজন একেবারেই অল্প বয়স্ক বালক। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে বয়স্ক লোকটা হঠাৎ অদ্ভুত এক ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো। তাকে ধমক দিয়ে চুপ থাকতে বলবে কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল অন্য ঘটনা।

জোনাথন বন্দুক বাগিয়ে ধরে ওদের প্রায় কাছাকাছি পৌছে গেছে এমন সময় কেউ একজন তীব্র আর্তনাদ করে উঠার সাথে সাথে ওরা দুজনেই চমকে উঠলো। কে আর্তনাদ করেছে সেটা বোঝার আগেই ওদের দুপাশের বাঁশের ছোট খোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দড়ির ফাঁস। জোনাথন প্রথমেই দেখলো একটা দড়ির ফাঁস এসে টান দিয়ে ওর হাত থেকে ছুটিয়ে নিলো বন্দুকটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজেকে ও আবিষ্কার করলো মাটিতে। পায়ে জড়িয়ে আছে আরেকটা দড়ির ফাঁস। পাশে তাকিয়ে দেখলো ডুম্বুরেরও একই অবস্থা। ওরা মাটিতে পড়ে যেতেই খোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আগের লোকগুলোর মতো একইরকম পোশাক পরা আরো দুজন মানুষ।

আস্তাবলে প্রবেশের আগে ডুম্বুর হাতের ইশারায় দেখিয়েছিল ভেতরে পাঁচজন মানুষ আছে। তার অনুমান যে একেবারে ঠিক ছিল এখন সে-ব্যাপারে জোনাথনের আর কোনই সন্দেহ নেই। তিনজন ক্যাপ্টেনকে বন্দি করেছিল আর বাকি দুজন আড়াল থেকে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছিলো। বন্দি হবার আগে এটাই ছিল জোনাথনের শেষ ভাবনা।

অধ্যায় সতেরো

বর্তমান সময়

নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

আরো আধাঘন্টা পরে বাশার বেরিয়ে এল টমির ল্যাব থেকে। হাতে একটা খাকি রঙের খামের ভেতরে সিজিআইয়ের মাধ্যমে উদ্ধার করা সেই ছবি। ইতিমধ্যে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। জিপের কাছে এসে ও দেখতে পেল আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা দুজনেই ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ বাশারের মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি চাপলো। জিপের কাছে এসে সিটের ওপরে খামটা রেখে হাত বাড়িয়ে জিপের হর্ণ চেপে ধরতেই দু'জনেই লাফিয়ে উঠে বসলো। জোরে-জোরে হেসে উঠলো বাশার।

দুজনে একটু স্বাভাবিক হতেই হাসি থামিয়ে কপট ভঙ্গিতে ধমকে উঠলো বাশার, "ডিউটির সময়ে ঘুম কিসের?"

"স্যার, খিদায় তো জান শেষ, কিছু খাইতাম না?" পেছন থেকে রমিজ দারোগা জানতে চাইলো।

এই লোক কি খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কিছুই বোঝে না। ও কিছু বলার আগেই আবদল্লাহ জানতে চাইলো, "স্যার, এইহানে কিছু পেলেন?" ছেলেটার অর্ধ-শুদ্ধ আর অর্ধ- স্থানীয় ভাষা শুনে হাসি পেলেও চেপে গেল বাশার। একটু আগে একবার হেসেছে এখন আবার হাসাটা ঠিক হবে না। আর তাছাড়া এভাবে হেসে উঠলে ছেলেটা মনে-মনে কষ্ট পেতে পারে।

"কাজ হয়েছে, আবার হয় নি। ঘটনা যা ছিল সেটা আরো প্যাঁচ লেগেছে। ওই সময়ে কী ঘটেছিল তা বের করতে পারিনি। তবে সেই লোকটার চেহারা বের করা গেছে যার কঙ্কাল আমরা পানির নিচ থেকে উদ্ধার করেছি।"

"তাই নাকি? তাইলে তো মানুষটার পরিচয়ই বের করন যাইবে," আবদুল্লাহ উত্তেজনার সাথে বলে উঠলো।

“হ্যা, সেটার জন্যে এই ছবি ঢাকা পাঠানো হয়েছে,” বাশার সিটে বসে চোখ মুদলো। পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে। যে-লোকটার কঙ্কাল ওরা পানির নিচ থেকে উদ্ধার করে এনেছে তাকে আজ সকালে কিভাবে দেখতে পেল কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না ওর। এই ব্যাপারটা এখুনি আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে জানাবে না সিদ্ধান্ত নিলো। তাহলে ওরা আরো ভয় পেয়ে যতে পারে।

“স্যার, কুনদিকে যামু?”

আবদুল্লার প্রশ্ন শুনে চোখ খুললো বাশার। “হুম, চলো আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক। গাঙ্গিনাপাড়ের দিকে চলো।”

আবদুল্লাহ জিপ ছেড়ে দিতেই আবারো ভাবতে লাগলো ও। ছবিটা প্রথম দেখার পর অবিশ্বাসের একটা ঢেউ খেলে যায় ওর মনের ভেতরে। টমিকে সেটা বলতেই সে হই-চই শুরু করে দেয় সে। তার মতে বাশার যা বলছে সেটা হতেই পারে না। কারণ ফেস রিকভারির মাধ্যমে উদ্ধার করা চেহারা অবশ্যই ঠিক হয়। পুরোপুরি না হলেও বেশিরভাগই ঠিক হয়ে থাকে, নিশ্চই বাশার ভুল দেখেছে।

টমির কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে বাশারের মনের ভেতরে দ্বিধা তৈরী হয়। সে ভালোভাবে মনে করার চেষ্টা করে সকালবেলা গাড়ির ভেতরে বসে থাকা মানুষটার চেহারা। মনের দ্বিধা দূর হয়ে যায় ওর। জোরদার কণ্ঠে ঘোষণা করে এই চেহারার প্রায় কাছাকাছি চেহারার একজন মানুষকেই ও সকালবেলা লাইব্রেরির সামনে দেখেছে। এবার টমির দ্বিধান্বিত হবার পালা।

দুজনেই মাথা ঠান্ডা করে আবারো ছবিটা দেখতে বসে। বাশার ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখে আরো নিশ্চিত হয় এই মানুষটাকেই সে দেখেছে আজ সকালে। তবে ছবিতে দেখা মানুষটাকে আরো কম বয়ষ্ক দেখাচ্ছে। এই মানুষটা এই ক-বছরে আরো বয়ষ্ক হয়েছে নিশ্চয়ই। একটা সময় পরে ওরা দুজনেই সিদ্ধান্ত নেয় এভাবে ভেবে লাভ নেই। তারচেয়ে ছবিটা দিয়ে ওপর মহলে খোঁজ খবর করে দেখা যেতে পারে এই লোকটার পরিচয় উদ্ধার করা যায় কিনা।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ওর মধ্যেও খানিকটা ঝিমুনি চলে এসেছিল হঠাৎ ভিউ মিররে চোখ পড়তেই ঝট করে উঠে বসলো ও। পেছনে একটা সাদা গাড়ি আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও বুঝতে পারলো না এটা সকালের দেখা গাড়িটা কিনা। সাদা গাড়ি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে ভুরি-ভুরি আছে। কাজেই

এটাই সেই গাড়ি কিনা অথবা ওদের পিছু নিয়েছে কিনা সেটা বোঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

“আবদুল্লাহ, জিপটা পার্ক করো,” বলেই আবার সামলে নিলো নিজেকে। “না-না পার্ক করোনা। দাঁড়াও,” বলে ও আশেপাশে দেখতে লাগলো। ওরা গাঙ্গিনাপাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। আরেকটু এগোলেই সিকে ঘোষ রোডের মোড়। তার আগেই বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা সিনেমা হল আছে। ওর মনে পড়লো, এই হলের আগে একটা গলি আছে। এই গলিটাকে ওরা ডাকতো ‘হিসু’ গলি। কারণ একটা সময় কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখতে এসে এই নির্জন গলিটাতে ওরা হিসু করতে ঢুকতো।

“আবদুল্লাহ, সামনে ডানে একটা গলি পাবে। জিপের স্পিড বাড়িয়ে গলিটায় ঢুকে পড়ো।”

ওর কথা মতোই আবদুল্লাহ জিপের স্পিড একটু বাড়িয়ে দিলো। একটু পরেই চট করে ঢুকে গেল গলিটায়। গলিতে ঢুকতেই জিপটাকে সামনে এগিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড় করানোর নির্দেশ দিলো বাশার। আর নিজে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে চলে এল গলির মাথার কাছে। যদিও সময় খুবই কম তবুও একবার দেখে নিলো চারপাশটা। আশপাশটা সব বদলে গেলেও গলিটা এখনো আগের মতোই আছে। মূল রাস্তা থেকে পাঁচশো গজের মতো ডানে ঢুকে অনেকটা সোজা এগিয়ে বামে বাঁক নিয়েছে গলি। বাঁকের আগে কোন বাড়ি-ঘর কিংবা দোকানপাট নেই। লোকজনও দেখা যাচ্ছে না।

বাশার যা করতে চাইছে তার জন্যে আদর্শ। ও গলির মাথার কাছে এসে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা একটা ভ্যানের আড়ালে বসে পড়লো। এর আগেই দেখতে পেয়েছে আবদুল্লাহ জিপটাকে বাঁকের কাছে নিয়ে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।

ওর পরিকল্পনা খুব সহজ। যদি সাদা গাড়িটা ওদেরকে অনুসরণ করেই থাকে তবে ওদের পিছু নিয়ে সেটাও ঢুকবে আর একবার ঢুকলে সামনেও বন্ধ আর পেছাতে গেলে ও হাজির হবে পেছন থেকে। আর যদি কোন গাড়ি ওদের পিছু নিয়ে না থাকে তবে তো পুরো ব্যাপারটাই বোকামিতে...

মনের ভাবনা শেষ করার আগেই গলির মুখে সাদা গাড়িটার নাক দেখতে পেল ও। খুব ধীরে-ধীরে সেটা ঢুকতে শুরু করেছে গলিটাতে। খানিকটা ঢুকে থেমে গেল, ড্রাইভার মনে হয় পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না।

বাশার মনে-মনে ভাবলো এইটুকু ঢুকে যদি উল্টো চলে যায় তবে সর্বনাশ, আবারো হারাতে হবে গাড়িটা। এখুনি উঠে যাবে কিনা ভাবছে তার আগেই গাড়িটা ঢুকতে শুরু করলো গলিতে। আরেকটু ঢুকতেই বাঁকের অন্যপাশে আড়াআড়ি দাঁড় করানো জিপটা দেখতে পেয়ে সাথে-সাথে থেমে গেল গাড়ি।

“এইবার,” বলে ভ্যানের আড়াল থেকে পিস্তল হাতে বেড়িয়ে এল বাশার। গাড়ির ড্রাইভার গাড়িটা ব্যাকগিয়ারে পেছাতে শুরু করেছে এমন সময় পিস্তল হাতে গাড়িটার পেছনে উদয় হলো ও। উল্টো রওনা দিতে গিয়ে আবারো থেমে গেল গাড়িটা।

উদ্যত পিস্তল হাতে সামনে এগিয়ে একটানে ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো বাশার, আর সাথে সাথেই বোকা বনে গেল সে।

মনে-প্রাণে বাশার নিশ্চিত ছিল গাড়ির ভেতরে সেই বিদেশীকে দেখতে পাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে একজন মহিলাকে দেখে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো ও।

অধ্যায় আঠারো

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

খাগডহর বাজার, ময়মনসিংহ

ম্যাকফি ওদেরকে দলে ভাগ করে দেয়ার পর থেকেই শঙ্কর আর মহাবীর সিং একে অপরের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দুজনেই বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের সাথে কথা পর্যন্ত বলেনি। এর পেছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। চুম্বকের সমধর্মী মেরু ঠিক যেভাবে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে ঠিক তেমনি নিষ্পেষিত সমাজের সর্বনি¤œ স্তরে বসবাসরত লোকজনের মনে কোন এক অদ্ভুত কারণে পরস্পরের প্রতি এক ধরনের বিরূপ মনোভাব কাজ করে। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটছে শঙ্কর আর মহাবীর সিংয়ের ক্ষেত্রে। দুইজন সম্পূর্ণ দুই সমাজ থেকে উঠে আসা দুই ধর্মের মানুষ। যারা এমনকি পরস্পরকে স্পর্শ করলেও জাত যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের পক্ষে একসাথে কাজ করাটা কঠিন বৈকি।

শঙ্করের জন্ম একেবারেই নিচু পরিবারে। সেখান থেকে নিজের বুদ্ধিমত্তা আর চতুরতা দিয়ে সে উঠে এসেছে আজকের অবস্থানে। অবহেলিত সমাজ থেকে উঠে এলেও সময়ের সাথে সাথে সে হয়ে উঠেছে এমন একজন যে জমিদার পরিবারের সব জানে। তার পদবিটা নায়েবের হলেও সে আসলে জমিদার পরিবারের ম্যানেজারের মতো। অন্দরমহল থেকে শুরু করে বাহিরমহল পর্যন্ত সবই সে জানে-দেখে-বোঝে, সেইসাথে অনেককিছু সামলায়ও। এই কারণে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে জমিদার বাড়িতে যখন বড় ধরণের একটা বিপদ এসে হাজির হয় তখন তার ডাক পড়ে। তাকে ভিড়িয়ে দেয়া হয় ক্যাপ্টেনের দলের সাথে।

প্রথমে মনে-মনে একটু বিরক্ত হলেও ক্যাপ্টেন লোকটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। এই মোটকু পাঠানকে চোখের সামনে দেখতে অসহ্য লাগছে তার। একে তেমন কিছু বলা যাবে না। কারণ কিছু বলতে গেলে কি না কি বিপদ হবে কে জানে। সে মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাজারে

ক্যাপ্টেনের লোকেরা যেভাবে ঘোড়া খুঁজতে এসেছে সে ওভাবে খুঁজবে না। তারচেয়ে নিজের মতো কাজ করবে সে।

বাজারের যে-অংশে ঘোড়া পরীক্ষা করার জন্যে ওদেরকে পাঠানো হয়েছে সে-অংশে খুব বেশি ঘোড়া নেই। এদিকটা মূলত বিভিন্ন ধরণের খাবার সামগ্রীতে ভরপুর। ওরা কিছুদূর হেঁটে অল্প সংখ্যক ঘোড়া যতোগুলো আছে সেগুলো দেখা শেষ হতেই মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ভাঙা হিন্দিতে জানালো এখানে আর খুব বেশি দেখার কিছু নেই। তারচেয়ে বরং তার পরিচিত এক লোক আছে সেই লোকের সাথে যোগাযোগ করলে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।

মহাবীর সিং তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ছোটখাট শঙ্করের দিকে। মনে-মনে যতোই সাহসি হোক না কেন মহাবীর সিংয়ের ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামনে নিজেকে কেমন জানি ছোট মনে হলো শঙ্করের। সে মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ভাঙা হিন্দিতে জানতে চাইলো সে কি চায়না ক্যাপ্টেন ম্যাকফি আসল অপরাধিদের খুঁজে বের করুক। সাথে-সাথে মহাবীর সিংয়ের দৃষ্টি একটু নরম হয়ে এল। শঙ্কর বুঝতে পারলো কাজ হয়েছে। সে আবারো বলতে লাগলো, যদি সত্যিই ক্যাপ্টেনের ভালো চায় তবে ওর উচিত তাকে সাহায্য করা। কারণ স্থানীয় অনেকের সাথে ওর যোগাযোগ আছে।

মহাবীর সিং চিন্তিত ভঙ্গিতে একটু ভাবলো, ভেবে সে মাথা নেড়ে সামনে এগোতে বললো। শঙ্কর পা বাড়িয়েছে সে হাতির শূঁড়ের মতো মোটা একটা হাত রেখে ওর পথ আটকালো। শাসনের ভঙ্গিতে ভাঙা বাংলায় বললো, ও যদি উল্টো-পাল্টা কিছু করে কিংবা কিছু খুঁজে বের করতে না পারে তবে ওর খবর আছে। শঙ্কর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে পথ ছেড়ে দিলো।

রাজবাড়িতে কাজ করার ফলে শঙ্করের একটা বিরাট সুবিধে হয়েছে। অত্র এলাকার একেবারে নিচু থেকে শুরু করে উঁচু পর্যন্ত সব স্তরের মানুষের সাথে তার পরিচয় আছে, সেইসাথে এই এলাকায় কার সাথে কে কি করছে, কিভাবে কী হচ্ছে এসব ব্যাপারে শঙ্করের খুব ভালো ধারণা আছে। সে নিজেও রাজবাড়িতে কাজ করার সুবিধে নিয়ে অবৈধ দুয়েকটা ব্যাপারের সাথে জড়িত থাকার কারণে এই ব্যাপারগুলো আরো ভালোভাবে জানে। আজকের হাটে আসার আগেই সে অনুমান করেছিল ক্যাপ্টেন যে-পদ্ধতিতে কাজ করতে চাইছে ওতে কাজ হতেও পারে আবার নাও পারে।

তাই সে আগে থেকেই এখানকার এক আড়তদারের সাথে যোগাযোগ করে রেখেছিল কিছু খবর বের করে দেয়ার জন্যে।

স্থানীয় এক দালাল আছে, বিল্লাল শেঠ। এই লোকটার সাথে দেখা করে একটু চাপ দিতে হবে। তা-না হলে কাজ হবার সম্ভাবনা কম। কারণ এই লোক একদিকে ঠিক যেমন প্রভাবশালী অন্যদিকে আবার ঠিক একইরকম ধূর্ত প্রকৃতির। নিজের স্বার্থ না দেখলে এই লোক একটা আঙ্গুলও নাড়াতে রাজি হবে না। তবে শঙ্করের ধারণা অত্র এলাকায় বিল্লাল শেঠের অজান্তে একটা পাখিও ডাক দেয়না।

শঙ্কর আগেও বহুবার এই হাটে এসেছে, কাজেই সে জানে কোন জায়গায় ব্যবসায়িরা জমায়েত হয়। মহাবীর সিংকে নিয়ে ওদিকেই রওনা দিলো সে। বাজার পার হয়ে ওরা চলে এল টোল ঘরের কাছাকাছি। টোল ঘরের কাছে এসে এক স্থানীয় প্রহরিকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারলো এখনো ব্যবসায়িদের জমায়েত হয়নি কারণ সবাই যার-যার মালামাল সামলানো নিয়ে ব্যস্ত। ওখান থেকে চলে আসছিল এমন সময় এক পরিচিত স্তবকদারের সাথে দেখা হয়ে গেল শঙ্করের।

তাকে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো শঙ্কর। কারণ এই লোক দীর্ঘদিন ধরে বিল্লাল শেঠের মালামাল মজুদ করে আসছে। তার কাছে জিজ্ঞেস করতেই সে সাথে-সাথে জানালো বিল্লাল শেঠ বাজারেই আছে। ভারত থেকে দড়ির খেলা দেখানোর জন্যে বাজিকরেরা এসেছে। বিল্লাল শেঠসহ আরো কয়েকজন গেছে সেই খেলা দেখতে। সে আরো জানালো বাজারের মাঝখান যে বড় বট গাছটা আছে ওটার নিচেই দড়ির খেলা দেখানো হচ্ছে, ওখানে গেলে বিল্লাল শেঠকে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

“এই দড়ির খেলা ব্যাপারটা আসলে কি?” ওরা বাজারের কেন্দ্রে অবস্থিত বট গাছটার দিকে রওনা দেয়ার একটু পরেই মহাবীর সিং শঙ্করের কাছে জানতে চাইলো। যদিও সে হিন্দিতে প্রশ্নটা করেছে তবুও শঙ্করের বুঝতে সমস্যা হয়নি কিন্তু সে উত্তর দেয়ার গরজ অনুভব করলো না। একমনে হেঁটে চলেছে বাজারের কেন্দ্রের দিকে। মহাবীর সিং আবারো একই প্রশ্ন করলো। শঙ্কর যে ইচ্ছে করে তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না এটা সে বুঝতেই পারেনি। সে ভেবেছে শঙ্কর তার শুনতেই পায়নি কিংবা বুঝতে পারেনি।

শঙ্কর একটু বিরক্ত সুরেই তার তার প্রশ্নের জবাবে জানালো, “এইডা একরঙ্গের খেলা, দেইখ্খা মাইষে মজা পায়।”

“দড়ির খেলায় এতো মজার কি আছে?” খুবই নিরীহ সুরে সে জানতে চাইলো মহাবীর সিং।

চরম বিরক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকালো শঙ্কর। “হেইডা আমি কইবার পারতামনা। অহন চুপ কইরা হাডুইন। আর যার লগে দেহা করবার যাইতাছি হের সামনে কুনো কতা কইন না যে। হেয় মানুষ বেশি সুবিধার না,” বলে সে আবারো মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে একবার কড়া দৃষ্টিতে মাথা নাড়লো। মহাবীর সিং একটু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। এরকম পুচকে একটা লোক হঠাৎ তার সাথে এতো কড়া হবার কারণ কি সে ঠিক বুঝতে পারছে না। অবশ্য বুঝতে পারার কথাও না। ভারতীয়দের জাতি বিভেদ যদি খুব সহজই হোত তবে এতো দূর থেকে এসে ইংরেজরা কখনোই ভারতবর্ষ শাসন করতে পারতো না। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে একবার কাঁধ নেড়ে হাঁটতে লাগলো সে।

আরো কিছুদূর এগোতেই বট গাছের নিচে ভিড় আর লোকজনের উপস্থিতি দেখতে পেল ওরা। “খেলা মনে অয় জইম্মা উঠছে,” বেশ খুশি-খুশি সুরে কথাটা বলে জোরকদমে পা চালালো শঙ্কর । মনে-মনে সে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছে বিল্লাল শেঠের সাথে দেখা করার কথাটা ভেবেছিল বলে। তা-না হলে জানতেও পারতো না বাজারে দড়ির খেলা দেখানো হচ্ছে। তুমুল অগ্রহ নিয়ে সে সামনে এগোতে গিয়েও থেমে গেল। কারণ দূর থেকে সে বিল্লাল শেঠকে দেখেতে পেয়েছে।

দড়ির খেলা দেখানোর ফাঁকা জায়গাটার অন্যপাশে বটগাছের একটা উঁচু শিকরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। শঙ্করের কাছ থেকে বেশ দূরে অবস্থান করলেও সাথে সাথে সে শেঠকে চিনতে পেরেছে লোকটার বিরাট ভুরির কারণে। এরকম পেটমোটা লোক এই অঞ্চ এলাকায় খুব কমই আছে। তবে তার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর একটু অবাক হয়ে গেল। কারণ লোকটা এরকম জমজমাট খেলার সামনে দাঁড়িয়েও খেলা দেখছো না বরং তার ঠিক সাথেই দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের সাথে কথা বলছে।

আগন্তুক দেখতে একেবারেই সাধারণ। তবে তাকে প্রথমেই খুব বেশি চোখে পড়ছে কারণ তার উচ্চতা। আশেপাশের সবার থেকে এক মাথা ওপর থেকে তাকিয়ে আছে লোকটা। তার পরনে খুবই সাধারণ পোশাক হবার পরও শরীরের পাশ থেকে ঝুলছে চামড়ার তৈরী একটা পাশ ব্যাগ। এই পাশ ব্যাগ সাধারণত ভারতীয়রা ব্যবহার করে না। একে তো উচ্চতা তার ওপরে আবার ব্যাগটা দেখে কেন জানি শঙ্করের সন্দেহ হলো এই লোকটা কি তবে

ভারতীয় নয়। তবে সেটা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ এই মুহূর্তে মানুষটা ওর দিকে পেছন ফিরে আছে। শঙ্কর একবার ভাবলো ওদিকে এগোবে কিনা। তবে সে নড়ে ওঠার আগে লোকটাই নড়ে উঠলো।

এতোক্ষণ বিল্লাল শেঠের সাথে কথা বলতে থাকলেও হঠাৎ সে তার কাঁধে হাত রেখে বন্ধুসূলভ ভঙ্গিতে একবার ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

লোকটা ঘুরে তাকানোর সাথে-সাথে শঙ্করের শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। লোকটার মুখ ঢাকা। এভাবে মুখ ঢেকে রাখে লোকজন হয় ধূলোবালি আর রোদ থেকে বাঁচার জন্যে আর না হয় নিজের পরিচয় গোপন করার জন্যে। এই লোককে দেখে মনে হচ্ছে না সে ধূলোবালি নিয়ে চিন্তিত। তবে মুখ ঢেকে রাখার কারণে শঙ্কর বেশি অবাক হয়নি। সে অবাক হয়েছে লোকটার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়াতে। যদিও সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে লোকটার দূরত্ব একেবারে কম নয়, তবুও সে পরিষ্কার দেখতে পেল লোকটার চোখ একেবারে গভীর নীল। এ'রকম গভীর নীল চোখ ভারতীদের হতেই পারে না। তারমানে লোকটা বৃটিশ। একজন বৃটিশ এভাবে নিজের চেহারা লুকিয়ে ঘুরে বেড়াবে কেন। মনের কথা মনেই রয়ে গেল হঠাৎ তীব্র চিৎকার আর লোকজনের হুড়োহুড়িতে ধাক্কা খেয়ে একপাশে ছিটকে পড়লো সে।

কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেও হঠাৎ দেখতে পেল বাজিকরদের খেলা দেখানোর দড়ির টানে বট গাছের মোটা একটা ডাল ভেঙে নেমে আসছে নিচের দিকে। সরাসরি তার দিকে ধেয়ে আসতে থাকা মোটা ডালটাকে দেখে স্থবির হয়ে গেল শঙ্কর।

***

অন্যদিকে মহাবীর সিংয়ের সমস্ত আগ্রহ দড়ির খেলার দিকে ছিল কিন্তু পুরোপুরি সামনে এগোনোর আগেই হঠাৎ চিৎকার আর লোকজনের ঠেলাঠেলির ভেতরে পড়ে গেল সে।

শঙ্করের মতো পড়ে না গেলেও লোকজনের ধাক্কা আর ঠেলার স্রোতে দিক-বিদিক হারিয়ে একপাশে সরে এল সে। কোনমতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আশেপাশে শঙ্করকে খুঁজতে লাগলো। ঘাড়

ঘুড়িয়ে অন্যপাশে তাকিয়েই দেখতে পেল মানুষজনের ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়েছে শঙ্কর।

আরো অবাক হয়ে খেয়াল করলো বাজিকরদের খেলা দেখানোর দড়ির টানে বটগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে মটিতে পড়ে থাকা শঙ্করের দিকে ধেয়ে চলেছে। সাথে-সাথে সে লাফ দিলো ওদিকে। ডালটা ওপর থেকে শঙ্করের ওপরে নেমে আসছে, এমন সময় একেবারে শেষ মুহূর্তে সেটা ধরে ফেললো মহাবীর সিং। ভারি ডালটা মাটির দিকে নেমে আসার তীব্র ধাক্কার চোটে তার মনে হলো নিজের হাতটা ছুটে যাবে কাঁধ থেকে। প্রচন্ড শক্তিতে সে ডালটা ধরে কাঁধ দিয়ে আটকে দিলো ওটাকে।

মহাবীর সিং ডালটা ধরে ফেলার পরও শঙ্কর ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে আছে। তাকে চিৎকার করে সরে যেতে বললো মহাবীর সিং। শঙ্কর ভেবেছিল ভারি ডালটার আঘাতে তার ভবলীলা শেষ। কিন্তু মহাবীর সিংয়ের চিৎকারে হুঁশ ফিরে এল তার। চোখ খুলেই দেখতে পেল মহাবীর সিং তার বিশাল দুই হাত দিয়ে ততোধিক বিশাল ডালটাকে কোনমতে আটকে রেখে চিৎকার করে সরে যেতে বলছে তাকে। পলকের জন্যে হতভম্ভ হয়ে রইলেও হুঁশ হবার সাথে-সাথে সে এক গড়ান দিয়ে পাতলা শরীরটাকে নিয়ে সরে গেল। সাথে সাথে গাছের শাখাটা ছেড়ে দিতেই মাটি কাঁপিয়ে পড়ে গেল ওটা।

ডালটাকে মাটিতে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মহাবীর সিং, পাগলের মতো হাঁপাচ্ছে। লোকজনের ধাক্কা-ধাক্কি আর প্রায় এক মণ ওজনের ডালটার পতন ঠেকিয়ে ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে তার।

শঙ্করের মনে হচ্ছে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়েছে তার। ভারি গাছের ডালটা যখন নেমে আসছিল ওর দিকে, সে ভেবেছিল সব শেষ, পালোয়ানের মতো দেখতে লোকটা যাকে সে জাত আর ধর্মের কারণে একরকম নিচু জাতের ভেবে আসছিল সেই লোকটা এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার প্রাণ বাঁচাবে সে ভাবতেও পারেনি। মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সে একবার হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু শুকনো মুখে কোন ভাব ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হলো সে। কিছু করার আগেই বিশাল আকৃতির মানুষটা এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। কোনমতে শঙ্কর তার হাতটা ধরতেই একটানে মাটি থেকে তাকে দাঁড় করিয়ে ফেললো মানুষটা।

শঙ্কর একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। স্বল্প পরিচিত মানুষটা এভাবে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তার প্রাণ বাঁচাবে ব্যাপারটা এখনো সে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু তাদের দুজনার জন্যেই আরো চমক অপেক্ষা করছিল। একটু স্বাভাবিক হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই শঙ্কর দেখতে পেল ক্যাপ্টেন ম্যাকফি দৌড়াতে-দৌড়াতে বট গাছের সীমানার শেষ প্রান্তে একটা ছোট টিলার আড়ালে হারিয়ে গেল।

মহাবীর সিংকে ইশারা করে সেদিকে রওনা দিলো সে। মূল বাজারটা বট গাছের সীমানাতেই শেষ হয়ে গেছে। ওখান থেকে ঢালু জমি নেমে গেছে নিচের দিকে।

শঙ্কর মনে-মনে দ্রুত হিসেব করলো। ক্যাপ্টেন ওদিকে কী করছে এখনো জানে না সে। হয়তো সে কারো পিছু নিয়েছে। যদি সত্যি কারো পিছু নিয়ে থাকে তবে লোকটা পালানোর জন্যে নিচের দিকেই যাবে।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেলেও সে দ্বিধা কাটিয়ে পশ্চিম দিকে হাত তুলে ইশারা করলো। “উছ্ তারাফ।”

বটগাছের সীমানা শেষ হয়ে ওখান থেকে জমি ঢালের মতো নেমে গেছে নিচের দিকে। ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে ডান দিকে একটা ঝলকের মতো দেখতে পেল। লাল পোশাক পরা কেউ একজন জংলামতো জায়গাটার ভেতরে হারিয়ে গেল।

“ওই যে,” শঙ্কর হাত তুলে দেখালো। “ওটাই, ক্যাপ্টেন।”

তার বলার দরকার ছিল না। কারণ লাল ঝলকটা মহাবীর সিং আগেই দেখতে পেয়েছে। আর ওটা যে ক্যাপ্টেনের লাল ইউনিফর্মের অংশ সেটা না বোঝার কোন কারণ নেই। মহাবীর সিং দ্রুতই ঢাল বেয়ে নামতে লাগলো। শঙ্কর পিছু নিলো তার। ওরা যেখান দিয়ে নামছে সেখান থেকে আধা মাইলের মতো দূরে ফাঁকা জায়গার পর জঙ্গলের মতো শুরু হয়েছে। এই জায়গাটাতেই লাল ঝলকটা দেখতে পেয়েছে ওরা।

মাটিতে নেমে দুজনে মিলে সেদিকে রওনা দিলো। তীব্র কাঠফাটা রোদের ভেতরে দর-দর করে ঘামতে ঘামতে দুজনেই এগিয়ে চললো জংলামতো জায়গাটার দিকে। জংলার ছায়ায় এসে থেমে গেল ওরা। ছোট একটা নালার মতো আছে এখানে। সেটা পার হলে ছোট একটা জঙ্গল। জঙ্গলের অন্য পাশ থেকে শুরু হয়েছে বাঁশ ঝাড়। ছোট নালাটা লাফিয়ে পার হয়ে ওরা

বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোল। জঙ্গুলে জায়গাটার অন্যপাশে একটা টিনের ঘরের মতো দেখা যাচ্ছে। ওরা জঙ্গুলে জায়গাটার পার হয়ে সেটার কাছাকাছি এগোতেই শঙ্কর চিনতে পারলো জায়গাটা। তার যতোটুক মনে পড়ছে, এখানে একটা ছোট আস্তাবলের মতো আছে। কারণ বাজারে নিয়ে আসা ঘোড়াগুলোতে এখানেই রাখা হয়ে থাকে।

আস্তাবল থেকে শ'খানেক গজ দূরে এসে থেমে গেল দুজনে। আশেপাশে কোথাও ক্যাপ্টেনের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।

"কিধার গেল ক্যাপ্টেন সাহেব। হামি কি জোরে ডাক দিবো, নাকি এটা দিয়ে কিছু একটা করবো?" বলে সে কোমর থেকে পাতার বাঁশিটা নিয়ে মুখে ঠেকানোর জন্যে তুলে ধরতেই তাকে থামিয়ে দিলো শঙ্কর ।

হাতে বাঁধা পড়তেই অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো মহাবীর সিং কিন্তু কেন শঙ্কর হাত ধরে ফেলেছে সেটা ব্যাখ্যা করার আগেই তী² শব্দে বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল। দুজনেই একসাথে ফিরে তাকালো আস্তাবলটার দিকে। কারণ বাঁশির আওয়াজ ওখান থেকেই ভেসে এসেছে।

"এ তো..." মহাবীর সিং কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল কিন্তু তার মুখের কথা শেষ করার আগেই বাজ পড়ার মতো গুলির শব্দে চমকে উঠলো দুজনে। ঝট করে ফিরে তাকোলো আস্তাবলটার দিকে। কারণ গুলির শব্দটা ওটার ভেতর থেকেই ভেসে এসেছে। সাথে-সাথে দুজনে মিলে দৌড় দিলো আস্তাবলের দিকে। প্রায় পৌছে গেছে এমন সময় আবারো গুলির শব্দ ভেসে এল। সাথে-সাথে শঙ্করকে জাপটে ধরে মাটিতে পড়ে গেল মহাবীর সিং।

তবে মাটিতে পড়ে গিয়েও ওরা থামলো না। বাকি পথটুকু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে কাছাকাছি পৌছে টিনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখে তাজ্জব হয়ে গেল দু'জনে। ভেতরে রীতিমতো দুটো খন্ডযুদ্ধ চলছে।

***

জ্ঞান ফিরে আসতেই ম্যাকফি ওর চোখের সামনে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা একটা কালো মুখ দেখতে পেল। মুখটা কালো হলেও চোখ দুটো বেশ

মায়ময়। ভীষণ কৌতুহলি আর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কিন্তু মনে মনে ও অবাক হলো মুখটা আছে তবে দেহটা কোথায়? আর এরকম উল্টো হয়ে ঝুলে আছে কেন মুখটা। সাথ-সাথেই বুঝতে পারলো আসলে মানুষটা ঠিকই আছে সে-ই উল্টো হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। মুখটা একটা বাচ্চা ছেলের। ও চোখ মেলার প্রায় সাথে সাথেই ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো একজন পূর্ণ বয়ষ্ক মানুষ। মুহূর্তেই সব মনে পড়ে গেল ওর। একজন লোকের পিছু নিয়ে ও এই পর্যন্ত এসে আস্তাবলের ভেতরে ঢুকেছিল ও, হঠাৎ পেছন থেকে কারো আক্রমণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও।

কারা আক্রমণ করেছিল তখন দেখতে পায়নি কিন্তু বয়ষ্ক লোকটা ওর ওপরে ঝুঁকে আসতেই চিনতে পারলো ও। এটা সেই লোক যারা বট গাছের নিচে দড়ির খেলা দেখাচ্ছিল। সাথে সেই ছেলে দুটোও আছে। ওদেরই একজন ঝুঁকে ছিল ওর ওপরে।

হুঁশ ফিরতেই নিজেকে নাড়ানোর চেষ্টা করে ও বুঝতে পারলো শরীর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। একটা ছেলে ওর পা দুটো ধরে আছে, আর ওর ওপরে ঝুঁকে থাকা ছেলেটা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর পা ধরে থাকা ছেলেটা ধমকের ভঙ্গিতে জোরে জোরে কিছু বলছে আর অন্য ছেলেটা মাথা নেড়ে মানা করছে। এবার ওর ওপরে ঝুঁকে থাকা লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই কদমে ছেলেটার পাশে দাঁড়ানে ছেলেটার সামনে গিয়ে তার মাথার পেছনে একটা চাটি মারলো।

মাথায় চাটি খেয়ে সে একবার লোকটাকে দেখলো আরেকবার ম্যাকফির পা ধরে থাকা ছেলেটাকে দেখলো। তারপর রাগের সাথে এক ঝটকা দিয়ে ম্যাকফিকে দেখিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে লাগলো।

ম্যাকফি আলগোছে শরীরটাকে নাড়িয়ে দেখলো কোনভাবে নিজেকে মুক্ত করা যায় কিনা। এরা দড়ি নিয়েই কারবার করে, তাই বাঁধন বেশ শক্ত। তবে ওকে যে বাঁশের পাল্লার সাথে বাঁধা হয়েছে সেটা বেশি শক্ত না। ম্যাকফি এক ঝটকা দিয়ে ডান হাত একটু আলগা করে কনুই দিয়ে বাড়ি মারলো বাঁশের পাল্লার গায়ে। ব্যাথায় মনে হলো কনুই ভেঙে গেছে, কিন্তু কাজ হলো। বাঁশের পাল্লাটা ভেঙে ওর শরীরটা ঢলে পড়লো একদিকে, ফলে শরীরের একটা পাশ একেবারে আলগা হয়ে গেল।

হাত ছাড়িয়ে শরীর সোজা করার আগেই বাপ দেখে ফেললো ওকে, এক লাফে ম্যাকফির কাছে এসে ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করার আগেই খোলা

হাতে লোকটার মুখে একটা ঘুসি মারলো ম্যাকফি। ওর মনে হলো কাঠের ওপরে গিয়ে লাগলো ঘুসিটা। তবে লোকটা পড়ে গেল মাটিতে, এই সুযোগে ব্রিচেসের পকেট থেকে পাতার বাঁশিটা বের করে মুখে পুরে ফুঁ দিলো ও। বাঁশিটা ঠিকমতো বাজার আগেই লোকটা উঠে এসে ওর বুকের ওপরে বসে পড়লো। এমনিতেই সম্পূর্ণ শরীর আটকা, পা ও ধরে রেখেছে একজন তার ওপরে লোকটা উঠে এসে ওর বুকের ওপরে চেপে বসেছে। তার দুই হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা সরু দড়ি। লোকটা ম্যাকফির পেটে ঘুসি মারলো, সাথে-সাথে হা হয়ে গেল ওর মুখ। মুখটা খুলে যেতেই লোকটা সরু দড়িটা ওর মুখে পরিয়ে দিলো।

ম্যাকফি মোচড়া-মুচড়ি করছে এমন সময় আস্তাবলের অন্যপাশ থেকে শব্দ ভেসে এল। ওর বুকের ওপরে চেপে বসা লোকটা কাকে যেন ইশারা করলো। ম্যাকফি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো আরো দুজন কোথা থেকে যেন পয়দা হয়েছে। লোকটা ইশারা করতেই সাথে-সাথে তারা দুটো খড়ের পাল্লার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। লোকগুলোও আরেকটু সামনে আসতেই ও দেখতে পেল জোনাথন আর ডুম্বুর। ম্যাকফি কিছু করার আগেই খড়ের গাদার আড়াল থেকে দুজন ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপরে। প্রথমেই ওদের ছুঁড়ে দেয়া দড়ির ফাঁসে বন্দি হয়ে হাত থেকে ছুটে গেল অস্ত্র। এরপর দড়ি ধরে টানতে-টানতে দুজনকে নিয়ে আসা হলো ওর কাছে।

অস্থির হয়ে উঠেছে ম্যাকফি। এক ঝটকায় নিজের খোলা হাতটা আবারো ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটার বুকে ঘুসি মারলো, কিন্তু এই ঘুসিটাও তেমন একটা জোরদার হলো না। তবে ঘুসি খেয়ে লোকটার পাগড়ি খুলে লম্বা লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়লো তার মুখের ওপরে। খপ করে ছড়িয়ে পড়া চুল ধরে একটানে তাকে সরিয়ে ফেললো একপাশে। তাল রাখতে না পেরে লোকটা পড়ে গেল। ম্যাকফিকে ধরে থাকা ছেলেটার হাত থেকে ছুটে গেল ওর পা। ঝটকা দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতেই আবারো আটকে গেল ও দড়িতে। দড়ি ছাড়ানোর চেষ্টা করছে এমন সময় বয়স্ক লোকটা মাটি থেকে উঠে পেছন থেকে একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিলো ম্যাকফির গলায়।

লোকটার সাথে এসে হাত লাগালো ছেলেটাও। ম্যাকফির মনে হচ্ছে গলায় চাপ খেয়ে ওর চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসবে। মরিয়া হয়ে সামনের বাঁশের পাল্লা ধরে সর্বশক্তিতে টান মারতেই ওটা ভেঙে তিনজনেই পড়ে গেল মাটিতে। নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে ও। হঠাৎ হাতে ঠেকলো সেই পাতার বাঁশিটা। ওটা মুখে পুরে ফুঁ দিতেই ছেলেটা এসে মুখ চেপে ধরলো। তবে তার আগেই পেছন থেকে গুলির শব্দে চমকে উঠলো সবাই।

ছেলেটা ওর মুখ ধরে থাকার পরও কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল জোনাথন আর ডুম্বুরের সাথে ওই দুই বাজিকরের খন্ড যুদ্ধও তুঙ্গে উঠেছে। সম্ভবত জোনথনই কাউকে গুলি করেছিল সেটা না লাগাতে আবারো ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে ওপরের উপরে। ম্যাকফি ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গলা থেকে দড়ির ফাঁসটা খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কারণ আবারো যদি লোকটা ওকে দড়ির ফাঁসে আটকে ফেলে তবে খবর আছে। গলা থেকে ছাড়ানোর জন্যে ফাঁসটা ধরতেই হঠাৎ আস্তাবলের একপাশের দেয়াল ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো।

সবাই যার-যার জায়গায় জমে গেল। আবারো কেঁপে উঠলো টিনের দেয়ালের যেখানে কাঠের দরজা আছে। দ্বিতীয়বার শব্দ হবার প্রায় সাথে-সাথেই ভেঙে পড়লো আস্তাবলের পেছনের দরজা। সেখানে উদয় হলো বিশাল আকারের এক মুর্তি। এক হাতে খোলা তলোয়ার অন্য হাতে ধরা একটা ছোট কুঠার। ম্যাকফি ভালোভাবে তাকানোর আগেই কুঠারটা ছুটে এসে নিখুঁত লক্ষে ছুটে এসে ওর গলার সাথে আটকানো দড়িটার টান হয়ে থাকা অংশটাকে দুভাগ করে দিলো ওটা। দড়ি কেটে যেতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকফি। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে দরজা থেকে ছুটে এল মুর্তিটা। সামনে বাগিয়ে ধরেছে খোলা তলোয়ার, অন্যহাতে কুঠার।

ম্যাকফি এবকার ভালোভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারলো খোলা তলোয়ার হাতে মানুষটা আর কেউ না মহাবীর সিং। তার পেছন-পেছন দৌড়ে আসছে শঙ্কর। মহাবীর সিং ছুটে এসে এক লাথি মারলো ম্যাকফিকে ধরে থাকা বয়স্ক লোকটাকে। অন্যদিকে ম্যাকফি ভাঙা একটা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলো ছেলেটার মাথায়।

এদিকটা সামলে নিয়ে জোনাথনদের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল ওদেরকে ধরে আছে অন্যদুজন। খোলা তলোয়ার হাতে মহাবীর সিং আর ম্যাকফি ছুটে যেতেই দ্বিধায় পড়ে গেল ওই দু'জন। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে এদেরকে আক্রমণ করবে। কিন্তু সেটা না করে ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে দুজনেই উল্টো ঘুরে দৌড় দিলো। দুইপাশের দুই জানালা দিয়ে বাইরে পালানোর চেষ্টা করতেই মাটি থেকে পড়ে যাওয়া পিস্তলটা তুলে নিয়ে পলায়মান লোকটার দিকে তাক করলো জোনাথন।

তবে জোনাথন গুলি চালানোর আগেই পলায়মান লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে টিনের জানালার অন্যপাশে। জোনাথন পিস্তল হাতে জানালার দিকে দৌড় দিলো আর ম্যাকফি ঘুরে তাকালো ভেতরের দিকে। বয়স্ক লোকটা আর

ছোট ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কর আর ডুম্বুর, সামনেই খোলা তলোয়ার হাতে মহাবীর সিং।

ওদের থেকে একটু দূরেই দাড়িয়ে আছে ঘরের পঞ্চম সদস্য। টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে ভয়ে কাঁপছে পিচ্চি ছেলেটা। এই ছেলেটাই আগে ম্যাকফির পা বাঁধতে অস্বিকৃতি জানিয়েছিল। এরপরে গন্ডগোল শুরু হবার পরে ওদের সাথে যখন অন্যদের মারামারি হচ্ছে সে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। এবার ম্যাকফিকে ওর দিকে এগোতে দেখে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটা।

অধ্যায় উনিশ

বর্তমান সময়,

গাঙ্গিনাপাড়, ময়মনসিংহ

সামনে বসে থাকা মহিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশার। ওর কি রাগ হওয়া উচিত নাকি কৌতুহলি হওয়া উচিত, ঠিক বুঝতে পারছে না। সে মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে, মহিলাও কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মহিলার কঠিন দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে বাশার চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালো।

বহু পুরনো এই প্রেসক্লাব ক্যান্টিন। একটা সময় ময়মনসিংহ শহরের সবচেয়ে সেরা বিরিয়ানি বিক্রি হোত এই ক্যান্টিনে। সেই সময় বিরিয়ানি আর ক্যান্টিন দুটোরই শান-শওকত ছিল দেখার মতো। সময়ের সাথে-সাথে নতুন-নতুন রেস্তোরায় ভরে উঠছে শহর। পুরনো সেই জৌলুস হারিয়েছে রেস্তোরা। তবে এদের চা আর কাটলেট এখনো যথেষ্ঠ ভালো।

“এই, এইদকে আয়,” ওয়েটার ছেলেটাকে ডাক দিলো বাশারের সামনে বসে থাকা মহিলা। বাশার মনে-মনে ভাবছে, একে কি মহিলা বলা উচিত নাকি মেয়ে।

“তোরে কখন চা দিতে বলছি! মায়ের বিয়া খাইতে গেছিলি?” মহিলা এমন কর্কশ সুরে ওয়েটারকে ধমকে উঠলো, ওয়েটার তো বটেই বাশারসহ চমকে উঠলো। আশেপাশের টেবিল থেকে দুয়েকজন ফিরে তাকালো ওদের দিকে। “কি হইছে? মজমা লাগছে?” অতি উৎসাহি লোকজন মহিলার কর্কশ ধমক শুনে যার-যার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, ওয়েটার ছেলেটা পালিয়ে বাঁচলো, আর বাশার সিদ্ধান্তে এল তার সামনে বসে থাকা মানুষটাকে কোনভাবেই মেয়ে বলা চলে না। একে মহিলাই বলতে হবে।

“এবার বলেন, আপনার সমস্যাটা কি?” মহিলার তী² চোখ জোড়া বাশারের ওপরে নিবদ্ধ। বাশার মনে-মনে ভাবলো মানুষের চোখের মণি এতোটা গভীর কালো আর রহস্যময় হয় কিভাবে। তবে মহিলার গায়ের রঙ মনে হয় তার চোখের চেয়ে কোন অংশে কম কালো হবে না।

“সমস্যা আমার না,” বাশার তার গভীর চোখের দিকেই তাকিয়ে জবাব দিলো। ছোটবেলায় সাঁতার শিখতে গিয়ে একবার পুকুরে ডুবতে বসেছিল ও। শরীরটা যখন নিকষ কালো পানির গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছিলো ঠিক যেরকম অনভূতি হয়েছিল মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকটা একই অনুভূতি হচ্ছে ওর । দৃষ্টি সরিয়ে নিলো ও।

হাতে ধরা মহিলার কার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলো, ফ্রিল্যান্স ক্রাইম রিপোর্টার সে। ক্রাইম রিপোর্টার, তাও আবার একজন মহিলা! তবে একে মানায়, মনে-মনে ভাবলো বাশার। দেখতে যেমন কালো, তেমনি পুরুষালি। এরকম কালো মহিলা এর আগে জীবনে দেখেছে ব’লে মনে পড়লো না ওর।

“সমস্যাটা আমার না, সমস্যাটা আপনার, আপনি...”

বাশার বাক্যটা শেষ করার আগেই মহিলা বলে উঠলো, “মোটেই না। আপনি দৌড়ে এসে আমার গাড়ির সামনে পড়েছিলেন। আর আপনি না এলে...” ওয়েটার ছেলেটা দু কাপ চা দিয়ে গেল।

“ঠিক আছে, বুঝলাম আমার সমস্যা,” মহিলা কথায়-কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাশার মাথা ঠান্ডা রাখলো। “তাহলে আপনি তখন কেন এ’কথা বললেন, ‘আমি জানি আপনি কী খুঁজছেন’? আপনি যদি আমাকে না-ই চিনতেন আমার ব্যাপারে না-ই জানতেন তবে একথা কোনদিনই বলতেন না।”

আধাঘন্টা আগে টমির অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর বাশার যখন দেখতে পায় একটা সাদা গাড়ি ওদেরকে অনুসরণ করছে ও গাড়িটাকে ফাঁদে ফেলে সেটাকে আটকে দেবার পর ভেতরে আবিষ্কার করে কোন সাদা চামড়ার লোক নয় বরং জিন্স আর ফতুয়া পরা ভীষণ কালো দেখতে একজন মহিলা বসে আছে সেখানে। একটা পুলিশের জিপকে কেন অনুসরণ করছিল, জানতে চাইবার পর মহিলা জবাব দেয় ‘আমি জানি আপনি কী খুঁজছেন’।

রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহ সাথে-সাথে মহিলাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাবার পক্ষে থাকলেও বাশার মহিলাকে থানায় নেয়ার আগে তার সাথে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করে। সে-জন্যেই মাহিলাকে নিয়ে প্রেস ক্লাবের ক্যান্টিনে এসে বসেছে।

বাশারের শেষ কথাটা শুনে মহিলা বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। চোখ তুলে তাকালো বাশারের দিকে। বাশার মনে-মনে ভাবলো এরকম কালো আর পুরুষালি দেখতে একজন মহিলার চোখ এতো গভীর আর রহস্যময় হওয়া উচিত না। আবারো সেই পানিতে ডুবে যাবার অনুভূতি ফিরে আসতেই চোখ ফিরিয়ে নিলো বাশার।

“আপনি ঠিকই বলেছেন। অকারণে ঝগড়া করে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং আমরা পরষ্পরকে সাহায্য করতে পারি,” এতোক্ষণে মহিলা চায়ের কাপটা তুলে নিলো।

“দেখুন মিস সরকার,” এই নামটাই লেখা ছিল তার কার্ডে।

“জয়া, আমাকে জয়া বলে ডাকতে পারেন। সরকার-ফরকার বলতে হবে না,” মহিলার কথা শুনে বাশারের মনে হলো এই মহিলা স্বাভাবিক কথাও এমনভাবে বলে মনে হয় ঝগড়া করছে।

“ঠিক আছে, মিস জয়া সরকার, আপনার কেন মনে হলো আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন?” বাশার চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলো। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ সিগারেট খাচ্ছে কিনা। তাহলে ও নিজেও একটা ধরাতো।

“সিগারেট ধরাতে চাইলে ধরাতে পারেন, এখানে সিগারেট খেতে কোন নিষেধ নেই।”

বাশার একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা টেবিলের ওপরে রাখতেই মহিলা সেটা টেনে নিলো নিজের দিকে। বাশার অবাক হয়ে খেয়াল করলো এই মহিলা এতোটাই স্বাভাবিক আর স্বতস্ফূর্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো যেন এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। বাশার একটু অবাক হয়েই খেয়াল করলো মহিলার কালো ঠোঁটে সিগারেটটা কেমন জানি মানিয়ে গেছে। বেশিরভাগ মেয়ের লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটে যেটা বেমানান লাগে এই মহিলার ক্ষেত্রে মোটেই অস্বাভাবিক লাগছে না সেটা।

“মিস্টার পুলিশ, এভাবে বোকার মতো আমার সিগারেট খাওয়া না দেখে বলুন যেটা বলছিলেন,” মহিলা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগলো। “আর নাটক না করে শুনুন আমাকে আপনার কেন দরকার। আমি জানি আপনি আজ থেকে এগারো বছর আগে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটা ব্যাপার খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না।”

“আপনি এসব কোথা থেকে জানলেন?” বাশার একটু অবাক হয়েছে।

“আপনারা যারা পুলিশ তারা একটা ব্যাপার ভুলে যান, ইনফরমার শুধু আপনাদেরই থাকে না। আমাদের মতো সাংবাদিকদেরও থাকে। আমি জানি সে-সময়ে আসলে কী ঘটেছিল,” বলে সে তার বহু পকেটওয়ালা সবুজ রঙের ব্যাগটা ঘাঁটতে লাগলো।

“তাই নাকি? কি ঘটেছিল?”

কিছু না বলে মহিলা তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ফাইল বের করে আনলো। সেটার ভেতরে থাকা বেশকিছু কাগজ থেকে বাছাই করে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে। “পড়–ন এটা।”

বাশার হাতে নিয়ে দেখলো একটা পত্রিকার কাটিং। হেডলাইনটা পড়ে আনমনেই বলে উঠলো ও। “ডাকাতি!”

জয়া সরকার ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। “হ্যা, মিউজিয়াম ডাকাতি।”

বাশার মনোযোগ দিয়ে পত্রিকার কাটিঙের লেখাটা পড়তে লাগলো। প্রথম অংশটুকু পড়ে পাতা উল্টে দেখলো বাকিটুকু নেই।

“বাকিটা এখানে আছে,” বলে জয়া সরকার সেই ফাইলটা দেখালো। “আপনার যেসব খবর পত্রিকা অফিসে কিংবা লাইব্রেরিতে থাকার কথা সে-সবই আমার কাছে আছে। বলতে গেলে শুধুমাত্র আমার কাছেই আছে। বাকি সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।”

“নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, মানে কি? কারা করেছে?” বাশার বেশ অবাক হচ্ছে মহিলার কথাবার্তা শুনে।

“সেটা পরে জানতে পারবেন, তার আগে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, লেখাটা পড়ে কি বুঝলেন?” জয়া সরকার তার চোখের চেয়েও গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে।

“ব্যাপারটা অদ্ভুত আর একটু রহস্যময়,” বাশার আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ওয়েটারকে ডাকলো। আরেক কাপ চা দরকার। “এগারো বছর আগে একটা মিউজিয়াম ডাকাতি নিয়ে ব্যাপারটা। ঠিক মিউজিয়ামে ডাকাতি নয়, বরং মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের আয়োজন করা একটা বিশেষ এক্সিবিশনে হওয়া ডাকাতি নিয়ে খবরটা।”

“হ্যা, ঠিকই ধরেছেন,” বলে সে চায়ের কাপটা তুলে নিলো। বাশার একটু অবাক হয়ে খেয়াল করলো এবার ছেলেটা চা দিয়ে যেতে এক সেকেন্ড দেরি করেনি। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে জয়া নামের মানুষটা একটা মুচকি হাসি দিলো ওয়েটার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে। “হ্যা, যা বলছিলাম। আমি আপনাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলছি।”

“তার আগে আমার দুটো প্রশ্ন আছে,” বশার বাঁধা দিলো মহিলার কথার মাঝখানে। “এই মিউজিয়াম ডাকাতির ঘটনার সাথে আপনি কিভাবে সম্পৃক্ত? আর এই মিউজিয়াম ডাকাতির সাথে আমার বর্তমান কেসের সংশ্লিষ্টতা কি?”

বাশারের প্রশ্ন শুনে জয়া হেসে উঠলো। বাশার একটু অবাক হয়ে একটা ব্যাপার খেয়াল করলো মহিলা হাসার সাথে সাথে কালো মুখটা যেন আরো অন্ধকার হয়ে গেল। সাধারণত একজন মানুষ হেসে উঠলে তার চেহারা যেমনই হোক তাকে ভালো দেখায়। কিন্তু মহিলা এমনিতেই দেখতে খারাপ তার ওপরে হেসে উঠলে তাকে আরো কুৎসিত দেখাচ্ছে।

“আরে, আগে আমাকে বলতে দিন, তারপর আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিবো,” হাসতে-হাসতেই জবাব দিলো জয়া। “তার আগে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কখনো ময়মনসিংহ জাদুঘরে গেছেন? কিংবা ময়মনসিংহ শহরের ইতিহাস সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?”

“জাদুঘরে?” বাশার মনে করার চেষ্টা করছে মিউজিয়ামটা কোথায়। তারপর মনে পড়াতে জবাব দিলো। “ময়মনসিংহ জাদুঘরে আমি একবার গেছিলাম। আম তখন বেশ ছোট, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। যতোটুকু

মনে পড়ে খুবই ছোট একটা মিউজিয়াম আর খুব বেশি জিনিসপত্রও ছিল না।"

"আর ময়মনসিংহ শহরের ইতিহাস, এই ভূখন্ডের ইতিহাস?" একেবারে সরাসরি তাকিয়ে আছে জয়া ওর চোখের দিকে।

বাশার এবার দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়ে বরং আরো প্রখর দৃষ্টিতে তাকানোর চেষ্টা করলো। "আমি খুব বেশি জানি না। ইতিহাস নিয়ে আমার খুব বেশি আগ্রহও ছিল না কখনো, কাজেই খুব বেশি জানার প্রয়োজনও পড়েনি," বাশার এই পর্যন্ত বলে আর চোখের দৃষ্টি ধরে রাখতে পারলো না। কাপের দিকে চোখ নামিয়ে নিলো আবারা।

"সেটাই স্বাভাবিক," বলে সে চায়ের কাপে চুমুক দিলো। "আমি আপনাকে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলছি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন," বলে সে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বাশারের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিলো। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে শুরু করলো। "ঘটনার শুরু সম্ভবত সত্তুরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তখন দেশের অবস্থা উত্তাল। তবে সেটার ছায়া মফস্বল শহরগুলোতে তখনো খুব একটা পড়েনি। সেই সময়ে ময়মনসিংহ শহরের মুক্তাগাছা অঞ্চলে একটা ঘটনা ঘটে।"

"কি ঘটনা?" বাশার জানতে চাইলো।

"বলছি," একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো মহিলা নাক-মুখ দিয়ে। কোন মেয়েমানুষ এরকম স্বতস্ফূর্তভাবে সিগারেট খেতে পারে দেখা তো দূরে থাক বাশার কোনদিন ভাবতেও পারেনি। "আপনি কি মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"তেমন কিছু জানি না। আমার নানাবাড়ি মুক্তাগাছা যাবার পথেই পড়ে, তাই ছোটবেলায় দুয়েকবার জমিদার বাড়িতে বেড়াতে গেছি, এই যা। কেন, ওদের সাথে এই ঘটনার সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্কে পরে আসবো। আগে ঘটনাটা বলে নেই," বলে সে ছাই ঝাড়লো। ঝেড়ে নিয়ে আবারো বলতে লাগলো। "মুক্তাগাছার জমিদারদের অনেক সম্পত্তি ছিল। তবে তার অনেকটাই সরকার তার দখলে নিয়ে নিয়েছে। এরকমই একটা সম্পত্তির ভেতরে ছিল মধুপুরের এক কাচারি বাড়ি। একাত্তর পরবর্তী সময়ে সরকার জমিদারদের সেই কাচারি বাড়ির দখল নিয়ে নেয়। দখল নেয়ার পরে কয়েক বছর পর্যন্ত ওটা ওভাবেই পড়ে ছিল।

তৎকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এই বাড়িটাকে সংস্কার করে ফরেস্টারের অফিস বা বাংলো কিছু একটা বানাবে। বাড়িটাকে খালি করতে গিয়ে সেখানকার পাতাল ঘরে পুরনো দিনের একটা বড় সিন্দুক আবিষ্কার করে তারা।"

"আগের দিনে পাড়া-মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার চট কিংবা ম্যাট্রেস রাখার জন্যে বড়-বড় ট্রাঙ্ক থাকতো, বিরাট আকারের সিন্দুকটা দেখতে অনেকটা ওরকম ছিল। তবে আকারে অনেক বড়। আমি নিজে তো আর দেখিনি, পত্রিকার কাটিং আর লোকমুখে যা শুনেছি, সেই বর্ণনা অনুযায়ী প্রায় পাঁচ ফিট উঁচু লোহার তৈরী সিন্দুকের মতো দেখতে জিনিসটা আকারে যেমন বড় ঠিক তেমন ভারিও ছিল। জিনিসটা জমিদারদের কাচারি বাড়ির মাটির নিচ থেকে বের করে এনে অনেকদিন বাইরেই ফেলে রাখা হয়েছিল। কারণ কেউ ওটা খুলতে পারেনি। খুলতে না পেরে এতো বড় আর ভারি জিনিসটা নিয়ে কী করবে সেটাও কেউ ভেবে বের করতে পারেনি। বেশ লম্বা সময় ধরে জামিদারদের কাচারি বাড়ির প্রাঙ্গনেই পড়ে ছিল ওটা। এমন সময় একজন ফরেস্ট অফিসার মধুপুর জঙ্গল ভিজিট করতে এলে তার নজড়ে পড়ে জিনিসটা।"

"ইতিহাসের ছাত্র সেই ফরেস্ট অফিসার জিনিসটা দেখে বেশ কৌতুহল বোধ করে। কামার ডেকে এনে সে খোলার চেষ্টা করে ওটা। কিন্তু খুলতে না পেরে ওটাকে বহন করে নিয়ে যায় মুক্তাগাছা শহরে। তার ইচ্ছে ছিল, সেখানে নিয়ে জিনিসটা খোলার চেষ্টা করবে," এই পর্যন্ত বলে জয়া একটু থামলো। এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার শুরু করলো।

"ফরেস্ট অফিসারের তার সেই ইচ্ছে আর পূরণ করতে পারেনি। জিনিসটা নিয়ে আসার কয়েকদিন পরেই পচাত্তরের আগস্টের ঘটনা ঘটে। পুরো দেশ থমথমে হয়ে ওঠে। ফরেস্ট অফিসারের ভাগ্যে কী ঘটেছিল আমি জানি না। তবে সেই সিন্দুক ওভাবেই পড়ে ছিল ফরেস্ট অফিসারের কোয়ার্টারের সামনে। এরও বছরখানেক পরে স্থানীয় মুক্তাগাছার এক মসজিদের ইমাম কোন এক কাজে একদিন সরকারি কোয়ার্টারে এলে ফেরার সময় প্রাঙ্গনের একপাশে পড়ে থাকা সিন্দুকটা দেখে কৌতুহলি হয়ে ওঠে। খোঁজ-খবর করে সে জানতে পারে এই জিনিসটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। সে ওটাকে নিয়ে মসজিদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে। আমি আগেই বলেছি আগের দিনে মসজিদে নামাজ পড়ার চট-ম্যাট্রেস, এসব রাখার জন্যে যে-ধরণের বড় সিন্দুকের মতো রাখা হোত জিনিসটা দেখতে ছিল অনেকটা সেরকম।

তাই সেই ইমাম সাহেব মনে করেন মসজিদ সংস্কারের পর এই জিনিসটা মসজিদে নিয়ে রাখলে এটাকে বিভিন্ন কাজে লাগানো যাবে। তো যাই হোক, উনি সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করার পর তারা খুশি হয়েই ইমাম সাহেবকে জিনিসটা দিয়ে দেয়। বলা যায় তারা একরকম হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।”

“তো ইমাম সাহেব সেটাকে একটা ঠেলাগাড়িতে করে সোজা নিয়ে যায় স্থানীয় একটা লোহার কাজের ওয়ার্কশপে। কারণ এর আগেই উনি এর ইতিহাস জেনে নিয়েছেন। এটাও জানতে পেরেছেন এই জিনিসটাকে খোলা যায়নি বলেই এরকম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তাই উনি জিনিসটাকে মসজিদে না নিয়ে সোজা ওয়ার্কশপে নিয়ে যান, যাতে ওটাকে ঠিক করে তারপর মসজিদে নিয়ে কাজে লাগাতে পারেন। যাই হোক, ওয়ার্কশপের লোকেরা জিনিসটাকে পরখ করে জানায়, এটা খুলতে হলে ওপরের ডালার একটা অংশ কাটতে হবে। এছাড়া এটা খোলার আর কোন উপায় নেই। সেটা করতে হলে সময়ও লাগবে সেই সাথে টাকাও খরচ হবে। টাকার পরিমাণ শুনে ইমাম সাহেব আঁতকে ওঠেন। উনি পরবর্তীতে জানাবেন বলে সেখান থেকে প্রস্থান করার পর আর আসেননি।”

“এবার জিনিসটার স্থান হয় এবার সেই ওয়ার্কশপের প্রাঙ্গনে একটা পুকুরের পাড়ে। ওখানেই ওটা পড়ে থাকে মাস তিনেক। এর মধ্যে তৎকালীন মালিক ওয়ার্কশপটা বিক্রি করে দেয় আরেকজনের কাছে। নতুন মালিক সব জিনিসপত্র বুঝে নেয়ার সময়ে এই জিনিসটাও তার হস্তগত হয়। নতুন মালিক প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি জিনিসটা নিয়ে কী করবে, পরে সে সিদ্ধান্ত নেয় যেহেতু জিনিসটা লোহার তৈরী, কাজেই এটাকে টুকরো টুকরো করলে অনেক লোহা পাওয়া যাবে। তাই সে এটাকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় তার লোকজনকে। ওরা অক্সিএসিটিলিন টর্চ নিয়ে কাজ শুরু করে। প্রায় দুইদিন টানা কাজ করার পরে ওরা যখন জিনিসটার ওপরের ডালার একটা অংশ প্রায় আলগা করে ফেলেছে ঠিক তখুনি,” বলে মহিলা একটু উত্তেজনা আনার জন্যে থামলো।

কিন্তু জয়ার উত্তেজনা বাশারকে স্পর্শ করলো না। জয়া আবারো শুরু করার আগেই বাশার বলে উঠলো, “আচ্ছা, আপনি তখন থেকেই কি এক সিন্দুকের গল্প করে চলেছেন। এর সাথে আমার পুকুরের নিচে পাওয়া গাড়ি আর বর্তমান কেসের সম্পর্ক কি, এর ধারের কাছেও যাচ্ছেন না। ব্যাপারটা কি বলুন তো?”

“শুনুন আপনার কান ধারণাও নেই আপনি কিসের ভেতরে জড়িয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটা কতোটা বড় আমিও সেটা পুরোপুরি জানি না। কিন্তু এর একটা অংশ বুঝতে হলে আপনাকে অন্য অংশটা শুনতে হবে। আচ্ছা আমাকে বলুন তো,” জয়া এবার সরাসরি বাশারের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাশার আবারো দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। “আপনার কি এই সিন্দুকের

ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। এরপরে কি হলো সেটা জানার জন্যে কৌতুহল হচ্ছে না?"

বাশার একবার কাঁধ ঝাকালো। "অস্বীকার করবো না, হচ্ছে। আচ্ছা বলুন এরপরে কি হলো। সিন্দুক থেকে দৈত্য দানো বেরিয়ে এল?"

জয়া হেসে উঠলো। "না, সেরকম কিছু হয়নি। কিন্তু যেটা ঘটেছিল সেটাও কম আশ্চর্যজনক নয়। সিন্দুকের ডালাটা প্রায় খুলে এসেছে এমন সময় তীব্র বিস্ফোরণে ছিটকে পড়ে আশেপাশের সবাই। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে মুক্তাগাছা শহরের একাংশ। আমি একজন প্রত্যক্ষ্যদর্শীর কাছে শুনেছি সেই শব্দের প্রকটতা এতোই বেশি ছিল যে আশেপাশের অনেক বাড়ির জানালার কাঁচ পর্যন্ত ভেঙে গেছিল।"

"তাই নাকি? তা ভেতর থেকে কি বের হলো?" বাশার এতোক্ষণে কৌতুহল বোধ করতে শুরু করেছে।

"সাত রাজার সম্পদ। বিশ্বাস করুন আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। কি ছিল না সেই সিন্দুকের ভেতরে। সোনা-রূপার মোহর, অসংখ্য দামি জুয়েলারি, হিরে বসানো হাতির দাঁতের দাবার সেট, সোনার তৈরী ডিনার সেট, কাঁচা সোনার তৈরী নানা ধরনের দেব-দেবীর মুর্তি। আরো কি-কি ছিল কে জানে। সবটা কখনোই জানা যায়নি। সিন্দুক খুলতেই আশেপাশে যারা ছিল তারা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে-যা পেয়েছে লুটে নিয়েছে। তখন সময়টা এমনিতেই উত্তাল তার ওপরে এরকম গণিমতের মাল কে ছাড়ে। অবশেষে যখন পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌছায় তখন সিন্দুকের তলায় পুরনো কিছু দলিল-পত্র আর কাগজ ছাড়া তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। ও ছিল, কিছু দামি জিনিসও ছিল যেগুলোকে ওজনের কারণে লোকজন খালি হাতে বহন করে নিতে পারেনি। তবে তৎকালীন পুলিশরা একটা ভালো কাজ করে। সাথে- সাথে আশেপাশের এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে আরো বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার করে সরকারের কাছে হস্তগত করে। সেই জিনিসগুলোর কিছু চলে যায় ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে, কিছু রয়ে যায় ময়মনসিংহের জাদুঘরে।"

"এগুলোর জন্যেই কি ডাকাতি হয়?"

"নাহ। এই ঘটনার পরে কেটে যায় বহু বছর বছর। অনেক কিছুই বদলে গেছে এর মধ্যে। তবে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারে। তাদের শেষ বংশধরদের অস্তিত্বও তখন প্রায় শেষের দিকে।

এমন সময় মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর বিজয় আচার্য নামে একজন সেই সিন্দুকে পাওয়া জিনিসগুলো দাবি করে বসে। সরকারের সাথে লড়াই করে সে শেষ পর্যন্ত সেগুলোর কিছু অংশ সে নিজের দখলে নিয়ে আসতে পারে। বেশিরভাগ দামি জিনিসই প্রতœতাত্বিক ডিপার্টমেন্টের অধীনে রয়ে যায়। শুধুমাত্র পুরনো কিছু দলিল আর কাগজপত্র সে নিজের অধীনে নিতে সক্ষম হয়। এই কাগজপত্রের ভেতরেই সম্ভবত ছিল একটা ডায়েরি। এই ডায়েরি থেকে সে জানতে পারে তার পরিবারের বহু পুরনো একটা কালী মুর্তি লন্ডনের এক মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সে বহু সাধ্য সাধনা করে এই মুর্তিটাকে দেশে আনার চেষ্টা করে কিন্তু লাভ হয়নি। পুরোপুরি নিয়ে আসতে না পারলেও সে এটাকে অন্তত একবারের জন্যে হলেও দেশে এক্সিবিশনের জন্যে নিয়ে আসার অনুমতি পায়।”

“এই এক্সিবিশনের সময়েই সেই ডাকাতির ঘটনাটা ঘটে, ঠিক?” বাশার প্রশ্ন করলো।

“ঠিক। ব্যাপারটা ঘটে খুব সহজেই। এক্সিবিশনের দায়িত্ব ছিল মংমনসিংহ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে। ওদের সাথে সংযুক্ত ছিল ইংল্যান্ড থেকে আসা প্রতিনিধি। ওরা জমিদারদের রাজবাড়ি শশীলজ- মানে যেটা এখন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-সেটার প্রাঙ্গনে আয়োজন করে প্রদর্শনীর। তো যেদিন প্রদর্শনী হবার কথা সেদিনই এক্সিবিশনের জন্যে সব সাজানোর পরে তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা এসে উদ্ভোধন করার কথা। সবাই অপেক্ষা করছে, এমন সময় জমিদার বাড়ির চত্বরে দুটো গাড়ি এসে থামে। কিছু অস্ত্রধারী বেরিয়ে এসেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা প্রদর্শনীর চত্বরে প্রবেশ করে। সিউকিউরিটির কয়েকজনকে আহত করে শুধুমাত্র একটা জিনিস নিয়ে চলে যায় তারা।”

“নিশ্চই সেই কালী মুর্তি?” বাশার মনে-মনে ভাবলো এরকম টুইস্ট ছাড়া ডাকাতির ঘটনা সে এর আগে পড়েছে বলে মনে পড়লো না।

“হ্যা, সেই কালী মুর্তি।”

“এই ঘটনা তো মনে হয় সেই জমিদারদের বংশধরই করিয়েছে।”

“হতে পারে, আবার নাও পারে।”

“মানে?” বাশার এবকটু অবাক হয়েছে।

“মানে ঘটনা যখন ঘটে জমিদারদের সেই একমাত্র বংশধর নাকি জাদুঘর প্রাঙ্গনেই ছিল। এরপর পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাকে খুঁজতে গেলে আবিষ্কার হয় সে নেই। নেই যে নেই। সাথে সাথে তার খোঁজ লাগানো হয়, তার বাড়িতে বসানো হয় পুলিশ পাহারা। ”

“অদ্ভুত!,” জয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো বাশার। “কি এমন মুর্তি! ওটা কি খুব বেশি দামি ছিল নাকি? তবে যাই হোক, এখন বলেন এই ঘটনার সাথে আপনার সম্পৃক্ততা কি, আর আমাদের বর্তমান ঘটনারই বা সম্পৃক্ততা কি?”

“প্রথমত, এই ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি ছিলাম একটা জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধি। এই ডাকাতির ঘটনার পরে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় এই ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখতে। আমি কাজ শুরু করার দুদিন পরেই হঠাৎ আমাকে ডেকে নিষেধ করে দেয়া হয়। আমি জানতে পারি ওপর মহল থেকে এই কেসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পাই সব জায়গা থেকে এই ব্যাপারে সমস্ত নিউজ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। দেখতে দেখতে চোখেন সামনে পুরো ব্যাপারটা ঁ্রফে ধামাচাপা পড়ে যায়। এর কয়েকদিনের ভেতরেই তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের বিশেষ বাহিনীর সাথে তৎকালীন ছাত্রদের গন্ডগোলে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো দেশ, ধামাচাপা পড়ে যায় ব্যাপারটা। এ-নিয়ে আর কেউই উচ্চ-বাচ্চ করেনি। আমি আজো জানতে পারিনি ওই সময়ে আসলে কী ঘটেছিল। চোখের সামনে থেকে একটা পরিবার, তাদের ইতিহাস হারিয়ে গেল কিভাবে। হয়েছিল কি আসলে।”

“কিন্তু সেই ঘটনার সাথে আমাদের বর্তমান ঘটনার সম্পৃক্ততা কোথায়?” বাশার প্রায় একই প্রশ্ন রিপিট করলো।

“বলছি। তবে তার আগে মুর্তিটার কথা বলে নেই। ওইদিনের পর এক্সিবিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর ওই এক্সিবিশন থেকে চুরি হওয়া মুর্তিটাকেও কখনো পাওয়া যায়নি। মুর্তিটা খুবই দূর্লভ ছিল। বেশ দামি কষ্টি পাথরের তৈরী কালো রঙের একটা কালী মুর্তি। তবে মুর্তিটা অমূল্য,” বলে সে বাশারের দিকে ফিরে তাকালো। “কারণ এটা একটা ঐতিহাসিক মুর্তি। এই মুর্তি নিয়ে অনেক মিথ প্রচলিত আছে।”

বাশার হেসে উঠলো। “হ্যা, এসব পুরনো দিনের মুর্তি মানেই নানা মিথ-রহস্য-জ্বিনের আসর আর বিশেষ ক্ষমতা, তাইনা?”

জয়া হাসলো না। “হতেও পারে আবার নাও পারে। কোনটা ঠিক-বেঠিক কে জানে, তবে এসব পুরনো জিনিসের সাথে এসব মিথ যোগ হওয়া মানেই এসবের অ্যান্টিক ভ্যালু বৃদ্ধি পাওয়া। আর দাম বৃদ্ধি মানেই,” বলে সে কাঁধ নাড়লো। “বুঝতেই পারছেন যেকোন জিনিসের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি মানেই ঝামেলা। এর পেছনে লোক লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ওপরে এই মুর্তি নিয়ে প্রচলিত আছে এটা নাকি মৃত মানুষকে জিবীত করতে পারে,” বলেই জয়া হেসে উঠলো।

বাশারও তার সাথে হেসে উঠতে যাচ্ছিলো কিন্তু সাথে সাথে বাশারের চোখে ভেসে উঠলো সাদা চামড়ার সেই লোকটার চেহারা যাকে টমি বলছে মৃত আর তাকে আজ সকালেই জীবিত অবস্থায় দেখেছে ও নিজের চোখে। মৃত মানুষ কি আসলেই ফিরে আসতে পারে? মনে-মনে ভাবলেও ও মুখে কিছু বললো না এ-ব্যাপারে। “এসব ফালতু কথা বিশ্বাস করতে বলেন আমাকে।”

“আসলে আমি এসব ব্যাপারে খুব বেশি জানি না। তবে এটা জানি, এই মুর্তি খুবই বিখ্যাত। বিশেষ করে বৃটিশ ভারতের পুরনো যতোগুলো বিখ্যাত আর্টিফ্যাক্ট আছে সেগুলোর মধ্যে এটাও একটা। এই মুর্তিটা বিখ্যাত হবার পেছনে আরো একটা কারণ হলো এই মুর্তি নাকি একটা জোড়া মুর্তি। জোড়ার একটা মুর্তি হারিয়ে গেছে, অন্যটা ছিল ইংল্যান্ডের এক মিউজিয়ামে। সেই ইংল্যান্ডের মুর্তিটাই ময়মনসিংহে এনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যখন ওটা চুরি হয়ে যায়।”

“ঘটনাটা আরেকটু বিস্তারিত বলেন, প্লিজ।”

“বিজয় আচার্য- মানে জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর- সিন্দুকের ভেতরে থেকে পাওয়া নথি থেকে জানতে পারে তার পূর্ব পুরুষদের একটা এরকম জিনিস ইংল্যান্ডের কোন একটা মিউজিয়ামে আছে। ময়মনসিংহ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনুরোধ করে সে প্রথমে জিনিসটা আনানোর চেষ্টা করে দেশে। সেটা করতে না পেরে সবশেষে সে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই প্রদর্শনীতে মূলত তিনজন মানুষ ছিল। প্রথমত জমিদারদের সেই শেষ বংশধর- বিজয়, তার সাথে ময়মনসিংহ মিউজিয়ামের তৎকালীর কিউরেটর আর ইংল্যান্ডের সেই মিউজিয়ামের প্রতিনিধি। এই তিনজন মিলেই মূলত আয়োজনটা করেছিল।”

“আচ্ছা,” বলে বাশার মুখ কুঁচকে উঠলো। “আপানারা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হলেন কখন? প্রদর্শনীর আগেই না পরে?”

“প্রদর্শনীর কয়েকদিন আগে আমাকে ওটা কভার করার অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয় আমার পত্রিকা অফিস থেকে। প্রদর্শনীর আয়োজনতো করা হলো। কিন্তু প্রদর্শনীর উদ্ভোধন করার আগেই হয়ে গেল ডাকাতি। প্রদর্শনী উদ্ভোধনের কথা ছিল রাত আটটায়। আমার যতোটুক মনে পড়ে সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা আসতে একটু দেরি হওয়াতে প্রদর্শনীর সময়টা শেষ মুহূর্তে একটু পেছানো হয়। এরপরে তো হয়ে গেল ডাকাতি। ডাকাতির ঘটনাটা ঘটার কিছু পরেই কয়েকটা ঘটনা ঘটে। ওইদিনের ডাকাতির ঘটনার পর বিজয় আচার্যের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সেটা পরে বলছি। ঘটনার পরেই সবাই ধরে নেয় ইংরেজ সেই প্রতিনিধির সাথে মিলে জমিদারদের সেই বংশধর বিজয়ই ডাকাতিটা ঘটিয়েছে। আর ডাকাতির পর সেই তারা মুর্তিটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই ঘটনাতে আরো মদদ যোগায় একটা ব্যাপার। সেটা হলো ডাকাতির ঘটনার পর খোঁজ-খবর করতে গিয়ে বের হয় ইংরেজ যে-প্রতিনিধি মুর্তিটার দলের সাথে এসেছিল সে আসলে এশিয়া থেকে ইউরোপে অ্যান্টিক চোরাচালানের সবচেয়ে বড় ডিলারদের একজন, সে একটা আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির পরিচয়ের আড়ালে এই কুকাজগুলো করে বেড়াতো। আরো জানা যায় সে ই মূলত লবিং করে এই মুর্তিটা বাংলাদেশে আনিয়েছিল। তো মোটিভ ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। আনটিল নাউ।”

“তারমানে আপনি বলছেন পুরো ব্যাপারটা জমিদারদের সেই বংশধর আর এই অ্যান্টিক ডিলার মিলেই করে। তারপর তারা মুর্তিটা ডাকাতি করিয়ে ¯ফে হাওয়া হয়ে যায়?”

“একটা সময় পর্যন্ত ব্যাপারটা তাই ছিল,” জয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগলো।

“তবে এটার সাথে আমার এই পুকুরের তলার গাড়িটার সংযোগ কোথায়? আর এই ঘটনার সব নথিপত্র রেকর্ড গায়েব করে দেয়া হয় কেন?” বাশার এখনো চিন্তায় আছে একটা সিগারেট ধরাবে কিনা।

“বলছি। নথিপত্র গায়েব করে দেয়ার ব্যাপারটা আগে বলছি। যে-মুর্তিটা ডাকাতি হয় সেটা ছিল হিন্দু দেবী কালীর মুর্তি যেটা অনেক হিন্দু কমিউনিটির জন্যে খুবই স্পর্শকাতর একটা ব্যাপার। তাই মুর্তি চুরি নিয়ে

যখন জল ঘোলা হতে থাকে তখন স্থানীয় হিন্দু কমিউনিটি থেকে ব্যাপারটা নিয়ে চাপ আসতে থাকে। সেইসাথে সরকার দেখতে পায় ব্যাপারটাতে তাদেরও অনেক গাফিলতি ছিল কাজেই তারা ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়ে দেয়। আমরা যারাই এই কেসে কাজ করছিলাম সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয় এই নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। তখন চলছিল কেয়ারটেকার সরকারের আমল, এমনিতেই দেশে ইস্যুর কোন অভাব নেই। কাজেই এটার কথা লোকে মনেও রাখেনি খুব বেশিদিন। তাই সরকারের একটা মহলের এটা ধামাচাপা দিতে কোনই কষ্ট হয়নি। এবার দ্বিতীয় কথায় আসছি। এই ডাকাতির সাথে আপনার পুকুরের তলার ঘটনার সংযোগ হলো যে-অ্যান্টিক ডিলার ভূয়া প্রতিনিধি সেজে ডাকাতির ঘটনাটা ঘটিয়েছিল বলে মনে করা হয় সেই লোকটা একটা কালো শেভ্রোলে সেডান চালাতো। আমার ধারণা এই গাড়িটাই আপনি আর আপনার লোকরা ওই পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। আর গাড়ির ভেতরে পাওয়া সেই দেহবাশেষও মনে হয় সেই লোকটারই," জয়া এই পর্যন্ত বলতেই ও মোবাইলটা বের করে সিজিআই দিয়ে বানানো টমির দেয়া সেই ছবিটা জয়াকে দেখালো। "এই লোকটাই কি?"

জয়া মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখলো। "হ্যা, এই লোকই সেই অ্যান্টিক ডিলার। কি জানি নাম, মনে নেই। তবে আপনাদের পুকুরের তলা থেকে উদ্ধার করা গাড়িটা আর এই লোকটার দেহাবশেষ উদ্ধারের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব কি জানেন?"

বাশার চুপ করে রইলো চোখে প্রশ্ন।

"গুরুত্ব হলো। আপনাদের এই গাড়ি উদ্ধারের আগ পর্যন্ত ধরে নেয়া হয়েছিল এই ব্যাটা মুর্তিটা ডাকাতি করিয়ে সে জমিদারদের বংশধর বিজয়কে ধোঁকা দিয়ে মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে। আপনার এই গাড়িটা আর লোকটাকে উদ্ধারের আগ পর্যন্ত এটাই প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু আপনার এই গাড়িটাকে খুঁজে পাওয়া প্রমাণ করে লোকটা মুর্তি নিয়ে পালায়নি বরং তার স্থান হয়েছিল ময়মনসিংহের অখ্যাত এক পুকুরের তলায়। তবে প্রশ্ন হলো ডাকাতি হওয়া মুর্তিটা গেল কোথায়। গাড়িতে তো কিছুই পাওয়া যায়নি।"

" পুরো পুকুর চষে দেখা হয়েছে সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। তবে আপনি যেভাবে ভাবছেন ব্যাপারটা অতোটা জটিল না। কারণ এতো বোঝাই যাচ্ছে জমিদারদের সেই বংশধরই খেলাটা এখানে বাজিমাত করেছে। কারণ তারা দুজনে মিলেই যদি ডাকাতিটা ঘটিয়ে থাকে তবে সেই নিজের পার্টনারকে

মেরে পুকুরের তলার ফেলে দিয়ে ওই মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছিল। সহজ ব্যাপার," বলে বাশার বলে ও কাপের অবশিষ্ট চা-টুকু পেটে চালান করে দিলো।

"ব্যাপারটা অতো সহজ না মিস্টার বাশার। অতো সহজ হলে তো ভালোই ছিল..."

"ম্যাডাম, হোটেল বন্ধ হইবে," ওয়েটার ছেলেটা এসে জানিয়ে গেল ওদেরকে।

"ক্যান আবার তোর বাপের বিয়া লাগছে নি?" বলে সে আরো কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই বাশার তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এই মহিলার আচার আচরণে একটু বিরক্ত বাশার। জয়া কিছু বলার আগেই সে মোবাইল বের করে আবদুল্লাহকে কল করে কাছাকাছি আসতে বললো।

"কেস কিন্তু প্রায় শেষ।"

"মানে," জয়া আরেকটা সিগারেট ধরাচ্ছে হাঁটতে-হাঁটতে।

"মানে খুব সহজ। তিনজন মানুষ মিলে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করলো। সেই প্রদর্শনীতে ডাকাতি হলো। ডাকাতির পরে দেখা গেল সেই তিনজনের দুজন গায়েব। ধরে নেয়া হলো এই দুজনে মিলেই ডাকাতিটা করেছে। তো কেস পরিষ্কার, এই ভূয়া প্রতিনিধি আর জমিদারদের বংশধর মিলে ডাকাতি করা মুর্তি নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু এর এগারো বছর পর সেই ভূয়া প্রতিনিধির লাশসহ তার গাড়ি পাওয়া গেল একটা পুকুরের তলায়। এটাতো পরিষ্কার সেই জমিদারদের বংশধর বিজয় তার ভূয়া পার্টনারকে মেরে পুকুরের তলায় দাফন করে দামি মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে।"

"ব্যাপারটা আসলে এতোটাও সহজ নয় কারণ জমিদারদের সেই বংশধরের পক্ষে এতো সহজে পালানো সম্ভব ছিল না... কারণ যেদিন সেই প্রদর্শনীতে ডাকাতি হয় সেদিনই ডাকাতির ঘটনার স্পট থেকে গায়েব হয়ে যায় জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর।"

"বিজয়," বলে উঠলো বাশার। "বিজয় আচার্য।"

“হ্যা, সে স্পট থেকে গায়েব হয়ে যাবার পরে সবাই ভাবে সে আর সেই প্রতিনিধি মিলে ডাকাতি করিয়ে মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে। সাথে-সাথে তার বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো হয় যাতে সে এলেই ধরা পড়ে... এবং সে এসেছিল। ভোরের দিকে পাহারারত পুলিশেরা যখন প্রায় ঘুমে সে চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে পুলিশের চোখে ধরা পড়ে যায়। পুলিশ তাকে থামতে বললেও সে কোনমতে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পুলিশেরা বাড়িতে ঢুকতে গেলে ভেতর থেকে সে গুলি চালায়। তখন আরো পুলিশ এসে বাড়ি ঘিরে ফেলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওরা বিজয়কে যখন প্রায় কব্জা করে ফেলেছে এমন সময় রান্নাঘরে গিয়ে লুকায় সে। সেখানে গোলাগুলির এক পর্যায়ে রান্না করার এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুই পুলিশ সদস্যসহ সে পুড়ে মারা যায়। বাকি তিন পুলিশ আহত হলেও তারা প্রাণে বেঁচে যায়। তাদের জবানিতেই বাকিটা জানা যায়। সবাই ধরেই নেয় বিজয় আচার্য আর ভূয়া প্রতিনিধি মিলে ডাকাতিটা ঘটিয়েছে। সবশেষে বিজয়কে ঠকিয়ে সেই বিদেশী প্রতিনিধি মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে। কেস এখানেই শেষ হয়ে গেছিল।”

“যদি না...”

“যদি না সেই ঘটনার এগারো বছর পরে আপনি শেষমোড়ের অখ্যাত এক পুকুরের তলা থেকে সেই গাড়ি আর সেই ভূয়া প্রতিনিধির লাশটা খুঁজে না পেতেন,” বাশারের কথাটা শেষ করে দিলো জয়া। “তবে এখানে একটাই প্রশ্ন রয়ে গেছে। সবাই এতোদিন ধরে যা ভেবে এসছিল সেটা ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে। এতোদিন সবাই ধরেই নিয়েছিল সেই বিদেশী প্রতিনিধি কালী মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু সেটা ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে আপনি সেই বিদেশীর লাশসহ গাড়িটা উদ্ধারের পরে। এরমানে সেদিনে রাতে ডাকাতির পরে সেও পালাতে পারেনি, আর মুর্তিটাও পাওয়া যায়নি। তারমানে ওই মুর্তি এখনো এখানেই কোথাও না কোথাও রয়ে গেছে।”

“আর এই কেস সলভ করতে হলে সেটাই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।”

অধ্যায় বিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

মুক্তাগাছা জমিদারের কাচারি বাড়ি, মধুপুর

“আমাদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, কথাটা বুঝিয়ে বলো ওদেরকে,” কথাটা বলে শঙ্করের দিকে ফিরে সেটাকে অনুবাদ করে শোনাতে বললো ম্যাকফি।

ম্যাকফি যা বলেছে সেটাকে অনুবাদ করে শোনাতেই লোকটা জোরে-জোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানালো। অচেনা ভাষায় তড়-বড় করে কি-কি জানি বলতে লাগলো।

“কি বলছে ও?” শঙ্করের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো ম্যাকফি।

“ও বলছে, ওরা কিছুই জানে না। খেটে খাওয়া মানুষ ওরা, ওদেরকে এভাবে হেনস্তা করলে খোদার অভিশাপ লাগবে,” শঙ্করের মুখে শেষ কথাটা শুনে ফট করে হেসে উঠলো জোনাথন।

ওরা এই মুহূর্তে বসে আছে মুক্তাগাছার জমিদারের কাচারি বাড়ির বৈঠকখানায়। ঘোড়ার হাটে বাজিকরদের সাথে মারামারির পর প্রায় দু-ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে। ওদের তিনজনকে বন্দি করার পর ইংরেজ সৈন্যদের চুরি যাওয়া ঘোড়াগুলো সহ ওদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে ওরা জানতে পেরেছে বয়স্ক লোকটা বাবা আর কিশোর দুজন তার ছেলে। আর পালিয়ে যাওয়া দুজন ওদেরই দলের লোক ছিল কিন্তু তাদের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

এতোক্ষণ ম্যাকফির পাশেই বসে ছিল জোনাথন। বসে-বসে বন্দুকটা পরীক্ষা করছিল। হেসে উঠেই সে বলে উঠলো, “ব্যাটা বলে কি, একেতো ইংরেজ সৈন্যদের ঘোড়া চুরি করেছে, তার ওপরে আরেকটু হলে আমাদেরকে মেরেই ফেলেছিল আর এখন সে সাধু সাজার চেষ্টা করছে,”

বলে সে বন্দুকটা লোড করে ম্যাকফির দিকে তাকিয়ে ছ্যাঁত করে বলে উঠলো, “নরম পন্থায় কাজ হবে না।”

ম্যাকফি ওকে হাতের ইশারায় থামতে বলে পাইপটা উঠিয়ে নিলো। কিভাবে কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। এদেরকে চাপ দিলে বা অত্যাচার করলে স্থানীয় লোকজন কিংবা রাজার লোকরো বিদ্রোহ করে বসতে পারে। আবার একে চাপ না দিলে কিছুই জানা সম্ভব নয়। এর কাছ থেকে অনেককিছু জানতে হবে। ওরা ঘোড়াগুলো কিভাবে পেয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরে নির্ভর করছে অনেককিছু। যেভাবেই হোক এই প্রশ্নের উত্তর ওকে বের করতে হবে। আর সেটা করতে হবে খুব সাবধানে, আর দ্রুত। কারণ এতোক্ষণে নিশ্চই জমিদার বাড়িতে খবর পৌছে গেছে। কাজেই জমিদারের লোকেরা এখানে পৌছানোর আগেই কথা আদায় করতে হবে এর পেট থেকে।

ম্যাকফি পাইপে কষে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিরাট পাগড়ি পরা বয়স্ক লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, “তুমি করো কি? মানে পেশা কি তোমার? আর এরা কি তোমার ছেলে?”

শঙ্কর তর্জমা করে শোনালো ওর প্রশ্ন। লোকটা কিছুক্ষণ চুপ থেকে পট-পট করে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলে উঠলো। ম্যাকফি তাকিয়ে রইলো শঙ্করের দিকে।

“স্যার, সে কইতেছে ওরা হলো বিহারের গোধ স¤প্রদায়ের লোক। পরিবার লয়া পুরা ভারতবর্ষে ঘুইরা দড়ির খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। এই দুজন ওর ছেলে। ও বড় আর ও ছোট,” বলে শঙ্কর ছেলে দুজার দিকে একে একে নির্দেশ করে দেখালো। এর মধ্যে যাকে বড় ছেলে হিসেবে দেখালো এই ছেলেটাই বাপের সাথে ঝগড়া করে ম্যাকফির পাঁ বাঁধতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এখন জুল-জুল করে কাতল মাছের মতো তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অন্যটা ছোট ছেলে। দেখলেই বোঝা যায় এই ছেলেটা বেশ ঘাড়ত্যাড়া। একটু পর-পর বেঁধে রাখা দড়ি টানা-টানি করছে আর রাগের সাথে ওদেরকে দেখছে।

ম্যাকফি মনে-মনে ভাবলো এবার শক্ত হতে হবে। “মহাবীর সিং,” ও ডাক দিতেই একপাশে পাহারের মতো দাড়িয়ে থাকা মহাবীর সিং নড়ে উঠলো। সবসময়ের মতোই সে নিঃশব্দে ঘুরে তাকালো ম্যাকফির দিকে। নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

“এই ছেলেটাকে দড়ির বাঁধন খুলে আলাদা করে ফেল,” ছোট ছেলেটাকে দেখালো ম্যাকফি। মহাবীর সিং ওর দিকে এগিয়ে যেতেই রাগের সাথে গজরাতে লাগলো ছেলেটা। মহাবীর সিং তার হাত চেপে ধরতেই রাগের সাথে মহাবীর সিংয়েও মুখে লাথি মারলো। ধীর-স্থির মহাবীর সিংয়ের কোন বিকার নেই সে ছেলেটার দড়ির বাঁধন খুলে তাকে শূণ্যে তুলে ফেললো। ইতিমধ্যেই হাত-পা ছুঁড়ে লাথি মেরে কোন ফল না পেয়ে ছেলেটা তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে। তার চিৎকারে কান পাতা দ্বায়।

ম্যাকফি আবারো মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই সে ছেলেটাকে শূণ্যে তুলে ধরতেই বসে থাকা শান্ত ছেলেটা চিৎকার করে উঠলো। পরিষ্কার বাংলায় সে বলে উঠলো, “থামুন। আমি বলতাছি। ওরে ছাইড়ে দেন।”

ছেলেটার বাংলা শুনে সবাই কমবেশি অবাক হয়ে গেছে। তবে ওদের অবাক হবার পালা আরো বাকি ছিল। ছেলেটার কথা শুনে পাশ থেকে বুড়োটাও পরিষ্কার বাংলায় চেঁচিয়ে উঠলো। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে সে পরিষ্কার বাংলায় চিৎকার করে শাঁসাতে লাগলো যদি সে কিছু বলে তবে ওকে খুন করবে।

“বাহ্, এরা তো দেখি সব বাংলা জানে। তাহলে এতোক্ষণ ধরে ভঙ ধরে ছিল কেন?” জোনাথন আনমনেই বলে উঠলো। বিগত কয়দিন শুনে শুনে স্থানীয় বাংলার অনেকটা তার দখলে চলে এসেছে।

“এই চুপ, সবাই চুপ,” ম্যাকফি ধমকে ওঠার পরেও বুড়োটা চেঁচাচ্ছে। সাথে-সাথে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকফি। বুড়োটার দিকে হাতের পিস্তল তাক করে বললো, “আর একটা কথা বললে মাথা গুঁড়িয়ে দিবো।”

ম্যাকফির আধা বাংলা আধা ইংরেজি পুরোপুরি না বুঝলেও লোকটা চুপ হয়ে গেল। কারণ মুখের ভাষা বুঝতে না পারলেও বন্দুকের ভাষা দুনিয়ার প্রায় সবাই কম-বেশি বুঝতে পারে। লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে ও মহাবীর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো ছেলেটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখতে। বলার সাথে-সাথে আস্তে করে ছেলেটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখলো মহাবীর সিং।

“এই তুমি, এদিকে আসো,” অন্য ছেলেটাকে পিস্তলের ইশারায় কাছে ডাকলো ও। “বলো, কি বলতে চাও। তোমরা তো সবাই বাংলা জানো তাহলে এতোক্ষণ অভিনয় করছিলে কেন?”

ওর কথার জবাবে ছেলেটা দুই হাত জোর করে কথা বলতে লাগলো। “হুজুর, আমগর বাপুর নির্দেশ,” সে একটা হাত তুলে তার বাবার দিকে দেখালো। “সে এই এলাকায় খেলা দেহানোর সময়ে আমগরে কথা কইতে নিষেধ করে। আমগর কুনো দোষ নাই হুজুর।”

ম্যাকফি ছেলেটার জোর করে ধরে রাখা হাত দুটোকে নামিয়ে দিলো। “নাম কি তোমার?”

“হুজুর, আমার নাম পানু,” ছেলেটাকে এখন অনেকটাই স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

“শোন পানু,” তোমাকে যা-যা জিজ্ঞেস করবো ঠিক-ঠিক উত্তর দিবে, না হলে ভীষণ বিপদে পড়বে তোমরা। আর যদি ঠিক-ঠিক উত্তর দাও তবে কোন ক্ষতি হবে না তোমাদের।

“হুজুর, আপনি আজ আমাকে প্রাণে না বাঁচাইলে আমি এতোক্ষণে মইরে ভূত হয়া যাইতাম। আপনার কথার উত্তর দিতে পাইরলে আমার মনে অনেক শান্তি আসবে।”

ছেলেটার কথা শুনে ম্যাকফি একটু চমকে উঠলো। আচ্ছা তাহলে এই ছেলেটাকেই বট গাছ তলায় ও শূণ্য থেকে পতিত অবস্থা ধরেছিল। “ঠিক আছে, সত্যিই যদি আমার প্রতি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা থেকে থাকে তবে ঠিক-ঠিক উত্তর দিবে। প্রথম প্রশ্ন, তোমাদের বাবা তোমাদেরকে কথা বলতে মানা করে কেন? তোমরা তো দড়ির খেলা দেখানোর বাজিকর তবে কথা বলতে সমস্যা কোথায়?”

ম্যাকফির প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে ছেলেটা একবার তার বাপের দিকে তাকালো। বাপ তড়-বড় করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই মহাবীর সিং কুঠার হাতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে চুপ মেরে গেল।

“তুমি বলো।”

“হুজুর, আমরা আসলে বাজিকর নই। আমরা হলাম তুসুমবাজ।”

“তুসুমবাজ! সেটা আবার কি?” এরকম কোন শব্দ এর আগে ম্যাকফি শোনেনি। সে একটু অবাক হয়েই শঙ্করের দিকে তাকালো। শঙ্করকে দেখে মনে হলো এই ব্যাপারে সে ভালোই অবগত আছে। “শঙ্কর, তুসুমবাজ কি?”

“ওর কাছ থেকেই শুনেন হুজুর। এই বল।”

“হুজুর, আমারা ডাকাইত।”

“ডাকাত।”

“সরাসরি ডাকাইত না এরা,” ছেলেটা জবাব দেয়ার আগেই শঙ্কর বলে উঠলো। “আমি এগো কথা অনেক শুনছি। কিন্তু এমনে সরাসরি দেখতে পারবো সেইটা ভাবিনাই। এরা বিভিন্ন জায়গায় দড়ির খেলা দেখায়ে বেড়ায় আর সুযোগ পাইলে অন্ধকারে পথের ধারে রাইতের বেলা মানুষরে দড়ির ফাঁস দিয়া নাইলে মাথা ফাডায়া খুন করে।”

“বলো কি! তোমার বাবা আর তোমরা আমাদের ওপরে আক্রমণ করলে কেন? আর যে-দুজন পালিয়ে গেল ওরা কারা ছিল?” ম্যাকফি আবারো পাইপ টানতে শুরু করেছে। ও বেশ বুঝতে পারছে আবারো পুরোপুরি তামাকের নেশার জালে জড়িয়ে গেছে ও। এরকম পরিস্থিতিতে তামাক ছাড়া কিছুতেই চলছে না।

“হুজুর, যে দুইজন পলায়ে গেল হেরা আমাগো দলেরই মানুষ?”

“তোদের দলে আর কে কে আছে?” এবারের প্রশ্নটা শঙ্করের।

“আর কেউ নাই, আমরা ছুডো দল। পাঁচজনে খেলা দেহাই আর সইন্ধার পরে রাস্তার সাইডে একলা মানুষ পাইলে মাতা ফাডায়া জিনিসপত্র লইয়া পলাই,” ছেলেটার একেবারেই নির্বিকার জবাব।

“বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমাদের ওপরে আক্রমণ করলে কেন?” ম্যাকফি আবারো আগের প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করলো।

হঠাৎ বাইরের দরজায় ধাম-ধাম করে শব্দ হলো। ম্যাকফি মহাবীর সিংকে ইশারা করলো দেখতে কে এসেছে। মহাবীর সিং দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। দিনের আলো শেষ হয়ে বাইরে সন্ধ্যার ঘুঁটঘুটে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। বিকেল থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে।

মহাবীর সিং ফিরে এসে জানালো রাজার লোকেরা বন্দিদের ব্যাপারে ওর সাথে কথা বলতে চাইছে। ম্যাকফি একটু ভেবে ওদেরকে বাইরেই অপেক্ষা করতে বলার জন্যে মহাবীর সিংকে বাইরে পাঠিয়ে আবারো শুরু করলো।

“কারণ আইন্নেরা, ঘুড়া দেইখ্যা ফালাইছেন?”

“ঘোড়া দেখে ফেলেছি মানে কি?” ম্যাকফি আড়চোখে একবার শঙ্করের দিকে তাকালো।

“এইগুলা চুরির ঘুড়া,” ছেলেটা এটুকু বলতেই ওদের মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। “কাইল রাইতেই এইগুলা একজনে আমগরে দিছে বেইচ্চা দেউনের লেই¹া। আমরা এইরহম চুরির ঘুড়াও কেনাবেচা করি।”

“ঘোড়াগুলো যদি বিক্রির জন্যেই নিয়ে থাকো তবে এগুলো বাজারে তোলনি কেন?”

“কারণ এডিত্তে অহনো ছাপ তুলা অয়নাই। কাইল রাইতেই এডি পাউনের পরে ছাপ তুলুনের সময় পাই নাই,” ছেলেটা এবারো একেবারে নির্বিকার বলে যাচ্ছে।”

“একারণেই ওগুলো বাজারে তোলনি এখনো তোমরা। আর এটা আমরা দেখে ফেলাতেই আমাদের ওপরে আক্রমণ।”

“হুজুর আপনে আমারে বাঁচাইছেন আপনের লগে মিছা কমুনা। আমি হেগোরে নিষেদ করছিলাম। হেরা আমার কথা শুনে নাই। আমি এরুমও কইছিলাম সাদা চামড়ার মানুষগো মারলে বিপদে পড়–ন লাগবো। হেরা হুনে নাই।”

ম্যাকফি ছেলেটার বাপের দিকে তাকালো। “তোমার ছেলেরা যা বলছে তা কি সত্যি?”

লোকটা কিছুই না বলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। “কি হলো? কথা বলছো না কেন?” বলে ম্যাকফি তার দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো লোকটার সামনে। পাইপে কষে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিলো লোকটার মুখ বরাবর।

“তুমি আমাকে জানাবে ঘোড়াগুলো কার কাছ থেকে পেয়েছো। যদি সেটা না করো তবে তোমাকে আমি কিছুই করবো না। স্রেফ জমিদারের লোকদের হাতে তুলে দিবো। আমি শুনেছি এই এলাকায় নাকি চোর আর খুনিদেরকে শূলে চড়ানো হয়। কিভাবে চড়ানো হয় জানো? বড় একটা কাঠের পাটাতনের ওপরে চোখা একটা ডান্ডা বসানো থাকে। সেটাতে তেল

মাখিয়ে পিচ্ছিল করে ওপর থেকে অপরাধিকে বসিয়ে দেয়া হয় ওটার ওপরে," এই পর্যন্ত বলে ম্যাকফি থামলো। লোকটাকে ওর বলা কথাগুলো অনুধাবন করার সময় দিলো। তারপর আবারো বলতে লাগলো। "শরীরের পিছন দিয়ে ঢুকে মুখ-মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় চোখা ডান্ডা। এবার বলো, তুমি আর তোমার তিন ছেলে জমিদারের হাতে পড়বে, নাকি আমার সাথে কথা বলে মুক্তি পাবে?"

লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাকফির দিকে। দুজনার কারোরই চোখের পলক পড়ছে না। হঠাৎ লোকটা মুখ ফাঁক করতেই কাঁচা-পাকা দাড়ির ফাটলের ভেতরে দুইসারি পানের দাগওয়ালা দাঁত দেখা গেলো। ম্যাকফিকে দন্ত প্রদর্শন করে করেই খিক-খিক করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো লোকটা। তারপর হো-হো করে হাসতে লাগলো। খুব গম্ভীর আর রাগি ভাব নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল ম্যাকফি। লোকটা এভাবে হেসে ওঠাতে বোকা বনে গেল ও। একবার শঙ্করের দিকে আরেকবার জোনাথনের দিকে দেখলো। লোকটা এখনো বিকারগ্রস্থের মতো হেসেই চলেছে।

মহাবীর সিং খপ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে আনলো। শান্তশিষ্ট মানুষটাকে রাগে লাল দেখাচ্ছে। তবে সে কিছু করার আগেই লোকটা কথা বলে উঠলো, "ছায়েব, বারো বছর বয়সে পরথম মানুষ মারি আমি। এরপরে এই পঞ্চাশ বছরের চুরি-ডাকাইতির জীবনে অন্তত একশ মানুষ মারছি, আর তুমি আমারে মরার ভয় দেহাও। আমি কিছুই কমু না। তুমরা কেউই," বলে সে একে-একে সবার দিকে দেখলো। "আমারে দিয়া কিছুই বলাইতে পারবা না," বলে সে মাটিতে একদলা থুতু ফেললো।

"তাহলে তোমাকে তো বটেই তোমার এই দুই ছেলেকেও জমিদারের লোকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ওরা বাইরেই বসে আছে। আমি স্রেফ একবার ডাক দিলেই ভর্তা করে ফেলবে তোমাদের।"

লোকটা কিছুই না বলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

"হুজুর, আমি বলবো তোমরা কি জানতে চাও," ছেলেটা কথা বলে উঠলো। "তবে আমারে আর আমার ভাইরে ছাইড়া দিতে হবে," ম্যাকফি একবার জোনাথনের দিকে তাকালো। জোনাথন সম্মতিসূচক ইশারা করতেই ম্যাকফি বলতে শুরু করলো। "তোমাদেরকে নিয়ে কি করা হবে সেটা আমি এখনো বলতে পারছি না। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে জমিদার

আচার্য। কারণ এটা তাদের এলাকা। তবে তুমি যদি আমাকে ঠিকমতো সাহায্য করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা আমি দেখবো। তবে সবই নির্ভর করছে তুমি আসলে কী জানো আর আমাদের কতোটুক সহায়তা করতে পারবে সেটার ওপরে।”

ওর কথা শেষ হতেই ছেলেটা একবার তার ভাইয়ের দিকে ইশারা করলো। অন্য ছেলেটা নেতিয়ে পড়া অবস্থা থেকে এখন সোজা হয়ে বসেছে। ওদের কথাবার্তাও শুনে এটাও বুঝতে পেরেছে বাপের কথা শুনলে এখন মরতে হবে। তারচেয়ে ভাই যা বলছে সেটাই ভালো। সেও তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলো।

“হুজুর, আমাদের বাপু ঘোড়াগুলো কোথা থেকে কার কাছ্ থাইকে পাইছে সেইটা আমি বলতে পাইরবো না। তয় যে-লোকটার কাছ থেকে বাপু এগুলা নিছে সেই লোকের সাথে আজ রাতে তার দেখা করার কথা টাকার ভাগ নিয়ে হিসেব করার জইন্যে। ওরা কুথায়-কুন সময়ে দেহা করবে হেইডা আমি জানি। আমি আপনেগো দেহায়া দিতে পারবো।

ম্যাকফি সাথে সাথে জোনাথনের দিকে ফিরে তাকালো। ওরা এইবার একটা সরাসরি রাস্তা পেয়েছে যেখান থেকে কোম্পানির সৈন্যদের ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছিল সেটা বের করতে পারবে।

অধ্যায় একুশ

বর্তমান সময়

হোটেল মোস্তাফিজ ইন্টারন্যাশনাল, ময়মনসিংহ

নিঃশ্বাস যেন বুকের ভেতরে চেপে বসতে চাইছে। বড় ক'রে একবার দম নিয়ে ঘড়ি দেখলো বাশার। এগারোটার ওপরে বাজে, আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা আসছে না কেন। এই খবর বের করতে তো এতোক্ষণ লাগার কথা নয়।

ওরা আসতে-আসতে সে মাথার ভেতরে সবকিছু আরেকবার যাচাই বাছাই করে নেয়ার চেষ্টা করলো। বাম হাতের আংটিটা ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পুরো ব্যাপারটাকে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো মাথার ভেতরে। ব্যক্তিগত আর কর্মজীবন দুটোর অবস্থাই ভয়াবহ খারাপ। নিজের মা মারা গেছে, মায়ের লাশটা দেখা তো দূরে থাক আজতক তার কবরটা পর্যন্ত দেখার ভাগ্য হয়নি। নাকি নিজের গোয়াতুর্মির কারণে দেখতে পারেনি? হতে চেয়েছিল জ্ঞান বিতরণকারী, হয়ে গেছে আইন প্রয়োগকারী। সেখানেও চমৎকার একটা ডিমোশন আর বদলি নিয়ে এসেছে সেই শহরে যেখানে সে জীবনেও আসতে চায়নি। যাই হোক, সেখানে এসেও কপাল খারাপ এখানকার ভারপ্রাপ্ত ওসি ওরই একসময়কার বন্ধু যেকিনা এখন তার শত্রু রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ধরিয়ে দিয়েছে এমন এক কেস যার কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হলো...

"স্যার কি ঘুমাই গেলেন নাকি?" বেশ বয়স্ক ড্রাই ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে সামেনর সিট থেকে জানতে চাইলো।

"নাহ, ঘুমানোর সুযোগ কই। এখনো নাস্তাই করতে পারলাম না," কথাটা বলার সাথে সাথেই পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো ওর। "বাসিত মিয়া, তুমি তো বহু বছর ধরে পুলিশে আছো।"

“জি স্যার, তা প্রায় বিশ বছর তো হবেই,” বলে বুড়ো ড্রাইভার একটু হাসলো।

“কখনো শুনছো মরা মানুষ জ্যান্ত হইতে?”

“না স্যার, বহুত রঙ্গের কাহিনী শুনছি কিন্ত এরকম শুনি নাই,” বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। “তয় স্যার মরা মানুষ জ্যান্ত হইতে না দেখলেও বহু জ্যান্ত মানুষরে চোখের সামনে মরতে দেখছি। আর মরণেরও বহু পন্থা আছে। কিছু কিছু মরণ আছে শারীরিক মরণের চেয়ে বেশি খারাপ। স্যার আপনে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। তাই কইতাছি, আপনে কোন ভুল করলে ওসি কিন্তু আপনের বারোটা বাজায় ছাড়বো। হেয় যে আপনের পিছে লাগছে এইটা এখন কতোয়ালি থানার উপেন সিক্রেট। আর কাউরেই বিশ্বাস কইরেন না স্যার।”

“হুম, বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ, বাসিত মিয়া। কথাগুলো আমি মনে রাখবো,” বলে মাথার পুলিশি টুপি খুলে ভিউ মিররে চেহারাটা একবার দেখে নিলো ও। হাজার হলেও একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে, তা সে যতো কুৎসিতই হোকনা কেন। “বাসিত মিয়া, তুমি চলে যাও। একটু পরেই আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা আসবে, আমি ওদের সাথে কাজে নামবো।”

ড্রাইভার বিদায় নিতেই বাশার টুপিটা আবারো পরে নিয়ে হোটেল মোস্তাফিজের প্রবেশ পথের দিকে এগোল। হোটেলের সামনের ছোট পেট্রল পাম্পটা পার হয়ে পায়ে চলা পথটা ধরে চলে এল প্রবেশ পথের কাছাকাছি। কাঁচের বিরাট সুইং ডোরটা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতে যাবে এমন সময় অপর পাশ থেকে ফোনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসা আরেকজন মানুষের সাথে ধাক্কা লাগলো ওর। লোকটা ওরই মতো লম্বা হবে। পরনে জিন্সের শার্ট, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। ফোনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল।

সে আর বাশার একই সময়ে সুইং ডোরটা ঠেলে প্রবেশ করতে গিয়ে একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগতেই লোকটার হাত থেকে ছুটে গেল ফোনটা। আর বাশারের হাত থেকে ছুটে গেল সুইং ডোরের হাতল। হাতল ছুটে যেতেই কাঁচের ভারি পাল্লাটা ছুটে এল সোজা লোকটার দিকে। সাথে-সাথে লোকটার কোমর ধরে খপ করে টেনে তাকে সরিয়ে নিলো বাশার। লোকটাও ওর ইউনিফর্মের কাঁধ খামচে ধরে নিজের পতন সামলালো।

“সরি ভাই, সরি,” নিজেকে সামলে নিয়ে বাশারকে ধন্যবাদ জানালো লোকটা।

“সাবধানে হাঁটেন ভাই, চোখের মাথা খেয়ে আসছেন নাকি সকালবেলা!” মেজাজটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে বাশারের। নিজের টুপি আর ইউনিফর্ম সামলে নিয়ে সামনের দিকে এগোল। হোটেলের রিসিপশন আর লাউঞ্জ পার হয়ে চলে এল দোতলার রেস্তোরায়। বেলা একটু পড়তির দিকে হলেও এখনো অনেকেই বসে নাস্তা করছে। ভেতরে প্রবেশ করে একবার চোখ বুলিয়েই একপাশের টেবিলে বসে নাস্তা করতে দেখলো জয়া সরকারকে।

মনে মনে ভাবলো, যে গায়ের রঙ! দুই মাইল দূর থেকেও চোখে পড়বে। কাছে এসে দেখলো অনেক খাবার তার টেবিলের ওপরে। ওকে দেখে কোন হাই-হ্যালো না কিচ্ছু না বলে খিক-খিক করে হাসতে লাগলো। জয়ার হাসি দেখে বাশারের গরম মেজাজ আরো গরম হয়ে গেল।

“কি ব্যাপার, এতো হাসির কি হলো?” একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো ও।

জবাব না দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নিরবে হাসলো জয়া। “হেভি একটা রোমান্টিক দৃশ্য দেখলাম। আহা কি ধাক্কা আর, আর কি উদ্ধার। আপনি তো মশায় সহজেই সিনেমার নায়ক হয়ে যেতে পারেন। এই পুলিশের চাকরিতে পড়ে আছেন কেন?” বলে সে আবারো হাসতে লাগলো।

“মজা নেন?” বাশার তাকিয়ে দেখলো এই টেবিল থেকে নিচের প্রবেশ পথটা দেখা যায়। বাশারের গা জ্বলে উঠলো মহিলার কথা শুনে।

“নিতেই পারি,” ডিম পোচ সহ বাটার টোস্টের একটা অংশ মুখে পুরে বলতে লাগলো জয়া সরকার। “কারণ আমার তো আর আপনার মতো ফাটছে না যে মুখ-চোখ গম্ভীর করে নাস্তা না করেই কাজে বেরিয়ে যাবো।”

বাশারের মেজাজ পুরো খারাপ হয়ে গেল। “আচ্ছা, আমার ফাটছে! আপনার যদি কোন আগ্রহই না থাকে তাহলে নিজের কাজ-কর্ম ফেলে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন। আর শোনেন, আপনাকে কে বলেছে আমি নাস্তা করিনি। ফুল ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি আমি।”

বাশারের গরুগম্ভীর কথা শুনেও বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ দেখা গেল না মহিলার মধ্যে। “হ্যা-হ্যা, অবশ্যই। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর শোনেন আমি

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, কারো চাকর নই। যেটা আমার আগ্রহ সেটাই আমার কাজ-কর্ম। আমি এখানে এসেছি যাতে নিজের পুরনো কৌতুহল মেটাতে পারি। আর এই সুবাদে একজন ব্যর্থ পুলিশ অফিসারের কোন সাহায্য হয়ে যায় তবে ক্ষতি কি।"

মহিলার শেষ কথাটা শুনে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো বাশার। "দেখুন, আমার মনে হয় না আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো। আপনার চিন্তা-ভাবনা যদি এরকম হয়..."

"আস্তে স্যার," মহিলাও ওর সাথে-সাথে দাঁড়িয়ে গেছে। "সরি, আমি বেশি কথা বলে ফেলেছি। ঠিক আছে, আমরা একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি সেটাই। ঠিক আছে?"

নিজেকে শান্ত করলো বাশার। এই মহিলার সাথে অযথা ঝামেলা করে লাভ নেই। ও যতোটুক বুঝতে পারছে এর স্বভাবই এমন। "ঠিক আছে," বলে ও বসে গেল। ওয়েটার এসে চা দিয়ে গেল মহিলার সামনে।

"এই শোন্," ওয়েটারকে বললো মহিলা। "স্যারের জন্যে চা নিয়ে আয়। স্যার তো নাস্তা করেই এসেছে। নাকি ঠান্ডা কিছু। শোন্, স্যারের জন্যে একটা ঠান্ডা কোক নিয়ে আয়," বলে সে আরেকটা মৃদু হাসি দিয়ে চায়ে চুমুক দিলো। "এবার বলেন, কাজের কতোদূর? উকিলকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন?"

"লোক পাঠানো হয়েছে," বাশার এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারেনি।

"ওহ, লোক পাঠিয়েছেন! এখনো খবর বের করতে পারেন নি?" বলে জয়া সরকার তার হাত ব্যাগ থেকে একটা মার্লবরো অ্যাডভান্স সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ঠোটে লাগালো।

"সমস্যা নেই, ওরা খবর নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে।"

জয়া কিছু না বলে তাকিয়ে রইলো বাশারের দিকে। মনে হলো সে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে। জয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে গতদিনের সেই গভীর পানিতে তলিয়ে যাবার অনুভূতি হলো বাশারের। সাথে-সাথে সে চোখ সরিয়ে নিলো। চোখ তো নয়, যেন ভয়ঙ্কর ফাঁদ।

ওয়েটার এসে বাশারের সামনে কোক রেখে গেল। কোকের বুদ্দুদের দিকে তাকিয়ে খালি পেটের ভেতর থেকে ঢেকুর উঠে এল বাশারের। খালি পেটে কোক! মনে মনে ঢোক গিললো ওর।

“ম্যাডাম,” ওয়েটারের ডাকে ধ্যান ভাঙলো জয়ার। “কি?”

“ম্যাডাম, এখানে স্মোক করা বারন,” ওয়েটার খুব অস্বস্তির সাথে বললো।

“তোর বাপের হোটেল?” জয়া হঠাৎ এমন ধমকে উঠলো থতবত খেয়ে গেল ওয়েটার।

“না , ম্যাডাম।”

“তাইলে চুপ থাক, আর না হয় যার সমস্যা হয় তারে ডাইক্কা আন,” বলে গজগজ করতে লাগলো জয়া। একবার ওকে দেখলো আরেকবার বাশারের ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়ে পালিয়ে বাঁচলো ওয়েটার।

“ছেলেটাকে ধমকানোর কোন দরকার ছিল? ওর কি দোষ?” বাশার কোকের বোতল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, এখনো ঢোক গেলেনি।

“ফালতু কথা বাদ দেন। কাজের কথা শোনেন। কোথা থেকে শুরু করবো বলেন। গতদিন জানি কোন পর্যন্ত বলেছিলাম?”

“কালী মুর্তি,” বাশার সাহস করে একটা ঢোক দিতেই কার্বোনেটেড বেভারেজ ওর গলা আর বুক জ্বালিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। “ডাকাতি হওয়া মুর্তিটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে কথা বলছিলাম আমরা।”

“কিন্তু কিভাবে?” চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো জয়া। “যেটা এতোদিনে সম্ভব হয়নি, এতোদিন পরে সেটা কিভাবে বের করা সম্ভব?”

বাশার এখনো ভাবছে। বহুদিন পরে ওর নিজের ভেতরের পুলিশি সত্তাটা অনুভব করতে পারছে। গতকাল সারারাত সে ঘটনাগুলো ধাপে-ধাপে বসিয়ে একটা সমাধানে পৌছানোর চেষ্টা করেছে।

“কি ব্যাপার, কিছু বলেন?” খানিকটা ধমকেই উঠলো জয়া।

বাশার পাত্তাও দিলো না। আরো কিছুক্ষণ পরে সে জবাব দিলো। মুখের সামনে তুলে ধরলো নিজের হাতের তিনটে আঙ্গুল। “তিন একে তিন, বিজয়, ভূয়া প্রতিনিধি আর মিউজিয়ামের কিউরেটর,” তিনটে আঙ্গুল দেখালো ও।

“প্রথমে গেল বিজয়, পুড়ে মরলো সে,” বলে একটা আঙ্গুল ভাঁজ করে ফেললো। “এরপরে গেল ভূয়া প্রতিনিধি, ডুবে মরলো সে,” বলে আরেকটা আঙ্গল নামালো। “রইলো বাকি এক; কিউরেটর, তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। এই রহস্য উন্মোচন করতে হলে তার সহায়তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সে কে, সে কোথায় আছে তার সাথে দেখা করা জরুরি।”

“এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম,” পেছনে থেকে মার্জিত গলা শুনে ফিরে তাকালো জয়া। ম্যানেজার গোছের একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। “ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না আমাদের এখানে আসলে স্মোক করা...”

“বারন?” ম্যানেজারের কথাটা জয়া শেষ করলো। ম্যানেজার কোন জবাব দেয়ার আগেই হাতে ধরা সিগারেটটাতে জোরে একটা টান দিয়ে ধোঁয়াটা সরাসরি ম্যানেজারের মুখে ছেড়ে সিগারেটের মোথাটা চায়ের পিরিচে চেপে নিভিয়ে দিলো। “খুশি?” বলে ও বাশারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বললো, “চলেন, বেরোই।”

বাশার আর জয়া মিলে বেরিয়ে এল বাইরে। “মানুষের সাথে এতো খারাপ ব্যবহার করেন কেন আপনি। ম্যানেজারের সাথে এরকম না করলে কি হোত?” এই মহিলার আচরণে বিরক্ত বাশার। জয়া কিছু বলার আগেই সে মোবাইল বের করে আবদুল্লাহকে কল দিলো। কল ধরলো রমিজ দারোগা। সে জানালো কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। কথা শেষ করে জয়ার দিকে তাকিয়ে ও দেখলো জয়া হাসছে। পুরনো সেই শ্লেষমাথা হাসি।

“আপনি কেন পুলিশের চাকরিতে দিনদিন অবনতি করছেন আমি বুঝতে পারছি,” জয়ার বলার ধরনটাই এমন, কটু কথা হবার পরও বাশারও হেসে উঠলো।

ওরা হেটোলের বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা দাঁড়িয়ে আছে জিপের সামনে।

“কাজ হয়েছে? জানতে চাইলো বাশার। তাদেরকে জয়ার কথামতো পাঠানো হয়েছিল মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের পারিবারিক উকিলের

কাছে।

“স্যার কাজ হইছেও, আবার হয়ও নাই,” আবদুল্লাহ এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগলো।

“এই চুপ,” তাকে ধমকে উঠলো রমিজ দারোগা। “বেশি কতা কয় এই পোলা। স্যার কাম অইছে। উকিলের লগে দেহা অইছে।”

“কি বললো উকিল?” রমিজ দারোগা অতি-উত্তেজিত থাকলেও বাশার শান্তভাবেই জানতে চাইলো।

“স্যার, যেই উকিলসাইবের নাম ঠিকানা আপনে দিছিলেন সে তো বাইচ্চা নাই,” আবদুল্লাহ বেশ ইনোসেন্ট চেহারায় জবাব দিলো। গতদিন প্রেসক্লাবের ক্যান্টিনে বসে আলোচনা শেষে জয়াই এই উকিলের ঠিকানা বাশারকে দিয়েছিল। এই উকিল হলো মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের পারিবারিক উকিল। বাশারের বক্তব্য ছিল যেহেতু সেই ডাকাতির ঘটনার সাথে মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের একজনের সংশ্লিষ্টতা আছে কাজেই তাদের ব্যাপারে খোঁজ করতে হবে। আর সেটার জন্যে প্রাইমারি সোর্স ছিল আচার্য পরিবারের পারিবারিক উকিল। সকালে জয়ার সাথে দেখা করতে আসার আগে তাই আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে ও পাঠিয়েছিল ওদের উকিলের চেম্বারে।

“তাহলে আপনি যে বললেন উকিলের সাথে দেখা হয়েছে?” বাশার প্রশ্ন নিয়ে তাকালো রমিজ দারোগার দিকে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরালো একটা। খালি পেটে কোক এরপর এবার সিগারেটেরে ধোঁয়া মুখে ঢুকতেই মুখটা আরো বিস্বাদ হয়ে গেল।

“মুক্তাগাছা জমিদার পরিবারের সবকিছু সামলাইতো যেই উকিল সেই উকিল মইরা গেছে। তবে হেই জমিদার পরিবারের সবকিছুর দায়িত্বে আছে আগের মালিকের ছেলে। তার লগেই আমাদের দেখা হইছে।”

“আচ্ছা,” বাশার ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে জিপের সিটের ওপরে এসে বসে পড়লো। ওর সামনেই একপাশে রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহ আর অন্যপাশে দাড়িয়ে জয়া মোবাইল ঘাঁটছে।

“কি বললো এই উকিল?”

“খুব বেশি কিছু জানাইতে পারে নাই। কারণ এই পরিবারের সবকিছু নাকি তার বাবাই দেহাশোনা করতেন। বাবা মরার পরে সেয় পারিবারিকভাবে দায়িত্ব পেলেও খুব বেশি কিছু জানে না। আর খুব বেশি কিছু জানুনেরও নাই। কারণ কেউ তো নাই।”

“মানে,” হঠাৎ চমকে ওঠাতে বাশারের গালায় ধোঁয়া আটকে কাশি চলে এল। “কেউ নেই মানে কি?”

“মানে হেরা তো বাইচ্চা নাই,” এতোক্ষণে সুযোগ পেয়ে কথা বলে উঠলো রমিজ দারোগা। “সেই এগারো বছর আগে হেগো শেষ বংশধর মরার পরে এহন দেশে আর আর কেউই নাই।”

“স্যার, এই যে,” বলে আবদুল্লাহ একটা কাগজ বাড়িয়ে দিতে গেল বাশারের দিকে। রমিজ দারোগা কমলা রঙের কাগজটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে নিলো তার কাছ থেকে। ওটা কেড়ে নিয়ে বাড়িয়ে দিলো বাশারের দিকে।

“কি এটা?” বাশার একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলো।

“স্যার, এইটা সেই কিউরেটরের নাম ঠিকানা,” বলে রমিজ দারোগা বত্রিশ ভোল্টের একটা হাসি দিলো। “উকিলে যখন বললো সে এই ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না আসলে তার বাপে সব জানতো তখন সে পুরান ফাইল বাইর কইরা কইলো এই ব্যাপারে জানতে চাইলে সেই সময়ে মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিল যে হেয় আপনেগো সাহাইয্য করতে পারবো। কইয়া সে তার নাম আর মিউজিয়ামের ঠিকানা লেইখা দিলো।”

এইটুকু কাজ করতে পেরে রমিজ দারোগার বিপুল আনন্দ দেখে বাশার আফসোসের সাথে একবার মাথা নেড়ে জিপ ছাড়ার নির্দেশ দিলো।

রমিজ দারোগার দেয়া চিরকুকটা হাতে নিয়ে বাশার দেখলো তৎকালীন কিউরেটরের নাম লেখা রিফাত মজুমদার।

“এই, জিপ ছাড়ো,” এবার জায়গামতো খোঁজ নেয়ার একটা সুযোগ এসেছে।

অধ্যায় বাইশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

তারাটি গ্রাম, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

“ওকে আবারো জিজ্ঞেস করো এই জায়গাই কিনা?” ম্যাকফিরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে মুক্তাগাছা আর বেগুনবাড়ি এলাকার মাঝামাঝি তারাটি নামক এক গ্রামের খালপাড়ে। জায়গাটা জমিদার বাড়ির বেশ কাছেই। সন্ধ্যার রেশ কাটিয়ে রাত গভীর হতে শুরু করেছে মাত্র। ওদেরকে এই জায়গায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে পানু নামের সেই বাজিকর ছেলেটা।

সন্ধ্যেবেলা ওরা কথোপকথনের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এমন সময় হুড়মুড় করে ওদের কাচারি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি। স্বয়ং জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য বন্দি তিনজনের খবর পেয়ে চলে এসেছে।

রাজাকে আসতে দেখে তাকে কাচারির উঠানেই চেয়ার পেতে বসতে দেয়ার ব্যবস্থা করে ওরা। জমিদার প্রথমে এসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও একটু পরেই সে রেগে ওঠে, কেন ম্যাকফিরা বন্দিদেরকে ওদের কাছে হস্তান্তর করছে না। কেন জিন লোকটার কথা শুনে রেগে না উঠে বন্দিদেরকে নিয়ে আসার হুকুম দেয় ম্যাকফি। বাপ আর ছোট ছেলেকে জমিদারের কাছে দিয়ে সে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, অন্য বন্দির সাথে ওর কাজ আছে। তাকে চাইলেও এই মুহূর্তে হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। আরো একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। বন্দিদের সাথে যেন কোন ধরণের খারাপ ব্যবহার করা না হয়। তাদেরকে কোন ধরণের তথ্যের জন্যে চাপ দেয়া না হয়। ওরা তার অধীনে থাকলেও মূলত বৃটিশ রাজের বন্দি, কাজেই ওদের সাথে কোনরকম বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সময় হলে তাদেরকে বৃটিশরাজের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

জমিদার তেমন কিছু না বলে বন্দিদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে ওদের সাথে আরো টুকিটাকি কিছু বিষয়ে কথা বলে বিদায় নেয়। আর ম্যাকফিও স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলে। কারণ ও বেশি বাড়াবাড়ি করলে জমিদার বিগড়ে গেলে কাজ করতে সমস্যা হোত। তারচেয়ে একে হাতে রাখতে পারলে সুবিধে হবে। আর এই মুহূর্তে ওদের রাতের অভিযানের ব্যাপারটা সে আড়াল করে রাখতে চাইছে জমিদারের কাছ থেকে। যদিও নিয়ে যওয়া বন্দিদের কাছ থেকে সে জেনে নিতে পারে। তবে এতো দ্রুত সে বন্দিদের কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারবে ব'লে মনে হয়না।

জমিদারকে বিদায় করে দিয়েই ওরা কাজে নেমে পড়ে। প্রস্তুতি নিতে শুরু করে রাতের অভিযানের। কারণ এখনো জানা নেই ছেলেটা ওদেরকে নিয়ে কতোদূরে যাবে, আর কখন দেখা করতে আসবে সেই লোক। ওরা দ্রুতই হালকা খাবার খেয়ে বেরুবে এমন সময় শুরু হয় বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার পর ওরা যখন বের হয় রাত তখন সন্ধ্যের কোঠা শেষ করে সবেমাত্র গভীরতার দিকে রওনা দিয়েছে। ছেলেটাকে সাথে নিয়ে ওরা বেড়িয়ে পড়ে।

ছেলেটার কাছ থেকে বর্ণনা শুনে শঙ্কর ওদেরকে জানায় ও সম্ভবত বেগুনবাড়ি আর মুক্তাগাছার মাঝামাঝি তারাটি নামক একটা জায়গায় খালপাড়ের বটগাছতলার কথা বলছে। ওখানেই সম্ভবত দেখা করার কথা ওদের। শঙ্কর জায়গাটার আরো বর্ণনা দিতেই ছেলেটা মাথা নেড়ে জানায় ওখানেই দেখা করার কথা। জায়গাটার কাছাকাছি পৌছে ওরা জোনাথন আর মহাবীর সিংকে একটা পুকুর পাড়ে ঘোড়াগুলোর তদারকির জন্যে রেখে ম্যাকফি, শঙ্কর আর পানু মিলে রওনা দেয় নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে। প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো হয়েছে ওরা এখানে এসে খালপাড়ের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

রাতের সময় হলেও আকাশে মস্ত থালার মতো চাঁদ ওঠাতে একেবারে পরিষ্কার দেখাচ্ছে সামনের দিকটা। ওরা এখন বসে আছে খেতের আইলের পাশে। এখান থেকে আর একটা ছোটমতো জায়গা পার হলেই খালপাড়। খালের ওপরে একটা বাঁশের সাঁকো দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা হঠাৎ হাত তুলে সেদিকে দেখালো। ম্যাকফি তাকিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না মনোযোগ দিয়ে দেখতেই চোখ পড়লো ব্যাপারটা। একজন মানুষ হেঁটে আসছে সেদিক থেকে।

মানুষটা কিছুক্ষণ খালের পাড় ধরে এগিয়ে এসে সাঁকোতে উঠে পড়লো। বেশ দ্রুত হেঁটে সে পেরিয়ে এল সাঁকোটা। চালচলন দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই এলাকারই মানুষ। সাঁকো পার হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো।

ম্যাকফি দুজনকেই হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলে ওরা খেতের আইলের পাশে নিচু হয়ে রইলো যাতে মানুষটার চোখে পড়ে না যায়।

লোকটার কোনদিকে হুঁশ নেই, সে এক নাগাড়ে হেঁটে চলে গেল ওদের সামনে দিয়ে। মনের সুখে শিস বাজাতে-বাজাতে চলেছে। ওদের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে দেখতে পেল ভীষণ মোটা লোকটার পরনে পাঞ্জাবি আর সাদা ধূতি। মাথায় সাদা পাগড়ির মতো টুপি আর হাতে একটা ছড়ি।

“আরে, এতো বিল্লাল শেঠ,” আনমনেই বলে উঠলো শঙ্কর ।

লোকটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল। ম্যাকফি শঙ্করকে চেপে ধরে নিচে নামিয়ে দিলো। এক্ষুনি লোকটার চোখে ধরা পড়ার কোনই আগ্রহ নেই ওর। লোকটা থেমে গিয়ে আশেপাশে একবার দেখে নিয়ে আবারো হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে-হাঁটতে সে গিয়ে খালপাড়ের বড় বট গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

“হুজুর, এহি আদমি হ্যায়, এর কাছ থাইক্কাই ঘোড়া নিছিল বাপু, এই লোকের কাছেই ঘুড়া বেইচ্চা টেহা দেউনের কতা।”

ম্যাকফি শঙ্করের দিকে দেখলো একবার। দ্রুত ভাবনা চলছে ওর মাথায়। এই লোককে যদি এখন হঠাৎ ধরে ওরা জিজ্ঞেস করে ঘোড়াগুলো সে কোথায় পেয়েছে তবে সে সরাসরি নিষেধ করে দিলেও ওদের কিছু করার থাকবে না। তারচেয়ে আরেক কাজ করা যেতে পারে, এই লোকের ওপরে নজর রেখে কোন একটা প্রমাণ পেলে ওকে সরাসরি ধরা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ঝামেলা আছে। এই ব্যাপারটা আগে মাথায় আসেনি দেখে মেজাজটা খারাপ গয়ে গেল ওর। ম্যাকফি কী করবে ঠিক করার আগেই লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ছোট একটা আলোর রেখা দেখা গেল।

“বিল্লাল শেঠ, তামুক খাইতে আছে। ব্যাটা তামুক ছাড়া থাকতেই পারে না,” শঙ্কর বলে উঠলো।

“চলো,” হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ম্যাকফি। লোকটাকে সরাসরিই ধরবে। কারণ ওভাবে নজর রাখতে গেলে এই সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। “ওকে এখানেই ধরতে হবে,” বলে ও শঙ্কর আর পানুকে ওর পেছন পেছন আসতে ইশারা করে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। খেতের আইল ধরে এগিয়ে

গাছটার যেদিকে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার অন্যপাশে এসে থেমে গেল ওরা।

গাছের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে ব্রিচেসের বেল্টের সাথে গুঁজে রাখা পিস্তলের বাটে হাত রেখে মৃদু হাসি ফুঁটে উঠলো ম্যাকফির মুখে। বহুদিন পর আবারো নিজের ভেতরে যুদ্ধের উত্তেজনা টের পাচ্ছে ও। আরেকবার শঙ্কর আর পানুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। ওর নিয়ত হলো হঠাৎ গাছের অন্যপাশে বেরিয়ে লোকটার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে চমকে দিবে। আর সে যদি ঘোড়ার ব্যাপারটা অস্বীকার করে তবে পানুকে প্রমাণ হিসেবে প্রদর্শন করবে।

কিন্তু ওর ভাবনা মনের ভেতরেই রয়ে গেল। লোকটাকে চমকে দেবার বদলে নিজেই চমকে উঠলো অন্য কারো গলা শুনে। বাংলা ভাষাটা খুব ভালো বুঝতে না পারলেও ম্যাকফি এটা বুঝতে পারলো কেউ একজন বিল্লাল শেঠের নাম ধরে ডাক দিলো। প্রায় সাথে সাথেই ধুপধাপ দৌড়ানোর শব্দ এল। একটু পরেই ভেসে এল আর্তনাদ আর ধস্তাধস্তির শব্দ। গাছের পেছনে মটকা মেরে পড়ে আছে ওরা। অন্যদিকে কী হচ্ছে ঠিকমতো কিছুই বুঝতেও পারছে না। আবার গাছের আড়াল থেকে উঁকি দেয়ারও সাহস পাচ্ছে না।

ম্যাকফি একবার ভাবলো ওর ব্রিচেসের পকেটে রাখা বাঁশিটা বের করে ফুঁকে দিবে কিনা। ওটা ফুঁকে দিলেই জোনাথন আর মহাবীর সিং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া নিয়ে পৌছে যাবে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই বাতিল করে দিলো ভাবনাটা। কারণ অন্যপাশে কী হচ্ছে, কয়জন আছে না জেনে ওদেরকে ডেকে এনে আনলে আরো বিপদ বাড়তে পারে। তারচেয়ে অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে হলো ওর কাছে। ধস্তাধস্তি আর চিৎকারের শব্দ এখন অনেকটাই কমে এসেছে। বেশ কয়েকজন মানুষের গলার শব্দও পাওয়া গেল। শঙ্কর আর পানুর দিকে তাকিয়ে ম্যাকফি দেখলো ভয়ে ওদেরও মুখ শুকিয়ে গেছে। ওদেরকে স্থির থাকতে বলে হাতের পিস্তলের বাটনটা আরেকটু শক্ত হাতে চেপে ধরে গাছের একপাশ থেকে উঁকি দিলো ম্যাকফি।

চাঁদ আবারো মেঘের আড়ালে চলে গেছে, তাই প্রথমেই চট করে কিছু চোখে পড়লো না। তবে মনোযোগ দিয়ে দেখেই বুঝতে পারলো বিল্লাল শেঠকে ঘিরে আছে বেশ কয়েকজর মানুষ। এই অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে তাদের পরনে সাদা ধূতি আর কালো পাগড়ি। প্রত্যেকের হাতের মজবুত

তেল মাখানো লাঠি এই স্বল্প আলোতেও চকচক করছে। ম্যাকফি গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল বিল্লাল শেঠের একটু আগের সেই তেজি ভাব আর নেই। তার মাথার পাগড়ি খুলে মাটিতে লুটাচ্ছে। ধূতির অবস্থাও তথৈবচ। লাঠি হাতে মানুষগুলোর মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোর করে কথা বলছে সে একজন নেতা গোছের মানুষের সাথে। অন্ধকারের ভেতরে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ম্যাকফি এটা বুঝতে পারলো নেতাগোছের মানুষটা কিছু একটা নির্দেশ দিলো অন্যদের। প্রায় সাথে সাথেই একরকম চ্যাঙদোলা করে তুলে ফেলা হলো মোটাসোটা বিল্লাল শেঠকে। তারপর টেনে নিয়ে ওরা রওনা দিলো অন্যদিকে।

হতভম্বের মতো স্থির হয়ে রইলো ম্যাকফি।

অধ্যায় তেইশ

বর্তমান সময়

করাচি রোড, ময়মনসিংহ

“এখানেই ডাকাতিটা হয়েছিল, তাইনা?” ওদের জিপ হোটেলের সামনে থেকে একটানে উঠে এসেছে কাচারি রোডে। শশীলজের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে ওদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো বাশার।

সেদিকে না তাকিয়ে মোবাইল টিপতে-টিপতেই জয়া জবাব দিলো, “হ্যা, এখানেই।”

“এটা কি এখনো টিচার্স ট্রেনিং কলেজই আছে?” বাশার প্রশ্ন করলো। ওর মনে পড়লো ছোটবেলা ওর খালার সাথে এখানে একবার এসেছিল। ওর খালা তখন এখানে এমএড করছিল।

“হ্যা, এটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজই আছে। তবে এর একটা অংশ নাকি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নিয়ে নিয়েছে। এক সময় এটা সবার জন্যে খোলা ছিল না। এখন আবার জনসাধারনের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে শুনেছি,” জয়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওদের জিপ কাচারি রোড পার হয়ে গোলপুকুরপার রোডে ঢুকেছে।

“স্যার, কোনদিকে?” ওর কাছে জানতে চাইলো আবদুল্লাহ।

“আমার তো মনে নেই,” বাশার অনুমান করার চেষ্টা করলো কোনদিকে জানি দেখেছিল জাদুঘরটা। “এদিকেই হবার কথা, কারো কাছে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে।”

বাশার কারো কাছে জানতে চাইবার আগেই পাশ থেকে জয়া বলে উঠলো, “জিজ্ঞেস করতে হবে না। আরেকটু এগোলে হাতের বামে দেখবে ইনকাম ট্যাক্স অফিস, সেটার ঠিক বিপরীত দিকেই মিউজিয়াম।”

আবদুল্লাহ আরেকটু এগিয়ে ঠিক মিউজিয়ামের পুরনো গেটের সামনে পার্ক করলো। বাশার জিপ থেকে নেমেই আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। গতকালের পর থেকে আর সেই সাদা গাড়ি চোখে পড়ছে না। আনমনেই ও খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই সাদা গাড়ি আর সাদা মানুষটাকে।

“তোমরা দুজনে জিপেই বসো। আমরা আসছি,” কথাটা আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগার উদ্দেশ্যে বলেই ও আর জয়া মিলে হাঁটা দিলো মিউজিয়ামের ভেতরের দিকে।

ছোটবেলায় একবার এলেও এখানকার স্মৃতি বলতে গেলে প্রায় কিছুই মনে নেই বাশারের। তবে এটুকু মনে আছে এখনকার মতো জীর্ণ দশা ছিল না তখন। গেট দিয়ে প্রবেশ করে দুইপাশে ছোট একটা বাগানের মতো জায়গা পার হয়ে ওরা হলুদ রঙের মূল ভবনটাতে প্রবেশ করলো। মিউজিয়ামের বাইরে একজন দারোয়ান বসে ঝিমোচ্ছে। তার পাশে একটা পুরনো দিনের বন্দুক। বাশার নিশ্চিত কেউ যদি লোকটার বন্ধুক নিয়ে দৌড় দেয় এই লোক টেরও পাবে না।

মিউজিয়ামের অফিসে একজন কেরনি গোছের বয়স্ক লোক বসে মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে পত্রিকা পড়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ এই ত্রিভূবনে হতেই পারে না। তার সামনে গিয়ে মৃদু কাশি দিলো বাশার। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আবারো কাশি দিলো ও। তাও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আরেকবার কাশি দিতে যাচ্ছিলো তার আগেই লোকটা পত্রিকা নামিয়ে বলে উঠলো, “এতো কাশি হইলে মানুষ ডাক্তারখানায় যায়, জাদুঘরে আইতে তো হুনি নাই।”

“আমরা দর্শনার্থী নই। একটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছি,” জয়া বলে উঠলো।

“তা আর কইতে, পুলিশে আইবো জাদুঘরে ঘুরতে, তাইলে তো বালাই আছিল। বলেন, কি জানতে চান?” সে তার চোখে পরে থাকা চাঁচের তৈরী সাদা চশমাটা খুলে জানতে চাইলো।

“মিউজিয়ামের কিউরেটরের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা,” বলে বাশার আশেপাশে একবার চোখ বুলালো। কিউরেটরের রুম বাইরে থেকে সিটকিনি আটকানো। “উনি আসেন নি?”

“উনি এতো সময়মতো আইলে তো ভালোই অইতো। অপনেগো কি জানুন দরকার সেইটা বলেন?”

“অপনাদের এখানে বেশ আগে রিফাত মজুমদার নামে একজন কিউরেটর ছিল, উনার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?” বাশার জানতে চাইলো।

কেরানী লোকটাকে দেখে মনে হলো বেশ অবাক হয়েছে। “এতোদিন পরে আতকা হের ব্যাপারে খুঁজ-খবর! কিছু অইছে নি?”

“না, একটা কেসের ব্যাপারে উনার সাথে কথা বলা দরকার আমরাদের। তাই জানতে চাচ্ছিলাম।”

“হুম্, কোন ব্যাপার, আপনেরাই ভালা জানেন তয় ভালা কিছু অউনের কথা না। কারণ ভালা মাইনষের লগে ভালা কিছু অয়না। ভালা মাইনষের লগে সবসময় মন্দ ব্যাপার ঘটে। আমি এইহানে আছি প্রায় পঁচিশ বছর। সামনের বছরে অবসরে যামু। কতো ম্যানেজার দেখলাম,” বাশার অনুমান করলো লোকটা কিউরেটরকে ম্যানেজার বলছে। “কিন্তু হের মতো মানুষ আর পাই নাই। পোলাপান মানুষ আছিল, বোকার মতোন একটা কাম কইরা বেচারা... হেরে তো চাকরি থাইক্কা বাইর কইরা দিছে বহুত আগে।”

“সেটা আমরা জানি কিন্তু উনাকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে-ব্যাপারে যদি কোন তথ্য দিতে পারতেন,” লোকটার বকবকানি শুনে একটু বিরক্ত বোধ করছে বাশার।

“শুনছিলাম ওই ঘটনার পরে হেয় নাকি বিদেশ গেছিল পড়ালেহা করতে।”

শিট, মনে মনে আঁতকে উঠলো বাশার এই লোকও যদি বিদেশ চলে গিয়ে থাকে তবে তো সর্বনাশ।

“...তয় শুনছি কিছুদিন আগে নাকি দেশে আসছে ভালা একটা চাকিরও পাইছে,” সাদা চশমা বলেই চলেছে।

“কোথায়?” রীতিমতো ধমকে উঠলো জয়া। “এতোকথা না বইলা কোথায় সেইটা বলেন।”

“জয়নাল আবেদিন সংগ্রহশালায় নাহি উপ-পরিচালক হিসেবে আছে হেয়।”

“ধূর মিয়া! এতোক্ষণ ত্যানা না পেঁচায় এইটা আগে বলতে পারলেন না,” বলে ধাম করে লোকটার টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বেরিয়ে গেল জয়া। বুড়ো অবাক হয়ে তাকিয়ে অছে তার দিকে। জয়া বেরিয়ে যেতেই বিড়-বিড় করে বলে উঠলো, “বাপরে, কি মাইয়া মানুষ, এমুন আর দেহি নাই।”

বাশার বাইরে এসে দেখলো জিপে উঠে বসেছে জয়া। সেও উঠে বসে আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলো, “পার্কের দিকে চলো, জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায় যেতে হবে।”

“স্যার, কুনো কাম অইলো?” রমিজ দারোগাকে দেখে মনে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এই সময়টাতে সে বেশ চমৎকার একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে। তার কথার জবাবে কিছু না বলে মাথা নাড়লো বাশার। ও তাকিয়ে আছে জয়ার দিকে।

“আপনি যে এভাবে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। এটা কি ঠিক?” বেশ কড়া সুরেই জানতে চাইলো ও।

“ঠিক বেঠিক জানি না, তবে আমি এরকমই। ভালো না লাগলে কিছু করার নেই,” জয়া মুখ ঝামটে উঠলো।

“শুনুন, মানুষের মনে কষ্ট দিতে নেই। এভাবে মানুষের মনে কষ্ট দিলে...”

বাশার কথা শেষ করার আগেই জয়া চোখ গরম করে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো তার আগেই চট করে বাশার ওর একটা হাত চেপে ধরলো।

“কি ব্যাপার?” হঠাৎ বাশার এভাবে হাত চেপে ধরাতে জয়া ভড়কে গেছে।

“সেই সাদা গাড়িটা,” বাশার ইশারায় ওদের জিপের পেছনে দেখালো। “আবারো পিছু নিয়েছে।”

জয়া এখনো কড়া চোখে বাশারের দিকে তাকিয়ে আছে। “আপনি কি নিশ্চিত?”

“অবশ্যই আমি নিশ্চিত। আমি পরিষ্কার দেখেছি এটার একটা লাইট ভাঙা।”

“কি করতে চান এখন?” জয়া জানতে চাইলো।

বাশার কিছু না বলে চিন্তা করছে। ও কিছু বলার আগেই জয়া বলে উঠলো। “এক কাজ করেন, আবদুল্লাহকে বলেন গাড়ির গতি আস্তে-আস্তে না

কমিয়ে হঠাৎ করে একপাশে পার্ক করতে। সত্যিই যদি গাড়িটা আমাদেরকেই অনুসরণ করে তবে অবশ্যই থামবে। আর না হলে তো চলেই যাবে।”

কথাটা মনে ধরলো বাশারের। ও আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলো জিপের গতি বাড়ানোর, এরপরে চট করে একপাশে সাইড করে ফেলার। আবদুল্লাহ মোটামুটি বুঝতে পারলো বাশার কি করতে বলছে। সেও জিপে গতি বাড়িয়ে দিলো।

ওদের জিপ ইতিমধ্যেই পার্কে প্রবেশ করেছে। খালি রাস্তা পেয়ে আবদুল্লাহ জিপের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

এখন বেশ তীব্র গতিতেই ডান দিকে ব্রহ্মপুত্র নদীকে ডানে রেখে সামনে এগিয়ে চলেছে। আরেকটু এগুলেই শুটিং ক্লাব পার হয়ে পার্কের দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করবে। এই জায়গাটায় পার্কের একটা অংশ দেয়াল দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। মাঝখানে ডিভাইডারের কাছে কিছু ফুচকার দোকান আছে সেখানে রাস্তাটা একটু বাঁক নিয়ে আবার পার্কের অন্য অংশে প্রবেশ করেছে। বাঁকের কাছাকাছি আসতেই চট করে জিপটাকে বামে এক সাইড করে রেখে দিতে বললো বাশার। আবদুল্লাহ সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখিয়ে বন-বন করে হুইল ঘুরিয়ে জিপটাকে রাস্তার বামদিকে দাঁড় করিয়ে ফেললো।

তীব্র ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল জিপ।

পেছনে অসছিল এক সাইকেল আরোহী হঠাৎ ব্রেক চাপাতে আরেকটু হলেই জিপের ওপরে এসে পড়ছিল কোনমতে, সামলে নিয়ে জিপ ড্রাইভারের গুষ্টি উদ্ধার করতে-করতে পাশ দিয়ে টুং-টাং বেল বাজিয়ে চলে গেল। জিপের ভেতরে সবাই এর-ওর গায়ে ছিটকে পড়েছে। নিজেদের ঠিক-ঠাক করে জয়া ফিরে তাকালো পেছন দিকে, বাশার তাকিয়ে আছে ভিউ মিররে। পেছনের সাদা গাড়ির প্রতিক্রিয়া দেখাটাই এখন মূল উদ্দেশ্য।

গাড়িটার গতি কি একটু কমে গেল, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো বাশার। পেছনের গাড়িটার গতি কমে গিয়েও আবার প্রায় সাথে সাথেই বেড়ে গেল। রাস্তায় যেরকম গতি থাকার কথা তারচেয়ে অনেক বেশি গতিতে ওদের জিপ পার হয়ে চলে গেল গাড়িটা। বাঁকের কাছে পৌছে গতি খানিকটা কমিয়ে পার হয়ে গেল বাঁকাটা। তারপর আবারো গতি বাড়িয়ে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

“ওটার লাইট কিন্তু ভাঙা ছিল না,” বাশার নিজের মোবাইলে গাড়িটার নম্বর লিখতে শুরু করেছিল হঠাৎ জয়ার মন্তব্য শুনে খেই হারিয়ে ফেললো।

“ধূরো,” নম্বরটা গুলিয়ে ফেলে নিজেকেই বকা দিয়ে জয়ার দিকে ফিরে তাকালো। “কি বললেন, লাইট?” বলে এক সেকেন্ড চিন্তা করে জবাব দিলো। “লাইট মেরামত করা এমন কঠিন কিছু না।”

“আর হ্যা, বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে সাদা গাড়ি খুঁজে বের করাও কঠিন কিছু না, প্রচুর আছে,” বলে বাশারের দিকে তাকিয়ে একটু টিটকিরির হাসি দিলো। জবাবে কড়া একটা কিছু বলতে চাইছিল বাশার তার আগেই আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলো, “স্যার, আরো অপেক্ষা করমু, নাকি যামু?”

“যাও, আর কি করবা,” অদ্ভুত এক দ্বিমুখী অনুভূতি হচ্ছে ওর। বুঝতে পারছে না গাড়িটা অনুসরণ করেনি বলে ও খুশি হয়েছে নাকি অনুসরণ করলেই বেশি খুশি হোত। মেজাজ খারাপ লাগছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে যাবে তার আগেই ওর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো জয়া।

“স্নায়ুর গোড়ায় ধোঁয়া দিলে নাকি স্নায়ু ঠান্ডা থাকে, আমারকে টিচার বলতেন,” জয়া মৃদু হাসি নিয়েই বললো। “দিনে দুই প্যাকেট সিগারেট খেতেন উনি।”

“সত্যি কথা বলেছেন উনি। তো আপনার সেই শিক্ষক এখন কোথায়?” সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানতে চাইলো বাশার।

“মাটির নিচে, বয়স পয়ত্রিশ হবার আগেই স্ট্রোক করে মারা গেছেন।”

জয়ার উত্তর শুনে আচমকা হেসে ওঠাতে গলায় ধোঁয়া আটকে গিয়ে হাসিটা কাশিতে রূপান্তরিত হলো। বেদম কাশি আটকে দেয়াতে চোখে পানি চলে এল ওর।

“স্যার, চইলা আসছি,” বলে আবদুল্লাহ জিপ থামালো জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার গেটের সামেন।

“গেটের একপাশে পার্ক করো।”

আবদুল্লাহ জিপ পার্ক করতেই নেমে এল সবাই। “আবদুল্লাহ আর রমিজসাহেব আপনারা দুজনে ভেতরে যান গিয়ে দেখে আসনে উনি আছেন কিনা,” বলে ও নাম লেখা চিরকুটটা ধরিয়ে দিলো রমিজ দারোগার হাতে। বার-বার এর-ওর ওখানে যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে বাশার। তারচেয়ে ওরা গিয়ে দেখে আসুক আছে কিনা। থাকলে পরে ও যাবে। “আপনারা ভেতরে গিয়ে খবর নেন। উনি সম্ভবত উপ-পরিচালক বা এরকম কিছু একটা হবেন। যদি থাকে তাকলে আমাকে কল দিয়েন,” বলে ও জয়ার দিকে তাকালো। চাইলে আপনিও যেতে পারেন।”

“নাহ,” হাত নেড়ে জয়া বললো। “ওরাই যাক।”

আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা বড় লোহার গেটটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। বাশার জিপের একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো। দৃষ্টি জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার দিকে। “আমরা যখন ছোট ছিলাম এটা তখন বহুবছর বন্ধ ছিল।”

“হ্যা, মাঝখানে বহুবছর বন্ধ থাকার পর এখন আবার জনসাধারণের জন্যে খুলে দেয়া হয়েছে,” ওর পাশ থেকে জয়া জবাব দিলো। দুজনেই সংগ্রহশালার দোতলা ভবনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাশারের মনে পড়লো শেষবার যখন এখানে এসেছিল জায়গাটা ঘন জঙ্গলের মতো হয়ে গেছিল যতেœর অভাবে। দোতলা ভবনটারও রঙ জলে জায়গায়-জায়গায় শ্যাওলা ধরে বাজে অবস্থা হয়ে গেছিল। এখান পুরো চিত্রটাই পাল্টে গেছে। সামনের বাগান সাজানো হয়েছে সুন্দর করে। রঙবেরঙের চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে এখানে-ওখানে। ভেতরে বহু মানুষের সমাগমও দেখা গেল। সংগ্রহশালার প্রাঙ্গনে এক জায়গায় বেশ কিছু বাচ্চা বসে ছবি আঁকছে। একজন শিক্ষিকা ছবি আঁকা শেখাচ্ছে তাদেরকে।

“কি অসারধারণ একজন মানুষ ছিলেন, তাইনা? কোথা থেকে কোথায় পৌছে গেছিলেন। তার কাজ-তার জীবন মানুষের সামনে তুলে ধরাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল,” মন্তব্য করলো বাশার।

“হ্যা, ছিল। তবে এসব ব্যাপারে, বিশেষ করে নিজেদের ভেতরের গুনী মানুষের কদর না করে তাদেরকে পথে বসানোর ব্যাপারে আমরা জাতিগতভাবে খুবই পারদর্শী। জয়নুল আবেদীন তো তাও ঠাই পেলেন। এস এম সুলতানের এক টুকরো স্বপ্ন কি আমরা বাঁচাতে পেরেছি? মানিক

বন্দোপাধ্যায়ের মতো মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা গেলেন, জীবনানন্দ দাসের কথা নাই বা বললাম। উদাহরণের কি অভাব আছে। কেউ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, আবার কেউবা সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে। আমরা কি আসলেই গুণীদেরকে সম্মান করতে জানি। আর কদরই যদি না থাকে তবে গুণী জন্মাবে কিভাবে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পরিণতি জানতে পারলে এ দেশের কোন ইয়ং ছেলে বা মেয়েটা লেখক হতে চাইবে, বলেন," জয়া কথা বলতে বলতে যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

"আপনি এভাবে বলছেন কেন? হূমায়ুন আহমেদ, সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো সাফল্যের উদাহরণও তো আছে। আছে না?"

"হ্যা, সেটা আছে। তবে হূমায়ুন স্যারের প্রায়োরিটি ভিন্ন ছিল।"

"এটা আপনি বলতে পারেন না। কার প্রায়োরিটি কী হবে সেটা অন্যকেউ ঠিক করে দিতে পারে না। আরেকটা ব্যাপার 'আর্টস ফর আর্টস সেইক, নাকি আর্টস ফর ম্যাটেরিয়ালিস্টিক পারপাস' এই দ্ব›েদ্বর ভেতর দিয়ে কোন সৃষ্টিশীল মানুষটাকে যেতে হয়নি, বলেন," এবার বাশারও একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

"আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। আমি যেটা বলছি সেটা হলো, উনি অনেক ভালো একজন লেখক ছিলেন। শুধু ভালো বললে হয়তো অন্যায় হবে। আমি বলবো সেরাদেরও সেরা। তবে আমার বক্তব্য উনি যা দিতে পারতেন বা অন্যভাবে বলতে গেলে উনার যা দেয়ার ক্ষমতা ছিল সেটা উনি পুরোপুরি দিতে পারেননি অনেক বেশি লেখার কারণে। একভাবে বলতে গেলে পাঠকদেরকে ও বাংলা সাহিত্যকে হয়তো আরো অনেক গভীর ও অনেক বেশি কিছু দেয়ার ক্ষমতা উনার ছিল। তবে সেটা উনি সেটা করেন নি। তাই তার প্রতি সবসময়ই একধরণের অভিমান কাজ করে আমার," একটু আগের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়াতেই কিনা কে জানে জয়া যেন একটু বিব্রত।

"মহান সৃষ্টি তৈরী করতে গিয়ে কেউ যদি না খেয়ে মওে তবে সেটা বুঝি ভালো?" বাশার পরিস্তিতি একটু হালকা করার জন্যে বললো কিন্তু জয়া উল্টো আবারো উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

"এটাই তো আমার বক্তব্য। জাতিগতভাবে কেন আমরা এখনো ভালো জিনিসের কদর করতে পারবো না। কেন এখনো হালকাই রয়ে যাবো। বুঝতে না পারি, কিন্তু ভালো জিনিসের কদর করতে তো শেখা উচিত।"

“আপনি এ-কথা বলছেন, আমার তো মনে হয় মোবাইলের এই যুগে মানুষ দিন-দিন আরো ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে,” বলে বাশার দুইহাত তুললো। “এসব বিতর্কের শেষ নেই, আমি ক্ষুদ্র মানুষ। নিজের ক্ষুদ্র চিন্তা-ভাবনা নিয়েই থাকতে চাই,” বলে ও হেসে উঠলো। “নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। এখন করছি পুলিশগিরি। আমি এসব বলার কে।”

জয়াও হেসে উঠলো। “ওই যে, ওরা চলে এসেছে।”

“পেয়েছো?” বাশার প্রশ্ন করলো রমিজ দারোগার উদ্দেশ্যে।

জবাব দিলো আবদুল্লাহ। “স্যার, উনি এইখানে উপ-পরিচালক হিসেবে আছেন। তবে আইজ আসেননি,” আবদুল্লার কথা শুনে আবার ভেতরে ভেতরে গুঙিয়ে উঠলো বাশার। মনে-মনে ভাবলো আবারো কানা গলি।

“তয় এইবারও কাম হইছে,” রমিজ দারোগা বলে উঠলো। বলেই সে বাশারের দিকে বাড়িয়ে দিলো একটা ছোট্ট চিরকুট। “এইহানে হের বাসার ঠিকানা লেইক্ষা আনছি,” বিরাট কাজ করেছে বলে সে ভুরি দুলিয়ে হাসতে লাগলো।

বাশার কাগজটা নিতে নিতে ভাবলো, এই লোক দেখি চিরকুট মানব হয়ে যাচ্ছে। কাগজটা হাতে নিয়ে সে দেখলো বাউন্ডারি রোডের একটা ঠিকানা। বাউন্ডারি রোডে ওর এক বন্ধুর বাসা ছিল সেটার কথা মনে করে বোঝার চেষ্টা করলো বাসাটা কোন জায়গায় হতে পারে। কিন্তু বুঝতে পারলো না। “বাউন্ডারি রোড চেনো না?” প্রশ্নটা ও করেছে আবদুল্লার উদ্দেশ্যে।

“জি, স্যার চিনি তো।”

সবাই মিলে জিপে উঠতেই জিপ ছেড়ে দিলো আবদুল্লাহ। সংগ্রহশালার সামনের রোড ধরে ওদের জিপ সোজা চলে এল কাঁচিঝুলি মোড়ে। এখান থেকে বাঁক নিয়ে গাড়ি আরেকটু এগিয়ে ঢুকে পড়লো হামিদউদ্দিন রোডে। এদিক দিয়ে ঢুকলো কেন আবুদল্লাহ ঠিক বুঝতে পারলো না বাশার। ও জানতে চাইলো।

“স্যার টাউন হলের মোড়ে এই সময়ে জাম হয়,” আবদুল্লাহ একমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

ময়মনসিংহ শহরেও আজ-কাল জ্যাম হয়, ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগে। গাড়ি এখন কলেজ রোড দিয়ে চলেছে। আরকেটু এগোলেই আনন্দমোহন কলেজ পার হয়ে সামনে এগোবে। এই এলাকাতেই বড় হয়েছে বাশার। যখন ও এখানে ছিল তখন আর এখনকার মধ্যে কতো পার্থক্য। ডেভলাপার আর রিয়েল অ্যাস্টেটের ছোঁয়ায় পুরো শহরটা জাদুর কাঠির মতো বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষগুলোও, হারিয়ে গেছে অনেকেই। শুধুমাত্র নিজের ভেতরে বেঁচে রয়েছে পুরনো স্মৃতিগুলো। ঝাপসা হতে হতে হয়তো স্মৃতিগুলোও একদিন হারিয়ে যাবে। বেশিরভাগ স্মৃতিই হলো রাতের হাইওয়েতে দেখা ছোট্ট কোন টঙ দোকানের বাতির মতো, গাড়ি যতো দূরে সরতে থাকবে আলোটা ততোই টিমটিমে হতে-হতে এক সময় হারিয়ে যাবে অন্ধকারে। তবে কিছু স্মৃতি রয়ে যায় চিরস্থায়িভাবে।

“স্যার, চইলা আসছি,” আবদুল্লার কথায় নিজের কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এল বাশার। দুপুর গড়িয়ে চলেছে। সকাল থেকে দুইশো পঞ্চাশ এমএল কোক আর দুটো বিড়ি ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি।

পেটে গ্যাস, মাথায় স্ট্রেস, বাঙালির কমন অবস্থা।

“একদিকে সাইড করো। কিছুই তো চিনি না এদিকে। খুঁজে বের করতে হবে, আমি নেমে জেনে নিচ্ছি তোমরা জিপ নিয়ে আস্তে-আস্তে আমার সাথে এগোবে,” বলে বাশার নেমে এলো জিপ থেকে। কাছেই একটা চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে ঠিকানাটা জেনে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। নির্দিষ্ট ঠিকানার বাসাটা দোকানের কাছেই। বাড়িটার সামনে এসে থেমে গেল ও। বেশ সুন্দর একটা পুরনো দিনের বাড়ি। ওপরে টিন-শেড দেয়া, সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বাড়ির ভেতরে প্রচুর গাছপালা দেখা যাচ্ছে। “এটাই।”

ও গেটের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, জয়া এসে ওর পাশে দাঁড়ালো। “চলেন ভেতরে যাই, যতো দ্রুত কথা বলা যায় ততোই ভালো,” জয়ার কথা শুনে বাশার মনে-মনে ভাবলো, হ্যা আমার জন্যেও। কিছু না খেলে আর চলছে না।

বাইরের বড় স্টিলের গেটের ছোট দরজাটা খোলাই আছে। ওটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো জয়া। আবুদল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে জিপেই অপেক্ষা করতে বলে বাশার আশেপাশে চোখ বুলালো একবার। একেবারে ভর দুপুরে জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে আছে। দূরে একটা সাদা গাড়ি দাড়িয়ে থাকতে

দেখে মৃদু চোখ কুঁচকালো বাশার। নিজেকেই ধমক দিলো, বাংলাদেশের রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুরের চেয়েও সাদা গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। নিজেকে ধমকে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ও। ভেতরে ঢুকেই প্রথমে যে-কথাটা মনে হলো বাড়ির মালিক বাগান করতে পছন্দ করে। এই শখ আজকাল শহুরে কারো আছে ব'লে মনে হয় না। তাও আবার বাড়ির সামনে সব্জি বাগান। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর গোছানো সব্জি আর ফুলের বাগান পার হয়ে ওরা চলে এল বাংলোর মতো দেখতে বাড়ির দরজার কাছে। স্প্যানিশ জলদস্যুদের জাহাজের গায়ে ঝোলানো আংটার মতো দেখতে একটা আংটা ঝোলানো দরজায়।

"কলিংবেল কই?" বাশারের প্রশ্নের জবাবে কিছু না বলে দরজায় ঝোলানো আংটার এক কোনা তুলে ধরে নিচের দিকে নামিয়ে আনলো। সাথে সাথে একটু ভোতা কিন্তু মিষ্টি একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো। বাশার বুঝতে পারলো এটাই কলিং বেল। কারো সাড়া নেই। ভেতর থেকে খুট-খাট শব্দ ভেসে আসছে।

"আরেকবার দিতে হবে মনে হয়," বলে এবার বাশার নিজেই চট করে আংটা ধরে নাড়া দিলো। একইরকম মিষ্টি আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো, এবার আরো জোরে। এখনো কারো সাড়া নেই। ও জয়ার দিকে তাকিয়ে একবার কাঁধ ঝাকিয়ে আবারো হাত বাড়াতে যাবে তার আগেই ধাম করে খুলে গেল দরজা। প্রথমেই চোখে পড়লো ঘামে ভেজা একটা টি-শার্ট, তার ওপরে ঘামে ভেজা একটা মুখ।

"কাকে চাই?" এইমাত্র দরজা খুলে বেরিয়ে আসা 'ঘাম-মানব' জানতে চাইলো। বেশ হাঁপাচ্ছে লোকটা সেই সাথে পুলিশ দেখে মনে হয় একটু নার্ভাস। "কি ব্যাপার, আপনারা? সরি, খুলতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমি পেছনের বাগানে কাজ করছিলাম। হাত ধুয়ে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল।"

"আপনি মিস্টার রিফাত?"

"জি, আপনারা?" সে এখনো মৃদু হাঁপাচ্ছে। "ব্যাপার কি, বলুন তো?"

বাশার একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। কারণ কেন জানি লোকটাকে বেশ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ওর কাছে। "না মানে আমরা একটা ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম," বাশার একটু দ্বিধার সাথে বলে একবার জয়ার দিকে দেখলো। জয়া ভ্রু কুঁকে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে।

“কোন ব্যাপারে?” লোকটাকে কেন জানি শঙ্কিত মনে হচ্ছে বাশারের কাছে। “আসলে আমি কাজ করছিলাম তো। তাই জরুরি কিছু না হলে পরে কথা বলতে হবে।”

“আজ থেকে এগারো বছর আগে আপনি মনে হয় ময়মনসিংহ মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিলেন। তখন একটা ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আমরা ওই ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। ব্যাপারটা একটু জরুরি।”

“একটু না, বেশ জরুরি,” বাশারের কথার সাথে যোগ করলো জয়া। সে এখনো কেন জানি কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মানুষটার দিকে।

লোকটা এবকটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, যেন দ্বিধা করছে কিছু বলতে। “এতো আগের ঘটনা! আর আমি ওই ব্যাপারে ঠিক কথা বলতে চাচ্ছিলাম না।”

“ব্যাপারটা জরুরি,” এবার বাশারও একটু কড়া গলায় বললো। আরো একটা দীর্ঘ মুহূর্ত লোকটা বাশারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে যেন হার মেনে নিয়ে বললো। “আসুন, ভেতরে আসুন,” বলে সে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

ভেতরে বেশ সুন্দর দেখতে একটা ড্রইংরুম। চারপাশে নানা ধরণের অ্যান্টিক জিনিস আর দেয়ালে পেইন্টিঙের ছড়াছড়ি। কিন্তু রুমটার মধ্যে একটু বিশদৃশ কী যেন আছে। বাশার ঠিক ধরতে পারলো না।

সোফায় এসে বসলো ওরা। সোফার একপাশে একটা শার্ট ভাঁজ করে ফেলে রাখা হয়েছে। বাশার আন্দাজ করলো ওরা আসার আগে মনে হয় লোকটা এই শার্টটা পরে ছিল। ওরা দুজনে একটা সোফায় বসতেই লোকটা অন্যপাশের একটা সোফায় বসলো। জুতো পরা একটা পা আরেক পায়ের ওপরে ভাঁজ করে রাখলো। সাথে সাথে বাশারের ভ্রু কুঁচকে উঠলো।

“বলুন, কি বলতে চান। তবে তার আগে আমি আপনাদের আইডিকার্ড দেখতে চাই। বাশার নিজের কার্ড দেখালো। লোকটা জয়ার দিকে তাকিয়ে আছে জয়াও সমান প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ দৃষ্টি নামিয়ে জয়া পকেট থেকে মোবাইল বের করে টিপতে লাগলো।

“আমি জানি না আপনারা কি বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন তবে এই ব্যাপারে আসলে এতোটাই জল ঘোলা হয়েছে যে...” লোকটার কথা শেষ করার আগেই বাশারের পাশ থেকে জয়া বলে উঠলো। “কি ব্যাপার,

আপনার মোবাইল বন্ধ নাকি? আপনার নামে আমার মোবাইলে টেক্সট এসেছে কেন?”

একে তো লোবটার সাথে কথা বলার মাঝথানে কথা বলেছে তার ওপরে চট করে এমন একটা কথা বলেছে বাশার প্রথমে বিরক্ত হলো তারপর অবাক হয়ে গেল। “আমার নামে টেক্সট এসেছে আপনার মোবাইলে! কিভাবে সম..”

“এইযে দেখুন,” বলে মোবাইলটা এগিয়ে দিলো সে বাশারের দিকে। বিন্তু বাশার মোবাইলটা নেয়ার আগেই ভেতরের রুম থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ ভেসে এল। কিছু একটা ভেঙেছে মনে হলো। বাশার আর জয়া দুজনেই ফিরে তাকালো সেদিকে তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো লোকটার দিকে। কথার মাঝখানে জয়া বাঁধা দেয়াতে লোকটা থেমে গেছিল, ভেতর থেকে শব্দ ভেসে আসতেই ওদের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস একটা হাসি দিলো সে।

“আর বলেন না, আমার বিড়ালটা এতো বিরক্ত করে,” বলেই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সোফার পাশ থেকে শার্টটা তুলে নিয়ে ভেতরের দিকে রওনা দিলো। জয়া তার হাতে ধরা মোইলাটা বাশারের দিকে আরো এগিয়ে দিলো। বাশার মোবাইলটা নিয়ে টেক্সট মেসেজটা পড়তে লাগলো। “এটাতো...”

“চুপ-চাপ পড়–ন কী লিখেছি,” জয়া ভেতরের রুমের দিকে তাকিয়ে আছে, যেদিক দিয়ে এইমাত্র লোকটা প্রবেশ করেছে।

বাশার দেখলো মোবাইলের মেসেজ অপশনে ইংরেজি অক্ষর দিয়ে একটা বাংলা মেসেজে লেখা।

‘এই লোকটা রিফাত মজুমদার হতে পারেনা,’ মেসেজটা পড়ে ঝট করে বাশার ফিরে তাকালো জয়ার দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে জয়া ঠোঁট গোল করে খুব মৃদু স্বরে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললো,

“কারণ, রিফাত মজুমদার একজন মহিলা।”

অধ্যায় চব্বিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

তারাটি গ্রাম, মুক্তাগাছা

বিল্লাল শেঠকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে একদল লোক, ব্যাপারটা অনুধাবন করার সাথে সাথে কিছুক্ষণ ম্যাকফির মাথা কাজ করলো না। তবে ওর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল প্রায় সাথে সাথেই।

ম্যাকফি গাছের আড়াল থেকে মাথা সরিয়ে নিলো। দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছে। লোকগুলো কারা সেটা ওরা জানে না। আর বিল্লাল শেঠ মানুষটা ওদের শেষ একটা সূত্র হতে পারে। আর এই লোকটা অবশ্যই অনেক কিছু জানে। তা-না হলে তার পেছনে এভাবে সবাই লাগতো না। কাজেই একে হাতছাড়া করা যাবে না। লোকগুলো যারাই হোক, প্রয়োজনে তাদের হাত থেকে বিল্লাল শেঠকে উদ্ধার করে হলেও এর সাথে কথা বলতে হবে। তবে সেটা করতে হলে আগে ওদের পিছু নেয়া দরকার। ম্যাকফি দ্রুত পরিকল্পনা করে ফেললো।

মহাবীর সিং আর জোনাথনকে প্রয়োজন নেই, সবাই মিলে পিছু নিতে গেলে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা যেমন থাকে ঠিক তেমনি অন্যপক্ষ টের পেয়ে যাবার সম্ভবনাও বেড়ে যায়। অন্যদিকে এদের পিছু নিতে গেলে নানা বিপদ হতে পারে। সেইসাথে পানু ছেলেটাকে এই বিপদে টেনে নিয়ে লাভ নেই। তবে শঙ্করকে ওর দরকার। একে তো এই এলাকা ও চেনে না অন্যদিকে বাংলা মোটামুটি পারলেও এই এলাকার স্থানীয় অনেকের ভাষাও বুঝতে পারবে না। কাজেই দ্রুত ও শঙ্করকে বলে দিলো কী করতে হবে। পানুকে বললো মহাবীর সিং আর জোনাথনের কাছে গিয়ে সব জানিয়ে অপেক্ষা করতে। যেদিকে লোকগুলো গেছে সেদিকে শঙ্করকে নিয়ে রওনা দিলো ও।

খেতের আইল ধরে দ্রুত পা চালালো ওরা। লোকগুলো এই সময়ের ভেতরে নিশ্চই খানিকটা এগিয়ে গেছে তাই প্রায় দৌড়াতে লাগলো ওরা।

সমস্যা হলো, ম্যাকফি পরে আছে লাল কোট আর সাদা ব্রিচেস। অন্যদিকে শঙ্করের পরনে কালো জামা আর সাদা ধূতি। মাথায় ছাই রঙের পাগড়ি। এই পোশাকে সহজেই অন্ধকারে চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। বরং ওরা আরো জোরে পা চালানোর চেষ্টা করতে লাগলো। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল লোকগুলো একটা ছোট বাঁশঝাড়ের মতো জায়গা পার হয়ে খালের পাড়ে গিয়ে নামল।

এবার চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল দলে ওরা পাঁচজন। দলনেতা বাদে প্রত্যেকের পরনে সাদা ধূতি, লাল পাগড়ি আর বুকে হাতা কাটা জামা। প্রত্যেকের হাতেই লম্বা-লম্বা লাঠি। এই মুহূর্তে দুজনেই বিল্লাল শেঠকে ধরে একরকম শূণ্যে তুলে নিয়ে হাঁটছে। পুরো দলটার কারোরই অন্যকোন দিকে নজর নেই। শক্তিশালী পায়ে দ্রুত হাঁটছে সামনের দিকে। দেখেই বোঝা যায় অন্ধকারে হাঁটতে তাদের বিন্দুমাত্র সমস্যা হচ্ছে না। তারমানে ওরা এই এলাকারই লোক। বাঁশঝাড় পার হয়ে ওরা খালপাড়ের দিকে এগোচ্ছে।

খালপাড়ে গিয়ে একটু থামলো ওরা। কারণ খালের ওপরে চিকন বাঁশের সাঁকো দেয়া। একজন একজন করে পা হতে হবে। প্রথমেই দলনেতা চলে গেল অন্যপাড়ে। এরপর একজন সাদা ধূতি গেল তারপর বিল্লাল শেঠ তারপর আরেকজন এভাবে রওনা দিলো ওরা।

ম্যাকফিরা বাঁশঝাড়ের ভেতরেই বসে রইলো। দলের সামনের লোকরো পার হচ্ছে নেতাগোছের লোকটা পেছন ফিরে চাইলো হঠাৎ করে। ম্যাকফি মটকা মরে বাঁশ ঝাড়ের ভেতরেই বসে রইলো। ব্যাপার কি? লোকটা কি দেখে ফেললো নাকি ওদেরকে। লোকটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে বাঁশঝাড়ের দিকে। হঠাৎ ঝপাত করে শব্দ ভেসে এল সামনে থেকে। সেইসাথে শোনা গেল চিৎকার। নেতা লোকটা তো বটেই ওরাও দূর থেকে দেখতে পেল বিল্লাল শেঠ তার বিশাল দেহ নিয়ে পালানোর জন্যে সাঁকো থেকে পানিতে লাফ দিয়েছে। এটা দেখে দলের একজন দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো পানিতে।

“হুজুর, এরা তো মনে অয় তালুকদারগো লাঠিয়াল,” শঙ্কর হঠাৎ চাপ স্বরে বলে উঠলো।

“এরা আবার কারা?” ম্যাকফি ফিসফিস করেই জানতে চাইলো।

“হুজুর, এরা...” শঙ্কর কথা শেষ করার আগেই দেখতে পেল বিল্লাল শেঠকে ঘাড়ে ধরে পানি থেকে টেনে তুলছে নেতাগোছের সেই লম্বা লোকটা।

বিল্লাল শেঠকে টেনে তুলেই ওরা আবারো হাঁটতে লাগলো। ম্যাকফি আর শঙ্কর খাল পাড়ের কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়লো। লোকগুলো দূরে সরে না যাওয়া পর্যন্ত খাল পার হওয়া সম্ভব না। কারণ এটা পার হবার একমাত্র উপায় সাঁকোটা। আর সাঁকো দিয়ে পার হতে গেলে অনেক দূরে থেকে চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ওরা খালপাড়ের কাদাযুক্ত মাটিতেই পড়ে রইলো। লোকগুলো বেশ দূরে সরে গেলে উঠে পড়লো সাঁকোর ওপরে। সাঁকো পার হয়ে খালের অন্যপাড়ে এসে প্রায় দৌড়াতে লাড়গলো দুজনে। লোকগুলোর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। বেশ অনেকটা পথ দৌড়ে প্রায় চলে এল জঙ্গলমতো একটা জায়গার প্রান্তে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে ম্যাকফি শঙ্কর তে প্রশ্ন করলো, “হারিয়ে ফেললাম নাকি ওদের?”

শঙ্কর কিছু না বলে আশেপাশে দেখতে লাগলো। “হুজুর, এই জঙ্গল ছাড়া তো আশেপাশে আর কুথাও দেখতে বাকি রাহি নাই।”

“এখানেই ঢুকতে হবে। আমার মনে হয় ওরা এদিক দিয়েই গেছে,” ম্যাকফি এখনো হাপাচ্ছে।

“সর্বনাশ! হুজুর কি কন! এইহান থাইক্কা মধুপুরের গড় শুরু। রাইতের বেলা গড়ের ভিতরে ঢুকতে নাই। অমঙ্গল হয়,” এই অন্ধকারে ভয় পাওয়ায় শঙ্করের চেহারা আরো সাদা দেখাচ্ছে।

“এই লোকগুলোকে হারালে আমাদের আরো বেশি অমঙ্গল হবে। চলো,” বলেই পিস্তলটা আবারো বের করে বনের ভেতরে ঢুকে পড়লো ম্যাকফি। ওকে বেশ দূরে রেখে অনুসরণ করছে শঙ্কর। ওরা জঙ্গলে প্রবেশ করে বেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে কিন্তু এখনো লোকগুলোর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। আরেকটু এগোলেই জঙ্গলের ফাঁকে একটা জায়গায় আরো কিছু মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। রীতিমতো একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। সাথে সাথে শঙ্করকে চেপে ধরে একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়লো ম্যাকফি। খালপাড়ের কাদামাটিতে শুয়ে থেকে একটা উপকার হয়েছে কাদা লেগে ওদের পোশাক বেশ ময়লা হয়ে গেছে। এখন অন্ধকারে আর সহজে চোখ পড়বে না। এখান থেকে ফাঁকা জায়গাটা চোখে পড়ছে।

ঝোপের ফাঁকে সেখানো আরো বেশ কয়েকজন লাঠিয়ালকে দেখতে পেল ওরা। সেইসাথে বিল্লাল শেঠকে বয়ে আনা সেই ক’জন। ওদের ঠিক সামনেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বিল্লাল শেঠ।

“তালুকদাররাই, আমি ঠিকি কইছিলাম। হুজুর এগোরে পুরা এলাকার সবাই লাল পাগড়ি বাহিনী নামে চেনে।”

“ওরা কারো জন্যে অপেক্ষা করছে,” ম্যাকফি আনমেনই বলে উঠলো।

একটু পরেই চারজন শক্তিশালী মানুষ একটা পালকি বহন করে নিয়ে নামিয়ে রাখলো ফাঁকা জায়গাটায়। পালকির ভেতর থেকে নেমে এল মুখ ঢাকা হালকা-পাতলা একটা অবয়ব। মানুষটা নেমে এসে বিল্লাল শেঠের সামনে দাঁড়াতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো শেঠ। কিন্তু মানুষটার তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে একটা হাত তুলে কি জানি বললো। প্রায় সাথে সাথেই শান্ত হয়ে এল শেঠ।

মুখ থেকে আবরণ সরালো মানুষটা।

সাথে সাথে পাশ থেকে বিস্ময়ধ্বনি শুনতে পেল ম্যাকফি ।

“বেগম সাহেবা!” শঙ্কর ফিসফিস করে বলে উঠলো। ম্যাকফি মুখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে প্রথমেই দেখতে পেল কপালে বড় একটা তিলক। তিলকের দুইপাশে অনিন্দ্য সুন্দর বড়-বড় দুটো চোখ।

“একজন মহিলা!” আপন মনেই বলে উঠলো সে।

দ্বিতীয় অংশ: মৃত্যুহরণ

অধ্যায় পঁচিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

কালীবাড়ি, মধুপুর, তালুকদার পরিবারের আবাসস্থল

মৃত মানুষ কি ফিরে আসতে পারে!

তালুকদার পরিবারের পুত্রবধূ জোহরা আনজুমান আরা তালুকদারের মনের ভেতরে বার-বার শুধু এ-কথাটাই ঘুরে-ফিরে আসছে। তবে মৃত মানুষ ফিরে না এলেও জীবিত মানুষ তো ফিরে আসতেই পারে। তার স্বামি সিরাজদুদ্দিন তালুকদার কি আসলেই বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে সেটা না জানা পর্যন্ত কিছুতেই বলা সম্ভব নয় সে কি আদৌ ফিরে আসবে নাকি আসবে না।

নিজের শোবার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কোনভাবেই ধেয়ে আসা চোখের জল আটকাতে পারলো না জোহরা। দোতলা কাঠের বাড়িটাতে নিজের শোবার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়ালে পুরো বাড়িটাই চোখে পড়ে। জানালা দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো জোহরা। বাইরে গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টির ভেতরেও বাড়ির উঠানে কাজ করছে কিছু লোকজন। গত কয়েকদিন যাবৎ টানা ধান সিদ্ধ করা হচ্ছে। তাই রোজ সকালে রোদ ওঠার সাথে-সাথেই বাড়ির কাজের লোকেরা ধানগুলোকে উঠানে শুকাতে দিয়েছিল কিন্তু বিধি বাম। বিকেলবেলা ধান গোলাঘরে তুলে আনার আগেই বৃষ্টি।

সকাল থেকে কাজে ব্যস্ত থাকলেও কিছুতেই আসলে তার মনোযোগ নেই। তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বামির একটা ছোট্ট খোঁজ পাবার জন্যে মনটা আনচান করছে। সে-খবরই আসার কথা। তাই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উঠানের কর্মব্যস্ততা ছাড়িয়ে তার মন আর দৃষ্টি দুটোই বারবার ছুটে যাচ্ছে বাড়ির পেছনের রাস্তাটার দিকে। যার খবর নিয়ে আসার কথা সে ওদিকে দিয়েই আসবে।

জানালার পাশ থেকে সরে এল সে। এভাবে ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে অসহ্য লাগছে জোহরার। দোতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচের খাবার ঘরে

নেমে এল জোহরা। সেখানে চেয়ারের ওপরে রাখা একটা শাল তুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটা জড়িয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। তালুকদার পরিবারের বউয়েরা কখনোই বাড়ির বাইরের বারান্দায় নিজেদের মুখ দেখায় না। বাড়ির পেছনের অংশে তাদের জন্যে আলাদা উঠান আছে, স্নানের জন্যে রয়েছে আলাদা পুকুর, প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে আলাদা ইঁদারা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে গেল বাড়ির বউদের ভেতরে সেই প্রথম যে এই প্রক্রিয়া ভেঙেছিল। কতোই বা বয়স ছিল তখন তার। আজ এতো বছর পরেও ঠিক মনে পড়ে। সময়ের সাথে সাথে স্মৃতিগুলোও ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হয়ে পড়ে। সময় পেরুলেই 'আজ' কতো সহজেই না 'কাল' হয়ে যায় ভাবতে অবাকই লাগে।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ভেতরে নির্জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরো শৈশব যেন ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে সে যখন এই বাড়ির বউ হয়ে আসে তখন তার বয়স ছিল মাত্র তেরো কি চোদ্দ । সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে বরং একটু দেরি করেই বিয়ে হয়েছিল তার। কারণ ছিল তার বাবা। জোহরার বাবা ছিল খুলনা এলাকার বনেদি পরিবারের ছেলে। এগারো ভাই-বোনের ভেতরে জোহরা ছিল সবার ছোট। যেকারণে বাড়ির কঠিন নিয়ম আর ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব খুব বেশি তার ওপরে পড়েনি। একারণেই যেসব কাজ তার ভাই বোন কিংবা বাড়ির লোকেরা করার কথা ভাবতেও পারতো না, সেসব দুষ্টুমি অবলীলায় করে বেড়াতো জোহরা। জোহরার এরকম আনন্দময় জীবনের পেছনে ওর বাবার ভালোবাসা আর প্রশ্রয়ই ছিল মূল কারণ। একে তো ছোট সন্তান তার ওপরে জোহরার প্রতি তার বাবার অতিরিক্ত ভালোবাসার একটা কারণ ছিল। এই গল্পটা জোহরা ওর মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল।

জোহরার জন্মের আগে ওর বাবা গেছিল হজ্ব করতে। তখনকার সময়ে হজ্ব মানেই বিরাট আয়োজন আর এলাহি ব্যাপার। কারণ তখন হজ্বে যাবার উপায় ছিল একটাই; পায়ে হেঁটে। তাই বিরাট কাফেলাসহ লোকজন হজ্বের জন্যে বেরিয়ে পড়তো লম্বা সময়ের জন্যে। জোহরার বাবার কাফেলা যখন মিশর পার হচ্ছে তখন তাদের সাথের গাইড মানে যাকে মোহাল্লেম বলা হয় সে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। ভীষণ মরুর গহীনে পথ হারিয়ে ফেলে তাদের কাফেলা। কোনভাবেই সঠিক পথ বের করতে না পেরে তারা যখন মরতে বসেছে তখন তারা আল জোহর নামের একটা মরুদ্যানে এসে পানি খুঁজে পেয়ে কোনমতে প্রাণে বেঁচে যায়। সেখানেই জোহরার বাবা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যদি এ-যাত্রা ভালোভাবে হজ্ব করে দেশে ফিরতে পারে তবে

সে আরেকটা সন্তানের জন্ম দিবে আর তার নাম রাখবে জোহর। সেই মরুদ্যানের নামে। যাতে জীবনের প্রতি পদে চলতে গিয়ে এই সন্তানকে দেখে সে তার নবজন্মের কথা মনে করতে পারে। এরপরে মেয়ে সন্তানের জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় জোহরা।

বাইরের টিপ-টিপ বৃষ্টি দেখতে-দেখতে জোহরা বারান্দায় এসে একটা ঝুল চেয়ারে বসে পড়লো। মন পড়ে গেল ওর বাবার কথা।

সময়টা সতেরশ শতকের শেষভাগ। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের কোষাগার তখন গড়ের মাঠ। এমন সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্যে আবারো লর্ড কর্নওয়ালিসকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এর আগে কর্নওয়ালিস তার প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর শক্তিশালী পদক্ষেপ দিয়ে অনেক কিছুই করে গেছে। এবারও তাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তবে এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে।

লর্ড কর্নওয়ালিস ক্ষমতায় আরোহন করা মাত্রই ফন্দি-ফিকির খুঁজতে থাকে কিভাবে ইংরেজ সরকারকে এই অর্থনৈতিক দূরবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায়। ঠিক তার আগের লর্ড করের মাত্রা বাড়িয়ে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কাজ হয়নি। তাই সে তার ধূর্ত মস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কুটিল আইন বের করে। সূর্যাস্ত আইন।

এই আইনের আওতায় কোন প্রজা বা জমিদার যদি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের সূর্যাস্তের ভেতরে নিজের বকেয়া খাজনা পরিশোধ করতে না পারে তবে তার জমিদারি ইংরেজ সরকার করায়ত্ত করে নিয়ে খাজনা আদায় করে নিতে পারবে। এই ব্যবস্থার ফলে বহু জমিদার, বহু ভূসম্পত্তির মালিক নিজেদের সব হারিয়ে পথে বসে। এইসব মানুষদের ভেতরে একজন ছিল জোহরার বাবা। সব হারিয়ে সে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। অর্থিক সামাজিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষটা যখন সব হারিয়ে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে ধেয়ে চলেছে এমন সময় তার সাহায্যর্থে এগিয়ে আসে তারই বন্ধু রমিজউদ্দিন তালুকদার।

এই মানুষটার কথা জোহরা ছোটবেলা থেকে বাবার মুখে শুনে আসলেও ছোটবেলার পর থেকে তাকে কখনো দেখেনি। জোহরার বাবা যেমন খুলনা এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। ঠিক একইভাবে রমিজউদ্দিন তালুকদার ময়মনসিংহের মধুপুরের গড় এলাকার সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী পরিবারের

মানুষ। একসাথে পড়ালেখা করার সময়ে তাদের পরিচয় জোহরার বাবা সবসময়ই রমিজউদ্দিন তালুকদারের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখতো তার অত্যাধিক ধর্মীয় গোড়ামির কারণে। কিন্তু তালুকদার জোহরার বাবাকে অত্যন্ত পছন্ত করতো। একরনেই জোহরার বাবার অসুস্থতার খবর শোনার সাথে সাথে দেরি না করে চলে আসে ওদের বাড়িতে। কিন্তু ওদের কপাল ছিল খারাপ। খুব অল্প সময়ের ভেতরেই জোহরার বাবা মারা যায় আর ওর বাবার মৃত্যুশোক কাটার আগেই মা ও সবাইকে ছেড়ে চলে যান।

রমিজউদ্দিন তালুকদার গোড়া হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ ছিল সে। জোহারার বাবা-মা দুজনেই প্রস্থান করার পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে সে বুঝতে পারে জোহরাকে এভাবে বাড়িতে রাখা যাবে না, অন্যদিকে তার কোন আত্মীয়ও জোহরার দায়িত্ব নিতে চাইছিল না। তাই রমিজউদ্দিনের সামনে তখন একটাই পথ খোলা ছিল। নিজের বড় ছেলের বউ মারা গেছে কিছুদিন আগে, তাই সে জোহরাকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে।

জোহরার বয়স তখন তেরো। আর ওর স্বামির বয়স চল্লিশের ওপরে। জোহরার স্বামি সিরাজ উদ্দিনের প্রথম ঘরের বড় সন্তানের বয়স তখন জোহরার চেয়ে কম করে হলেও সাত আট বছর বেশি। বিয়ের পরে জোহরা নিজের চারপাশে অন্য এক ভুবনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। তালুকদার পরিবার চলতো কঠিন ধর্মীয় অনুশাসনে। এক কথায় বলা চলে তাদের চলাফেরা, বেশভূষা, পারিবারিক আর সামাজিক রীতিনীতি সবই কঠিন ধর্মীয় অনুশাসনে মোড়ানো থাকে।

তবে জোহরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করে এই ধর্মীয় অনুশাসনের বেশিরভাগটাই আসলে রমিজউদ্দিন তালুকদার নিজে মেনে চলে আর বাকি পুরোটাই মেনে চলতে হয় পরিবারের মেয়েদের। পরিবারের বেশিরভাগ পুরুষ বলতে গেলে এই ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরেই অবস্থান করে। শুধু তাই নয় রমিজউদ্দিন তালুকদার নিজে যেমন শক্ত মানুষ সেই হিসেবে নিজের সন্তানদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। নিজে বেশ শিক্ষিত হবার পরও তার সাত ছেলের প্রায় কেউই তেমন পড়ালেখা করেনি। অন্যদিকে পারিবারিক বিরাট ব্যবসার প্রায় পুরোটাই সে নিজে পরিচালনা করে। তার পরিবারিক রীতিনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা কোনটাতেই তার কোন ছেলেদের তেমন অংশগ্রহণ নেই।

বিয়ে হবার পর থেকেই জোহরাকে তাদের পারিবারিক আইন-কানুন কঠিনভাবে মেনে চলতে হোত। এইসব কঠিন নিয়ম কানুন আর পারিবারিক কাজের পর জোহরা খুব বেশি একটা সময় পেত না। কিন্তু এর ভেতরেই সে নিজে থেকে চেষ্টা করতো তালুকদার পরিবারের ব্যবসা বোঝার, অন্যদিকে নিজে-নিজে পড়ালেখা করার চেষ্টাও করতো। এই দুটোর কোনটাই সম্ভব হোত না যদি না জোহরার স্বামি সিরাজ উদ্দিন তালুকদার তার প্রতি সহনশীল না হোত। বিয়ের পর প্রথম-প্রথম সিরাজ উদ্দিন তালুকদার মানুষটা জোহরাকে একরকম এড়িয়েই চলতো। আর নিজের চেয়ে দ্বিগুন বয়সি স্বামিকে জোহরা ভয় পেত।

কিন্তু ধীরে-ধীরে তারা পরস্পরকে আবিষ্কার করতে থাকে। জোহরাকে এড়িয়ে চলার কারণও আবিষ্কার করে। সেটা হলো প্রথম স্ত্রীর জন্যে সিরাজ উদ্দিন তালুকদারের অপরিসীম ভালোবাসা। নিজের স্ত্রী মারা যাবার পরও তার প্রতি সিরাজের ভালোবাসা এতোটুক কম হয়নি। এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করার পর মানুষটার প্রতি জোহরার সম্মান বাড়তে থাকে। অন্যদিকে জোহরার পড়ালেখা শেখার আগ্রহ সিরাজ উদ্দিন তালুকদারকে বেশ আনন্দ দিতো। তাই সে নিজেও চেষ্টা করতো তার স্ত্রীকে যতোটা সম্ভব সহায়তা করার। কিন্তু গ্রামের পরিবেশে ওইরকম অবস্থায় এক নারীকে পড়ালেখা শেখানো এতোটা সহজ ছিল না। তাই জোহরা সাহস করে একদিন রমিজউদ্দিন তালুকদারের মুখোমুখি হয়ে তার পড়ালেখা শেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

ব্যাপারটা ছিল একরকম অবিশ্বাস্য। রমিজউদ্দিন তালুকদার জোহরার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বেশ সময় নিয়ে এটা-ওটা জানতে চান। জোহরার জানার ইচ্ছে আর পড়ালেখা করার ইচ্ছে সত্যিই তাকে প্রভাবিত করে। তবে জোহরার প্রস্তাব শুনে রমিজউদ্দিন তালুকদার একটু চিন্তায় পড়ে যায়। কারণ তখনকার দিনে একটা মুসলিম পরিবারের কোন মেয়েকে কোন পুরুষ শিক্ষক এসে পড়াবে সেটা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে তাকে পড়ানোর মতো আর কেউ নেই। রমিজউদ্দিন তালুকদার সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করে বসে সে নিজেই জোহরাকে পড়াবে। যদিও সে নিজের প্রাত্যহিক ব্যস্ত জীবনে সময় পেতো খুবই কম। তবুও প্রতিদিন রাতের আহার সম্পন্ন করার পর জোহরাকে নিয়ে পড়াতে বসতো সে।

পড়ানোর প্রথমিক বিষয় ছিল আরবি আর ফার্সি ভাষা। কিন্তু জোহরার আগ্রহের কারণে ধীরে-ধীরে ইতিহাস আর ভূগোল আর গণিতও অন্তর্ভূক্ত হয়। রমিজউদ্দিন তালুকদার নিজে শিক্ষিত ছিল, এছাড়াও সে মধ্যপ্রাচ্য

থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর দীর্ঘদিন পারিবারিক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তার ব্যবসায়িক জ্ঞানও ছিল অপরিসীম। কিন্তু কখনোই সে নিজের সন্তান বা নিজের নাতি-নাতনিদের কাউকেও পড়ালেখার বিষয়ে আগ্রহি করে তুলতে পারে নি। তাই মনের মতো ছাত্রি পেয়ে নিজের জ্ঞান উজাড় করে দেয় মানুষটা। অন্যদিকে বৈষয়িক জ্ঞান থেকে শুরু করে তালুকদার পরিবারের ব্যবসা পর্যন্ত সবকিছুই ধীরে-ধীরে আয়ত্ব করে নিতে থাকে জোহরা। এভাবে নির্ভিগ্নেই চলে যায় আরো বেশ কয়েক বছর।

তালুকদার পরিবারের বড় ছেলের বউ মানেই বাড়ির বড় বউ। আর এধরনের পরিবারে বড় বউয়ের প্রভাব থাকে অন্যরকম। আর পড়ালেখা করার কারণে আর রমিজউদ্দিন তালুকদারের স্নেহভাজন হবার কারণে তালুকদার পরিবারে জোহরার শক্ত একটা অবস্থান তৈরী হয়ে যায়। পারিবারের অভ্যন্তরীণ অনেক সিদ্ধান্তও জোহরাই নিতে শুরু করে।

সব ভালোভাবেই চলছিল তবে এর মাঝেও একটা ঘটনা ঘটে যা আবারো ক্ষণিকের জন্যে হলেও জোহরার পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়। জোহরা প্রথম সন্তান জন্ম দেবার সময়ে শারীরিকভাবে খুবই জটিল এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গর্ভের সন্তান জন্ম দেবার সময়েই মারা যায় আর ধাত্রি ঘোষণা করে জোহরা আর কোনদিন সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। আরো একবার অপরিসীম দূর্ভাগ্য জোহরার পৃথিবীকে অন্ধকার করে দেয়। এই শোক পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার আগেই আবারো এমন এক ঘটনা ঘটে যার ফলে শুধু জোহরা নয় পুরো তালুকদার পরিবারের ভাগ্য এক নিমিষে পাল্টে যায়।

রমিজউদ্দিন তালুকদার হঠাৎই এক দূর্ঘটনায় মারা যায়। শুধু রমিজউদ্দিন তালুকদারের মৃত্যুই নয়, এই দূর্ঘটনায় বিরাট আর্থিক ক্ষতিরও সন্মূখীন হয় তালুকদার পরিবার। ঘটনাটা ঘটেছিল কোন এক তীব্র শীতের রাতে। কী ঘটেছিল বলার আগে তৎকালীন মধুপুর এলাকার প্রেক্ষাপট বলে নেয়াটা জরুরি।

সেই সময়ে তালুকদার শুধুই একটা পারিবারিব উপাধিই ছিল না বরং জমিদারদের মতো এটারও একটা গুরুত্ব ছিল। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিজমা-অর্থাৎ যাদের ‘তালুক’ থাকতো তাদেরকেই সরকার কর্তৃক তালুকদার উপাধি দেয়া হোত। রমিজউদ্দিন তালুকদাররা বহু আগে থেকেই পারিবারিকভাবে তালুকদার উপাধি প্রাপ্ত ছিল। সত্যি কথা হলো তারা শুধু

তালুকদার উপাধি প্রাপ্তই নয় তাদের পরিবারিক আরো অনেক বেশে গুরুত্ব ছিল অত্র মধুপুর অঞ্চলে।

ধর্মীয়ভাবে তারা মুসলমান হওয়াতে অত্র হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সবচেয়ে বড় মুসলমান পরিবার হিসেবে তাদের একটা গুরুত্ব তো ছিলই সেইসাথে ব্যবসায়িক কারণেও তালুকদার পরিবার ছিল এই এলাকার অন্যতম পরিবার। অত্র এলাকার প্রাণ যে-দুটো ব্যবসা সেই দুটোর মূল পরিচালক ছিল তালুকদার পরিবার। প্রায় শতবছর ধরে তারাই ছিল এই এলাকার নিয়ন্ত্রক ও হর্তাকর্তা। এমন সময় দেশের উত্তর বঙ্গ থেকে স্থানান্তর হয়ে আচার্য জমিদারদের পরিবার যখন এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করলো খুব স্বাভাবিকভাবেই দুই পরিবারের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবি ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি কারণ রমিজউদ্দিন তালুকদার ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।

সে খুব ভালোভাবেই জানতো যতোই বহিরাগত হোকনা কেন একে তো ধর্মীয় কারণে তারা এই এলাকায় একটা সুবিধা পাবে, তার ওপরে আবার আচার্য পরিবারের বিত্ত-সম্পদ তাদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই শুরু থেকেই সরাসরি যেকোন সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে অবশ্যম্ভাবি যা-যা করণীয় সেগুলো ঠিকমতোই পালন করে চলতো সে। বর্তমান জমিদার সূর্যকান্ত আচার্যের পিতা আর রমিজউদ্দিন তালুকদারের ভেতরে এক ধরণের অলিখিত চুক্তি বজায় ছিল দীর্ঘ সময় ধরে।

কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা ভেঙে পড়ে সূর্যকান্ত আচার্যের পিতার মৃত্যুর পরেই। সূর্যকান্তের বাবার মৃত্যুর পর দিয়ে প্রথমে যথা নিয়মে সূর্যকান্তের বড় ভাই রমাকান্ত আচার্য তাদের পারিবারিক জমিদারির দায়িত্ব পায়। তবে অল্প সময়ের ভেতরেই ছোটভাইয়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে হয় তাকে। অন্যদিকে সূর্যকান্ত জমিদার হবার প্রায় সাথে সাথেই একের পর এক সংঘর্ষ লাগতে থাকে তালুকদার পরিবারের সাথে।

রমিজউদ্দিন তালুকদার ছিল পাকা ব্যবসায়ি। আগে থেকেই সবকিছু অনুধাবন করতে পেরেছিল সে। সে আন্দাজ করতে পেরেছিল সূর্যকান্ত জমিদার হলে তার সাথে লাগার চেষ্টা করবে কিন্তু সে এমনভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল যেখানেই সূর্যকান্ত হাত বাড়ানোর চেষ্টা করতো রমিজউদ্দিনে পূর্বপ্রস্তুতির কারণে সে কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। পেছন যুদ্ধে খুব বেশি সুবিধে করতে না পেরে সূর্যকান্ত আচার্য সরাসরিই রমিজউদ্দিনকে একটা প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবটা ছিল খুবই জঘন্য। এমনকি রমিজউদ্দিন তালুকদারের মতো ঠান্ডা মাথার মানুষও এই

প্রস্তাব শুনে দিগবিদিক হারিয়ে রেগে ওঠে। সূর্যকান্তের প্রস্তাব মেনে নিতে হলে রমিজউদ্দিনকে তার কাঠের ব্যবসার প্রায় পুরোটাই ছেড়ে দিতে হবে। সরাসরিই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সে।

জোহরার এখনো মনে পড়ে সেই রাতের কথা। প্রতিদিনের মতো রাতের আহার সারার পর রমিজউদ্দিন তালুকদার জোহরার সাথে পড়ালেখা ও ব্যবসায়িক আলাপ ইত্যাদি নিয়ে বসতো। তখন বেশ শীত পড়েছে। ধুমছে চলছে ফসলের কাজ। হাজার হাজার মন ধান কেটে-শুকিয়ে-সিদ্ধ করে তারপর আবার শুকিয়ে গুদামজাত করা এলাহি কারবার। ওইদিন রমিজউদ্দিন অত্যন্ত ব্যস্ত দিন কাটিয়েছে। জোহরা ভেবেছিল সে তার সাথে বসবে না। কিন্তু রাতের খাবার পর ঠিকই জোহরার ডাক পড়ে। যথারীতি জোহরা তার বইপত্র নিয়ে হাজির হয় রমিজউদ্দিনের বসার ঘরে।

সে ঘরে ঢুকে দেখতে পায় রমিজউদ্দিন বেশ গম্ভীর মুখে বসে আছে। জোহরাকে বইপত্র হাতে প্রবেশ করতে দেখে তাকে বইপত্র নামিয়ে রাখতে বলে। জোহরা পরিষ্কার মনে করতে পারে রমিজউদ্দিন তালুকদার তার কাছে ওইদিন কি কি বলেছিল। সে প্রথমেই খুব আফসোস করছিল তার ছেলেদের কাউকেই সে নিজের মতো করে মানুষ করতে পারেনি ব'লে। সে জোহারাকে জানায় তার যদি কিছু হয়ে যায় তবে জোহরা যেন এইসব দেখে রাখে। কারণ যেকোন ছেলের চাইতে জোহরা তার পরিবারিক ব্যবসার ব্যাপারে বেশি জানে। রমিজউদ্দিনের মতো শক্ত মানুষের এই চেহারা জোহরা কখনো কল্পনায় করতে পারেনি। যে-লোক কখনো তার পরিবারের মেয়েদেরকে বাড়ির বাইরে মুখ দেখাতে দেয়নি সেই লোক কোন অবস্থায় পড়লে তা পুত্রবধূকে বলে তার ব্যবসার হাল ধরতে। তবে সত্যি কথা হলো ওইদিন রমিজউদ্দিনের অচরণ জোহরার কাছে অনেকটাই বাড়াবাড়িই মনে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি-সত্যি এর কয়দিনের ভেতরেই ঘটনা ঘটে যায়।

সূর্যকান্ত আচার্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার পর থেকেই রমিজউদ্দিন খুব সাবধানে চলাচল করছিল, তার দেহরক্ষীর সংখ্যাও সে বৃদ্ধি করেছিল। তার ধারণা ছিল সূর্যকান্ত তার ওপরে প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। কিন্তু বিপদ আসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে। সেবার প্রচন্ড শীত পড়েছিল। সেইসাথে ফসল তোলার চাপের কারণে সময়টাও যাচ্ছিলো খুব ব্যস্ততার সাথে। একারণে সবাই খেয়েই দ্রুত ঘুমিয়ে যেত। এরপরে আবার সকাল সকাল উঠে কাজে লাগতে হবে। এমনি এক তীব্র শীতের রাতে হঠাৎ খবর আসে তালুকদার পরিবারের কাঠের গুদাম আর ধানের গোলায় নাকি চোর ঢুকেছে। রমিজউদ্দিন তালুকদার প্রাথমিকভাবে তার লোকদেরকে পাঠায়

কিন্তু তারা ফিরে না আসাতে সে নিজেই ওদিকে রওনা দেয় অস্থির হয়ে। পরিবারের সবাই মানা করার পরও সে কারো কথা শোনেনি। জোহরার এখনো মনে পড়ে একটা কুপি হাতে রমিজউদ্দিন তালুকদারের দেহায়বয়বটা সেদিন মিলিয়ে গেছিল কুয়াশার ভেতরে। সেই মানুষ আর কোনদিনই ফিরে আসেনি।

রমিজউদ্দিন তালুকদার বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ওরা বাড়ি থেকে দেখতে পায় তালুকদার পরিবারের কাঠের গুদাম আর ধানের গোলা দাউ দাউ করে পুড়ছে। তীব্র শীতের রাতে শুকনো আবহাওয়ায় একসারিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তালুকদার পরিবারের সম্পদের একটা বড় অংশ। সেইসাথে রমিজউদ্দিন তালুকদার নিজেও। আগুন কিভাবে লেগেছিল আর সেই আগুনের ভেতরে রমিজউদ্দিন তালুকদার কিভাবে গিয়ে পড়েছিল সেটা পুরোপুরি কখনোই উদ্ধার হয়নি। জোহরা পারিবারিক দায়িত্ব নেয়ার পরে আবিষ্কার করেছিল রমিজউদ্দিন তালুকদারের পাহারাদাররাই তার সাথে বেঈমানি করেছিল। সূর্যকান্তের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ওরাই গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে তাতে ছুঁড়ে দিয়েছিল বৃদ্ধ রমিজউদ্দিনকে। যদিও জোহরা তাদের সবাইকে একে-একে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিল তবে সেটা অনেক পরের ঘটনা।

পারিবারিক সম্পদ আর পরিবারের পিতাকে হারিয়ে তালুকদার পরিবার একরাতের ব্যবধানে পথে বসে যায়। তাদের অর্থ কিংবা সম্পদের যে খুব কমতি ছিল তা নয়। যে-পরিমাণ গহনা পরিবারের মেয়েদের কাছে ছিল তা দিয়েই কয়েক পুরুষ বসে খাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা সেটা নয়, সমস্যা হলো যেকোন প্রতিষ্ঠান চলতে হলে শক্ত ও দক্ষ একজন পরিচালক দরকার। এতোবড় একটা পরিবারও বিরাট ব্যবসা সামলানোর মতোই। এই পরিবারে তেমন কেউই ছিল না তখন। তার ওপরে আবার সূর্যকান্তের চাপ, সবমিলিয়ে রমিজউদ্দিন তালুকদারের ছেলেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। একে তো তারা বাপের ব্যবসার কিছুই জানতো না তার ওপরে রমিজউদ্দিনের মৃত্যুর সুযোগে সূর্যকান্ত বিভিন্নভাবে তাদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে একেবারে দিশেহারা করে তোলে।

এমতাবস্থায় তারা যখন কিছুতেই বুঝতে পারছে না কী করবে। সুযোগ বুঝে সূর্যকান্ত তাদের পুরো পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়ার প্রস্তাব পাঠায়। যদিও টাকার পরিমাণটা উপযুক্ত হিসেবের চেয়ে অনেক কম তবুও যে-টাকা তারা পাবে সেটাও অনেক। তালুকদার পরিবারের ছেলেরা যখন সবকিছু প্রায় বিক্রি করে ফেলার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলছে এমন সময় এগিয়ে

আসে জোহরা। সে তালুকদার পরিবারের ছেলেদের মতের বিপক্ষে গিয়ে পুরো পরিবারের ব্যবসা ও পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

যদিও খুব সহজে সেই কাজটা সে করতে পেরেছিল তা নয়। কারণ রমিজউদ্দিন তালুকদারের কোন ছেলেই এটা মেনে নিতে রাজি ছিল না, তার ওপরে সূর্যকান্তের প্রভাব তো ছিলই। সবিমিলিয়ে কোনভাবেই জোহারা এদের সাথে পেরে উঠতো না, যদি তার স্বামি সিরাজ উদ্দিন তালুকদার তাকে পূর্ণ সহযোগিতা না করতো। জোহরার স্বামি যতোই অকর্মণ্য হোকনা কেন জোহরা তার স্বামিকে এটা বোঝাতে পেরেছিল যে এভাবে নিজেদের পৈত্রিক ভিটেমাটি বিক্রি করে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে অসম্মানের আর কিছু হতেই পারে না। আর সিরাজউদ্দিন তালুকদারও সেটা তার ভাইদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সবাই মিলে জোহরাকে সময় দেয় ছয় মাস। এর ভেতরে যদি পরিবার ও ব্যবসা গুছিয়ে এই এলাকায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে না পারে তবে আগের কথাই বহাল থাকবে, ওরা সূর্যকান্তের কাছে সব বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।

দায়িত্ব তো নিজের কাঁধে তুলে নিলো কিন্তু সব কিভাবে সামলাবে সেটা ভেবে প্রথমে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে জোহরা। তবে নিজে থেকে না পারলেও তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে সিরাজ উদ্দিন তালুকদার। জোহরা প্রথমেই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটা বুঝতে পারে তার একটা শক্তিশালী ডানহাত দরকার। আর সেই শক্তিশালী ডানহাত কে হতে পারে সেটাও খুব পরিষ্কার ছিল। মানুষটা আর কেউ নয় তালুকদার পরিবারের প্রধান নায়েব মুন্সি মজিদ।

রমিজউদ্দিন তালুকদার যদি বটবৃক্ষ হয়ে থাকে তবে সেই বটবৃক্ষের গোড়া ছিল এই বুড়ো মুন্সি। পারিবারিক ব্যবসা থেকে শুরু করে এলাকা নিয়ন্ত্রণের একটা অংশ সামলাতো এই বুড়ো মুন্সি। ছোট-খাট মানুষটার পারিবারিক উপাধি মুন্সি হলেও সে ওই পেশায় যায়নি। বরং সে ব্যবসায়ী নায়েব উপাধি নিয়ে তালুকদার পরিবারের সমস্ত ব্যবসা সামলাতো। জোহরা তাকে ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ করতে বসে। মুন্সি তাকে খুব সহজ কয়েকটা উপায় বাতলে দেয়। প্রথমেই তাদের বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আর সে-জন্যে গঠন করতে হবে লাঠিয়াল বাহিনী। কথাটা জোহরার মনে ধরে। কারণ একই প্রয়োজন জোহরা নিজেও অনুধাবন করতে পারছিল।

তালুকদার পরিবারের একটা অংশের বেতনভুক্ত কর্মচারি ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের বোয়াল চর এলাকার লোকজন। বোয়াল চরের লোক হবার কারণে

এদেরকে ডাকা হোত বোয়ালি। আসাধারণ লাঠিয়াল আর প্রচন্ড হিংস্র এই বোয়ালিরা বছরে দুইবার নদী পার হয়ে এই পাড়ে আসতো ফসলের কাজ করার জন্যে। প্রচন্ড আগ্রাসী ধরণের এই বাহিনীটা শুধুমাত্র রমিজউদ্দিনের কথা শুনতো কারণ রমিজউদ্দিন তাদেরকে নদী ভাঙ্গনের সময়ে আশ্রয় দিয়েছিল। মুন্সির মাধ্যমে জোহরা এদেরকে ডেকে পাঠায়। জোহরা ডেকে পাঠানোর প্রায় সাথে-সাথেই পরদিন নদী পার হয়ে চলে আসে পঞ্চাশজনের মতো মানুষ।

এরা এসেই জোহরাকে মা-জননী ডেকে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এদের ভেতর থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দেখে ত্রিশজনকে বেছে নেয় সে আর মুন্সি মিলে। এই ত্রিশজনকে নিয়ে ওরা গঠন করে লাল-পাগড়ি বাহিনী। প্রত্যেকের পরনে থাকবে সাদা ফতুয়া, লাল পাগড়ি আর লুঙ্গি। এই লাল পাগড়ি বাহিনীই ওদের বাড়ি থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাহারা দিবে, সেইসাথে ওদের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এমনকি কোথাও কোন বিপদ দেখা দিলেও এরাই সেটা সামলাবে। নায়েব মুন্সিকে দেয়া হয় এই দলের দায়িত্ব। মুন্সির নেতৃত্বে এই লাল পাগড়ি দল অত্র এলাকায় তালুকদার পরিবারের প্রভাব তো ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়ই সেইসাথে এরা সূর্যকান্তের জন্যে আতঙ্ক হয়ে দেখা দেয়।

জোহরা নিজের পরিবারিক ভিত একটু শক্ত করার পর থেকেই ভাবছিল সূর্যকান্তকে একটু হলেও ভয় দেখাতে হবে। কারণ রমিজউদ্দিন মারা যাবার পর থেকেই সূর্যকান্তের লোকেরা কমবেশি ওদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার জন্যে নানা ধরণের ছোটখাট অপরাধ করে আসছিল। যেমন ওদের কাঠের ব্যাপারিদের ভাগিয়ে নিয়ে যচ্ছিলো, খোলা মাট থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যচ্ছিলো ওদের গরু, ওদের কোন লোককে একা পেলে উল্টোপাল্টা মার দেয়া। এমনকি দীর্ঘ দিন ধরে এই এলাকার ঘোড়ার হাটের ইজারা দিয়ে আসছিল তালুকদার পরিবার সেটাও ছিনিয়ে নিয়েছিল সূর্যকান্তের লোকেরা।

তাই জোহরা সিদ্ধান্ত নেয় সূর্যকান্তের ঔষুধ এবার তাকেই উল্টো ধরে গেলানো হবে। এতোদিন ধরে তারা যা করে আসছিল লালপাগড়ি বাহিনী এবার সেটাই ফিরিয়ে দেয়া শুরু করে। দুই পক্ষের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষের তোড়ে একরকম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। সেইসাথে অত্র এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত নাম হয়ে ওঠে জোহরা। একজন মহিলা এরকম করতে পারবে কেউ ভাবতেও পারেনি। একে একে হারানো সব ব্যবসা আবারো ফিরে আসতে শুরু করে ওদের কাছে। অন্যদিকে অস্থির হয়ে ওঠে সূর্যকান্ত। তার অস্থির হবার আরো একটা কারণ তার বড় ভাই এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিল। সূর্যকান্ত চাইছিল সেটাকে চালিয়ে যেতে। সে চাইছিল নিজের বিরাট প্রাসাদ বানাতে। যে-কারণে সে চাইছিল সবকিছু নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে কিন্তু বাস্তবে ঘটছিল সব উল্টো।

অন্যদিকে এলাকাতে দেখা দিয়েছিল ডাকাতের উপদ্রব। পুরো ভারতবর্ষ যুদ্ধে বিদ্ধস্ত। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকেরা ইংরেজদের কাছে হেরে ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো ভারকবর্ষ জুড়ে। যুদ্ধের অস্ত্র নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সাধারণ মানুষের ওপরে। ডাকাতের উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠেছিল একদিকে ব্রহ্মপুত্রে পানি অন্যদিকে মধুপুর জঙ্গলের রাস্তা।

সূর্যকান্ত আর তালুকদার পরিবারের ভেতরে সংঘর্ষ যখন তুমুল পর্যায়ে ঠিক এমন সময়ে জোহরা জানতে পারে সূর্যকান্ত নাকি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে ইংরেজদের সাথে সন্ধি করছে। সূর্যকান্ত যদি সত্যি-সত্যি ইংরেজদেরকে এলাকাতে প্রবেশের সুযোগ দেয় তারা অবশ্যই সূর্যকান্তকে সাহায্য করবে, আর সূর্যকান্তের পক্ষে থাকা মানেই জোহরাকে তারা ধরে নেবে শত্রু হিসেবে। এমনিতেই মুসলমানদের ব্যাপারে ইংরেজদের অতিরিক্ত কাজ করতো। তাই এই খবর শুনে জোহরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

মুন্সিকে ডেকে জরুরি আলোচনা করে সে। সব শুনে মুন্সি তাকে অভয় দেয়। সে জোহরাকে জানায় সূর্যকান্ত যদি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করে তবে প্রয়োজনে ওরাও করবে। জোহরা বেশ অবাক হয়ে জানতে চায় সেটা কি আসলেই সম্ভব কিনা। মুন্সি মজিদ তার পানের রসে রাঙানো দাঁত বের করে হেসে ওঠে। সে জোহরাকে বলে অবশ্যই সেটা সম্ভব কারণ বিল্লাল শেঠ নামে একজন ব্যসায়িকে সে চেনে যে দীর্ঘদিন যাবৎ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্যবসা করে আসছে। চাইলে সে তার মাধ্যমে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবে।

মুন্সির কথামতোই বিল্লাল শেঠকে গোপনে ডেকে পাঠানো হয় তালুকদার বাড়িতে। মুন্সি, জোহরা আর জোহরার স্বামি সিরাজ উদ্দিন কথা বলে বিল্লাল শেঠের সাথে। অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যবসায়ি বিল্লাল শেঠ প্রথমে কিছুই স্বীকার করতে চায়নি কিন্তু লাল পাগড়ি বাহিনীর ভয় দেখাতেই সে স্বীকার করে যে ইংরেজদের সাথে ব্যবসা তো করেই সেই সাথে এই এলাকার সমস্ত খবর সে- ই ইংরেজদের কাছে সরবরাহ করে। সে এটাও নিশ্চিত করে যে সূর্যকান্ত সত্যিই ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করেছে। আর দুয়েকদিনের মধ্যেই তারা এই এলাকায় পা রাখবে। এমন সময় মুন্সি তার কাছে জানতে চায় যদি সূর্যকান্ত তাদের সাথে সমোঝোতায় আসতে পারে তবে ওদের পক্ষেও সেটা সম্ভব কিনা। বিল্লাল শেঠ জানায় সেটা একমাত্র ওদের সাথে কথা বললেই বের করা সম্ভব। ওরা চাইলে সে ইংরেজদের সাথে আলোচনা করার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। ওরাও সেটাই চাইছিল।

এর কয়েকদিন পরেই ইংরেজরা পা রাখে বৃহত্তর এলাকায়, সেইসাথে সূর্যকান্তের আতিথ্য গ্রহণ করে। তখনো ওরা বিল্লাল শেঠের কাছ থেকে কিছুই জানতে পারেনি। ইংরেজরা যেদিন এলাকায় প্রবেশ করে তার পরদিন রাতে বিল্লাল শেঠ চুপি-চুপি মুন্সির সাথে দেখা করে জানায় আগামিকাল ইংরেজরা এলাকা ত্যাগ করবে। সেটা করার আগে আগামিকাল রাতে ওরা দেখা করতে রাজি হয়েছে। জোহরা নিজেই ইংরেজদের সাথে কথা বলার জন্যে যেতে চাইলে মুন্সি তাকে বাঁধা দেয়। সে জানায় প্রথমেই একজন মহিলার যাওয়াটা ঠিক হবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হয় জোহরা নয় বরং মুন্সি আর জোহরার স্বামি সিরাজ দুজনে মিলে যাবে দেখা করতে। তারা দুজনে মিলে দেখা করতে যায় পরের দিন। সেটা ছিল আজ থেকে বেশ কয়েকদিন আগে। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। আর কোন খবরও পাওয়া যায়নি তাদের।

বারান্দায় বসে থাকা চেয়ার থেকে হঠাৎ করে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো জোহরা। বৃষ্টিভেজা পথ ধরে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। এই গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টির ভেতরেও ঘোড়ার ওপরে বসে থাকা মুর্তিটা একেবারে স্বচ্ছন্দ। কাদা মাখা পথটা দিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে আসছে একেবারেই সপ্রভিত ভঙ্গিতে। এভাবে একজনই ঘোড়া চালাতে পারে এই এলাকায়। সেই মানুষটা আর কেউ নয় মুন্সি মজিদের ছেলে মুন্সি মানিক।

জোহরা উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার কিনারায় আসতে-আসতেই ঘোড়াটা এসে দেউরির কাছে থেমে গেল। ওটা থামার আগেই ঘোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে এল শুকনো পাতলা দেখতে মানিক। বাড়ির ভেতর থেকে

বেরিয়ে আসা এক চাকরের হাতে ঘোড়াটাকে ধরিয়ে দিয়ে বড়-বড় পা ফেলে চলে এল বারান্দার ওপরে।

মাথায় সাদা পাগড়ি, খালি গা আর সাদা ধূতি পরনে মানিককে দেখে বোঝার কোন উপায়ই নেই সে অভিজাত পরিবারের ছেলে। তাকে দেখলে যেকেউ ভাববে হয় সে কঠের কলে কাজ করে অথবা কোন কুমোর কিংবা ছুতোরের শিক্ষানবিশ। জোহরা দেখতে পেল বৃষ্টিতে ভিজে মানিকের চোখ জোড়া টকটকে লাল হয়ে আছে। যদিও অন্য যেকোন সময় হলে আগে মানিকের যতœ নিতে বলতো সে কিন্তু এখন কিছুই না বলে স্রেফ তাকিয়ে রইলো মানিকের দিকে।

মানিকও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জোহরার দিকে। সেকেন্ডেরও কম সময় ধরে চোখে-চোখে কথা হলো দুজনার। তারপর মানিক বলে উঠলো, “খবর পেয়েছি, তয় বাবা কিংবা সিরাজচাচার খবর অহনো কিছুই জানি না। ইংরেজগুলার ব্যাপারেও না,” বলে সে মাথা নাড়তেই ভিজে পানি গড়িয়ে পড়লো পাগড়ির নিচ থেকে। “কিন্তু বিল্লাল শেঠ এহন কই আছে সেইটা জানি, লাল পাগড়ি তিনজনরে পাহারায় রাইখা আসছি।”

কথাটা শুনে জোহরার শরীর জুড়ে একটা শিহরন বয়ে গেল। সাথে-সাথে মানিককে ভেতরে যাবার ইশারা করলো সে। কিন্তু ভেতরে যাবার আগেই মানিক জোর গলায় বলে উঠলো, “সময় নাই।”

“মানিক তুই ভিতরে যা, আগে শরীর মুছে কাপড় বদলা, তারপর কথা,” জোহরা ওকে ভেতরে যাবার ইশারা করলো আবার। মানকি কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল, একবার মাথা নেড়ে বললো, “বেশি দেরি হই গেলে পরে আমারে দুষ দিও না,” বলে সে চলে গেল ভেতরে।

জোহরা আবারো এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। ইলশে গুড়ি বৃষ্টি এখন বড় বড় ফোঁটায় রূপ নিয়েছে, সেইসাথে নেমে আসছে রাতের অন্ধকার। জোহরা মনে-মনে ভাবলো এই অন্ধকার কি প্রকৃতির, নাকি ওর জীবনের অথবা তালুকদার পরিবারের। বহু আগেই নিজের পরিবার শেষ হয়ে গেছে, এখন এই পরিবারই ওর নিজের পরিবার। কিছুতেই সে এই পরিবারের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসতে দিবে না।

নায়েব আর ওর স্বামি সিরাজ ইংরেজদের সাথে দেখা করতে যাবার পর অধীর আগ্রহে ও অপেক্ষা করছিল। কারণ ইংরেজদের সাথে ওদের আলোচনাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওর অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়নি।

সন্ধ্যে থেকে রাত, রাত থেকে ভোর, ভোর থেকে দিন। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। না নায়েব, না তার স্বামি।

গোপনে দেখা করতে যাবার কারণে ওদের সাথে একজন বিশ্বস্ত প্রহরি বাদে আর কেউই ছিল না। এমনকি সেও ফিরে আসেনি। প্রথমে জোহরা ভেবেছিল হয়তো রাত বেশি হয়ে যাবার কারণে তারা আর বাড়িতে ফেরেনি। হয়তো কাচারি ঘরে রয়ে গেছে কিংবা আসন্ন হাটের প্রস্তুতির জন্যে বাজারে চলে গেছে। কিন্তু সেখানে লোক পাঠিয়ে জানা গেল সেখানেও যায়নি তারা।

কোথাও তাদের খবর না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে জোহরা। সর্বপ্রথম যার ব্যাপারে সন্দেহ লাগে সেটা হলো জমিদার সূর্যকান্ত। জেহরা মনে-মনে ধরেই নেয় নিশ্চই নায়েব আর তার স্বামির অন্তর্ধানের পেছনে জমিদারের হাত আছে। হয়তো ইংরেজদের ওপরে তার লোকেরা নজর রাখছিল নায়েব আর সিরাজকে পেয়ে তাদের কোন ক্ষতি করেছে। এই ভাবনা অনুযায়ি জোহরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা যখন ভাবছে ঠিক তখুনি জানতে পারে শুধুমাত্র মুন্সি আর সিরাজই নয় ওদের সাথে ইংরেজ অফিসারদেরও নাকি কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমে ব্যাপারটা শুনে জোহরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি কিন্তু পরে খবর আসে ঘটনা সত্যি। জোহরা অনুধাবন করে যদি তাই ঘটে থাকে তবে এর পেছনে অন্য কারো হাত আছে। সে ভেতরের খবর বের করার জন্যে মুন্সির পালকপুত্র মানিককে ডেকে পাঠায়। মুন্সির ছেলে হবার পরও মানিক এ-বাড়িতেই বলতে গেলে বেড়ে উঠেছে।

মাতৃত্ববঞ্চিত জোহরার সাথে মানিকের সম্পর্ক অনেকটা ছোটভাই আর ছেলের মাঝামাঝি। বাপের খবর না পেয়ে সদ্য যুবক মানিক ক'দিন ধরে পাগল প্রায় হয়ে গেছে। জোহরা ডেকে এনে এ-ব্যাপারে বলতেই কাজে লেগে যায় সে। লাল পাগড়ি বাহিনীর সর্দারের সাথে মিলে খবর নিয়ে আসে যে-ইংরেজ বাহিনীর অফিসারেরা গায়েব হয়ে গেছে আর তাদের সূত্র সন্ধান করার জন্যে আরো ইংরেজ অফিসারেরা মাদ্রাজ থেকে থেকে রওনা দিয়েছে।

জোহরা বুঝতে পারে পরিস্থিতি খুবই খারাপ রূপ নিয়েছে। যেকোন সময় এমনকি ইংরেজদের সৈন্যবাহিনীও চলে আসতে পারে এই এলাকায়। এই অবস্থায় আসলে ওরা কী করবে বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করতে থাকে।

এমন সময় ইংরেজ অফিসারেরা আসার পর একটু অবাকই হয় সবাই। ওরা ভেবেছিল নিজেদের অফিসারের গায়েব হবার খবর শুনে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হবে, সেখানে ছোট একটা দল এসে পৌছায় মাত্র। তাতেও আবার সাদা চামড়ার লোক মাত্র দুজন। সত্যিকথা হলো ইংরেজরা অনেক ভাব দেখালেও সত্যিকার অর্থে তাদের লোকবল যে আসলে কতো কম সেটা সাধারণ ভারতীয়রা জানেই না।

ইংরেজদের দলটার ওপরে নজর রাখতে পাঠায় ও মানিককে। মানিক নজর রাখতে গিয়ে একবার প্রায় ওদের হাতে ধরা পড়তে বসেছিল। তবে ওদের ওপরে নজর রাখতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে মানিক; বিল্লাল শেঠ। নায়েব আর সিরাজ মূলত বিল্লাল শেঠের মাধ্যমেই ইংরেজদের সাথে দেখা করতে গেছিল। ওরা গায়েব হবার পর থেকেই বিল্লাল শেঠকে পাওয়া যচ্ছিলো না। নায়েব, সিরাজ আর ইংরেজ অফিসারদের সাথে সেও কি গায়েব হয়েছে কিনা সেটাও বোঝা যাচ্ছিলো না। অবাক বিষয় হাটের দিন সে ঠিকই এসে হাজির হয় জায়গামতো। তারমানে সে হারায়নি বরং গা ঢাকা দিয়ে ছিল। হাটে না গেলে তার বিরাট ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়ে যেত, তাই ওখানে যেতে বাধ্য হয়েছে। আরো অবাক ব্যাপার বিল্লাল শেঠ হাটে একজন সাদা চামড়ার মানুষের সাথে কথা বলছিল। এরকমটা হওয়া প্রায় অসম্ভব। যাকে এমনিতেই পাওয়া যাচ্ছিলো না তাকে একেবারে হাটে দেখা যাবে, তাও একজন ইংরেজের সাথে সেটা এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার।

বাজারে বিল্লাল শেঠের ওপরে নাজর রাখতে গিয়ে এক পর্যায়ে অন্য এক গন্ডগোলের সুযোগে বিল্লাল শেঠকে হারিয়ে ফেলে মানিক। বিল্লাল শেঠকে হারিয়ে সে জোহরাকে এসে খবর দেয় বিল্লাল শেঠকে কি অবস্থায় কোথায় দেখেছে। জোহরা সব শুনে তাকে লাল পাগড়ি বাহিনী নিয়ে জলদি রওনা দিতে বলে, সাথে এও জানিয়ে দেয় যেকোন মূল্যে বিল্লাল শেঠকে তার খুঁজে বের করতে হবে। কারণ বিল্লাল শেঠের ওপরে এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। সেই যে লাল পাগড়িদের তিনজনকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল মানিক ফিরে এল এখন। জোহরা মাথার ভেতরে কিছু চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিয়ে ভেতের এসে ঢুকলো।

রান্নাঘরে এসে দেখলো মাটিতে পাটি পেতে মানিক খেতে বসেছে। ইতিমধ্যেই সে পরনের ভেজা পোশাক পরিবর্তন করে শুকনো কাপড় পরেছে। জোহরা মানিকের সামনে গিয়ে একটা পিঁড়িতে বসে পড়লো।

ওকে দেখতে পেয়েই মানিক কথা বলতে শুরু করলো খাওয়া বাদ দিয়ে। “ছোট মা,” মানিক ওকে সবসময় ছোটমা বলেই ডাকে। আর অন্য সবার সামনে ডাকে ছোট বেগম বলে।

“আগে খেয়ে নে,” জোহরা ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ছেলেটা একেবারেই নিজের উত্তেজনা সামলাতে পারছে না। নিশ্চই কিছু একটা ঘটেছে। তবে ওর উত্তেজনাকে পাতা দিলে চলবে না। বরং ওকে শান্ত করে সব শুনতে হবে। বহু আগেই জোহরা বুঝতে শিখেছে কৈশোরের চপলতাকে শান্ত করতে পারলে অনেক কাজে লাগানো সম্ভব আর সেটাকে বাড়তে দিলে সব ধ্বংস হওয়াও সম্ভব। “লাল পাগড়িরা কোথায়?”

“তুমি তো আমার কথাই শুনতাছো না। বিল্লাল শেঠরে বাইর করলাম কেমন হেইডা শুনো।”

“শুনুম, আগে তুই বল, ওরা কোথায়?” জোহরার কণ্ঠস্বর ভীষণ শক্ত।

“ওগোরে বিল্লাল শেঠের পাহারায় রাইখা আসছি,” বলে সে আরেক লোকমা ভাত মুখে পুরে দিলো। সেটাকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলো। “বহুকষ্টে বাইর করছি হেরে। এইবার আর হারান যাইবো না। আমি নিচ্চিত হালায় কিছু একটা জানে,” যে এই পর্যন্ত বলতেই জোহরা কড়া চোখে ফিরে তাকালো তার দিকে। বাজে ভাষার ব্যববহার সে কখনোই সহ্য করে না। মানিক তার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন মিইয়ে গেল। চোখে-চোখেই সে দুঃখিত বলে আবারো বলতে শুরু করলো। “লাল বাহিনী রাইখা আসছি, ওরা শেঠরে এক্কেরে চক্ষে চক্ষে রাখবো। হে লড়লেও লগে-লগে লড়বো।”

“ওরে উঠায়া আনোস নাই ক্যান?”

“জানতাম তুমি এইডা জিগাবা, এল্লেগাই কইতে চাইতাছিলাম হেরে ক্যামনে পাইলাম,” আবারো বলতে শুরু করলো সে। “দুফরে তো হেরে বাজারে হারাইয়াই উঠলোাইছিলাম। এরপরে হেরে আর পাইনা। ওইদিকে বাজারো লাগলো গন্ডগুল। এনু তুমারে আরেকটা জিনিস জানাই রাহি। বাজারে ওই নতুন ইংরেজ অফিসারেরা নাকি ঘুড়া চুর ধরছে,” মানিকের কথাটা শুনলেও খুব একটা পাত্তা দিলো না জোহরা। ওরা ঘোড়া চোর ধরে বেড়াক তাতে ওর কোন আগ্রহ নেই। আগে মূল ঘটনা জানা দরকার।

“এসব প্যাচাল বাদ দিয়ে মূল ঘটনা বল। কিভাবে খুঁজে বের করলি বিল্লাল শেঠকে?”

“হেইডাই তো কইতাছি। ইংরেজরা ঘুড়া চোরগর পিছে লাগার পরে বাজারের তো বারোডা বাইজ্জা গেল। আমি বাড়িত ফিরা আইসা তুমারে সব কইলাম। এন থাইক্কা বাইর হইয়া চিন্তা করতাছি বিল্লাল শেঠরে কই পাওয়া যাইতে পারে। এমন সময় খবর পাইলাম কাঠকলের বাজারে এক লাল পাগড়ি নাকি ওই ইংরেজ সাবরে দেখছে?”

একটু চমকে উঠলো জোহরা। “কোন ইংরেজ, যারা হারিয়ে যাওয়া অফিসারদের খুঁজে বের করতে এসেছে?”

“না-না, হেরা না। হেরা তো ওই ঘুড়া চুর লাইয়া ব্যস্ত,” মানিক ভাত মুখে দিতে দিতে বললো।

“তাহলে এইটা আবার কে?” জোহরা বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা।

“এইটা হইলো আমাগো মতোন সাদা ধূতি-পাঞ্জাবি পরা ইংরেজ। এই ব্যাটারেই বিল্লাল শেঠের লগে দেখছিলাম বাজারে,” মানিক এই পর্যন্ত বলতেই জোহরা জানতে চাইলো, “সেই ইংরেজের ওই দল থাইক্কা আলাদা মনে হইলো ক্যান?”

“হেরে তো একবারও হেগো লগে দেহি নাই। আর হেরা পুরা মধুপুর দাপায়া বেড়াইতাছে আর এই ব্যাডা কেমুন জানি পলায়া পলায়া বেড়ায়। যাই হোক, আর হেয় কাপরও ইংরেজগর মতোন পিন্দে না। হেরে দেইখা চিনবারই পারতাম না। কারণ হাটবারের কারণে তো অনেক বাইরের ব্যাপারি আইছে। তয় হেরে এক লাল পাগড়ি চিনবার পারে কারণ হের লগে একটা চামড়ার ব্যাগ আছিল। বাজারে বিল্লাল শেঠের লগে কতা কউনের সময় আমিও ব্যগটা দেখিছ। হেই ব্যগটা দেইখাই লাল পাগড়ি হেরে চিন্না আমারে খবর পাডায়। আমার ক্যান জানি মনে অয় এই ব্যাডা বিল্লাল শেঠরে খুঁইজ্জা বাইর করবোই। কারণ বাজারে গন্ডগুল লাগুনে হেয় শেঠের লগে কথা শেষ করবার পারে নাই। তো লাল পাগড়ি আর আমি হের পিছে লাই◌া রইলাম। দেখলাম হেয় পরথম কাঠ গুদাম থাইক্কা বাজারে গেল। হেন থাইক্কা বহু ঘোড়াঘুরি কইরা বিকাল দিকে বেগুনবাড়ি সরাইখানা গিয়া উঠলো। বুঝলাম ব্যাডা এইহানেই উঠছে। ভাবতাছি লাল পাগড়িরে রাইখা আমি অন্যদিকে খুঁজ করমে এমুন সময়ে দেহি বিল্লাল শেঠ ঘুড়ার গাড়ি কইরা সরাইখানার ভিতরে ঢুকলো। আর আমি চাইলা আসলাম তুমারে জানাইতে।”

“ভালো করছোস, তারমানে বিল্লাল শেঠ আর ওই লোক এহনো অইখানেই আছে?”

মানিক কিছু না বলে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

“কয়জন লাল পাগড়ি আছে ওইখানে?” জোহরা চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো।

“তিনজন। হেরা দুইজনের মধ্যে কেউ ওইহান থাইক্কা লড়লেও খবর পাইয়া যাবো।”

“সেটা যথেষ্ঠ নয়,” জোহরা উঠে দাঁড়ালো। “লাল পাগড়িদের ভেতর থেকে পনেরো জনকে তৈরী হতে বল। আমরা একটু পরেই রওনা দিবো। বিল্লাল শেঠের সাথে আমি নিজে কথা বলতে চাই। ওকে যদি এখানে আনা সম্ভব না হয় তবে তাকে যেখানে পাওয়া যাবে আমি নিজেই সেখানে যাবো। লাল পাগড়ি বাহিনী আর পালকি তৈরী করতে বল। লুকাচুরি অনেক হইছে। আর না। শেঠের সাথে সরাসরি কথা কইতে হবে এইবার।”

বলে জোহরা ভেতরে নিজের কক্ষে চলে এল। পুরনো দিনের কাঠের আলমারির ভেতর থেকে বের করলো নিজের স্বামির কালো একটা পোশাক। একটু ঢিলা হলেও বেশি করে কুঁচি দিয়ে সেটা পরে নিলো নিজের গায়ে। লোহার তৈরী বড় একটা ট্রাঙ্ক খুলে বের করলো রমিজউদ্দিনের রেখে যাওয়া তলোয়ার আর একটা পিস্তল। একটা বড় বন্দুকও আছে কিন্তু সেটা সাথে নেয়া ঝামেলা হবে ভেবে রেখে দিলো। ধূতি আর ফতুয়া পরে মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে কোমরের একপাশে পিস্তল নিয়ে হাতে তলোয়ার সহ যখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অন্য এক মানুষকে আয়নায় আবিষ্কার করলো সে।

মনে মনে নিজেকে শক্ত করে ও পা রাখলো কক্ষের বাইরে। প্রথমেই ওকে দেখতে পেল বাড়ির কাজের মেয়ে। কিছুই না বলে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলো সে। ও হেঁটে বাইরে আসতে-আসতে পুরো বাড়ির যারাই দেখতে পেল ওকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। ও তলোয়ার হাতে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো পালকি বাহক আর লাল পাগড়ি তো বটেই এমনকি মানিকও হা করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তালকুদার বাড়ির কোন মেয়ে তো ধূরে থাক ওরা সম্ভবত এই জীবনে কোন মেয়েকেই এ-ধরনের পোশাক পরা অবস্থায় কল্পনাও করেনি। জোহরা কাউকে পাত্তা না দিয়ে সোজা উঠে বসলো পালকিতে। ও উঠে বসায় একটু পরেই চলতে শুরু করলো পালকি, সাথে অন্যান্য লোকজন। ওরা বেশ খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎ মানিক পুরো বহরকে থামতে বলে টোকা দিলো পালকির একপাশে।

জোহরা জানতে চাইলো, “কি ব্যাপার, থেমে গেল কেন সবাই?”

“ছোট মা, এক লাল পাগড়ি খবর নিয়া আসছে। বিল্লাল শেঠ নাকি সরাইখানা থেকে বাইর হইয়া কার লগে জানি দেহা করবার জন্যে এইদিকেই আসতাছে।”

“এদিকে মানে কোথায়? আর সে কারো সাথে দেখা করার জন্যে আসছে এটা লাল পাগড়ি জানতে পারলো কিভাবে?”

“ছোট মা, বিল্লাল শেঠ সরাইখানা থেকে বিদায় নেয়ার সময়ে সেই ইংরেজের সাথে কথা বলছিল তারই কিছুটা কানে আসছে ওগোর।”

“ঁএফে শোনা কথা থেকে তুই আমার কাছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্যে এসেছিস? বিল্লাল শেঠ এমনিতেই ধুরন্ধর লোক সে হয়তো বুঝে গেছে কেউ তার ওপরে নজর রাখছে। তাই সবাইকে ভুল পথে চালানোর জন্যে এমনটা করছে।”

“না, ছোট মা। আমাদের লোকেরা শুনেছে সে নাকি এখানে কার থেকে টাকা উসূল করবার আইছে।”

এক মুহূর্ত ভাবলো জোহরা। এরকম ঝামেলায় থাকার পরও বিল্লাল শেঠ টাকার ব্যাপারে ছাড় দেবে না। কাজেই ব্যাপারটা সত্য হতে পারে। “ঠিক আছে, এক কাজ কর। আমরা আরেকটু এগিয়ে অপেক্ষা করি। তুই লাল পাগড়িদের নিয়া ওইখানে যায়া ওরে ধইরা নিয়া আসবি,” বলে সে একটু থামলো মুহূর্তের জন্যে। মানিককে একা পাঠিয়ে ভুল করছে কিনা ভেবে নিলো মুহূর্তের জন্যে। নাহ, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

“ঠিক আছে, তুই যা। কোন ভুল করিস না।”

মানিক লাল পাগড়িদের কয়েকজনকে নিয়ে চলে যেতেই আরেকটু সামনে এগিয়ে জঙ্গলের মাঝে ফাঁকা একটা জায়গায় পালকি থামাতে বললো। এতোক্ষণ পালকির ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের ভেতরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বিরক্ত লাগছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় পালকি থামাতেই নেমে এল জোহরা। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক আগেই। সকালটা ছিল রোদেলা, বিকেল থেকে সন্ধ্যের পর পর্যন্ত সময়টা গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টিতে কেটেছে এখন আবার বৃষ্টি থেমে আকাশে থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে।

অন্যান্য দিন এই সময়ে সাধারণত ঘুমিয়ে যায় সে। আজকে রাতের এই জেগে থাকাটা বেশ উপভোগই করতো সে, যদি মাথায় এত্তোগুলো দুঃশ্চিন্তা না থাকতো। পালকি থেকে নেমে আসার সাথে-সাথে পাহারাদার আর পালকি বাহকেরা সরে গেছে। একপাশে ফাঁকা জায়গাতে জোছনার ভেতরে পায়চারি করতে লাগলো জোহরা। ওর হিসেবে বিল্লাল শেঠের অবস্থান যেখানে থাকার কথা সেখান থেকে তাকে ধরে আনতে আধা ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। কারণ জায়গাটা খুব একটা দূরে না এখান থেকে। কিন্তু এক ঘন্টা পার হবার পরও যখন কেউই এল না তখন বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। আরো আধা ঘন্টা সময় কোনরকম ঘটনা ছাড়াই নিশ্চুপ কেটে গেলো। অস্থির লাগছে জোহরার। এবার কিছু একটা করতে হবে।

লাল পাগড়িদের সর্দারকে সামনে বাড়তে ইশারা করলো সে। আবারো পালকিতে চড়ে বসলো ও। তবে না উঠলেও চলতো কারণ অরেকটু এগোতেই লোকজনের হাঁক-ডাক শুনতে পেল। চেনা গলাটা মানিকের আর অচেনা গলাটা সম্ভবত বিল্লাল শেঠের। পালকি দাঁড় করানোর নির্দেশ দিলো ও।

মানিকদের গলা থেমে গেছে। নিজের পোশাক সামলে নিয়ে মুখে একটা কাপড় জড়িয়ে ও নেমে এল পালকি থেকে। ওর ঠিক সামনেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে বিল্লাল শেঠ। তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মানিক, অন্যপাশে লাল পাগড়ি বাহিনীর প্রধান নিতাই। নিতাইয়ের হাতে সবসময়ের মতোই একটা লম্বা চকচকে কাঞ্চন বাঁশ দিয়ে তৈরী লাঠি। জোহরা বিল্লাল শেঠের সামনে দাড়িয়ে মুখ থেকে কালো কাপড়ের আবরণ সরিয়ে ফেললো।

ওকে চিনতে পারার সাথে-সাথে মুখ হা হয়ে গেল তার। পোশাকের কারণে প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, এখন বুঝতে পেরে বাকিদের মতোই তাজ্জব হয়ে গেছে। সেইসাথে চোখে মুখে ভয় আর বিপদের ছায়া খেলতে লাগলো। দুইবার মুখ খোলার পরে আওয়াজ বেরুলো তার মুখ দিয়ে। “বেগম,” বলে একবার ঢোক গিলে সে আবারো যোগ করলো, “তালুকদার বেগম।”

“বিল্লাল শেঠ, তোমাকে এখানে ধরে আনার কোন ইচ্ছেই ছিল না কিন্তু আমি নিরুপায়,” জোহরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিল্লাল শেঠের দিকে। “শেঠ, তুমি জানো আমার স্বামি কোথায়, আর ওর বাবা?” বলে সে মানিকের দিকে দেখালো। “ওরা শেষবার তোমার সাথে বের হয়ে গেছিল। তুমি আমাকে জানাবে, ওরা কোথায় আছে, কি হয়েছে ওদের?”

“বেগমসাহেবা আমি কিছুই জানি না, আমি তো আপনাগর ভালার জন্যেই...”

“শেঠ তুমি একটা নিচ মনের মানুষ। যে-মানুষ ফিরিঙ্গিদের টাকা খেয়ে নিজের মানুষদের খবর অন্যদেরকে সরবরাহ করে সে অন্যের ভালোর জন্যে কিছু করে না, তুমি টাকা নিয়েছিলে মুন্সি আর আমার স্বামিকে ইংরেজদের সাথে দেখা করিয়ে দেয়ার বিনিময়ে,” বলে ও একটু থামলো। উত্তেজনায় কথা আটকে আসছে। “ঠিক আছে, সেটা তোমার ব্যবসা। কিন্তু টাকার বিনিময়ে তুমি তাদেরকে যদি টোপের মুখে নিয়ে গিয়ে থাকো শেঠ তবে তোমার খবর আছে,” জোহরা আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলো তার আগেই বিল্লাল শেঠ একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর পায়ের ওপরে।

শেঠকে ওর দিকে এগোতে দেখে চট করে একপা পিছিয়ে গেল জোহরা। শেঠ মাটিতে শুয়ে পড়ে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করার মতো মাটিতে মুখ রেখে চিৎকার করতে লাগলো। “বেগম সাহেবা, আমি হাছা কইতাছি। আমরা এই এলাকার তাবৎ মানুষ তালুকদার বাড়ির নুন খায়া বড় অইছি। হেগো লগে বেঈমানি করার কতা চিন্তাও করতে পারি না।”

জোহরা একবার মাটিতে পড়ে থাকা শেঠকে দেখলো আরেকবার দেখলো মানিককে। মানিক মাথা নেড়ে ওকে এই লোকের কথা বিশ্বাস করতে মানা করলো। জোহরা লাল পাগড়ির সর্দার নিতাইকে ইশারা করলো শেঠকে মাটি থেকে তুলতে। পোদ্দার লাঠিটা আরেকজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের সুপারিগাছের মতো মোটা দুই হাত দিয়ে শেঠকে বাচ্চা ছেলের মতো শূন্যে তুলে ফেললো।

জোহরা লোকটার দিকে এগিয়ে এল। “শেঠ, তুমি একটা বেঈমান, শয়তান। তবে সত্যি যদি তালুকদার বাড়ির নুনের প্রতি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা থেকে থাকে তবে তুমি আমাকে এক্ষণ জানাবে আমার স্বামি আর মুন্সির কি হয়েছে? না জানালে নিতাই তোমার দুই হাত শরীর থেকে টেনে ছিড়ে ফেলবে। এক্ষুণি।”

শেঠ আবারো হাউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিলো তার আগেই নিতাইয়ের দুই হাতের চাপ খেয়ে গো গো করতে লাগলো। জোহরা নিতাইকে ইশারা করলো চাপ কমাতে। “শেঠ, কথা বলো। আমাকে জানাও কী হয়েছিল সেদিন। ”

“বেগম সাহেবা আমি হাছাই জানি না ওইদিন আসলে কি হইছিল,” বলে সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। “তয় খালি নায়েব আর সিরাজ তালুকদারই না ওই ইংরেজরা শুদ্ধা সবাই গায়েব হই গেছে। হাছা কতা অইলো ওইদিন রাইতে আমি নায়েব সাইব আর সিরাজ ভাইরে ইংরেজগো ক্যাম্পের বাইর পর্যন্ত দিয়া চাইলা আইছিলাম। কারণ নায়েব সাইবই আমারে হেগো লগে থাকতে মানা করছিল।”

জোহরা ভাবতে লাগলো। ঘটনা সত্য হলে হতেও পারে কারণ নায়েব কোনভাবেই চাইবে না শেঠ তাদের আলোচনায় থাকুক। জোহরা কিছু বলার আগেই শেঠ বলে চলেছে। “হেরা রাজনীতি আর ব্যবসা নিয়া আলোচনা করবো আমি ওইহানে থাইক্কা কি করুম। আর ওইখানে মেঘালয়ের রাজার চরও আছিল, হেইলা¹াই...”

“এক মিনিট শেঠ, তুমি কিভাবে জানতে ওখানে তারা কি নিয়ে আলোচনা করতো, আর মেঘালয়ের রাজার লোক থাকবে সেটাও তোমার জানার কথা না,” জোহরার মনে কিছু একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে।

“আমি, আমি, জানতাম,” হঠাৎ জোহরার প্রশ্নবানে একটু হতচকিত হয়ে গেছে বিল্লাল শেঠ। আর এই চমকে গিয়েই ভুলটা করে বসলো সে। “হেরা আমারে কইছিল ক্যাম্পে যাওনের আগে।”

কথাটা শোনামাত্রই জোহরা বুঝতে পারলো বিল্লাল শেঠ মিথ্যে কথা বলছে। সিরাজ কিংবা নায়েব দুজনার একজনও ইংরেজদের সাথে কী নিয়ে আলোচনা করবে সেটা বিল্লাল শেঠকে জানানোর কোনই কারণ নেই। তারমানে শেঠ নিশ্চই লুকিয়ে তাদের আলোচনা শুনেছিল। “শেঠ তুমি মিথ্যে বলছো,” শেঠের চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বললো জোহরা। “তুমি লুকিয়ে ওদের আলোচনা শুনছিলে তাইনা?”

শেঠ পুরোপুরি হতভম্ভ হয়ে গেছে। সে কিছু বলার আগেই জোহরা কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা বের করে সোজা চেপে ধরলো শেঠের গলায়। “শেঠ, সত্যি কথা বলো, না হলে...” জোহরার এই হঠাৎ অগ্নিমুর্তি দেখে মানিক আর নিতাইও চমকে গেছে। ওরা কি করবে বুঝে ওঠার আগেই আবারো বিল্লাল শেঠ হাউমাউ করে উঠলো।

শেঠের কান্নাকে পাত্তা না দিয়ে জোহরা চানতে চাইলো, “কি শুনছিলি তুই?”

“আমি আমি বেশি কিছু শুনি নাই। হেরা ক্যাম্পে ঢুকুনের পরে আমি পিছে দিয়া গিয়া হেগো কতা শুনতে থাহি। ওইখানে ইংরেজরা ছিল পাঁচজন, মুন্সি, সিরাজ ভাই আর মেঘালয়ের এক বড় ব্যবসায়ি আছিল। আমি জানি ওই লুক আসলে ঘুড়ার ব্যবসা করলেও হে মেঘালয়েল রাজার চর। হেরা কথা শুরু করার এট্টু পরেই মেঘলোয়ের ওই ব্যবসায়িরর লগে মুন্সি আর সিরাজ ভাইয়ের কথা কাটাকাটি লাই্া যায়। এইডা দেইখা আমি ওইখান থাইক্কা সইরা আসি। বাইরে আইসা দেহি হেই লুক নিজের পাহারাদার নিয়া গট-গট কইরা ক্যাম্প থাইক্কা বাইর হইয়া গেল। এরপরে আমি আর ওইহানে থাকার সাহস পাই নাই।”

জোহরার মনে দ্রুত ভাবনা চলছে। “তারমানে তুই বলতে চাস ইংরেজদের সাথে কথা বলার সময়ে মেঘালয়ের ওই ব্যাসসায়ির সাথে ওদের ঝামেলা হয় তারমানে তারা ওদের কোন ক্ষতি করে থাকতে পারে?”

“হইতে পারে, বেগম সাহেবা? আমি জানি না,” বলে বিল্লাল শেঠ ফোঁপাতে লাগলো। জোহরা লোকটার মুখের নিচ থেকে পিস্তলটা সরিয়ে নিলো। “ওদেরকে কোথায় পাওয়া যাবে? ওই মেঘালয়ের ব্যবসায়িকে, নাকি ওরা ইতিমধ্যেই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে?”

“বেগম সাহেবা হেরা হাটের জন্যেই আসছিল। আইজ হাটবার শেষ, আইজই আলীগড়ের দিকে রওনা দেওয়ার কতা।”

“তুই জানিস ওরা কোন পথ দিয়ে যাবে?” পাশ থেকে মানিক জানতে চাইলো। এতোক্ষণ সে চুপচাপ শুনছিল।

“হেরা এইহান থাইক্কা রাশশাহি আইয়া কলিকাতা যাবে, হেন থেইক্কা আলীগড়। হেরা কুনদিক দিয়া যাবে আমি জানি না তয় হেরা কুনহানে ক্যাম্প করছিল হেইডা আমি জানি।”

“তুই আমাদেরকে ওইখানে নিয়া যাবি,” এটা বলতেই সে চট করে আবারো জোহরার সামনে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

জোহরা একটু পিছিয়ে গেল। কেন জানি ওর কাছে লোকটার এই অতিভক্তি একেবারেই ভালো লাগছে না। “শেঠ, মাটি থেকে ওঠ।”

“বেগমসাহেবা এইসব ব্যবসায়িদের লইয়াই আমার কাম হেগো বিরুদ্ধে গেলে বাল-বাচ্চা নিয়া না খাইয়া মরতে অইবো।”

“আর আমি যা বলি সেটা যদি না শোন তবে বাল-বাচ্চা না দেইখাই মরতে হবে, বুঝছোস?” জোহরার কণ্ঠস্বরও পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন।

বিল্লাল শেঠ একটু চিন্তা করলো। “ঠিক আছে আপনেরা কয়েকজন আমার সাথে আসেন,” বলে সে একটু থেমে ভাবলো। “সবাই মিল্লা না। সবাই গেলে হেরা আগেই টের পাইয়া গেলে সমইস্যা অইতে পারে। তারচেয়ে আগে দুই একজন আমার লগে চলেন। আগে পরিস্থিতি বুইজ্ঞা লন। তারপর যা করার কইরেন। তয় আগে বইল্লা নেই। আমি হেগোরে দেহাইয়া দিলেই আমারে বিদায় দিবেন। আমি হেগো সামনে যাইতে পারুম না।”

জোহরা চুপচাপ ভাবতে লাগলো। লোকটা কোন প্রতারণা করার চেষ্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

“কুনো জরুরত নাই, গেলে আমরা সবাই...” মানিক কথাটা শেষ করার আগেই জোহরা কথা বলে উঠলো। “কতো দূরে জায়গাটা, এখান থেকে?”

“বেশি দূরে না। গড়ের অন্যপাশে বইদের কাছাকাছি। এইখান থাইক্কা মাইল দুইয়ের ভিতরেই অইবো।”

জোহরা ফিরে তাকালো মানিকের দিকে। “বিল্লাল শেঠ ভুল বলেনি। আমাদের সবার সেখানে যাওয়াটা ঠিক হবে না।”

“কিন্তু এই ব্যাটা যদি কোন চাল চাইল্লা থাকে, তাইলে?” জোহরার সিদ্ধান্ত মানিক মেনে নিতে পারছে না।

“কিছুই করার নেই। সত্য বের করতে হলে এখন এই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে,” বলে একটু থামলো জোহরা। ও নিজেও আসলে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না এইভাবে ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা। তবে এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আসলে কিছু করারও নেই কারণ মেঘালয়ের ব্যবসায়িদের সাথে এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। এতো লোক লষ্কর নিয়ে ওখানে গেলে যদি একটা যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয় তবে সেটা পরিস্থিতি আরো ঘোলা করতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা ওদের সাথে বড় ধরণের কোন ঝামেলায় জড়ালে সিরাজ আর মুন্সির কী হয়েছিল সেটা আর বের করা যাবে না।

ভাবনা-চিন্তা গুছিয়ে নিয়ে আবারো কথা বলে উঠলো জোহরা। “আমরা সবাই এখান থেকে একসাথেই রওনা দিবো। বিল্লাল শেঠের সাথে শুধু তুই আমি আর নিতাই যাবো। বাকিরা পথেই কোন জায়গায় অবস্থান করবে যাতে খবর পাঠালে যেকোন সময়ে ওরা জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য করতে পারে। বোঝা গেছে আমার কথা?” সবাই মাথা দোলালো। শুধুমাত্র মানিক চুপচাপ তাকিয়ে আছে জোহরার দিকে। জোহরার এই সিদ্ধান্ত সে মেনে নিতে পারছে না।

পালকি বাহিনীকে বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিয়ে জোহরাও এবার বাকি সবার সাথে পায়ে হেঁটে রওনা দিলো গন্তব্যের দিকে। মাইলখানেক এগিয়ে ভাওয়াল গড়ের শেষ মাথায় এসে বাকিদেরকে অপেক্ষা করতে বলে বিল্লাল শেঠকে নিয়ে জোহরা, মানিক আর নিতাই রওনা দিলো মেঘালয়ের ব্যবসায়িদের ক্যাম্পের দিকে।

***

“হুজুর, এইবার কি করবেন? এরা তো দুইদল দুই দিকে যাবো মনে হইতাছে,” শঙ্করের চোখে একইসাথে কৌতুহল আর ভয় খেলা করছে।

তবে শঙ্কর যে-ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে সেই একই ব্যাপার ম্যাকফিকেও ভাবিয়ে তুলেছে। গড়ের ভেতরে বিল্লাল শেঠের অপহরণকারীদের অনুসরণ করে এসে ওরা যখন দেখতে পেল ছেলেদের পোশাক পরা একজন মহিলা তাকে জেরা করছে। আর সেই মহিলাও যেকেউ নয় অত্র এলাকায় সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই পরিবারের একটির কর্তী, ব্যাপারটা জানতে পেরে বেশ অবাক হয়ে যায় ম্যাকফি। আসলে কী ঘটছে বোঝার জন্যে অকুল হয়ে ওঠে ও।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে জেরার এক পর্যায়ে দেখতে পায় ওরা চলতে শুরু করেছে। প্রায় সাথে সাথেই ম্যাকফি সিদ্ধান্ত নেয় অনুসরণ করতে হবে। কারণ ওর মন বলছে রাতের বেলা এই অদ্ভুত ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এই ঘটনার সাথে অফিসারদের অন্তর্ধানের কোন না কোন সংযোগ অবশ্যই আছে। তাই শঙ্করের আপত্তি থাকা স্বত্বেও সে পিছু নেয় ওদের। মাইলখানেক পিছু-পিছু চলার পর। ওরা এখন ঘন জঙ্গলের কিনারায় পৌছে

গেছে। এখানে এসে এখন দলটা দুই ভাগ হয়ে দুইদিকে রওনা দিয়েছে তাই শঙ্কর জানতে চাচ্ছে এবার কি করবে ম্যাকফি।

ম্যাকফির মনে কোন দ্বিধা নেই। কারণ তার মনে হচ্ছে বৃটিশ অফিসারদের অন্তর্ধানের ঘটনার সাথে এই ঘটনার কোন না কোন সংযোগ অবশ্যই আছে।

“শঙ্কর তুমি এক কাজ করো, মহাবীর সিং আর জোনাথনের কাছে গিয়ে জানাও এখানে কী ঘটেছে, তোমাদের অপেক্ষা করার দরকার নেই। তোমরা সোজা চলে যাও কাচারি বাড়িতে। আমি এদের পিছু নিয়ে দেখি এরা কোথায় যায়, কী করে।”

প্রবল আপত্তিতে মাথা নাড়তে লাগলো শঙ্কর, “হুজুর সেইটা কেমনে সম্ভব। আপনি এই এলাকা কিচ্ছু চিনেন না। কিছু যদি নাও হয় তাও ফিরবেন ক্যামনে?”

“এতো চিন্তা করলে হবে না। তুমি ওদের খবর দাও। আমি কাজ সেরে ঠিকই কাচারিতে ফিরতে পারবো। যাও,” ম্যাকফি একটু তাড়াহুড়ো করছে কারণ সে দেখতে পাচ্ছে সামনের দুটো দলের বড়টা থেমে আছে আর ওদেরকে রেখে ছোট দলটা জঙ্গলের ভেতের হারিয়ে যাচ্ছে। দেরি করাটা একদম ঠিক হবে না। “শঙ্কর, যাও।” বলেই ও ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে রওনা দিলো যেদিকে ছোট দলটা অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে।

খানিকটা ঘুর পথে এসে ও চলে এল যেখান দিয়ে দলটা এগিয়ে গেছে সেদিকে। এখানকার জঙ্গল খুব বেশি ঘন না কিন্তু জোছনা থাকার পরও অন্ধকারের ভেতরে দেখতে সমস্যা হচ্ছে। ম্যাকফি অন্ধের মতোই আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু সামনে কারো ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। না বিল্লাল শেঠ, না লাল পাগড়ি না বাকি দুজনার একজনকে।

বিরক্তির আওয়াজ বেরিয়ে এল ম্যাকফির মুখ দিয়ে। শঙ্করের সাথে কথা বলতে গিয়ে একটু দেরি করে ফেলেছে ও। হারিয়ে ফেলেছে দলটাকে।

***

জোহরা, মানিক, নিতাই আর বিল্লাল শেঠ একটানা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। গড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসাতে জঙ্গলের ঘনত্ব অনেকটাই পাতলা হয়ে এসেছে তবে পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে খুব। একটু আগের জোছনা বিদায় নিয়ে আকাশ বেশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে। আবারো যেকোন সময়ে বৃষ্টি হতে পারে মনে হচ্ছে।

জোহরা হাঁটতে-হাঁটতে একবার বিল্লাল শেঠকে দেখলো। লোকটা বেশ নেতিয়ে পড়েছে। তাকে একহাতে ধরে আছে মানিক। অন্যদিকে লাঠি হাতে সতর্ক নিতাই। যতোই পরিশ্রমী হোক তিনজন পুরুষ মানুষের সাথে পথ চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে জোহরা।

“আর কতো দূর?” হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইলো সে। কেউ জবাব দেয়ার আগেই পেছনে একটা শব্দ শুনে তিনজনেই চমকে উঠলো।

থেমে দাঁড়িয়েছে সবাই। “কি ব্যাপার নিতাই, এই বনে কি বাঘ আছে?” উৎকন্ঠিত স্বরে জানতে চাইলো জোহরা।

“নয়, বেগমসাহেবা এদলা ওয়াক্তে তো বাঘ থাকুইনের কতা নয়, তয় মাইচ্ছা বাগের কুনো সময়-গময় নাই,” পোদ্দার লাঠি বাগিয়ে ধরে পেছনটা জরিপ করছে। “বেবাগতে হুশিয়ার রাহুইন।”

ওরা আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথের প্রান্তে এসে থামলো। “হ¹লে সাবধান,” বলে সে সাবধানে আগে বাড়লো। আরেকটু এগোতেই সামনে এগোনোর পর কিছু চোখে পড়ার আগে কানে এল ঘুঙরুর শব্দ আর গানের আওয়াজ।

ব্যাপার কি? এখানে গানের আওয়াজ আসছে কোথা থেকে, মনে-মনে ভাবলো জোহরা। আরেকটু এগোতেই জবাব পাওয়া গেল। সামনে আলো দেখা যেতেই বিল্লাল শেঠ সবাইকে ইশারা করলো নিচু হতে। ওরা ধীরে-ধীরে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল।

একটু আগের বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব অনেকাই কমে গেছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। কালচে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ঘোলাটে চাঁদ। ঠিক জোছনা না হলেও একেবারে অন্ধকারও বলা যাবে না। তবে অন্ধকার হলেও ওদের দেখতে কোন সমস্যা হোত না কারণ সামনে বেশ আলো।

যেখান থেকে নাচ-গানের শব্দ ভেসে আসছে ওটাই যে মেঘালয়াদের ক্যাম্প এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এদেশিদের থেকে ওদের তাঁবুর আকৃতি আর ধরণ একটু আলাদা হয়ে থাকে। ক্যাম্পের চারপাশে বসানো মশালের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ক্যাম্পের সমানের অংশ।

পায়ে চলার পথের পাশেই একটু ফাঁকা জয়গা দেখে বসানো হয়েছে বড়-বড় তিনটে তাঁবু। তাঁবুর একপাশে চরছে রান্নাবান্নার আয়োজন। অন্যপাশে প্রহরার কাজে নিয়োজত লোকজন থাকার কথা কিন্তু সেখানে এই মুহূর্তে কেউই নেই। কারণ সবাই তিনটে তাঁবুর সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এসে জড়ো হয়েছে।

ঠিক তাঁবুর সামনে ফাঁকা জায়গাটায় তক্তপোশের আসন বসানো হয়েছে। সেখানে বসে আছে কয়েকজন। তাদের ঠিক পাশেই মাটিতে বসে আছে গরিব চেহারার কিছু লোক। ওদের ভেতরে কয়েকজনের হাতে খঞ্জনি ছোট তবলা আর মাদুলি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এই মুহূর্তে তিনজনে ওগুলোতে সুর তুলেছে, ওদের ঠিক সামনেই গোঁফওয়ালা স্বাস্থ্যবান চেহারার একজন মানুষ সুর তুলে গান গাইছে। দেশি বাদ্যযন্ত্র আর গানের সুরে-সুরে ঘুঙরু পরে গোল জায়গাটাতে নাচছে দশ-বারো বছরের সুন্দর দেখতে একটা ছেলে। ছেলেটার নিম্নাঙ্গে মেয়েদের মতো পোশাক, পায়ে ঘুঙরু, খালি গা আবার মাথায় পাগড়ি। গানের তালে তালে নাচছে ছেলেটা।

চারপাশে উৎসব উৎসব পরিবেশ। এদের মাঝে হঠাৎই জোহরার নিজেকে খুব অপাঙতেয় মনে হলো। অভিজাত ঘরের বউ সে। এভাবে নিজের স্বামির খোঁজে মরিয়া হয়ে জঙ্গলের ভেতরে চোরের মতো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মানুষের ওপরে নজর রাখছে ব্যাপারটা ভাবতেই নিজেকে খুব ছোট মনে হলো জোহরার। হয় সে মেঘালয়াদের সাথে সরাসরি কথা বলবে আর না হয় চলে যাবে এখান থেকে। সামনে তাকিয়ে দেখলো গান থেমে গেছে ক্যাম্পে। সবাই খোশগল্প করছে। একটু অগে গান গাইতে থাকা মোটা গোঁফের লোকটাকে দেখা গেল মেঘালয়াদের প্রধানের কানে কানে কিছু একটা বলছে। তার কথা শুনে সর্দার লোকটা খুশিতে মাথা নাড়লো।

আর না, মনে মনে ভাবলো জোহরা। সে পাশ ফিরে মানিককে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই গায়ক লোকটা সর্দারের সম্মতি পেয়ে তালি দিয়ে উঠলো। সেই সাথে চিৎকার করে বলে উঠলো, “হুজুরের তেষ্টা পেয়েছে, তাম্বাকু লাও।”

জোহরা হঠাৎ খেয়াল করলো ওদের মাঝে বিল্লাল শেঠ নেই। ওরা যখন মনোযোগ দিয়ে সামনে দেখছিল বিল্লাল শেঠ কখন উঠে গেছে কেউ খেয়ালই করেনি। সাথে সাথে ঝট করে সামনে ফিরে বোকা বনে গেল জোহরা। বিল্লাল শেঠ তার বিরাট বপু নিয়ে মেঘালয়াদের ক্যাম্পের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চলেছে, তার পিছু নিয়েছে মানিক। জোহরা আর নিতাই কী করবে বুঝে ওঠার আগেই অন্য ঘটনা ঘটতে শুরু করলো।

গোঁফওয়ালা গায়ক লোকটা তামাক আনার কথা বলে তালি দিতেই কোথায় যেন তী² গলায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। প্রায় একইসাথে ক্যাম্পের চারপাশে আরো কয়েকটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। জোহরা চমকে উঠে সামনে তাকালো। একটু আগের হাসি-আনন্দে মশগুল ক্যাম্প এই মুহূর্তে পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। একটু আগে আগুনের সামনে বসে থাকা ভূখা-নাঙ্গা লোকগুলো হাতে কিছু একটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে মেঘালয়াদের ওপরে। জোহরা দেখতে পেল চারপাশ থেকে হঠাৎ সুশৃঙ্খল আক্রমণে একে একে লুটিয়ে পড়ছে ক্যাম্পের প্রহরিরা। একদিকে ক্যাম্পের ভেতরে লোকজনের মৃত্যুনাদ অন্যদিকে আর বিল্লাল শেঠ আর মানিক ছুটে চলেছে ওইদিকেই।

চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল জোহরা। সামনে তাকিয়ে দেখলো শুধু প্রহরিরাই না মেঘালয়াদের সর্দারও লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। এতোক্ষণে ও পরিষ্কার দেখতে পেল আসলে কী ঘটছে ওখানে। মেঘালয়াদের সর্দারের গলায় একটা হলুদ রঙের রুমাল পরিয়ে পেছন থেকে সর্বশক্তিতে টানছে গোঁফওয়ালা সেই গায়ক লোকটা। এমনকি নাচতে থাকা পিচ্চি ছেলেটাও যোগ দিয়েছে ওদের সাথে, গায়ক লোকটা রুমাল টানছে আর পিচ্চি ছেলেটা দুই হাতে চেপে ধরেছে মৃত্যুরত লোকটার পা। আধ মিনিটেরও কম সময়ের ভেতরে ক্যাম্পের মধ্যে দশ থেকে বারোজন মানুষ মারা পড়লো। ঠিক এমন সময়ে ক্যাম্পের ভেতরে চলতে থাকা মৃতুবুহ্যের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়লো দৌড়াতে থাকা বিশ্বাসঘাতক বিল্লাল শেঠ, তার ঠিক পেছনেই মানিক।

ওদেরকে প্রথমে দেখতে পেল গায়ক লোকটা। সে সবেমাত্র মেঘালয়াদের সর্দারকে খুন করে তার গলা থেকে ফাঁসটা খুলে আনছিল এমনসময় তার দৃষ্টি পড়লো দুজনার ওপরে। বিজাতীয় ভাষায় কিছু একটা বলে উঠতেই তার দলের দুজন দুপাশ থেকে ধরে টেনে মাটিতে শুইয়ে দিলো বিল্লাল শেঠকে। সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের ভেতরে তার গলায় একইরকম দেখতে হলুদ ফাঁস পরিয়ে দিলো আরেকজন। বোকার মতো দৌড়াতে দৌড়াতে

ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল মানিক, এই দৃশ্য দেখে ভয়ে উল্টোদিকে দৌড় দিলো কিন্তু দশ পনেরো গজ এগোনোর আগেই গায়ক লোকটা পেছন থেকে ধরে ফেললো তাকে। শক্তিশালী হাতে পেছন থেকে জাপটে ধরে মাকড়শার মতো দক্ষতায় গলায় ফাঁস পরিয়ে টান দিলো।

জোহরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাটিতে পড়ে তড়পাতে থাকা মানিকের মুখটা। গলায় ফাঁস পরিয়ে টান দিতেই তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো জোহরা। কিন্তু লাল পাগড়িদের সর্দার নিতাই তো আর ভয় পাবার লোক নয়। গায়ক লোকটা মানিককে মাটিতে ফেলে দিতেই একটা ছোটখাট গর্জন করে লাঠি হাতে জোহরার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। ঝেড়ে দৌড় দিলো মানিককে সাহায্য করার জন্যে।

ওদিকে মানিককে মাটিতে ফেলে দক্ষহাতে ফাঁসে টান দিয়েছে গায়ক। নিতাইয়ের গর্জন শুনেও তার কাজে বিরতি দিলো না সে। নিতাইকে তেড়ে আসতে দেখে স্রেফ একটা কনুই নিচু করে মাকিকের ঘাড়ের পেছনে চাপ দিয়ে ধরে অন্যহাতে ফাঁসটা দিয়ে আরো জোরে টান দিলো। নিচ থেকে ফাঁসের টান আর ওপর থেকে কনুইয়ের চাপে মানিকের গর্দানটা পাটকাঠির মতো মট করে ভেঙে গেল।

অন্যদিকে নিতাই দৌড়ানো অবস্থাতেই মাথার ওপরে তার কাঞ্চন বাঁশের লাঠি তুলে শূণ্যের ভেতরে চালিয়ে দিলো ওটা। তার লক্ষ্য ছিল মানিকের ওপরে উঠে বসা গায়কের মাথা। সব ঠিক থাকলে নিতাইয়ের মোটা লাঠির এক বাড়িতেই গায়কের মাথা ভর্তা হয়ে যেত। কিন্তু সেটা হলো না। কারণ মানিকের শরীরের ওপরে বসা অবস্থাতেই লাঠিটাকে আসতে দেখে সে নিজের শরীরটাকে স্রেফ পেছনে ঢলে পড়তে দিলো লোকটা। ফলে নিতাইয়ের তেল চকচকে লাঠির কোনাটা শূণ্যে শুধু পাক খেলো একবার।

লাঠির বাড়ি ছুটে যেতেই নিতাই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। অন্যদিকে গায়ক শোয়া অবস্থাতেই এক গড়ান দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাড়ালো। বিশালদেহী নিতাই শরীরের ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই সে মাটি থেকে এক খাবলা কাদামাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো নিতাইয়ের চোখে-মুখে। গায়ক সেটা ছুঁড়ে মারতেই সদ্য শরীরের ভারসাম্য ফিরে পাওয়া পোদ্দারের চোখে তো বটেই নাকে-মুখেও ঢুকে গেল মাটি। এক হাতে লাঠি ধরে থাকা অবস্থায় নিজের অজান্তেই তার অন্য হাত চলে গেল চোখের কাছে। এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগালো গায়ক।

তার হাতে ধরা হুলুদ রঙের রুমালটা দুইবার শূণ্যে ঘুরিয়ে বিশেষ কায়দায় সেটা ছুঁড়ে মারলো পোদ্দারের দিকে। কিন্তু পোদ্দারের গলা নয় তার লক্ষ্য ছিল পোদ্দারের হাতের লাঠি। রুমালটা নিখুঁত লক্ষ্যে পেঁচিয়ে গেল লাঠিটার গায়ে। দক্ষ হাতে শক্ত টান দিতেই পোদ্দারের সাধের লাঠি হাতছাড়া হয়ে ছিটকে পড়লো মাটিতে। লাঠি হাতছাড়া হতেই অন্ধপ্রায় পোদ্দার একটা গর্জন করে তেড়ে গেল গায়কের দিকে। কিন্তু তার রাগ আর শক্তি কোনটাই কাজে লাগলো না। বিশালদেহি পোদ্দার হালকা-পাতলা সুঠামদেহি গায়কের সামনে কোন পাত্তাই পেল না। পোদ্দারকে ভীম বেগে ছুটে আসতে দেখে গায়ক একপাশে সরে গেল, ফলে পোদ্দার যখন তার কাছাকাছি চলে এসেছে সে একলাফে পোদ্দারের গায়ের জামা ধরে ছুটন্ত পোদ্দারের একেবারে ঘাড়ের ওপরে উঠে পড়লো।

পোদ্দার যতো শক্তিশালীই হোক ছুটন্ত অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের ওজন সহ্য করতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। ভীষণ জোরে মাটিতে ঠুকে গেল তার নাক। গায়ক এমনিতেই প্রায় পোদ্দারের গায়ের ওপরেই উঠে পড়েছিল, পোদ্দার মাটিতে পড়তেই বন বিড়ালের মতো উঠে এর তার পিঠের ওপরে, পেঁচিয়ে ধরলো ঘাড়। পোদ্দার মাটিতে পড়ে স্থির হবার আগেই সে তার গলায় ফাঁস পরিয়ে পাশবিক দক্ষতার সাথে টান মারলো ওপরের দিকে। পোদ্দারের দেহটা ¯ফে দুইবার খাবি খেল শূণ্যে। আরো শক্ত করে ফাঁস চেপে ধরলো গায়ক। পোদ্দার দুইহাতে মাটি খামচে ধরে এগোনোর চেষ্টা করছে ওদিকে গলায় ফাঁসের টানে মুখ দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে জ্বিভ, দুই চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেকোন সময় ওই দুটোও কোঠর থেকে টুপ-টুপ করে বেরিয়ে আসবে। পোদ্দার আরেকটু এগোনোর চেষ্টা করতেই গায়ক আরো জোরে চেপে ধরলো ফাঁস। পোদ্দারের চোখ দুটো বেরিয়ে না এলেও দাঁতের ফাঁক দিয়ে আধ হাত বেরিয়ে আসা জ্বিভের পেছনে মট করে ভেঙে গেল কণ্ঠার হাড়।

আর সহ্য করতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠলো জোহরা। ওর মনে হতে লাগলো পেটের ভেতর থেকে টক-টক পানি উঠে আসছে। যেকোন সময় ভাসিয়ে দিতে পারে বমি করে। তবে বমি হলো না ওর, যা হলো সেটা আরো খারাপ। নিতাইকে নিকেশ করে গলা থেকে রুমালটা খুলে আনছিল এমন সময় ঝোপের পেছন থেকে উদ্ভট আওয়াজ শুনে ঝট করে সেদিকে ফিরে তাকালো গায়ক।

শরীরটাকে একটু সামলে মুখ তুলে সামনে তাকিয়েই জমে গেল জোহরা। গায়ক লোকটা এখনো নিতাইয়ের দেহের ওপরে বসে আছে, এক হাতে ধরে

আছে নিতাইয়ের গলা থেকে খুলে নেয়া রুমালটা। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে জোহরার লুকিয়ে থাকা ঝোপটার দিকেই।

মৃত্যুবৎ আতঙ্কের সাথে জোহরা অনুভব করলো সে ধরা পড়ে গেছে। তবে তারচেয়েও বেশি আতঙ্কে ওর দম বন্ধ হয়ে এল কারণ কেউ একজন পেছন থেকে মুখ চেপে ধরেছে ওর।

অধ্যায় ছাব্বিশ

বর্তমান সময়

বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিংহ

পরিস্থিতি হঠাৎ বিপজ্জনক রূপ নিলেও বাশার মাথা ঠান্ডা রাখলো। রিফাত মজুমদার একজন মহিলা এটা জানার সাথে সাথে এতোক্ষণের অস্বস্তিটা ধরতে পারলো বাশার। লোকটার দেরি করে দরজা খোলা, হাঁপাতে থাকা, জুতো পায়ে কার্পেটের ওপরে হাঁটা, সোফার ওপরে ভাজ করে রাখা জিন্সের শার্ট... শিট এই তো সেই লোক আজ সকালে যার সাথে ওর হোটেলের গেটে ধাক্কা লেগেছিল, একারণেই চেনা চেনা লাগছিল। সেই জিন্সের শার্টটাই ভাঁজ করে রাখা ছিল সোফার হাতলে। চট করে এক হাতে ও নিজের পিস্তলটা বের করে আনলো।

তবে তার আগেই ভেতরের রুম থেকে ভেসে এল তীব্র আর্তনাদ।

ভেতরের কামরা থেকে আর্তনাদ ভেসে আসতেই জয়া সেদিকে দিকে দৌড় দিতে চাইলেও চট করে আঙ্গুলের ইশারায় তাকে থামতে বললো বাশার। পিস্তলটা তুলে ধরলো সামনের দিকে। জয়াকে ওর পেছনে থাকতে বলে পিস্তল বাগিয়ে ধরে সামনের দিকে এগোল। অন্যপাশের কামরা থেকে এখনো হুটোপুটির শব্দ ভেসে আসছে। ড্রইংরুম পার হয়ে চলে এল পাশের লাগোয়া ডাইনিং রুমে। এখানে এটা-ওটা উল্টে আছে কিন্তু কেউ নেই। ধস্তাধস্তির শব্দ এখন আরো বেড়েছে।

“কি ব্যাপার কেউ তো...” জয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই বাশার কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুপ থাকতে বললো। ডাইনিং রুমের সাথেই একটা ছোট দরজা দেখতে পাচ্ছে। ওটা সম্ভবত রান্নঘরের, ওদিকে না এগিয়ে অন্যপাশে এগোল ওরা। বড় একটা দরজা আছে ওখানে। ওদিক থেকেই ভেসে আসছে আওয়াজ। পিস্তলটা আরেকটু ওপরে তুলে ধরে ওদিকেই এগোল। কাছাকাছি পৌছে গেছে এমন সময় ঝড়ের বেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কেউ একজন। পিস্তলের ট্রিগারে বাশারের আঙ্গুল চেপে বসেছিল, কোনমতে নিজেকে সামলে নিলো। কারণ দরজা দিয়ে যে বেরিয়ে

এসেছে সে একজন মহিলা। আলুথালু বেশের মহিলা একেবারে উড়ে এসে পড়লো বাশারের ওপরে। কোনমতো তাকে ধরতেই জয়া এসে সাহায্য করলো। মহিলার মুখ বাঁধা, দুই হাত পেছনে বাঁধা। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেছে ভয়ে। জয়া তাকে ধরে প্রথমেই মুখের বাঁধনটা আলগা করে দিলো।

“ওদিকে, ওই রুমে লোকটা...” মহিলা কথা শেষ করার আগেই ধাম করে একটা শব্দ হলো তারপর কিছু একটা ভেঙে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। “তুমি একে সামলাও,” বলে ও মহিলাকে জয়ার জিম্মায় রেখে পিস্তল তুলে প্রবেশ করলো রুমের ভেতরে। অবশ্যই এটা একটা বেডরুম। আগে সম্ভবত বেশ শৌখিনভাবে সাজানো ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে একেবারে যা-তা অবস্থা। তবে রুমের ভেতরে কাউকেই দেখতে পেল না ও।

অন্যপাশের পর্দার পেছনেই একটা দরজা দেখে সেদিকে এগোল। দরজাটার একটা পাল্লা আলগা হয়ে আছে। পিস্তলটা এক হাতে ধরে দরজার আলগা পাল্লটা ঠেলে পেছনের লনে বেরিয়ে এল সে। বাইরে এসে একরকম বোকা বনে গেল।

কেউ নেই।

পিস্তলটাকে সামনের দিকে ধরে রেখেই শরীরটা একশ আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে পুরো লনটাতে কাউকেই দেখতে পেল না ও। মনে মনে হিসেব কষে দেখলো দরজা ভাঙার যে শব্দ ও শুনেছে সেই সময়ে কেউ বেরিয়ে এলে এতো দ্রুত পালাতে পারার কথা নয়। মনে-মনে শিউরে উঠলো ও তারমানে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা লোকটা এখানেই আছে এখনো।

ভাবনা শেষ করতে পারার আগেই ও আরেক পা এগিয়ে এসেছিল, দেয়ালের সাথে ঝুলন্ত অইভি লতার ঝাড়ের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে জাপটে ধরলো ওকে। অন্য হাতে থাবা মেরে ফেলে দিলো ওর হাতের পিস্তলটা। নিজেকে সামলানোর আগেই ওকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। পেছন থেকে আইভি লতা দিয়ে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। প্রচন্ড টানে বাশারের মনে হর ওর গলা ছিড়েই যাবে। মটিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই লোকটাকে হাঁটুতে মারার চেষ্টা করলো ও কিন্তু জোর হলো না বরং আরো জোরে চেপে বসলো আইভি লতার দঙ্গল। বাশার বুঝতে পারছে এভাবে কাজ হবে না।

ওর থেকে দুই হাত দূরে পড়ে থাকতে দেখলো নিজের পিস্তলটা। ওটার জন্যে হাত বাড়াতেই লোকটা ওকে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে

পিস্তটার দিকে এগিয়ে গেল। মরিয়া হয়ে উঠলো বাশার ইতিমধ্যেই লোকটা বাশারের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে পিস্তলটার দিকে। লোকটা আরেক গড়ান দিয়েই পিস্তলটা ধরে উঠে দাঁড়ালো। ও মাটিতে আধা বসা অবস্থাতেই লাফ দিলো লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে। পিস্তল হাতে ঠিকমতো সোজা হবার আগেই বাশারের কাঁধ গিয়ে বাড়ি মারলো লোকটার হাঁটুতে। তীব্র ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে সটান উল্টো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। পিস্তলটা উড়ে গিয়ে পড়লো অন্যপাশে। লোকটাকে না ধরে পিস্তলটার দিকে ডাইভ দিলো বাশার। ওটা হাতে ধরার আগেই ভেসে এল গুলির শব্দ।

বাশার অনুভব করলো গুলিটা ওর কানের পাশ দিয়ে হুঁশ করে বেরিয়ে গেল। সর্বনাশ, লোকটার কাছেও পিস্তল আছে। সোজা না হয়ে আবারো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল ও। আরো দুটো গড়ান দিয়ে চলে এল একটা ওয়ার্ক বেঞ্চের আড়ালে। ওটার ওপরে নানা ধরণের বাগান করার যন্ত্রপাতি সাজানো। বেঞ্চটা নিয়ে অন্যদিকে উল্টে পড়লো ও। আর কোন গুলির শব্দ ভেসে অসছে না দেখে আড়াল থেকে উঁকি দিলো। গুলি করবে কি, লোকটা চড়ে বসেছে দেয়ালের ওপরে। বাশার বসা থেকে সোজা হয়ে নিজের পিস্তল তুললো। লোকটা দেয়ালের ওপরে চড়ে বসেছে। গুলি করবে কি করবে না সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই লোকটা দেয়ালের অন্যপাশে আড়াল হয়ে গেল।

প্রাণপনে দৌড় দিলো বাশার। ও নিজেও একই পথে নেমে এল অন্যপাশের রাস্তায়। লোকটা এখন প্রাণপনে দৌড়াচ্ছে। বাশার রাস্তায় নেমে দেখতে পেল বাঁক ঘুরে দেয়ালের আড়ালে চলে গেল সে। বাশারও সেদিকেই দৌড় দিলো। একহাতে পিস্তলে সামলে অন্যহাতে বের করে আনলো ওয়াকিটকিটা। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে সাবধান করে দিয়ে দৌড়ে চলে এল বাঁকের অন্যপাশে। মূল রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। আবদুল্লাহ আর ও রমিজ দারোগাকেও দেখতে পেল, কিন্তু লোকটা নেই।

দুজনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এগোল ও। জিপের কাছাকাছি পৌছে গেছে এমন সময় ওকে ছুটে আসতে দেখে উল্টোদিক থেকে আবদুল্লাও দৌড়ে এল। “এখান দিয়ে কাউকে দৌড়ে পালাতে দেখেছো?” হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো বাশার। আবদুল্লাহ কাছাকাছি এসে থেমে গেছিল হঠাৎ সে চট করে বাশারকে জড়িয়ে ধরে রাস্তার একপাশে টেনে নিয়ে এল। দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। ওদের পাশ করে হুঁশ করে বেরিয়ে গেল একটা সাদা গাড়ি। ওরা উঠে দাঁড়ানোর আগেই বাঁক ঘুরে গায়েব হয়ে গেল ওটা।

“স্যার স্যার,” রমিজে দারোগা তার বিশাল ভুরি নিয়ে দৌড়ে আসছে। দুজনকেই ধরে দাঁড় করিয়ে দিলো সে। গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে গাল বকে উঠলো বাশার, “ধূর, বাল।” মাটিতে পড়ে কনুই ছড়ে গেছে। কপালের একপাশ দপ-দপ করছে ব্যাথায়।

“স্যার, ঘটনা কি?” আবদুল্লাহ ঠিক-ঠাক হয়ে এখন সাহায্য করছে বাশারকে।

“থাক, ঠিক আছে,” বলে ও টকিতে সাদা গাড়ির ব্যাপারটা ইনফর্ম করে এলার্ট জারি করে দিতে বললো। “কি হয়েছে পরে বলছি। তোমরা বাড়ির সামনে পাহারায় থাকো। আমি দেখি ভেতরের পরিস্থিতি কি,” বলেই ও আর অপেক্ষা না করে বাড়ির ভেতরের দিকে রওনা দিলো। ড্রইংরুম এখনো ফাঁকা, কেউ নেই। ও ভেতরের রুমে চলে এল ও। জয়া আর ওই মহিলা ডায়নিং রুমে বসে আছে।

এই বিপজ্জনক আর বিরক্তিকর পরিস্থিতিও না চাইতেও বাশারের চোখ আনমনেই চলে গেল মহিলার দিকে। জোর করে চোখ সরিয়ে নেয়ার আগে মুহূর্তেও জন্যে ওর পুরুষ দৃষ্টি আটকে রইলো ওদিকে। এরকম পরিস্থিতিতেও মনে-মনে মহিলার সৌষ্ঠবের প্রশংসা না করে পারলো না ও। বিদ্ধস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে মনের ভেতরের প্রশংসার পারদটা আরেক ডিগ্রী চড়ে গেল।

“কি ব্যাপার, কি হলো? লোকটাকে ধরতে পেরেছো?” জয়া একবার কাঁধ ঝাকিয়ে চোখ বড়-বড় করে জানতে চাইলো।

“পালিয়েছে,” একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো বাশার।

“আপনারা?” বলে মহিলা হাতে ধরা গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো। বাশার লক্ষ্য করলো তার হাত কাঁপছে। “আপনারা কারা, এসব কি হচ্ছে? ওই লোকটা ওই লোকটা আরেকটু হলে মনে হয় আমাকে মেরেই ফেলতো!” আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে।

“শান্ত হোন প্লিজ, সব ঠিক হয়ে যাবে,” কথাটা বলে বাশার নিজেকে মনে-মনে গালি দিলো। এরকম সিনেমার ডায়লগের মতো কথা শুনতেও কেমন জানি হাস্যকর শোনায়।

“ঠিক তো পরে হবে, আগে আমাকে বুঝতে হবে হচ্ছেটা কি? একটা ব্যক্তিগত কারণে আজ অফিস যাইনি। বাসায় বসে কাজ করছিলাম। কথা নেই, বার্তা নেই একজন লোক এসে আমাকে বন্দি করতে চাইলো। এরপরে আপনারা আবার এসে উদ্ধার করলেন। কিন্তু কেন হচ্ছে এসব?” আতঙ্কে মনে হচ্ছে মহিলার দুই চোখ বেরিয়ে আসবে। বাশার জানে জীবনে যারা মৃত্যু আতঙ্ক প্রত্যক্ষ করেছে। একমাত্র তারাই এই অভিজ্ঞতার তিক্ততা অনুধাবন করতে পারবে।

“প্লিজ, শান্ত হোন। বাইরে আমার দুজন ডেপুটি আছে। আর তাছাড়া কিছুক্ষণের ভেতরেই আমাদের ফোর্স চলে আসবে। কাজেই যা হবার হয়েছে আর কোন ভয় নেই,” বাশার জয়ার দিকে তাকিয়ে ইশরা করলো কিছু বলতে। “তুমি বলো।”

কিন্তু জয়া কিছু বলার আগেই মহিলা ঝামটে উঠলো, “টু হেল উইথ পুলিশ! হচ্ছেটা কি আমাকে সেইটা বলেন আগে।” বাশারের রাগ না হয়ে বরং ও স্বস্তি বোধ করলো যাক তাহলে মহিলা ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।

“আপনিই কি রিফাত মজুমদার? জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার উপপরিচালক?”

“জি, আবশ্যই। আমিই রিফাত,” মহিলার জবাব শুনে বাশারের দিকে তাকিয়ে জয়া মাথা নাড়লো।

“আজ থেকে এগারো বছর আগে আপনি ময়মনসিংহ মিউজিয়ামের কেয়ারটেকার ছিলেন?” এবারের প্রশ্নটা বাশারের।

“অহ, প্লিজ বলবেননা এই ঘটনার সাথে বিশ্রী ঘটনাটার সম্পৃক্ততা আছে,” মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে তার মাথা ব্যথা করছে। আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরেছে কপালের দুই পাশ। “আমি ওই বাজে ব্যাপারটা স্বপ্নেও আর মনে করতে চাইনা।”

“কিন্তু আপনাকে মনে করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আর বলতে গেলে আপনার ওপরে হামলা হবার কারণও ওই ঘটনা। মূলত ওই ঘটনার সূত্র ধরেই আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম কথা বলতে। আসার পর তো এই ব্যাপারটা ঘটে গেল।”

“বলেন কি! এতোবছর পরে আবার এসব কি শুরু হয়েছে? আমি আমি, ধূর। এই শহরে আবার ফেরত আসাটাই আমার উচিত হয়নি,” মহিলা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ওপর থেকে একগোছা এলোমেল চুল সরালো। আর বাশার তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। কিছু-কিছু সৌন্দর্য আছে হঠাৎ সহ্য করা যায় না। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় চোখ জ্বালা করে, মাথার ভেতরে নেশা নেশা লাগে। মহিলার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জয়ার দিকে তাকালো ও। সাথে সাথে অনুভব করলো প্রকৃতির কি বিচিত্র বৈষম্য তার সৃষ্টির প্রতি।

“শুনুন, এখন এসব বলে কোন লাভ নেই। আগে আপনি বলুন এখানে কী ঘটেছিল, এরপর আমরা বলছি এতো পুরনো ঘটনা নিয়ে কেন আমরা এখানে এসেছি,” বলে জয়া বাশারের দিকে তাকালো। ওর উদ্দেশ্যে একবার সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বাশার দুজনার দিকে থেকেই চোখ সরিয়ে টকিতে কথা বলতে লাগলো।

“এক মিনিট, আসছি,” বলে মহিলা চলে গেল শোবার ঘরের দিকে।

টকিতে বাশারের কথা শেষ করে ও জয়ার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, “কি মনে হয় রিফাত নামের এই মহিলা কিছু বলতে পারবে?” ওর দিকে না তাকিয়েই জয়া জবাব দিলো। “আমার ধারণা এরার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে তা-না হলে তার ওপরে আক্রমণ হোত না। যদিও আসলে মহিলার ওপরে এভাবে আক্রমণ নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। তবে...”

জয়ার কথা শেষ হবার আগেই মহিলা চলে এল। গায়ে একটা ওড়না পেঁচিয়েছে মুখ মুছে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। বাশারের মনে হলো পরিচ্ছন্ন না হলেই ভালো ছিল। এবার চাইলেও আর চোখ সরাতে পারছে না ও।

“আপনি কি এখানে একাই থাকেন?” জয়া জানতে চাইলো।

“না, আমার মা আর ছোট ভাই ঢাকা গেছে একটা কাজে। আর ছুটা বুয়া আছে। সে তো আজকের মতো কাজ সেরে চলে গেছে তবে কল দিলে আবারো আসবে। আচ্ছা ঘরদোর এভাবে... আর শোবার ঘরের দরজাটা?”

রিফাত প্রশ্ন করার আগেই আবার জবাব দিলো বাশার, “প্লিজ কিছুই করতে হবে না। আমি থানায় খবর পাঠিয়েছি ওখান থেকে লোক আসছে ওরা আসার আগে কিছুই করা যাবে না। পরে আমি ব্যবস্থা করবো,” ওর শেষ

কথাটা শুনে জয়া চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। কড়া দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলো বাশার।

“আমরা কি বাইরে বসতে পারি?” বাসার পেছনে বসার জায়গা আছে। “চলুন প্লিজ।”

ওরা তিনজনে মিলে বাড়ির পেছনের লনের মতো জায়গাটায় চলে এল। সেখানে একপাশে ছোট বাগানের মাঝখানে একটা টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার পাতা। ওখানে এসে বসলো ওরা। আবারো টকিতে আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে অ্যালার্ট থাকতে বলে চেয়ারে বসতে-বসতে একটু আগে যেখানে ধস্তাধস্তি হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি চলে গেল বাশারের। লোকটা কি সত্যিই গুলিটা মিস করেছিল নাকি ইচ্ছে করেই সতর্ক করার জন্যে কানের পাশ দিয়ে গুলি করেছে। তবে লোকটা ওকে মারতে চায়নি এটা নিশ্চিত। কারণ তাহলে প্রথমেই আইভি লতা দিয়ে পেঁচিয়ে না ধরে সোজা গুলি করতো। আনমনেই শিউড়ে উঠলো ও।

“এবার বলুন, কী ঘটেছিল এখানে। লোকটা ভেতরে ঢুকলো কিভাবে?” বাশার প্রশ্ন করার আগেই জয়া বলে উঠলো। “বাই দ্য ওয়ে, আমি জয়া সরকার, ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার। আর উনি ইন্সপেক্টর বাশার। উনিই সেই পুরনো ডাকাতির কেসটা তদন্ত করছে। সেটা কি ও কেন পরে বলছি। আগে বলুন এখানে কি ঘটেছে।”

“আমি সম্প্রতি একটা আন্তর্জাতিক একাডেমিক কনফারেন্সে যাবার জন্যে আবেদন করেছি। সেটার পেপার জমা দেয়ার আজকেই শেষ তারিখ। তাই পরিবারের সবাই ঢাকা যাবার পরেও আমি আমি যাইনি। অফিস থেকে ছুটিও নিয়েছি একারণেই। আমি কাজ করছিলাম হঠাৎ বাইরে কলিংবেলের আওয়াজ। দেখি এক লোক দাড়িয়ে আছে। সে জানালো অফিস থেকে জরুরি নাকি কি ফাইল নিয়ে এসেছে, ওটাতে সই করতে হবে। এখানেই আমি ভুল করি। ক্রশ চেক না করেই দরজা খুলে দিতেই সে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে হয় আসার আগেই সে খেয়াল করেছে বাড়িতে কেউ নেই। দরজা খুলতেই সে আমার মুখের ওপরে একটা শার্ট ছুঁড়ে মারে। সেটা সরাতেই দেখি আমার মাথার পাশে চেপে ধরে পিস্তল। আমি চুপ হয়ে যাই।”

“ভেতরের রুমে নিয়ে প্রথমেই আমার হাত আর মুখ বেঁধে ফেলে আমার কাছে জানতে চায় পেছনের দরজাটা কোনদিকে। আমি এমন ভয় পেয়েছি কিছুই না বুঝে ইশারায় দেখিয়ে দেই। সেটা তালা মারা দেখে চাবি কোথায়

চানতে চায় আমি আলমারি দেখিয়ে দেই। এমন সময় কলিংবেলের শব্দ হয় লোকটা দৌড়ে বেরিয়ে যায় বেডরুম থেকে। একটু পরেই আমি অন্য রুমে মানুষের গলার আওয়াজ পাই সাথে সাথে জোরাজুরি শুরু করি। করতে-করতে চেয়ারটা উল্টে হাতল ভেঙে অনেকটাই মুক্ত হয়ে যাই। জোরাজুরি করে প্রায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি এমন সময় লোকটা রুমে প্রবেশ করে। আমি কিছু না ভেবেই জোরে এক লাথি মারি তার কোমরে কিন্তু ঠিকমতো লাগেনি সেটা। সে জাপটে ধরতে চায় আমাকে। কোনমতে পেছনে ঠেলে দিয়েই দৌড় দেই অন্য রুমের দিকে। তারপর তো আপনারা জানেনই।"

"বুঝতে পেরেছি। লোকটা মনে হয় আপনাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরুনোর পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু আমরা চলে আসাতে সে হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে আপনারই নাম নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়ে যায়," জয়া বলে উঠলো বাশারের দিকে তাকিয়ে। বাশার একটু অবাক হলো তার বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে। ও মনে মনে ভাবলো মেয়েটা দেখতে খারাপ হতে পারে কিন্ত গুন আছে।

"কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না, লোকটা ঠিক আমরা আসার আগেই কেন এখানে এল। আর..." জয়ার কথার পিঠে বাশার বলে উঠলো। "হ্যা, আরো একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার না...

"হ্যালো, আপনারা কি এভাবেই ইশারায় কথা বলবেন আমাকে ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে নাকি এখন বলবেন আসলে কি ঘটেছিল, আর কেনই বা আপনারা এখানে। আর ওই লোকটাই বা কিভাবে আমার এখানে এসে হাজির হলো?" রিফাতের চোখে কৌতুহলের পাশাপাশি বিরক্তি।

বাশারের টকি খর-খর করে উঠলো। "মনে হয় টিম এসে গেছে। জয়া তুমি ওনাকে সব বলো। আমি ওদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসছি," বলে ও উঠে গিয়ে দেখলো ক্রাইম সিন ইউনিট চলে এসেছে। ওদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখলো জয়া কাহিনী বলে চলেছে। ওর বলা শেষ হলে রিফাত কিছুক্ষণ ঝিম মেরে রইলো।

"সর্বনাশ! আমি পুকুরের নিচ থেকে গাড়ি ওঠানোর খবরটা দেখেছিলাম। কিন্তু সেটা যে ওই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ভুলেও ভাবতে পারিনি। তারচেয়ে বড় কথা এই গাড়ি উদ্ধারের ব্যাপারটাতো এতোদিনের সব থিউরি উল্টে দিলো। আমি তো জানতাম বিজয় আচার্য আর ডেভিড মিলে এই ডাকাতিটা করেছে। ফেঁসেছিলাম আমি আর শেষ পর্যন্ত বিজয়তো মারা গেল। আর

ডেভিড মুর্তিটা নিয়ে পালালো কিন্তু এখন তো দেখছি ঘটনা পুরো উল্টে গেছে। বিজয় মরলো গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে, ডেভিড মরলো পানিতে পড়ে," বলে ও চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলো। "তবে... তবে চুরি হওয়া মুর্তিটা গেল কোথায়?"

"রিফাত, আমি কি আপনাকে রিফাত ডাকতে পারি?" প্রশ্নটা করলেও জবাবের অপেক্ষা করলো না বাশার। বরং রিফাতের দিকে একটু এগিয়ে বলে উঠলো, "আসলেও ওই সময়ে কি ঘটেছিল সেটা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারবেন। আর আমরা আশা করছি আপনি আমাদেরকে এই ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন," বলে মুখ কুঁচকে ফেললো পেটের ব্যাথায়। সকাল থেকে না খাওয়া পাকস্থলি এবার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। "যদি আমরা একসাথে কাজ করি একমাত্র তবেই ব্যাপারটার সুরাহা করা সম্ভব।

অধ্যায় সাতাশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

কালন্তি বিল, মধুপুর, ময়মনসিংহ

শঙ্করকে বিদায় দিয়ে ম্যাকফি মনে-মনে বেশ আফসোস করছিল। আসলেই চেনা আর অচেনার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তবে প্রথমে হারিয়ে ফেললেও কিছুটা এগিয়ে সে ওদেরকে খুঁজে পায়। লোকগুলোর পিছু নিতে-নিতে ম্যাকফি মনে মনে নিজের মুন্ডুপাত করছিল কারণ এই অচেনা জায়গায় অন্ধকারের ভেতরে কিছু করা তো দূরে থাক পিছু নেয়াই এক বিপদের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। ম্যাকফি ভাবছে কখন না সে এদের কাছে ধরা পড়ে যায়। আর লোকগুলোও চলেছে তো চলেছেই, এরা যাচ্ছে কোথায় কে জানে।

বিরক্তিকর আর ভীতিকর পিছু নেয়া একসময় শেষ হলো। মানুষগুলো আরেকটু এগোনোর পর সামনে থেকে ভেসে আসতে লাগলো গানের শব্দ। জোহারারা গানের শব্দে ঠিক যেভাবে অবাক হয়েছিল, একইরকম অবাক হলো ম্যাকফি। যদিও জোহরাদের থেকে বেশ অনেকটা পেছনে অবস্থান করার কারণে ঠিক বুঝতে পারছে না সামনের ক্যাম্পে আসলে কী ঘটছে তবে এটা বুঝতে পারছে বেশ আনন্দ উৎসব চলছে ওখানে। মনে-মনে নিজের ওপরে বিরক্ত বোধ করলো ম্যাকফি। এভাবে বোকার মতো এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।

হঠাৎ সামনে থেকে নাচ গানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এতোক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে ছিল ম্যাকফি, এবার ঝোপের আড়ালে পাতার ওপরে নিচু হয়ে বসে পড়লো। কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা খুলে রেখে দিলো একটা কাঁটা গাছের ডালের ওপরে। তারপর মনোযোগ দিয়ে কাদা পরিষ্কার করতে লাগলো জুতো আর ব্রিচেস থেকে। এই অভিযানের সমাপ্তি খুবই বাজেভাবে হবে মনে হচ্ছে। সে যদি জানতো তার মনের কথার সত্যতা কতোটুকু তবে নিজেও অবাক হয়ে যেত।

কাদা পরিষ্কার করে পিস্তলটার দিকে হাত বাড়াবে হঠাৎ তী² চিৎকারে চমকে উঠলো সে, হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা ধরতে গিয়ে হাতের ধাক্কা লেগে ঝোপের ভেতরে পড়ে গেল ওটা। মাথা নিচু করেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে সামনে তাকালো।

ওর অবস্থান থেকে বেশ খানিকটা সামনে এতোক্ষণ চারজন বসে ছিল চোখ তুলে দুজনকে দেখতে পেল। বাকি দুজনকে দেখতে পেল না ও। সামনের ক্যাম্প যেখান থেকে এতোক্ষণ গান-বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছিল সেখান থেকে এখন আর্তনাদ আর হুটোপুটির আওয়াজ ভেসে আসছে। ব্যাপার কি? হচ্ছেটা কি? ম্যাকফি সামনে চোখ রেখে এখনো পিস্তলটা খুঁজছে। “কাহা গেয়া?” পিস্তলটা না পেলে খবর আছে।

হঠাৎ সামনে থেকে লাঠি হাতে পুরুষটা উঠে দৌড় দিলো চিৎকার করতে করতে। ম্যাকফি গলা উঁচু করে দেখতে পেল ওদের সাথে আসা অল্প বয়ষ্ক ছেলেটাকে কেউ একজন মাটিতে চেপে ধরে ঘাড় ভেঙে দিতেই ওর সাথে এই লাঠিয়ালের তুমুল মারামারি বেঁধে গেল। ও অবাক হয়ে খেয়াল করলো বিশালদেহি লাঠিয়াল গোঁফওয়ালা লোকটার সাথে মারামারিতে পাত্তাই পাচ্ছে না।

বিপদ বিপদ! মাথার ভেতরে সংকেত বেজে উঠলো। ওর হাতে ঠেকলো পিস্তলটা। ওটা টান দিয়ে হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে সামনে যেখান ওরা সেই জায়গাটার পেছনে এসে থেমে গেল। সামনে বিভৎস দৃশ্য। মোটা লাঠিয়ালকে গলায় কিছু একটা দিয়ে চেপে ধরে খুন করছে সেই গোঁফওয়ালা। আর ওর ঠিক সামনেই সেই মহিলা-যাকে শঙ্কর বেগমসাহেবা বলেছিল-সে বসে বসে ফোঁপাচ্ছে। লাঠিয়ালকে খুন করে উঠে দাঁড়িয়েছে সেই মোটাগোঁফ। সে ঝট করে এদিকেই ফিরে তাকালো। সম্ভবত অনুমান করেছে এখানে কেউ আছে।

যদিও হাতে পিস্তল আছে তবুও ম্যাকফি বুঝতে পারলো এই দলের সাথে লাগতে গেলে ও পারবে না। বরং এই মোটাগোঁফ যদি মহিলার সন্ধান পায় তবে তারও খবর আছে। মোটাগোঁফ একদৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে আছে, আর ওর সামনে বসে থাকা মহিলা ভয়ে আতঙ্কে বিচিত্র সব শব্দ করছে। ম্যাকফি পেছন থকে একটু এগিয়ে খপ করে মহিলার মুখ চেপে ধরলো শক্ত করে। সাথে-সাথে মহিলা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করার আগেই ও কানে-কানে বলে উঠলো, “বন্ধু, চুপ রাহিয়ে।”

যদিও আতঙ্কে অস্থির, তবুও মহিলা স্থির হয়ে গেল। গোঁফওয়ালা লোকটা এদিকে তাকিয়ে হাতে ধরা হলুদ রঙের একটা রুমাল পাকাচ্ছে। ম্যাকফি মহিলার মুখ চেপে স্থির হয়ে রইলো পাথরের মতো। কারণ লোকটা একা হলেও তার পেছনে দেখা যাচ্ছে তাদের একটা বেশ বড় দল আছে। হঠাৎ অনুচ্চ স্বরে শিস দিয়ে উঠলো লোকটা। প্রায় সাথে সাথে পেছন থেকে দৌড়ে এল দুজন। তারা বিচিত্র এক ভাষায় কথা বলতে লাগলো। বহুদিন ভারতবর্ষে থাকলেও এই ভাষা আগে ম্যাকফি শোনেনি।

লোকগুলো নিজেদেরে ভেতরে কথা বলছে, ম্যাকফি মহিলার মুখ ছেড়ে দিয়ে তাকে ইশারা করলো পেছন দিকে সরে আসার। নিজেও পিছিয়ে আসতে লাগলো ধীরে-ধীরে। ওদিকে লোকগুলোর কথোপকথন আরো চড়া হয়েছে, সম্ভবত কোনকিছু নিয়ে তর্ক করছে তারা। এই সুযোগে আরেকটু পিছিয়ে এল ওরা। এমন সময় কথা থামিয়ে লোকগুলো ফিরে যেতে লাগলো। প্রথমে রওনা দিলো মোটা গোঁফ, এরপরে পেছনে লাঠিয়ালের দেহ টেনে নিয়ে যেতে লাগলো দুজনে। পেছাতে গিয়ে ম্যাকফির ইউনিফর্মের হাতা আটকে গেল একটা কাঁটা ঝোপে। ওর ঠিক সামনেই ছিল সেই মহিলা, ম্যাকফি পোশাকটা কাঁটা থেকে ছাড়ানোর আগেই সে এসে পড়লো ম্যাকফির ওপরে। ফর-ফর করে ছিড়ে গেল ইউনিফর্ম।

সাথে সাথে থেমে গেল লোকগুলো। কড়া স্বরে কিছু একটা বলে উঠলো সেই মোটাগোঁফ। আবারো একইরকম অনুচ্চ স্বরে শিস দিয়ে উঠলো। প্রায় সাথে সাথে আরো দুজন দৌড়ে এল। সবাই মিলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

ম্যাকফি নিজের ইউনিফর্ম ছাড়ানোর জন্যে টানাটানি করছে। ওর দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলা। ম্যাকফি একহাতে কাপড় টানতে টানতে নিজের পিস্তলটা বাড়িয়ে দিলো মহিলার দিকে। তবে ওকে অবাক করে দিয়ে মহিলা নিজেই একটা পিস্তল বের করে আনলো কোমর থেকে। যদিও দুজনেই জানে পিস্তল দিয়ে কিছুই হবে না। দুটো পিস্তল থেকে দুটো গুলি বেরুবে। আর শত্রু অনেক। দ্বিতীয়বার গুলি ভরার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। ম্যাকফি শেষবারের মতো জোরে এক টান দিয়ে কাপড়টাকে ছিড়ে বের করে আনলো। সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়া লোকগুলো ওদের দিকে ইশারা করে কিছু একটা বলে উঠলো। ম্যাকফি বুঝত পারলো আর লুকিয়ে লাভ নেই ধরা পড়ে যাবে ওরা।

সে মহিলাকে একটানে দাঁড় করিয়ে দৌড়ানোর ইশারা করে নিজেও দৌড় দিলো। সাথে সাথেই লোকগুলো দেখে ফেললো ওদেরকে। দুজনেই প্রাণপনে দৌড়াতে লাগলো। ওদের পেছনে-পেছনে দৌড়ে আসছে লোকগুলো। ম্যাকফি একবার পেছনে ফিরে তিনজনকে দেখতে পেল। আরো জোরে দৌড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলো ও। আর পেছনের লোকগুলো দৌড়ে আসছে। দূরত্ব তো বাড়ছেই না বরং কমছে।

ওর সামনে মহিলা দৌড়রত অবস্থাতেই কিছু একটা বললো। ম্যাকফি বুঝতে পারলো না। আরেকটু এগোতেই মহিলা দাঁড়িয়ে গেল। আরেকটু হলেই দৌড়ানোর ঝোঁকে মহিলার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে বসতে যাচ্ছিলো ম্যাকফি।

“কি হলো?” হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইলো ম্যাকফি। ভুলে গেছে মহিলা তার ভাষা নাও বুঝতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষকে সর্বোচ্চ বোঝাপড়ার দিকে ঠেলে দেয়। মহিলা তাকে হাতের ইশারায় সামনে দেখালো। ওদিকে তাকিয়েই ম্যাকফি চমকে উঠলো। সামনে পানির একটা ধারা দেখা যাচ্ছে। নদী নাকি, মনে মনে ভাবলো ও। পেছন ফিরে দেখলো খোলা মাঠ ধরে দৌড়ে আসছে লোকগুলো।

আর কোন উপায় নেই। মনে হচ্ছে পানিতেই লাফিয়ে পড়তে হবে। ঝট করে মহিলার একটা হাত ধরে ফেললো সে। সাথে-সাথে অনুভব করলো এই বিপদেও মহিলা শক্ত হয়ে গেছে। চাদের আলোয় মহিলার চোখ দেখে মনে হলো সে রাগের সাথে হাতটা ছাড়িয়ে নিবে কিন্তু তার আগেই নদীর পাড়ের আলগা মাটি ভেঙে দুজনেই গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

বালুর ওপরে স্থির হবার আগেই এক জোড়া শক্ত হাত টান দিয়ে দাড় করিয়ে দিলো দুজনকে। ম্যাকফি দেখতে পেল আগাগোড়া কালো পোশাক পরা একটা মুর্তি, এমনকি মুখের ওপরেও কালো আবরণ। ম্যাকফি কিছু বলার আগেই হাতের ইশারায় দুজনকেই চুপ থাকতে বলে সামনে এগোতে বললো। নদী পাড় থেকে বড় একটা মাটির চাঙর তুলে নিয়ে গড়িয়ে দিলো পানিতে তারপর দৌড়ে চললো দুজনকে নিয়ে। সামনেই নদীর পানিতে ঝুঁকে রয়েছে একটা বড় গাছ। কালো মুর্তিটা দুজনকেই টেনে নিয়ে ওটার আলগা হয়ে থাকা শিকড়ের নিচে ঢুকে গেল। অর্ধেক শরীর পানিতে, আর অর্ধেক শরীর শিকড়ের আড়ালে লুকিয়ে ওদেরকে ইশারায় চুপ থাকার নির্দেশ দিলো মুর্তিটা।

নদীর কিনারা থেকে মানুষের গলা ভেসে আসছে। শিকড়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল নদী পাড়ে পাঁচজন দাড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। যদিও অন্ধকার তবুও সেই গোঁফওয়ালা লোকটাকে দেখতে পেল দুইহাতে এখনো ধরে আছে সেই হলুদ রুমালটা। ম্যাকফি মনে মনে প্রার্থনা করলো লোকগুলো যেন নদীতীরের বালুতে ওদের পায়ের ছাপ দেখতে না পায়। একটু পরেই সবার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মাঝে গোঁফওয়ালা লোকটা একটা হাত তুলতেই সবাই থেমে গেল। লোকটা কী যেন বললো, এরপরেই একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল সবগুলো মাথা।

পানি আর আলগা শিকড়ের আড়ালে আরো অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইলো ওরা। ভয়ের চোটে কেউ নড়তেও সাহস পাচ্ছে না। হঠাৎ আগাগোড়া কালো পোশাকের মানুষটা কথা বলে উঠলো। “মনে হয়, ওরা চলে গেছে।”

লোকটার মৃদু স্বরে বলা কথাগুলো শুনে চমকে উঠলো ম্যাকফি। একেবারে নেটিভ ইংরেজি। কথার মধ্যে ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডশায়ার এলাকার টান পরিষ্কার। “আপনি ইংরেজ?” অবাক হয়ে জানতে চাইলো ম্যাকফি?”

ওর প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে উঠলো লোকটা। মুখের আবরণ সরাতেই তার রোদে পোড়া দুধ সাদা চামড়া দেখা গেল। যদিও অন্ধকার, তবু নীল চোখ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

“ক্যাপ্টেন ম্যাকফি, আমি উইলিয়াম হেনরি স্লীম্যান,” বরে সে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ম্যাকফির দিকে। ম্যাকফি নিজের হাত বাড়ানোর আগেই পাশ থেকে জোহরা উছলে ওঠার মতো করে বলে উঠলো।

“ওখানে কি হচ্ছিলো? এই লোকগুলো কারা, আর এভাবে সবাইকে মেরে ফেললো কেন ওরা?” জোহরার বড়-বড় চোখে এখনো চরম আতঙ্ক। মহিলাও ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছে শুনে একটু অবাক হয়ে গেল ম্যাকফি আর স্লীম্যান দুজনেই। যদিও তার ইংরেজি ভাঙা ভাঙা তবুও এই প্রত্যান্ত এলাকার একজন মহিলা এভাবে ইংরেজি বলবে সেটা তো ভাবাতীত।

জোহরার প্রশ্ন শুনে আঁতকে উঠলো স্লীম্যান। “আস্তে, মাই লেডি। লোকগুলো যদি আশেপাশে থেকে থাকে তবে বিপদ হতে পারে।”

“কিন্তু, এরা কারা, ওখানে হলোটা কি, আর আপনিই বা এখানে এভাবে এলেন কিভাবে?” এবার প্রশ্ন করেছে ম্যাকফি।

“বলছি, আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তরই দিবো। তবে তার আগে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।”

“না, আগে আমি জানতে চাই ওরা কারা, এভাবে আমার লোকদেরকে, মেঘালয়াদেরকে মেরে ফেললো কেন, আরেকটু হলে তো আমাদেরকেও...” এইটুকু বলেই জোহরা শিউরে উঠলো।

“অস্থির হবেন না মাই লেডি, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। কারণ আপনারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে কুখ্যাত খুনে দলের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এরাই ইংরেজ অফিসারকে খুন করে গুম করেছে, সেইসাথে আপনার স্বামি আর আপনার পরিবারের অন্য মানুষটাকেও,” শেষ কথাটা স্লীম্যান জোহরাকে উদ্দেশ্য করে বললো।

“মানে, এরা কারা?” আর আপনিই বা এদের সন্ধান পেলেন কিভাবে?”

“সে এক লম্বা গল্প,” বলে স্লীম্যান তিক্ত হাসি দিলো। “তবে এটুকু বলে রাখি এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন-ভিন্ন নামে পরিচিত কিন্তু এদের সবচেয়ে পরিচিত নাম ‘ঠগী’। আপনারা আজ ঠগী নামেরই এক দূর্ধর্ষ খুনে ডাকাত দলের মুখোমুখি হয়েছিলেন।”

“ঠগী আবার কি? আর আপনিই বা এদের ব্যাপারে জানলেন কিভাবে? সবচেয়ে বড় কথা একেবারে সঠিক সময়ে আমাদের কাছে এভাবে পৌছালেনই বা কিভাবে?” ম্যাকফি জানতে চাইলো।

“ক্যাপ্টেন, আমি কিভাবে ঠগীদের ব্যাপারে জানতে পারলাম আর এখানেই বা কিভাবে এলাম সেটা বলতে হলে বেশ আগে থেকে শুরু করতে হবে,” বলে সে ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিলো। “আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে হবে।”

অধ্যায় আটাশ

বর্তমান সময়

বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিংহ

“এই রহস্য উন্মোচন করতে হলে তোমাদেরকে আগের ঘটনা পুরোটা বুঝতে হবে। আর ওই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সব এখানে আছে,” বলে রিফাত ধপ করে জুতোর বাক্সের মতো দেখতে সুন্দর একটা বাক্স কাঁচের টি-টেবিলের ওপরে রাখলো।

ওরা এখন বসে আছে রিফাতের বাসার ড্রইং রুমে। সময়টা বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। ইতিমধ্যেই ক্রাইম সিন ইউনিট রিফাতের বাসা থেকে তাদের কাজ সেরে যাবার পর মিস্ত্রি আর বুয়াকে ডেকে সব ঠিকঠাক করা হয়েছে। রিফাতের বাসার সামনে বসানো হয়েছে পুলিশ পাহারা। বাশার অফিসে ফিরে লাঞ্চ করে রিপোর্ট জমা দিয়ে এসেছে। যদিও যা ঘটেছে তার অনেক কিছুই এড়িয়ে গেছে ও রিপোর্টে । ওসি মল্লিক দেখা করতে বলেছে সেটাও করেনি। বরং কাজে মন দিতে চাইছে ও। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে আজকের মতো ছুটি দিয়ে ফিরে গেছে নিজের ঘরে। ওখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে জয়াকে নিয়ে ফিরে এসেছে রিফাতের বাসায়।

রিফাত বাক্সটা রাখতেই জয়া ওটাকে উঠিয়ে দেখলো। “আপনি এতোদিন ধরে এগুলোকে এতো যতেœ রেখে দিয়েছেন?”

রিফাত কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো। “সত্যি কথা হলো, আমার নিজেরও কখনো না কখনো ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল। এই ঘটনায় যে-অপমান আমি হয়েছিলাম সেটা জীবনেও ভুলবো না। আমার পরিবার যদি প্রভাবশালী না হোত তবে হয়তো এখনো জেলে থাকতে হোত আমাকে,” রিফাতের চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তার কষ্টটা বাশার পুরোপুরি অনুভব করতে পারছে। কারণ একই অভিজ্ঞতা তার নিজেরও হয়েছে। বাম হাতের আংটিটা আনমনেই চেপে ধরলো ও।

“ওই সময়ে আসলে হয়েছিল কি?” জানতে চাইলো বাশার। জয়া অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হলো না খুব বেশি একটা আগ্রহ আছে জানার। তবুও বাশারের সাথে সহমত পোষণ করে মাথা নাড়ালো সেইসাথে রিফাতের অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরালো।

“কি আর বলবো,” বলে রিফাত তার চায়ের কাপে চুমুক দিলো। “তখন আমি সবেমাত্র আর্কিওলজিতে অনার্স করে বেরিয়েছি। ভাবছিলাম চাকরি করবো নাকি হায়ার স্টাডিজের দিকে যাবো, এমন সময় আমার মেঝ খালা আমাকে একটা প্রস্তাব দেন। উনি ছিলেন ময়মসসিংহ জাদুঘরের কিউরেটর। তখন উনার অবসরে যাবার সময় চলে এসেছে। তার ছেলে-মেয়েরা সব থাকে কানাডায়, সেখানে চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন উনি। তাই ভাবলেন এতো বছর চাকরি করেছেন, মিউজিয়ামটাতে পরিচিত কাউকে বসিয়ে যেতে পারলে শান্তি পেতেন। তো ওই মুহূর্তে এই কাজের জন্যে আমার চেয়ে ভালো আর কেউ ছিল না। একেতো প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রি তার ওপরে সদ্য পাস করে বেড়িয়েছি, কাজেই উনার পরামর্শে ঢুকে গেলাম। ছোট জাদুঘর, কাজ নেই তেমন। আমি ঢুকেছিলাম চরম অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। সেখানে ক্ল্যারিকেল জব করতে-করতে বিরক্ত হয়ে পড়লাম এক বছরের মাথায়। ওখানে বসেই আন্তর্জাতিক কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে কোন এক্সপিডিশন টিম আনানো যায় কিনা ভাবছি ঠিক সেই সময়ে আমার সাথে দেখা হয় বিজয় আচার্যের।”

“সদ্য বিশ্বাবদ্যালয় জীবন শেষে এই ম্যারমেরে চাকরি করে আমি যখন বেশ বিরক্ত তখন বিজয় আচার্য আমার সাথে এসে দেখা করে। হালকা-পাতলা সুদর্শন এক তরুণ। তার মনের ভেতরে অনেক ছটফটানি আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা,” বলে রিফাত টেবিলের ওপরে রাখা বাক্স থেকে একটা ছবি বের করে দেখালো। বাশার দেখলো ছবির ভেতর থেকে ফর্সা এক যুবক তাকিয়ে আছে, হালকা লাল চুল পাট করে আঁচড়ানো। ও মনে-মনে ভাবলো ছেলে হিসেবে একটু বেশিই সুন্দর। প্রশ্নটা ও না করে পারলো না, “যদি কিছু মনে না করেন। আপনার সাথে কি তার প্রেম বা ওরকম কিছু হয়েছিল?”

রিফাত বেশ অবাক হয়ে তাকালো প্রথমে তারপর হেসে ফেললো। হাসিতে যেন একটু দুঃখ। “তারসাথে প্রেম হওয়া সম্ভব ছিল না।”

“কেন,” বাশারও একটু অবাক হয়ে গেছে রিফাতের উত্তর শুনে।

“কারণ তার শরীরিক ত্রæটি ছিল। একারণেই ওই ঘটনা বলার আগে বিজয়ের ব্যাপারটা বলতে হবে। ময়মনসিংহের জমিদার পরিবারের দুটো শাখা। একটা ওদের মূল শাখা। অন্য শাখাটা অনেকটা পরিবারের পার্শ্ব অংশের মতো। শশীকান্ত আচার্যের বাবা সূর্যকান্ত যখন শশীলজ নির্মাণ করে তখন সেটা ঘিরে নাকি অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। সেই সময়েই আচার্য পরিবারের একটা অংশ আলাদা হয়ে যায়। মূল অংশ থেকে আলাদা হওয়া অংশটার আসলে কি হয়েছিল সেটার প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাপারটা বলে নেই। উনিশশো শতকের শুরুর দিকে এই জমিদার পরিবার ধীরে-ধীরে দূর্বল হতে থাকে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানের সাথে-সাথে তারা এক রকম বিলুপ্ত হয়ে যায়। একাত্তরের পরে তাদের যে-বংশধর ছিল তারা পরিবারের বেশিরভাগ সম্পত্তিই সরকারকে দিয়ে দেয়। আশির দশকে আসামে বড় মাপের ভূমিকম্পে ময়মনসিংহের অনেককিছুই নষ্ট হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় জমিদার পরিবারের সম্পদ। জমিদার পরিবারের অবস্থা তখন খুব খারাপ। নিজেদের বেশিরভাগ সম্পদই মেরামত করার মতো সামর্থ তখন তাদের নেই। তাই বেশিরভাগ সম্পদ তারা সরকারকে দিয়ে দেয়, সরকার সেগুলোকে মেরামত করে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বানায়, সরকারি অফিস বানায়। তো যাই হোক, এরকমই এক বাজে সময়ে বিজয়ের জন্ম। বিজয় ছিল আনবর্ন বেবি।”

“আনবর্ন মানে?” বাশার আবারো জানতে চাইলো। সে জয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো জয়া মোবাইলে কার সাথে যেন চ্যাট করছে। তার এই ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ আছে ব’লে মনে হচ্ছে না।

“বিজয়ের জন্মের আগেই তার মা মারা যায়। ডাক্তার মা আর বাচ্চা দুজনকেই মৃত ঘোষণা করে কিন্তু আসলে মৃত মায়ের পেটের ভেতরে বাচ্চা তখনো বেঁচে ছিল। তার মাকে মৃত ঘোষণা করার পরেও কিভাবে যেন এক নার্স অনুমান করে বাচ্চা আসলে বেঁচে আছে। এরকম কেস খুব রেয়ার হলেও কখনো কখনো ঘটে। এরপরে বিচিত্র এক জটিলতার মধ্যে দিয়ে জন্ম হয় বিজয়ের। জন্মের আগেই মাকে হারায় সে। জন্মের পর দেখা যায় সে আসলে পুরোপুরি পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি। অপরিণত বাচ্চাদের যেসব সমস্যা থাকে তারও তেমনই ছিল। বিজয়ের বাবার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। কিছুদিন আগেই তার পরিবার একরকম শেষ হয়ে গেছে, তারপর তার স্ত্রী মারা গেছে অন্যদিকে যে বাচ্চার জন্ম হয়েছে সে আসলে ছেলে না মেয়ে সেটা পরিষ্কার না, বিজয়ের বাবা বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে।”

“এমনসময় হিজরারা এসে তাকে নিয়ে যায়। বিজয়ের বাবা একরকম স¦স্তির সাথেই তাকে বিদায় করে। এই ছেলের ব্যাপারে সে কাউকেই কখনো কিছু বলেনি। এমনকি তার বড় ছেলে মানে বিজয়ের বড় ভাইকেও না। তো বিজয় জন্মের পর থেকে বড় হতে থাকে হিজরাদের মাঝে। সে নিজের বংশ পরিচয় জানতো না। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সে বুঝতে পারে সে যাদের সাথে বসবাস করছে সে পুরোপুরি তাদের মতো না। একটা সময় সে হিজরাদের থেকে সরে যায়। সে স্বাভাবিক জীবনযাপনের চেষ্টা করতে থাকে ততোদিনে পরিণত যুবক হয়ে উঠেছে। কলেজে ভর্তিও হয়েছে। তখনো সে জানে না সে আসলে কে।”

“এমন সময় তার বাবা মারা যায়। মারা যাবার আগে নিজের বড় ছেলের কাছে বিজয়ের ব্যাপারে বলে যায়। বাপের মৃত্যুর পরে বড় ভাই তাকে খুঁজে বের করে। বিজয়ের বড় ভাই ছোটবেলা থেকেই বিদেশ থাকতো। সে তার ভাইকেও বিদেশ নিয়ে যেতে চায় কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে বিজয় যেতে রাজি হয়নি। সে তার পারিবারিক পরিচয় পেয়ে বেশ অবাক হয়ে গেছে, সে তার পরিবারকে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। তখন বড় ভাই তাকে স্থানীয় কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে দেশে তাদের পারিবারিক সম্পত্তি যা ছিল সেগুলো সব বিক্রি করে গোলকিবাড়িতে বিজয়কে একটা বাড়ি বানিয়ে দেয়। এই বাড়িতেই পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে সে মারা যায়,” রিফাত এই পর্যন্ত বলতেই জয়া হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো।

একটু কড়া সুরেই সে প্রশ্ন করলো, “আচ্ছা, একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, বিজয়ের ইতিহাস এতো বিস্তারিত জানার প্রয়োজনীয়তা কি? এরচেয়ে বরং সেই সময়ে কি ঘটেছিল সেটা জানাটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।”

“সেটা বোঝাতে হলে বিজয়ের ইতিহাস জানাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পুরো ব্যাপারটার শুরু ওখান থেকেই। তো যাই হোক বিজয় তখন আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসে পড়তো আর তার পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতো। এই গবেষণা করতে গিয়েই সে জানতে পারে ময়মনসিংহ শহরে সত্তরের দশকে একটা ঘটনা ঘটেছিল।”

“সেই সিন্দুকের ব্যাপারটাতো?” জয়া প্রশ্ন করতেই রিফাত মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। “ওটা আমি বাশারকে বলেছি।”

“অহ্, আপনারা তাহলে ওটার ব্যাপারে জানেন। ওটার ব্যাপারে ক্লেইম করে বিজয় তার পারিবারিক ইতিহাসের বেশ অন্ধকার কিছু দিক সম্পর্কে জানতে পারে। সে এও জানতে পারে তার পরিবারের একটা অংশের বেশ কালো অধ্যায় আছে। এবার সে এই অংশটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে। গবেষণায় সে আবিষ্কার করে তার পরিবারের একটা অংশ বৃটিশ ভারতের সময়ে ঠগী ছিল।”

“কি ছিল, ‘ঠগী’?” বাশার বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো। “ সেটা আবার কি?”

“ওহ ডিয়ার ‘ঠগী’ কি সেটা বলতে হলে বেশ লম্বা ইতিহাস বলতে হবে। তবে তারচেয়ে বেশি বলতে হবে উইলয়াম হেনরি স্লীম্যান নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজের কথা। ঠগীদের ইতিহাস জানার আগে তার ব্যাপারে জানতে হবে। আর তার ব্যাপারে বলতে গেলেই ঠগীদের ইতিহাস চলে আসবে।”

“ঠিক আছে, শুনি তাহলে কে এই স্লীম্যান?”

অধ্যায় উনত্রিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

কালন্তি বিল এলাকা, মধুপুর

তালুকদার পরিবারের আবাসস্থলের দিকে যেতে-যেতে ম্যাকফি আর জোহরাকে নিজের গল্প বললো হেনরি স্লীম্যান। সেইসাথে ঠগীদের সাথে তার সংঘর্ষের গল্পও।

ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডশায়ারের বিখ্যাত মিলিটারি পরিবারগুলোর একটিতে জন্ম উইলিয়াম হেনরি স্লীম্যানের। বাবা ফিলিপ স্লীম্যান ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। আট ভাইবোনের ভেতরে হেনরি ছিল ফিলিপ স্লীম্যানের পঞ্চম সন্তান। হেনরির সব ভাইরাই ছিল মিলিটারিতে। তিনজন সেনাবাহিনী আর একজন নৌবাহিনীতে। তাই ছোট্ট হেনরি ছোটবেলাতেই মনে মনে স্থির করে ফেলে সে একদিন সৈনিক হবে। তবে এই উদ্দেশ্যের পেছনে আরো বেশি মদদ যোগায় হেনরির বাবা।

অবসরপ্রাপ্ত মিণিটারি বাপের মুখে বিচিত্র সব জায়গার বর্ণনা শুনে ছোট্ট হেনরির মনের গহীনে জেগে ওঠে মানুষকে দেখবার জানবার আর ঘুরে বেড়াবার এক অদ্ভুত শখ। সদ্য শৈশব থেকে কৈশোরে পা রাখা হেনরি সেই কিশোর বয়সেই ঠিক করে ফেলে সে সৈনিক হবে। আর সে তার সৈনিক জীবন কাটাবে স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে।

তখনকার দিনে যেকোন উচ্চাবিলাসী ইংরেজ তরুণের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইংরেজদের জন্যে ভারতবর্ষ তখন সত্যিই স্বপ্নের দেশ। হেনরি যখন ভারতবর্ষে যাবার পরিকল্পনা আঁটছে মনে-মনে তার কিছুদিন আগেই শীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসন তখন সবেমাত্র স্থায়ি চেহারা নিতে শুরু করেছে। ধন-সম্পদ, সম্মান-খ্যাতি-রোমাঞ্চ- ভারতবর্ষ তখন যেকোন অভিযাত্রির জন্যে স্বর্গরাজ্য। যেকোন অভিযান প্রিয়, উচ্চবিলাসী ইংরেজ যুবক তখন ভারতবর্ষ বলতে অজ্ঞান।

তবে এদের ভেতরে হেনরির ছিল একটু ব্যতিক্রম। কারণ সে অন্য ইংরেজ তরুণদের মতো শুধু অর্থবিত্তের জন্যে ভারতবর্ষে ছুটে যাবার জন্যে আগ্রহী ছিল না বরং বিত্ত-খ্যাতির চাইতে তার ভেতরের অভিযান প্রিয় মন তাকে অধিক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। একারণেই একেবারে সঠিক অর্থে জীবনের লক্ষ্য স্থির করা হেনরি ইল্যান্ডের মাটিতে বসেই শিখে নিচ্ছেলো ভারতবর্ষের ভাষা, সংস্কৃতি ইতিহাস। আর তাই যেদিন সে প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষের ফোর্ট উইলিয়ামে পা রাখে তার গড়-গড় করে বলা স্থানীয় ভাষা শুনে সবাই ভেবেছিল তার জন্ম বুঝি এই ভারতের মাটিতেই। মন্তব্যটা শুনে মনের গহীনে সন্তুষ্টির মুচকি হাসি ফুঁটে উঠেছিল ইংরেজ সন্তান হেনরি স্লীম্যানের।

ভারতবর্ষে এসে বারাসাতে নিজের শিক্ষানবীশ সময় পার করে পনেরো নম্বর ইনফ্যান্ট্রির সৈনিক হিসেবে যোগ দেয় সে। এই ইনফ্যান্ট্রির সৈনিক হিসেবেই ভারতবর্ষকে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ এসে যায় তার হাতের মুঠোয়। এই ইনফ্যান্ট্রির সাথেই সে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে উত্তর আর পূর্ব ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল। পথ চলতে-চলতে সে একটু একটু করে আবিষ্কার করতে থাকে তার পুস্তকে পড়া ভারতবর্ষকে। সেইসাথে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে পুস্তকের সাথে বাস্তবের কতোই না পার্থক্য। কত বৈচিত্র আর কত রঙ মিশে আছে এখানকার মানুষের জীবনের প্রতিটি ভাঁজে-ভাঁজে।

উত্তর আর দক্ষিণ ভারত ঘুরতে ঘুরতে হেনরির স্থানীয় ভাষার ভান্ডারে আরো অনেকগুলো ভাষা যুক্ত হয়ে যায়। হেনরি আর তার ইনফ্যান্ট্রি উত্তর ভারতে ভালোই সময় কাটাচ্ছিল এমন সময় তাদেরকে ব্যারাকপুরে ডেকে পাঠানো হয়।

হেনরির মনটা খারাপ হয়ে যায়। কারণ ভারতের পথে-প্রান্তরে লুকিয়ে থাকা অভিযানের মজা সে দুহাত ভরে গ্রহণ করছিল। তাই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের আরামের বিছানার চেয়ে নেপাল সীমান্তের কর্কশ ঠান্ডা ক্যাম্প তার জন্যে অধিক আনন্দের। তবে ব্যারাকপুরে ফিরে এলেও সময়টা সে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করে ফোর্ট উইলিয়ামের লাইব্রেরিতে। সেইসাথে ভর্তি হয় যায় বাংলা ভাষা শেখার কোর্সে। সাথে আরবি আর ফার্সিও শিখতে থাকে অল্প করে। হেনরি জানতো না এই ফোর্ট উইলিয়ামের লাইব্রেরির একটা বই বদলে দিতে যাচ্ছে তার জীবন। সেইসাথে ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও খানিকটা।

হেনরির ভাষা শেখা ভালোই চলছিল। সময় পেলেই সে লাইব্রেরিতে ভারত বিষয়ক বই পড়ার চেষ্টা করতো। সেদিনও আর দশটা দিনের মতোই লাইব্রেরিতে বই খুলে বসেছিল, এমন সময় একটা জায়গায় চোখ আটকে যায় তার।

এম. থিভেনট নামে ফরাসি এক লেখকের লেখা ভ্রমণ কাহিনীর বই। লেখক সপ্তদশ শতকে এসেছিল ভারতবর্ষে। বইটা তখনকার সময়ে থিভেনটের দেখা ভারতবর্ষের বর্ণনা। বর্ণনার এক পর্যায়ে সে লিখেছে দিল্লী থেকে রাজস্থান যাবার পথে তার গাইড তাকে জানায় এই পথে কারো সাথে না মিশতে, কথা না বলতে। কারণ এই এলাকাতে নাকি ভারতবর্ষের সবচেয়ে দূর্ধর্ষ ডাকাত দলের বসবাস। লেখক প্রথমে একটু অবাক হয়, কারণ ডাকাতদের সাথে মেশার কি আছে। ওরা কি আর এসে কথা বলবে, ওরা করবে ডাকাতি।

তখন তার গাইড নাকি জানায় এরা ভিন্ন ধরণের ডাকাত, এরা ভয়ঙ্কর। এরা প্রথমে এসে মিশবে তারপর নিখুঁত লক্ষ্যে ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে খুন করবে। চোখের নিমিষে সব শেষ। এরা নাকি দল বেঁধে থাকে সবসময়, আর পুরো ভারতবর্ষ জুড়েই নাকি ছড়িয়ে আছে এরা।

থিভেনটের বর্ণনা পড়ে হেনরি একটু অবাক হয়। ব্যাপার কি? এতোদিন যাবৎ ভারতে আছে অথচ সে এরকম কিছু তো শোনেনি। মনে-মনে সে ভাবে এই খুনির দল কি এখনো টিকে আছে। এরা কি এখনো নিজেদের মতোই খুন করে বেড়ায় নিঁখূত লক্ষ্যে মানুষকে ফাঁস পরিয়ে। হেনরির মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা পেয়ে বসে। যেখানেই যায় সে এদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করার চেষ্টা করে। কিন্তু হেনরির যা জানার ছিল, সেটা সে খুঁজে পায় আরেকটা বইয়ে ভাঁজে। তবে সেটা আরো অনেক পরে।

ভারতবর্ষে পদার্পনের পর বেশ অনেক বছর কেটে গেছে। হেনরি তখন নিয়মিত সৈনিক। গোরখপুর, উত্তর দিনাজপুর, মীর্জাপুরে নিয়মিত ডিউটি করছে ইতিমধ্যে তার ইনফ্যান্ট্রি গর্বের সাথে গোর্খা যুদ্ধে অংশ নিয়ে বেশ সুনামও কামিয়েছে। তবে একটার পর একটা ছোট ছোট যুদ্ধে জয়ি হয়ে ইংরেজরা তখন ধীরে ধীরে পুরো ভারতকে নিজেদের পতাকাতলে নিয়ে আসছে। তাই সৈনিকদের কোন ছুটি নেই। নেই কোন স্থিরতা। আজ এখানে তো কাল ওখানে।

হেনরির কাছে এই জীবন ভালোই লাগে। এটাই তো সে চেয়েছিল। এটাই তার স্বপ্নের জীবন। তবে এই অস্থির আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনেও দুটো ব্যাপার তার নিয়মিত সঙ্গি। একটা হলো বই; যেখানই যাক আর যাই করুক, নিয়মিত বই পড়ায় তার কোন বিরতি নেই। আর অন্যটা হলো থিভেনটের লেখা সেই ডাকাত দলের সন্ধান করা। থিভেনটের লেখাটা পড়ার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও একটা দিনের জন্যে ব্যাপারটা হেনরির মন থেকে মোছেনি। যেখানেই যাক যাই করুক ভিড়ের ভেতরে সে ওদেরকে খুঁজে বেড়ায়।

হেনরির ডিউটি তখন এলাহাবাদে। কয়েকদিন হলো তার দল এখানে এসেছে। দলের প্রধানের দায়িত্বে আছে একদিন নিয়মিত মিলিটারি টহলের সময়ে অন্যান্য সব সময়য়ের মতোই হেনরি কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময়ে অভিযাত্রিদের একটা দলের ওপরে আপনমনেই নজর বোলাচ্ছিল এমন সময় তার সহকর্মি দলীয় প্রধান কর্নেল জানতে চায় এতো মনোযোগ দিয়ে সে কি দেখছে। জবাবে একটু লজ্জার হাসি হেসে হেনরি তাকে জানায় সে আসলে কী দেখছে। প্রতিবারের মতো এবারও সে ভেবেছিল আর সবার মতো কর্নেলও তার কথা হেসে উড়িয়ে দিবে কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে কার্নেল আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে জানায় এরকম সেও কোথায় নাকি শুনেছিল।

কর্নেলের জবাব শুনে হেনরির গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। এই প্রথমবারের মতো বইয়ের বাইরে কারো কাছে এই ব্যাপারে কিছু একটা শুনতে পেল সে। সাথে সাথে জানতে চায় কোথায় শুনেছে এদের কথা। জবাবে কর্নেল কিছুক্ষণ চিন্তা করে জানায় এই এলাহাবাদের স্থানীয় কালেক্টরের অফিসে এক ইংরেজ অফিসার আছে, পেশায় কালেক্টর হলেও ভারত নিয়ে গবেষণা করা তার নেশা। সম্ভবত তার কাছেই এরকম কিছু একটা শুনে থাকবে সে। প্রায় সাথে সাথেই কর্নেলের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সেখানে ছুটলো হেনরি।

সময়টা দুপুর। হেনরি যখন সেখানে পৌছালো কালেক্টর সাহেব তখন দুপুরের খাবার নিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন। হেনরিকে নিয়েই বসে গেলেন খেতে। এটা ওটা আলাপ হয় তবে মূল প্রসঙ্গে আর আসতে পারে না সে। অবশেষে যখন সে মূল ব্যাপারটা জানতে চাইলো কালেক্টর সাহেব মৃদু হেসে জানালেন এই ব্যাপারে উনি নিজে কিছু জানেন না তবে সম্ভবত কোথাও পড়েছিলেন। কোথায়? খেতে খেতেই উনি পাশের একটা ছোট কামরার দিকে ইশারা করে জানালেন, কালেক্টরের অফিসে ছোট একটা

লাইব্রেরি আছে ওখানে সে ভারতেও ওপরে নানা ধরণের গবেষণাপত্র সংগ্রহ করেছেন। সম্ভবত ওখানেই কোন একটা বইতে এই ব্যাপারে কিছু একটা পড়েছিলেন। হেনরি পারে তো খাওয়া রেখেই উঠে যায়। তবে বৃটিশ কেতা বলে কথা।

কোনমতে খাওয়া সেরে সে গিয়ে ঢোকে লাইব্রেরিতে। জায়গাটা এলোমেলো কাগজপত্রের স্তুপ। সেই স্তুপের ভেতরে শত-শত কাগজ ঘেঁটে অবশেষে সে খুঁজে বের করতে পারলো সেই মহা মূল্যবান সম্পদ। বই নয় একটা পান্ডুলিপি। সাম্প্রতিক সময়ে একজন ইংরেজ ডাক্তারের লেখা একটা গবেষণাপত্র।

পান্ডুলিপিতে লেখা আছে ডাক্তারের নাম ড. রিচার্ড শেরউড। উনি ফোর্ট সেন্ট জর্জের সার্জন ছিলেন। তার লেখা পান্ডুলিপিটা আসলে গবেষণাপত্রও নয় একটা রিপোর্ট। উনি রিপোর্টে লিখেছেন শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধের সময় উনি সেখানে ডিউটি করছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের পতনের পর ব্যাঙ্গালোরের পথে অন্যান্য কয়েদিদের সাথে একটা বিশেষ ডাকাত দল ধরা পড়ে। সংখ্যায় প্রায় একশর কাছাকাছি এই ডাকাতদের দলটা নাকি অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। স্থানীয় ভাষায় এদেরেকে বেশ কয়েকটি নামে ডাকা হয় তবে সেসব নামের ভেতরে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ‘ফাঁসীগীর’ বা ‘ফাঁসুড়ে’।

এদেরকে এই নামে ডাকার পছেনে মূল কারণ হলো, এরা নাকি গলায় ফাঁস পরিয়ে মানুষ খুন করে। এই পর্যন্ত পড়ে হেনরির মনে হতে লাগলো আনন্দে তার হাত-পা কাঁপছে। গত কয়েকটা বছর ধরে এক ফরাসি লেখকের লেখা পড়ে যে মাতলামিতে সে ভুগছিল সেটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবার পাওয়া গেল। দলটাকে নিয়ে খুব বেশি কিছু লেখা না থাকলেও শেরউডের রিপোর্টে আরো বেশ কয়েকটা এধরণের ছোট ছোট দলের গ্রেপ্তারের খবর লেখা আছে, সেইসাথে ওদের কথা-বার্তার টুকরো টুকরো কিছু অংশও দেয়া আছে। আনন্দে কাঁপতে-কাঁপতেই কালেক্টরের কাছ থেকে হেনরি পান্ডুলিপিটা ধার নিয়ে গেল। মনের ভেতরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেহেতু পেয়েছে কাজেই খুঁজে বের করতে হবে এদেরকে। হেনরি জানতো না সে সুযোগ তার আসবে তবে সেটা করতে তাকে আরো বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এলাহাবাদ থেকে সেই রিপোর্ট উদ্ধারের পর পার হয়ে যায় বেশ কয়েক বছর। ইতিমধ্যে স্লীম্যানের জীবনে বেশ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সৈনিকের পেশা ত্যাগ করে সে গায়ে চড়িয়েছে সিভিল সার্জনের কোট। চেয়েছিলেন ফোর্ট উইলয়াম কলেজে অধ্যপনা করবে কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। ইংরেজ সরকার তার মতো করিৎকর্মা অফিসারকে এতো সহজে ছেড়ে দিতে চায়নি। তাই তার অবসরের আবেদন ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সিভিল সার্জনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে নর্মদা এলাকায়।

প্রাথমিক ভাবে তাকে নর্মদা এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করতে হবে। কোম্পানির এ-ধরণের সিদ্ধান্তে প্রথমে মনে মনে হেনরি আঁতকে উঠেছিল। কারণ ইতেমধ্যেই একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে সৈনিক জীবনের প্রতি তার কেমন যেন এক ধরণের বিরক্তি তৈরী হয়েছে। তার ওপরে যোগ হয়েছে পড়ালেখা করার ইচ্ছে। তাই তার আগ্রহ ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করবে, আর সেইসাথে খুঁজে বেড়াবে ফাঁসীগীরদের। কিন্তু সবকিছু তো আর নিজের মতো চলে না। কখনো কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকার সাথে গতিময় জীবনকে মানিয়ে নিতে হয়।

হেনরিরও তখন সেই অবস্থা। একরকম নাখোশি নিয়েই সে রওনা দিলো নর্মদার দিকে। তবে সে জানতো না যার খোঁজে সে চষে বেড়াচ্ছে পুরো ভারত সেটার সন্ধান সে নর্মদাতেই খুঁজে পাবে।

নর্মদাতে গিয়ে সে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাথে কাজ করে, আর অবসর সময় কাটায় ফাঁসীগীরদের নিয়ে গবেষণা করে। ইতিমধ্যে সে কিছু জিনিস সংগহ করেছে। আবার কিছু ব্যাপারে হতাশও হয়েছে। হতাশার প্রথম কারণ ড. শেরউডের রিপোর্টটা লেখা হয়েছে কয়েকবছর আগে কিন্তু তথ্যগুলো ছিল তারচেয়েও বেশি পুরনো তাই সেগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করে কিছুই বের করা যায়নি। অন্যদিকে ড. শেরউড নিজে অবসর নিয়ে চলে গেছে ইংল্যান্ডে তাই তার কাছ থেকেও কিছু পাবার আশা বাতুলতা। অন্যদিকে সংগ্রহ করা তথ্যগুলোর ভেতরে শক্ত কিছু নেই যা দিয়ে নতুন কিছু বের করা যাবে বা এদের অস্তিতের¡ শক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখাবেই নর্মদায় দুবছর কেটে যায় হেনরির। নিজের কাজের পাশাপাশি ফাঁসুড়েদের নিয়ে গবেষণা করা রীতিমতো তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অবসরে যাবার সময় চলে আসে। এলাকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হবার কথা হেনরিরই কিন্তু তাতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় কয়েকটা ব্যাপার। হেনরিকে তার পূববর্তী কাজের ভালো রেকর্ড দেখে এই এলাকাতে অনেকটা জোর করেই পাঠিয়েছিল কোম্পানি কিন্তু

সেই রেকর্ডের সাথে গত কয়েক বছরের রেকর্ড একেবারেই মেলে না। এর ওপরে তার এই আজব গবেষণা আর অনুসন্ধানের খবর ঠিকই ওপরওয়ালাদের কানে পৌছেছে। তাও তেমন সমস্যা হোত না কিন্তু হঠাৎ করে নিজের অধীনে কিছু কিছু এলাকা থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় বন্ধ রাখায় তার ওপরে নাখোশ হয় কর্তৃপক্ষ। সেইসাথে টোলঘরের কর্মচারিদের সাথে স্থানীয়দের ঝামেলার জবাবদিহি করতে ডাক পড়ে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে।

ফোর্ট উইলিয়ামে বাজে অভিজ্ঞতার পর হেনরি নর্মদায় ফিরে আসে আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। ফোর্ট উইলিয়ামের অভিজ্ঞাতার পর হেনরি একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে; তার স্বজাতিরা ভারতবর্ষ শাসন করতে গিয়ে নিজেদের মূলনীতি থেকে বহুদূর সরে গেছে। তাদের কারোরই এখানকার মানুষ নিয়ে-তাদের উন্নয়ন নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। সবাই যার যার গদি আর নিজের লাভ সামলানোর তালে আছে। নীতিকথা এখানে বাতুলতা মাত্র। কিন্তু হেনরি নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে সরলো না। নিজের কাজ চালিয়ে গেল, সেইসাথে গোপন অনুসন্ধানও। এমন সময় তার হাতে ধরা দিলো এক শক্তিশালী সূত্র।

আর দশটা দিনের মতো নিজের অফিসে বসে কাজের ফাঁকে অলস সময় কাটাচ্ছিল ও। সাধারণত দুপুরের খাবার পরে এই সময়টাতে সে একটু বিশ্রাম নেয়। এমন অলস সময়ে তার চোখ পড়ে জানালা দিয়ে বাইরে। সেখানে নারী-পুরুষের প্রায় একশজনের একটা দল বসে আছে। এই দলটাকে দেখে হেনরির মন আনচান করে ওঠে।

ইতিমধ্যে পড়ালেখা আর টুকরো-টুকরো অনুসন্ধান করে সে যা জানতে পেরেছে তা অনেকটা এরকম; এই ফাঁসীগীরেরা সবসময় দলে থাকে, কখনোই একা থাকে না, এরা সমসময় খুবই সাধারণ পরিচ্ছদে চলাফেলা করে, এরা সবসময়ই বুন্ধুবেশে নিজের শিকারের সাথে মিশে গিয়ে সুযোগ বুঝে শিকার করে। তাই সাধারণ চেহারার এই দলটাকে দেখে হেনরির মনটা আনচান করে উঠলো। সাথে সাথে সে এক আর্দালিক ডেকে জানতে চাইলো এরা কারা?

বুড়ো আর্দালি হেনরির প্রশ্নের জবাবে জানালো এরা একটা অভিযাত্রি দল। ধর্মীয় কারণে বাড়ি থেকে তীর্থ দর্শনে চলেছে। আসলে এখানে কয়েকটা দল আছে; একদল হয়তো তর্থযাত্রি, একদল ব্যবসায়ি, অন্যদল হয়তো ভিন্ন কারণে চলেছে। পথে চলার সুবিধার্থে আর নিরাপত্তার স্বাথে তারা

একসাথে পথ চলছে। এই পর্যন্ত জানিয়ে বুড়ো আর্দালি একটু থামলো। হেনরির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জানালো, সাহেব কী খুঁজছে সে জানে। একটু অবাক হয়ে বুড়ো লোকটার দিকে ফিরে তাকালো ও। মনের ভাব গোপন না করেই বুড়োর কাছে জানতে চাইলো, 'কি জানো তোমরা?'

'হুজুর আপনি ঠগীদেরকে খুঁজছেন,' বুড়োর মুখে তখনো মৃদু হাসি। 'শুধু আমি না, এই তল্লাটে সরকারি আফিসের বেবাকেই জানে।'

'ঠগী' 'ঠগী' বুড়ো আর্দালির মুখে উচ্চারিত শব্দটা যেন হেনরির মাথায় গিয়ে আঘাত করলো। এই শব্দ তো সে এর আগে শোনেনি। এতোদিন যাদের 'ফাঁসুড়ে' কিংবা 'ফাঁসীগীর' নামে জেনে এসেছে এদের প্রকৃত নাম তাহলে ঠগী। অদ্ভুত ব্যাপার! এতোদিন ধরে এদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ এদের নামটাও ঠিকমতো জানতো না সে। তার চোখে ভেসে উঠলো থিভেনট আর ডক্টর রিচার্ড শেরউডের নাম। এমনকি ওরাও জানতো না এই নাম। এই প্রথমবারের মতো হেনরি উপলব্ধি করলো আসলে একই মাটিতে বাস করলেও এখনো ইংরেজ আর ভারতীয়দের ভেতরে কতোটা দূরত্ব রয়ে গেছে।

'ঠগী! ঠগী কারা? কি জানো তুমি ওদের ব্যাপারে?' প্রশ্নটা যেন আনমনেই হেনরির মুখ দিয়ে বেড়িয়ে গেল প্রশ্নটা।

বুড়ো আবারো হেসে উঠলো। যেন সাহেবের কথায় খুব মজা পাচ্ছে সে। 'সায়েব, আমি ক্যান ওগো ব্যাপারে কেউই জানে না। খালি এইডা জানি ওরা ঠগী আর ওরা কালী মা'র সন্তান। তবে সায়েব ওগো ব্যাপারে না জানলেও আপনেরে একটা কতা কইবার চাই,' বলে সে একটু থেমে গেল। মনে হচ্ছে সে একটু দ্বিধা করছে। 'হুজুর, আড়ালে আবডালে সবাই আপনেরে নিয়া মজা করে। আপনেরে সবাই 'ঠগী সিলিম্যান' নামে ডাহে। হুজুর গোস্তাখি নিয়েন না, আপনের ভালা চাই দেইখাই কইলাম,' বলেই সে মাথাটা একবার ঝুঁকিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ স্থানুর মতো বসে রইলো হেনরি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি আর জানা-অজানার এক অদ্ভুত দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে গেছে সে। একদিকে হয়তো সে এই ডাকাতদের আসল নামের সন্ধান পেয়েছে অন্যদিকে তার আগে মনে হয়না অন্য কোন ইংরেজকে, বিশেষ ক'রে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে এ-ধরণের হাসাহাসি করার সাহস কেউ পেয়েছে। কথাটা মনে হতেই ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে। টান দিয়ে নিজের পোশাক

ঠিক করে মাথায় হ্যাট পরে হাতে চাবুক নিয়ে টান-টান হয়ে বেরিয়ে এল নিজের কামরা থেকে। অদ্ভুত এক রাগ আর ক্ষোভ অনুভব করছে নিজের ভেতরে। সেইসাথে সমপরিমাণ জেদ। ঠিক আছে, তার ডাকনাম যদি 'ঠগী-স্লীম্যানই' হয়ে থাকে তবে এই নামের সার্থকতা প্রমাণ করে ছাড়বে সে।

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে অ্যাডজ্যুটেন্টের কামরায় প্রবেশ করলো। পদমর্যাদায় সে অ্যাডজুন্টেটের ওপরে তাই তাকে দেখে উঠে দাড়ালো অ্যাডজ্যুটেন্ট আর কাস্টমস অফিসার। দুজনে মিলে সদ্য দুপুরের খাবার নিয়ে বসেছিল। হেনরি জানতে চাইলো সামনে অফিসের প্রাঙ্গনে যে দলটা বসে আছে ওরা কারা। জবাবে কাস্টমস অফিসার জানালো ওরা একটা তীর্থ যাত্রি দল, সাথে কিছু ব্যবসায়িও আছে। ওরা দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে চলেছে। তাহলে ওদেরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন, জানতে চাইলো সে। জবাবে জানতে পারলো ওদের অনুমতিপত্রে নাকি কী সব ঝামেলা আছে তাই আগের চৌকিতে খবর পাঠানো হয়েছে সেই চৌকি থেকে ছাড়পত্র ঠিকমতো দেয়া হয়েছিল কেন। ওখান থেকে জবাব আসার অপেক্ষায় আছে এখন ওরা। যে-পর্যন্ত ওখান থেকে জবাব না আসছে সে-পর্যন্ত ওদেরকে ছাড়া যাবে না।

হেনরি খানিক চিন্তা করে জবাব দিলো, যদি ছাড়পত্র চলেও আসে তবুও তার অনুমতি না নিয়ে যেন ওদেরকে ছাড়া না হয়। জবাবে দুজনেই একটু অবাক হলো, তবে এই কর্তার কিছু পাগলামো আছে দুজনেই জানতো তাই আর কিছু না বলে নীরবে সম্মতি জানালো উভয়েই।

ওখান থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় প্রবেশ করলো হেনরি। কামড়ার ভেতরে কিছুক্ষণ পায়চারি করে জানালার ধারে এসে দাড়ালো। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আঙ্গিনায় বসে থাকা দলটাকে। পুরষেরা তাদের মালাসামান সামলে সেগুলোর ওপরে বসে তামাক টানছে আর কথায়-কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে একে অপরের ওপরে, মেয়েরা অনেকে বাচ্চা সামলাচ্ছে, গল্প-গুজবে মেতে আছে সবাই। অনেকে আবার বিষন্ন-বিরক্ত মুখে বসে আছে। ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় হেনরি জানে এরা খুবই সাধারণ আর স্বাভাবিক আর-দশটা ভারতীয় অভিযাত্রি দলের মতোই। তবে সে কী খুঁজছেন এদের মাঝে, কী দেখে সন্দেহ হলো এদেরকে, হয়তো নিজেও জানে না। এমন সময় ভিড়ের ভেতরে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে একটু আশাবাদি হয়ে উঠলো সে। আর্দালিকে দিয়ে ডেকে পাঠালো লোকটাকে।

একটু পরেই ভেতরে প্রবেশ করলো সাদা দাড়িওয়ালা ভীষণ শুকনো লম্বা এক লোক। আর্দালি তাকে নিয়ে প্রবেশ করতেই সে এক মুহূর্ত স্লীম্যানকে দেখলো, চিনতে পেরেই মাটিতে প্রায় শুয়ে সালাম করলো। "সালাম, হুজুর, সালাম। আপনি এইখানে!" তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে স্লীম্যানকে দেখে খুবই অবাক।

"ওঠো মতলব ঠাকুর, আমি এখানকার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, তুমি জানতে না?" হেনরির মুখেও ফুঁটে উঠেছে মৃদু হাসি।

"না হুজুর, সেই চুরির ঘটনার পর যে এলাকা ছাইড়েছিলাম এই ক'দিন আগে এলাম," বলে সে একটু থামলো।

"হ্যা, সরকারি আস্তাবল থেকে ঘোড়ার খাবার চুরির দায়ে তিনমাসের জেল দিয়েছিলাম আমি তোমাকে," হেনরি এটুকু বলে হেসে উঠলো।

মতলব ঠাকুর সাথে সাথে আবারো মাথা নিচু করে ফেললো। "হুজুর আপনি দেওতা। সাদা চামড়ার মানুষেরা যেহানে খালি চাবুক মারে, সেইহানে আমি জেলে যাবার পর আপনে আমার বউ বাচ্চাদের থাকা-খাওয়া-কাজের ব্যবস্থা না করে দিলে ওরা মারাই যেত হুজুর। আপনে দেওতা।"

লোকটাকে দেখলো হেনরি। একে কি কাজে লাগানো যায়? সে একবার মতলব ঠাকুরকে দেখলো আরেকবার বাইরে বসে থাকা দলটাকে দেখলো। তার জন্যে আর কোন উপায় নেই। ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে।

"সবই ঠিক আছে মতলব, কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম দুটো কারণে। যাতে তোমার পাপের শাস্তি তোমার পরিবারকে পেতে না হয় আর তুমি ভালো হয়ে যেতে পারো। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম," এই পর্যন্ত বলে সে ইচ্ছে করেই থেমে গেল।

মতলব ঠাকুর পান্ডুর মুখে হেনরির চোখের দিকে তাকালো। "কেন হুজুর?"

"কারণ," খুব শক্ত গলায় বললো হেনরি। "আবারো তুমি খারাপ লোকের সঙ্গে পড়েছো," বলে সে একটু ঝুঁকে এল মতলব ঠাকুরের দিকে। বাইরে বসে থাকা দলটার দিকে ইশারা করে বললো। "আবারো তুমি খারাপ কাজ করছো মতলব, এবার কিন্তু তুমি ফাঁসির দড়ি কিছুতেই এড়াতে পারবে না।

সাথে সাথে চেহারা সাদা হয়ে গেল মতলব ঠাকুরের। দুবার কথা বলার জন্যে মুখ খুললো কিন্তু আওয়াজ বেরুলো না।

“হুজুর, হুজুর ওরা খারাপ লোক আপনি জানলেন কিভাবে?” সে এখনো হতভম্ভ। “এই কথা তো কাক-পক্ষিতেও জানে না,” মতলব ঠাকুর এখনো কিছুতেই যেন ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।

মতলব ঠাকুরের তার কথা শুনে মনে-মনে আশাবাদী হয়ে উঠলো হেনরি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল সে কিন্তু মনে হচ্ছে সেই ঢিল জায়গামতো লাগতে যাচ্ছে। টেবিলের এককোনে শরীরটাকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হেনরি। সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মতলব ঠাকুরের একেবারে মুখের কাছে চলে এল। সরাসরি তাকালো ঠাকুরের চোখের দিকে। সাথে সাথে চমকে উঠলো একটু।

ঠাকুরের চোখে ভয়, অপরিসীম ভয়ের এমন অন্ধকার গহŸর সে জীবনে খুব কমই দেখেছে। এই মুহূর্তে ঠাকুরের চোখ সেরকম একটা অন্ধকার গহŸরের মতো মনে হচ্ছে। কেন জানি ঠাকুরের ভয় সেই চোখ থেকে প্রবাহিত হয়ে তার নিজের ভেতরেও প্রবেশ করলো খানিকটা। শীতের আগমনি বাতাসের ঝটকা হঠাৎ যেভাবে শরীরটাকে কাঁপিয়ে দেয় হেনরির মনের ভেতরটা যেন সেভাবে একটুখানি কেঁপে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ঠাকুরের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলো, “আমি জানি তুমি কাদের সাথে মিসেছো। ওরা খুনি, ওরা ডাকাত,” বলে সে একটু থেমে যোগ করলো, “আর, তুমিও ওদেরই একজন।”

একটু আগে হেনরির মনের ভেতরেটা যেভাবে কেঁপে উঠেছিল ঠিক সেভাবেই ঠাকুরের শরীরটা কেঁপে উঠলো। মুহূর্তের জন্যে হেনরির মনে হলো ঠাকুর জ্ঞান হারাবে। তবে জ্ঞান হারিয়ে না হলেও আক্ষরিক অর্থেই ঠাকুর কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লো। হেনরির দুই পা জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে উঠলো সে।

“হুজুর, অপনি মা বাপ, খুদা গাওয়া আমি ওদের একজন না। ওরা ভয়ঙ্কর। ওরা আমারে মেরে ফেলাইবে হুজুর।”

হেনরির মনের ভেতরেটা একটু মোচড় দিয়ে উঠলো ঠাকুরের অবস্থা দেখে। কিন্তু যে চাল সে দিয়েছে এ-থেকে পেছানোর আর কোন উপায় নেই। পা ছাড়িয়ে নিয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল সে। “ঠাকুর, আমি তোমাকে একবার সুযোগ দিয়েছিলাম কিন্তু এবার আর উপায় নেই। এবার তোমার ফাঁসি হবে।

আর আমি নিজে সেই ফাঁসির নির্দেশে সই করবো। তোমার পরিবার রাস্তায় না খেয়ে মরবে।”

সাথে সাথে যেন বিজলী বয়ে গেল ঠাকুরের শরীরে। সে বসা অবস্থাতেই ঝট করে সোজা হয়ে বললো। “হুজুর, পরিবারের কসম; আমি ওদের কেউই না, তয়ে আমি ওগো খবরি। বিশ্বাস করেন হুজুর টাকার লোভে না নিজের পরিবারকে বাঁচানির লাইগাই আমি এই পথে পা বাড়ায়েছি,” বলে সে কাঁদতে লাগলো।

“পরিবারের জন্যে তুমি যে-পথে পা বাড়িয়েছো, সেই পথই তোমাকে আর তোমার পরিবারকে গিলে খাবে যদি না...” বলে সে ইচ্ছে করেই থেমে গেল।

হেনরি আর কিছু বলার আগেই ঠাকুর বলে উঠলো, “হুজুর আমি আপনাকে সব জানাবো, সব। আপনি যা যা জানতে চাইবেন সব তয়...” দরজায় খট-খট শব্দ শোনা গেল।

বুড়ো আর্দালি জানিয়ে গেল অন্য কাস্টমস চৌকি থেকে অনুমতিপত্র এসে গেছে। হুজুর নির্দেশ করলেই এখন দলটাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হেনরি তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললো। আর্দালি চলে যেতেই হেনরি ফিরে তাকালো ঠাকুরের দিকে। “তুমি আমাকে এক্ষুণি সব জানাবে। না হলে তুমি তো তুমি তোমাদের পুরো দলটাকে আমি কয়েদ করবো।”

“হুজুর, আপনে মা-বাপ আমি আগেই বলেছি। তয় এইটা করিয়েন না। আমি আপনাকে সব জানাবো। তয় এখন না। একটু ধৈর্য ধরেন। আমি নিজে আইসে সব জানিয়ে যাবো আপনেরে। এখন সব কইতে গেলে ফিরিঙ্গীয়া সন্দেহ করবে আমারে। ফিরিঙ্গীয়া আমাগো দলের নেতা। খুব ভয়ঙ্কর লোক। একটু সন্দেহ হইলেই আমারে মাইরা ফেলাইবে। আর এখন ওগোরে ধরলেও কিছু পাইবেন না। কাজেই হুজুর যদি বিশ্বাস রাহেন তয় আমারে দুইটা দিন সময় দেন।”

হেনরি কিছু না বলে তাকিয়ে রইলো, মনের ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে-কূলকিনারাবিহীন কাজ সে হাতে নিয়েছে না চাইতেই তার একটা কূল দেখা দিয়েছে। তবে সে আসলেই ঝুঝতে পারছে না এই লোকটার ওপরে ভরসা রাখবে কিনা। কারণ যে-ভয় এই লোকের চেখে দেখেছে তাতে...প্রায় কিছু না ভেবেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। খেলাটা সে খেলবে।

“ঠাকুর, আমি তোমাকে দুদিন সময় দিলাম। মনে রেখ, ঠিক দুই দিন। এর মধ্যে তুমি আমার সাথে দেখা করে সব জানাবে। না হলে মনে রেখ তোমার পরিবার কোথায় থাকে আমি জানি। আর এই নর্মদা এলাকায় গাছের পাতাও আমার নির্দেশে নড়া-চড়া করে। কাজেই তুমি যাও,” বলে ইশারা করতেই ঠাকুর এসে একবার তার পা ছুঁয়ে একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল।

আর্দালিকে ডেকে বললো দলটাকে ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দিতে। হেনরির বুকের ভেতরে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কাজটা কি ঠিক হলো। তবে বৃহত্তর স্বার্থে এইটুক ঝুঁিক নিতেই হোত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেনরি দেখতে পেল ঠাকুর বাইরে যেতেই দলের পুরুষেরা তাকে ছেঁকে ধরলো। কথা শেষ করে তারা যে যার যার মতো বোচকা-বুচকি কাঁধে তুলে রওনা দিলো বাইরের দিকে। তবে একটু অবাক হয়ে দেখলো দলের পুরুষদের ভেতরে একজন তাকিয়ে আছে ঠিক তারই দিকে।

লোকটার পরনে ধূতি, গায়ের ফতুয়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে সুঠাম পেশীবহুল শরীর। মুখের পাকানো গোঁফে আভিজাত্যের ছোঁয়া। হেনরি তখনো জানে না সেই অলস দুপরে সরকারি দপ্তরের সেই আঙ্গিনাতে ভিন্ন জগতের দুই পুরুষের ভেতরে কতো বড় শত্রুতার বীজ রচিত হলো। হেনরির পক্ষে তখন জানা সম্ভব ছিল না এই শত্রুতার বীজ তাদের দুজনকেই দাপিয়ে বেড়াবে বাঙ্গাল মুল্লুক পর্যন্ত- বদলে দেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছোট্ট একটু অংশ।

দলটা ধীরে-ধীরে চলে গেল। হেনরি একবার ভাবলো নিজের লোকদের কাউকে পাঠিয়ে দেয়, ওদের ওপরে নজর রাখার জন্যে তবে সেটা খুব বুদ্ধিমানের মতো হবে না ভেবে ক্ষান্ত দিলো। এখন মতলব ঠাকুরই তার ভরসা।

তবে সময়ের সাথে সাথে ঠাকুরের ওপরে ভরসা কমতে লাগলো তার। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিনদিন পার হয়ে যাবার পরও যখন ঠাকুরের কাছ থেকে কোন খবর এল না তখন আবারো চিন্তিত হয়ে উঠলো হেনরি। ব্যাপার কি, ঠাকুর কি আসলেই পালালো ওদের সাথে।

কিন্তু ঠাকুর পালায়নি। সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে হেনরি ঘুমাতে গেল বেশ অনিশ্চয়তা নিয়ে। মনে-মনে একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে সকালে উঠেই সে ঠাকুরের বাড়িতে হানা দিবে ফৌজ নিয়ে। বিছানায় এদিক-সেদিক করতে-করতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় বাংলোর বাইরে চিল্লাচিল্লি শুনে সে বেরিয়ে এল। তার পাহারাদারেরা মুখ ঢাকা এক লোককে ধরে রেখেছে। “কি ব্যাপার?” শোবার পোশাক পরা এক হাতে হেরিকেন ধরা হেনরি চেঁচিয়ে জানতে চাইলো।

“কই চোরা হোগা ছায়েব। হামাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলোয় ঢুকতে চাইছিল। হামনে পাকার লিয়া,” বলে একটানে পাহারাদার লোকটার মুখের কাপড় সরিয়ে দিতেই হেনরি অবাক হয়ে খেয়াল করলো লোকটা আর কেউ না মতলব ঠাকুর।

“হুজুর আমি আমি, ঠাকুর,” চিঁ চিঁ করে চেঁচিয়ে উঠলো ঠাকুর।

“ওকে ভেতরে আসতে দাও,” বলে হেনরি বাংলোর ভেতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হতেই ঠাকুর দৌড়ে এসে ওর একটা হাত ধরে ফেললো। “হুজুর,

মেরা মানিয়ে। দয়া করে বাংলোর বাত্তি নিবিয়ে দেবেন। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।”

ঠাকুরের এই বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হলেও কি মনে করে পাহারাদারকে ইশারা করলো চুপ থাকতে আর অতিরিক্ত বাতি নিভিয়ে ফেলতে।

ভেতরে ঢুকতেই ঠাকুর পানি চাইলো। কাজের লোক পানি নিয়ে আসতেই ঢক-ঢক করে সেটা পান করলো ঠাকুর।

তাকে একটু স্থির হতে ইশারা করে জানতে চাইলো, “কি ব্যাপার, ঠাকুর? হয়েছে কি? এমন পাগলামো করছো কেন? আর বাইরের বাতি নিভিয়ে দিতে বললে কেন?”

“হুজুর, আপনি ঠিকই অনুমান কইরেছেন,” ঠাকুর এখনো পুরোপুরি স্থির হতে পারেনি। “ওইদিনের দলটা আসলেই ঠগীদের একটা দল আছিল। ওরা বেবাকতে মা ভবানীর সাধক। ওই দলের বেশিরভাগই ছিল ঠগী। ”

ঠাকুরের কথা শুনে তার দিকে স্থির তাকিয়ে রইলো হেনরি। বুকের ভেতরে স্বস্তির পরশ। এতোদিন ধরে সে ¯ফে নিজের বিচার বুদ্ধির ওপরে আস্থা করে ছায়ার পেছনে ছুটে চলছিল এবার মনে হয় শক্তিশালী কিছু একটা পাওয়া যাবে।

“সেটা তো আমি তোমাকে সেদিনই বলেছিলাম। আর তুমিও আসলে ওদেরই একজন। তুমিও ভবানীর সাধক। তুমিও ঠগী তাই না?” হেনরি নিজেকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। সেও পাত্র থেকে খানিকটা পানি পান করে নিলো।

“না হুজুর, আমি যদি সত্যিই ঠগী হইতাম ভবানীর পূজক হইতাম তয় আমি এহন যা বলতাছি সেইটা জীবনেও আপনার সামনে উচ্চারণ করতাম না। আমি ¯ফে ওগো একজন খবরি মাত্র। আমার কাজই হইলো ওদেরকে খবর সংগ্রহ কইরে দেয়া। তাও পেটের দায়ে আমি ওদের খবরি হইতে বাধ্য হইয়েছি।”

“মানে তুমি নিজে সরাসরি ওদের দলের লোক নও?”

“না, হুজুর। কবে কোথায় কোন ব্যবসায়ি টাকা নিয়ে পথে নামবে। কার কাছে কত মূল্যবান গহনা আছে এসব খবর বের করাই আমাদের মতো

খবরিদের কাজ," ঠাকুরের কথা শুনে হেনরি একটু অবাক হলো। আচ্ছা একারণেই তাহলে এরা এতোটা শক্ত দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সে যা ভেবেছিল এরা আসলে তা নয়। কিন্তু হেনরি জানতো না সে ঁফে ওদের ওপরের তল দেখতে পেয়েছে। এরপরে সে যা জানবে সেটা এর থেকে আরো অনেক অনেক বেশি গভীর আর ভয়ঙ্কর।

"আমাকে এদের ব্যাপারে বলো, একেবারে বিস্তারিত বলতে হবে ঠাকুর। আমি এদের ব্যাপারে সব জানতে চাই," হেনরি এবার আশাবাদি। ঠাকুর যেহেতু নিজ থেকেই ফিরে এসেছে কাজেই এবার কাজের কাজ কিছু হতে পারে।

"কি বলেন হুজুর। আপনি এদের ব্যাপারে জানেন না!" ঠাকুরকে মনে হলো সে খুবই অবাক হয়েছে হেনরির কথা শুনে। "আমি তো ভাবছিলাম আপনে সবই জানেন। হের লাইগ্গাই তো..." ঠাকুরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে সে।

"আমি জানি ওরা ডাকাতি করে বেড়ায়..." হেনরি বলার আগেই ঠাকুর তাকে থামিয়ে দিলো।

"হুজুর কন কি! খালি ডাকাইতি, খালি ডাকাইতি করলে তো ভালাই আছিল," বলে সে একটু থামলো। আরেকটু পানি খেয়ে নিয়ে বললো, "হেরা ডাকাইতের চাইতেও বেশি কিছু।"

"ওরা কি সেটাই তো জানতে চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে," বলে সে একটা হাত রাখলো মাটিতে বসে থাকা ঠাকুরের কাঁধে। "দেখ ঠাকুর, আমি যা করতে চাচ্ছি সেটা তোমাদের ভালোর জন্যেই করতে চাচ্ছি। আর আমি যা করতে চাচ্ছি সেটা করতে হলে তোমার মতো স্থানীয় মানুষের সাহায্য লাগবে। যদি সেটা না করো তবে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। এখন বলো কি কি জানো তুমি।"

"হুজুর, আমি আপনাকে আগেও কইয়েছি আমি ওদের লোক না। ওরা নিজেগোর বাইরে কাউরেই কিছুই কয় না। আর ওগো ব্যাপারে সব জানতে পাইরবেন। তয় আইজ রাইতে ওগোরে নাঙ্গা হাতে পাকরানোর বিরাট সুযোগ আছে।"

"তাই নাকি?" হেনরি আবারো পানি খাবার জন্যে গ্লাস তুলে নিয়েছিল সেটা মুখের সামনেই থেমে গেল।

“হ, হুজুর আপনে ফৌজ খবর দেন। নাইলে দেরি অই যাইতে পারে।”

“আগে আমাকে শুনতে হবে হয়েছে কি? না শুনে আমি ফৌজে খবর দিতে পারবো না,” হেনরির গলা একটু শুকনো শোনালো। ও আসলে বুঝতে চাইছে ঠাকুর কি বলছে। না বুঝে ফৌজে খবর দিলে পরে বোকা বনতে হবে। এরকম বোকা বনার অভিজ্ঞতা তার একেবারে কম না।

ঠাকুর একটু ভাবলো। “ঠিক আছে। হুজুর আগে শোনেন, হইছে কি। ওইদিন আপনে ছাইড়া দেওনের পরে আমি বাইরে যাইতেই হেরা আমারে সব ঘিইরা ধরে। আমারে ক্যান ডাকছিলেন, কি জিগাইছেন সব সব শুনে। বিশেষ কইরা ফিরিঙ্গিয়া। হেয় আমারে এক ঘন্টা ধইরা এইটা-ওইটা জিগাইছে,” বলে একটু থামলো সে। তার চোখে মুখে আবারো সেই ভয় খেলা করছে। সেইদিনের দেখা সেই ভয়। “হুজুর, আপনেরে কই, ওগো দলের নেতা ফিরিঙ্গিয়া- যারে আমি ফিরিঙ্গী ডাকি। হুজুর, ও বড় ভয়ঙ্কর। কতায় কতায় এরে ওরে মাইরা উঠলোায়। যদি বুঝে দলের ক্ষতির কারণ অইতে পারে তাইলে নিজের ভাইরেও মারতে সময় লাগে না ওর। আমার সামনেই একদিন তুপানির গুড় খাওনের সময় একজনরে মাইরা উঠলোইছে সন্দে অওয়াতে।”

“তুপানির গুড়, আবার কি?” হেনরি মাঝখানে জানতে চাইলো।

“হুজুর বলতাছি। তো ফিরিঙ্গিয়ারে ওর দলের লোকজনই বাগের মতো ডরায় আর আমি তো কুন ছাড়। তো হেয় যখন আমারে জেরা করলো আমি তো ভয়ে শেষ তাই আমি সব হাছা কতা কইয়া দিছি,” বলে ঠাকুর একটু হেসে উঠলো।

“মানে কি? তুমি বলে দিয়েছো যে আমি ওদের পিছু নিয়ে বেড়াচ্ছি?” হেনরি হাতে পাইপ ছিল সেটা আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলো।

“হুজুর, পাগল নাকি! ওরে এইডা বললে আমার লাশ পইড়া যাইতো তহনি। আমি বলছি আমি আপনেরে চিনি। আপনে আমার পরিবাররে থাকতে-খাইতে দিছিলেন। তাই আমারে ডাকছিলেন কতা বলার জন্যে। ফিরিঙ্গীয়া হুনলো আমার কথা। তারপর আমারে যাইতে বললো। তয় ও অইলো শাদুর্লের মতোন চালাক। আমারে কিছু না কইলেও আমি বুঝতে পারলাম আমার উপরে গোপনে নজর রাখতাছে। দুইদিন পার অইলো আমি কিছুই করতেও পারলাম না। আপনের লগে দেহাও করতে পারলাম না। তয় সুযোগ ঠিকই আইলো। আইজ রাইতে হেরা একটা ডাকাতির পরিকল্পনা

করতাছিল আমি কাইল সইন্ধা থাইক্কা বুজতেছিলাম। কাইল সইন্ধাবেলা হেরা জোড়া-দেবীর পূজা দিছে। এই পূজা হেরা তহনি দেয় যখন মা ভবানির কাছ থাইক্কা হেগো বিশেষ সাহাইয্য দরকার অয়। পূজার পরেই হেরা বলাবলি করতাছিল মা ভবানীর নির্দেশ নাকি চইল্লা আসছে। আমিও তক্কে-তক্কে রইলাম। কুন জায়গায় ডাকাতি দিবো হেইডা শুইন্না আমি মটকা মাইরা পইরা রইলাম। হেরা বাইর ওয়ুনের এট্টু পরেই আমি জোড়া-দেবীর ঘরে ঢুকার চেষ্টা করি কিন্তু দেহি হেইডা আটকানি," বলে ঠাকুর একটু থামলো।

হেনরির মনের ভেতরে অনেক প্রশ্ন কিন্তু জানতে চাইলো না। কারণ এখন লোকটাকে থামিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে সে খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই আগে শুনে নিক পরে প্রশ্ন করবে।

"তো হেইহানে ঢুকতে তো পারলাম না কিন্তু বাড়ি খুইজ্জা আরেকটা মূল্যবান জিনিস পাইয়া গেলাম," বলে সে একটু থেমে নিজের পোশাকের বুকের কাছ থেকে একটা চামড়ায় মোড়ানো বটুয়ার মতো বের করে আনলো। ওটা হেনরির হাতে তুলে দিয়ে বললো, "হুজুর, আপনে যা যা জানতে চাইতেছিলেন সব এইহানে আছে। এইডা ঠগীগো ইতিহাস। হেরা ক্যামনে কি করে। ক্যামনে মা ভবানীর পূজা করে। কেমনে ছোট বাচ্চাগো ঠগী বানায়। কি করে ক্যামনে থাকে সব এইখানে আছে। এইরকম ছোট-ছোট বটুয়ার মতো ওরা বানায়া রাহে ওগো ভবিষ্যত প্রজন্ম যারা নতুন ঠগী অয় ওগোরে নিজেগোর ইতিহাস জানানোর জইন্যে।"

ঠাকুর এই পর্যন্ত বলতেই হেনরি বটুয়াটা টেনে নিলো নিজের দিকে। চামজার ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে এল হলদে রঙের কাগজের একটা বান্ডিলের মতো। বিজাতীয় এক ভাষায় লেখা হরফগুলো। সেগুলো বুঝতে না পারলেও ছবিগুলো দেখে চমকে উঠলো হেনরি। অক্ষরের ফাঁকে-ফাঁকে হাতে আঁকা ছবি। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একদল লোক গোল হয়ে বসে পূজো করছে। তাদের সামনে রাখা দুটো ভয়ঙ্কর দর্শন দেবী মুর্তি। আরেকটা ছবিতে একজন মানুষকে ধরে আছে দুজনে অন্য একজন তার ওপরে চড়ে বসে গলায় ফাঁস পরাচ্ছে।

"সর্বনাশ, এটা তো সোনার খনির চেয়েও দামি। এরপর কি হলো?"

"হুজুর এইডা পাওনের পরে আমি আর কিছু দেহি নাই দিগবিগিক ছাড়ায়া দৌড় দিছি। একেবারে থামছি আপনের বাংলোর বাইরে আইসা," সে যেন

আবারো হাঁপাতে শুরু করবে। “হুজুর ওরা এহন কই আছে আমি জানি। অনেক দেরি হইয়া গেছে কিন্তু এহনো আপনে চাইলে ফৌজ নিয়া গেলে ওগোরে নাঙ্গা হাতে মালামাল সমেত ধরতে পারবেন।”

হেনরি অনুভব করলো ঠাকুরের শেষ কথাটা শুনে তার সর্বশরীরে একধরণের শিহরণ বয়ে গেল। এক মতলব ঠাকুরের কাছ থেকে সে এতোটা আশা করেনি। একদিকে ওদের ব্যাপারে সব জানার মতো জিনিস তার হাতে চলে এসেছে, অন্যদিকে এইরম একটা দলকে হাতে নাতে ধরার সুযোগও এসেছে।

“হুজুর হুজুর, শুনেন হেরা আইজ কই ডাকাতি করবে,” বলে সে বর্ণনা করে জানিয়ে দিলো কোথায় পাওয়া যাবে ওদেরকে। জায়গাটা হেনরি খুব ভালোভাবেই চেনে। এখান থেকে মাইল তিনেক উত্তরের দিকে হবে। সে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে আর্দালিকে ডেকে পাঠিয়ে এক্ষুণি সৈনিকদেরকে ডেকে তুলতে বললো। তার আগে একজনকে পাঠাতে বললো অ্যাডজ্যুটেন্টের অফিসে। নিজে দৌড়ে এসে ঢুকলো শোবার ঘরে। পোশাক ছেড়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত পরে নিলো ইউনিফর্ম। বেল্ট আটকাটে-আটকাতে ঠাকুরের দেয়া বটুয়াটা তুলে নিয়ে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়েও কী মনে করে সেটা ঢুকিয়ে রাখলো ইউনিফর্মের বুক পকেটে। বাইরের কক্ষে এসে দেখলো ঠাকুর এখনো সেখানেই থম মেরে বসে আছে।

ঠাকুরকে দেখে প্রথমেই যে-কথাটা মনে এল সেটাই বললো হেনরি, “ঠাকুর, তোমার পরিবার কোথায়?”

“হুজুর, ওরা তো খন্ডেলপুরে চইলা গেছে। আমার বউয়ের বাপরে বাড়ি ওইখানে,” ঠকুরের জবাব শুনে হেনরি মনে মনে হিসেব করে দেখলো জায়গাটা এখান থেকে বেশ দূরে। আর মনে হয় ওখানে তার পরিবার নিরাপদেই থাকবে।

“ঠাকুর, এই মুহূর্তে আমি তোমার পরিবারের চেয়ে বেশি চিন্তা করছি তোমাকে নিয়ে। আমার মনে হয় তোমার আমাদের সাথে না যাওয়াই ভালো। তার চেয়ে তুমি এখানেই থাক। সেটাই তোমার জন্যে নিরাপদ হবে,” বলে হেনরি একটা হাত রাখলো ঠাকুরের কাঁধে। “তুমি আমাকে যে-সাহায্য করলে এর প্রতিদান আমি দিতে পারবো না ঠাকুর।”

“হুজুর আপনে কি যে বলেন, আমি তো কিছুই করি না। এহন জলদি যান নাইলে হেরা পলাইতে পারে।”

ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুরোদুস্তর প্রস্তুত হেনরি বাইরে এসে দেখলো ওর অধীনে থাকা সৈন্যরা একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে আছে। সংখ্যায় গুনে দেখলো মোটে বারো জন। এই সৈন্য নিয়ে ওদেরকে ধরা সম্ভব নয়। কেউ একজন হেনরির হাতে ওর পিস্তল আর বন্দুক ধরিয়ে দিলো। পিস্তলটা কোমরে নিয়ে বন্দুকটাকে পিঠে গলিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলো। এখন আর অন্য কাউকে পাঠানোর সময় নেই। নিজেকেই যেতে হবে কর্নেলের বাড়িতে। নিজের গুটিকয় সৈন্য নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল কর্নেলের বাংলোয়। তার অধীনে ছোটখাট একটা প্লাটুন আছে। যেকোন সময় জরুরি প্রয়োজনে ওদরেকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাংলোর সামনে এসে দেখলো বারান্দায় বাতি জ্বলছে আর সেখানে ওর পাঠানো আর্দালির সাথে তর্ক করছে শোবার পোশাক পরা কর্নেল। ঘোড়া থেকে নেমে দৌড় এসে বাংলোর দরজায় উঠলো সে। ওকে দেখতে পেয়ে রাগান্বিত কর্নেল চিৎকার করে বলে উঠলো, “হেনরি, এসব কি হচ্ছে? তোমার আর্দালি মাঝরাতে এসে আমাকে বলছে তুমি নাকি সৈন্য পাঠাতে বলছো। তুমি জানো না এভাবে হুটহাট করে চাইলেই সৈন্যদেরকে কাজে লাগানো যায় না। তাদের একটা নিয়মিত ড্রিল আছে। ওরা সরাদিন কাজ করে এখন ঘুমাচ্ছে। শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া...”

“স্যার, এটা জরুরি অবস্থা, খুবই জরুরি অবস্থা। আমি এতোদিন ধরে যাদের পিছু নিচ্ছি তাদের একটা দলকে হাতে-নাতে ধরার সুযোগ এসেছে,” মরিয়া হেনরি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে উঠলো।

এক মুহূর্তের জন্যে থমকে রইলো কর্নেল। “ওহ, হেনরি তুমি আর তোমার পাগলামো। তুমি তোমার কল্পনা নিয়ে থাকতে পারো, আমি পারি না।”

“প্লিজ, কর্নেল। একটাবার আমার কথা বিশ্বাস করে দেখুন। এইবার আমাকে সাহায্য করুন প্লিজ। আজ যদি আমি কিছু প্রমাণ করতে না পারি, ডাকাতদের ধরতে না পারি, তবে এর দ্বায়ভার আমার নিজের। সেইসাথে আমার সৈন্যদের কোন ক্ষতি হলেও।”

“দেখ হেনরি...” কর্নেল কথা শেষ করার আগেই হেনরি আবারো বরে উঠলো। “স্যার, প্লিজ।”

কর্নেল একটু চুপ থেকে আর্দালি ডেকে সৈন্যদেরকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিলো। আরো প্রায় আধা ঘন্টা পর পঞ্চাশজনের মতো ক্লান্ত-বিরক্ত-অর্ধজাগন্ত সৈন্যদেরকে নিয়ে জোড় পুকুরের দিকে চললো হেনরি।

ঠাকুরের কথামতো ওখানেই আজ অভিযান চালানোর কথা ঠগীদের। জোড় পুকুর এলাকাটা হলো পাশাপাশি বিরাট দুটো দিঘীর সমন্বয়ে একটা ফাঁকা মাঠের মতো জায়গা। ভোপাল আর নর্মদাকে সংযোগকারী মূল রাস্তা থেকে বেশ কাছেই সুন্দর আর ফাঁকা হওয়ায় জায়গাটা দূরের অভিযাত্রিদের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বেশ প্রিয় জায়গা এটা।

জায়গাটার কাছাকাছি এসে সৈন্যদেরকে থামতে ইশারা করলো হেনরি। আশেপাশে কোন বাতি বা আগুন চোখে পড়ছে না। এখনে ক্যাম্প বা তাঁবু থাকলে দূর থেকেই বাতি চোখে পড়ার কথা। সে নিজের সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ হবার নির্দেশ দিয়ে পুরো জায়গাটাকে দুইদিক থেকে কভার করে এগোনোর নির্দেশ দিলো। সব সৈন্যরা প্রায় নিঃশব্দে নিজেদের হাতিয়ার বের করে দুইভাগে ভাগ হয়ে পুরো এলাকাটাকে যতোটা সম্ভব বেস্টন করে সামনে এগোল। একদিক থেকে হেনরি অন্যদিক থেকে বাকিরা। পুরো জায়গাটাকে ঘিরে দুইদিক থেকে সাবধানে এগোতে-এগোতে আবারে দুই দল মুখোমুখি হয়ে গেল।

“হুজুর কাউকেই তো পেলাম না,” অপর পক্ষের সৈন্যদের প্রধান জানালো।

একহাতে পিস্তল নিয়ে অন্যহাতে ঘোড়া সামলে দ্রুত কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে হেনরি কিন্তু তার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। ব্যাপার কি, এরকম তো হবার কথা নয়। ডাকাতরা কি তবে চলে গেল নিজেদের কাজ সেরে। কিন্তু এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না। এখানে আজ কেউ আসেইনি মনে হচ্ছে।

“হুজুর?” সৈন্যদের প্রধান আবার চিৎকার করে উঠলো।

“ভালোভাবে দেখেছো?”

“জি, হুজুর,” আজ এখানে এই এলাকাতে কেউ আসেইনি। আমি নিশ্চিত,” সৈন্যদের প্রধান জবাব দিলো।

“তবুও আরেকবার পুরো এলাকা পরীক্ষা করে দেখ,” বলে ও একটু ভেবে জবাব দিলো। “আমি কয়েকজনকে নিয়ে এখানেই দাঁড়াচ্ছি তোমরা ঘোড়া নিয়ে একটা চক্কর দিয়ে এসো। হেনরি ওখানেই দাড়িয়ে রইলো। আধাঘন্টার ভেতরেই সৈন্যদের প্রধান ফিরে এল তার বাহিনী নিয়ে। মানুষ তো দূরে থাক একটা শেয়াল পর্যন্ত দেখতে পায়নি কেউ।

“কই আ রাহা হ্যায়,” সৈন্যদের দলের পেছন থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো। সাথে সাথে প্রায় সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা চট করে বের করে আনরো হেনরি। ওর দেখাদেখি আরো কয়েকজন বের করে আনলো নিজেদের অস্ত্র।

“থামো থামো,” চিৎকারটা নিজেদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে করেছে হেনরি। কারণ এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটা আর কেউ না কর্নেলের বাংলোর আর্দালি। “হুজুর, আমাকে কর্নেলসাহেব পাঠিয়েছেন, আপনার বাংলোয় আগুন দেখা যাচ্ছে।”

“কি?” চমকে উঠলো হেনরি।

“জি, হুজুর আমাদের ওখান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে কর্নেল সাহেব আমাকে পাঠালেন আপনাদের কাছে খবর পাঠাতে।”

হঠাৎ একটা অসুস্থ চিন্তা চিড়-বিড় করে উঠলো হেনরির মাথায়। এরকমটা ঘটতে পারে সে ভাবতেও পারেনি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আসলে সে ওদের পিছু ধাওয়া করছিল না বরং ওরাই তাকে নিয়ে খেলছিল। ঘোড়া ঘুড়িয়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত ঘোড়া ছোটালো হেনরি আর তার দল। এক ঘন্টারও বেশি পথের দূরত্ব পার হয়ে এল আধাঘন্টারও কম সময়ে। নিজের বাংলো, অ্যাডজ্যুটেন্টের অফিস, কাস্টমস চৌকিসহ পুরো জায়গাটা ঘিরে আগুনের নৃত্য দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা। আরো জোরে ঘোড়া ছোটালো হেনরি। আঙ্গিনার কাছে এসে দেখলো দুচারজন স্থানীয় প্রতিবেশি এদিক-সেকিদ দৌড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। ঘোড়া থেকে নামতেই ওর চোখ আটকে গেল পুড়ন্ত বাংলোর দেউরিতে।

বিভৎস দৃশ্যটা দেখে আরেকটু হলে বমিই করে ফেলতো ও। দেউরির চৌকাঠ থেকে কড়িকাঠের সাথে ঝুলছে একজন মানুষের দেহ। গলায় তীব্র টানে মুখ দিয়ে তার জিভ বেরিয়ে এসেছে আধ-হাত, টক-টকে লাল চোখের বল জোড়া মনে হচ্ছে টুপ-টুপ করে যেকোন সময় কোঠর থেকে ঝড়ে পড়বে। তবে এর চেয়ে বিভৎস ব্যাপার; লোকটাকে ঁফে ঝুলিয়েই ক্ষান্ত হয়নি খুনিরা, তার পেট কেটে দিয়েছে। যার ফলে তার নাড়িভুরি সব কাটা পেট থেকে বেরিয়ে কিছু নিচে পড়ে আছে কিছু ঝুলছে কাটা তলপেট থেকে। যে মানুষটাকে একটু আগেও মতলব ঠাকুর নামে চিনতো পৃথিবীর

মানুষ তাকে দেখে কোনভাবেই আর পরিপূর্ণ মানুষ বলার উপায় নেই। অপার্থিব একটা জীব মনে হচ্ছে।

নিজেকে সামলে ধীরে-ধীরে বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো হেনরি। তার সৈনিকেরা ছুটোছুটি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। চিৎকার চেঁচামেচি করছে। এসবের কিছুই কানে ঢুকছে না হেনরির। ঠাকুরকে সে নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রæতি দিয়েছিল। একমাত্র তার কারণে এরকম বিভৎস মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে মানুষটাকে।

মতলব ঠাকুরের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো কান্নায় ভেঙে পড়লো উইলিয়াম হেনরি স্লীম্যান।

অধ্যায় ত্রিশ

বর্তমান সময়

বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিংহ

“আচ্ছা, এই ঠগীদের উৎপত্তি কোথা থেকে?” রিফাত হেনরি স্লীম্যানের ঘটনা বর্ণনা করছে এমন সময় বাশার জানতে চাইলো।

“এদের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মিথই প্রচলিত আছে। তবে ঠগীদের অস্তিত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে পুরনো যে মিথগুলো প্রচলিত আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা হলো এরা নাকি পারস্যের রাজা জেরেক্সিসের সেনাবাহিনীর একটা অংশ ছিল।”

“জেরেক্সিসকে চিনতে পেরেছো তো?” রিফাতের কথার মাঝখানে জয়া বলে উঠলো। “সেই যে স্পার্টার রাজা লিওনাইডাসের তিনশ সৈন্যের সাথে যার বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই জেরেক্সিস। এই অংশটা আমি জানি,” বলে সে রিফাতের দিকে তাকালো বলার অনুমতির জন্যে। রিফাত মাথা নাড়তেই সে শুরু করলো। “আমি যতোদূর জানি, সেটা ভুল হলে তুমি ঠিক করে দিও প্লিজ। জেরেক্সিসের সেনাবাহিনীর একটা অংশ নাকি এশিয়ান বংশদ্ভূত ছিল। এই বাহিনীর আবার একটা অংশ নাকি ছিল যাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল চামড়ার ফালি। ওরা নাকি চামড়ার ফালি গলায় পরিয়ে মানুষ খুন করতো।”

“হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছো। জেরেক্সিসের বাহিনীর এই অংশটা আদৌ ঠগীদেরই পূর্বপুরুষ ছিল কিনা সেটা সঠিকভাবে বলা কিংবা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে ওদের সাথে ঠগীদের অনেক মিল আছে। প্রচলিত আছে পারস্য যুদ্ধ শেষ হবার পর নাকি এই চামড়া বাহিনীর একটা অংশ পায়ে হেঁটে ভারতে চলে আসে। হয়তো ওরাই এই ভারত উপমহাদেশে ঠগী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করে। তবে এদের অরিজিনের ইতিহাস যাই হোক না কেন এরা যে অনেক প্রাচীন সেই ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ ভারতের ইলোরাতে অনেক প্রাচীন গুহাতে ওদেরকে নিয়ে অনেক দেয়ালচিত্র আছে। অনেক মুর্তি আছে। তবে এইসব দেয়াল চিত্রগুলোতে দেখা যায় রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ঠগী বাহিনী। কেউ

শিকারের গলায় রুমাল পারাচ্ছে। কেউ শিকারকে খুন করার পর পেট কেটে নাড়িভুড়ি বের করছে। কেউ আবার ভবানীর পূজো করছে। কিছু-কিছু ছবিতে দেখা যায় দেবী তার সন্তানদেরকে আশীর্বাদ করছে। এই আরকি।"

"আচ্ছা সব বুঝলাম, ঠগী কারা, কোথা থেকে এসেছে এসবও বুঝলাম," ঠগী যারাই হোক আর তাদের ইতিহাস যাই হোক সেই ব্যাপারে বাশারের তেমন আগ্রহ নেই। সে বরং বর্তমান নিয়ে বেশি আগ্রহী। "তো এর সাথে বিজয় আচার্যের সংযোগটা হলো কিভাবে?" বাশার প্রশ্ন করলো।

"সেই সিন্দুকের জিসিনপত্র ক্লেইম করে তো সে পেল না কিন্তু ওগুলো নিয়ে গবেষণা করা সুযোগ পেল। সেই জিনিসগুলোর ভেতরে এক ইংরেজ অফিসারের ডায়েরি ছিল। ডায়েরিটার অর্ধেকের বেশি পোকায় কেটে নষ্ট হয়ে গেছিল কিন্ত প্রথম যে-অংশটুকু ঠিক ছিল সেটুকু পড়ে বিজয় জানতে পারে তার পূর্বপুরুষদের একটা অংশ ঠগী ছিল। সেখান থেকে সে ঠগীদের নিয়ে গবেষণা শুরু করে। আগেই তো বলেছি ঠগীরা ছিল কালী সাধক। বিজয় নিজেও কালী সাধনা শুরু করে। এ থেকে সে জানতে পারে ঠগীদের আইকনিক কালী মুর্তি ছিল যেটা সারা বিশ্বে 'টুইন কালী' নামে পরিচিত। কথিত আছে এই মুর্তির নাকি অস্বাভাবিক শক্তি আর ক্ষমতা আছে," রিফাতের কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলো বাশার।

"আসলেই কি আছে? নাকি এগুলো সবই গালগল্প?" ও জানতে চাইলো।

"যেকোন মিথ গালগল্প থেকেই তেরী হয়। যেকোন ব্যাপারে প্রথমে গাল-গল্প তৈরী হয় তারপর সেটা থেকে ধীরে ধীরে কিছু সত্য মিশে অথবা না মিশে তৈরী হয় মিথ," জয়া বলে চললো। "কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে সেটা গরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো কিছু মানুষের সেটা বিশ্বাস করা আর না করা নিয়ে। আর যেকোন অ্যান্টিক জিনিসের ক্ষেত্রে এধরণের মিথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিথ যতো বাড়তে থাকে অ্যান্টিক নিয়ে মানুষের জল্পনা-কল্পনা ততো বাড়তে থাকে। আর মানুষের জল্পনা-কল্পনা যতো বেশি অ্যান্টিকের দামও ততো বেশি।"

"আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত," রিফাত জয়ার সাথে সহমত পোষণ করলো। "এই টুইন কালীর ব্যাপারটাও একইরকম। সেই বৃটিশদের সময় থেকে, বিশেষ করে স্লীম্যানের সাথে ঠগীদের সংঘর্ষের পর থেকেই এই টুইন কালী নামক জোড়া কালী মুর্তি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। হিন্দু দেবী

মডার্ন কালচারে যেরকম বিখ্যাত, ঠগীরাও ঠিক একই রকম রহস্যময়। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি; ইংরেজি ‘ঞযঁম’ শব্দটা আসলে এসেছে এই ঠগীদেরই ইংরেজি নাম ‘ঞযঁমবব’ থেকে। এমনকি বাংলা শব্দ ‘ঠগ’ কিংবা বাংলা বাগধারা ‘ঠগ বাছতে গা উজার’ এইসবেরও উৎপত্তি ঠগীদের ঘিরেই। এ তো গেল ঠগীদের বৃত্তান্ত। অন্যদিকে হিন্দু দেবী মা কালীও মডার্ন কাল্টগুলোর একটি। হিন্দুদের দেবী হবার পাশাপাশি খ্রিস্টানদেরও তাকে নিয়ে নিজস্ব মতবাদ আছে,” এই পর্যন্ত বলে রিফাত হেসে উঠলো। “এমনকি অনেক আধুনিক সেলিব্রেটিও কালী সাধনা করে, তাকে কাল্ট হিসেব মানে।”

“তাই নাকি? যেমন?”

“যেমন ধরো পপ গায়িকা মাইলি সাইরাস। সে খুবই সুপরিচিত কালী সাধক। প্রায়ই দেখবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সে কালীর নকল করে জিহŸা বের করে ছবির পোজ দেয়। তারমতো এরকম আরো আছে।”

“ছাগলামি আরকি,” বাশার বলে উঠলো।

“সেটা তোমার কাছে মনে হতে পারে তবে অনেকের কাছে এটাই সিরিয়াস ব্যাপার। প্রশ্নটা পাগলামির নয়, প্রশ্নটা হলো ঠগী আর কালী দুটোই সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বহুল আলোচিত অর রহস্যময় বিষয়। আর এই রহস্যের কেন্দ্রে চিরকালই আবর্তিত হয়েছে এই জোড়া কালী মুর্তির নাম। তো যাই হোক, বিজয় তার পূর্বপুরুষের ঠিকুজি কুঠি থেকে জানতে পারে এই জোড়া কালী মুর্তির একটা চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। অন্য কালী মুর্তিটা নাকি বিখ্যাত ঠগী শিকারি উইলিয়াম হেনরি স্লীম্যানের রাইট হ্যান্ড কর্নেল জেমস ম্যাকফি ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে তার পরিবারের সদস্যরা সেটা স্থানীয় মিউজিয়ামে দিয়ে দেয়। সেটা নাকি ইংল্যান্ডের সেই মিউজিয়ামেই রাখা আছে”

“এই মুর্তি নিয়ে কথা বলতেই বিজয় প্রথমবারের মতো আমার সাথে দেখা করতে আসে। তার কথায়, তার পরিবারের ইতিহাসের ওপরে দখল দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। সে প্রস্তাব দেয় কোনভাবে যদি ময়মনসিংহের ইতিহাসের এই হারিয়ে যাওয়া অংশটা উদ্ধার করা যায় তবে দারুণ হবে। আমি নিজেও দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে যাই। আর তাছাড়া ওর নিজের ইতিহাস শুনে ছোটেবলো থেকে সংগ্রামের কথা শুনে আমি

খানিকটা প্রভাবিতও হয়ে যাই। ও সবসময় হাতে এরকম একটা আংটি পরে থাকতো," বলে ও জয়ার হাতের একটা আংটির দিকে নির্দেশ করলো।

নিজের হাতের আংটিটা দেখিয়ে হেসে উঠলো জয়া। "এরকম? আমি এটা কিনেছি নিউ মার্কেট থেকে। এটার ওপরে বসানো প্রজাপতিটা খুব ভালো লেগে গেছিল আমার।"

"বিজয়ের অংটিটা দেখে প্রথমদিনই আমি অবাক হয়ে যাই। কারণ আংটিটাতে একটা গুবড়ে পোকার ছবি ছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই গুবড়ে পোকার ছবিওয়ালা আংটি কেন পরে থাকে ও। জবাবে ও আমাকে জানায় ও ব্যক্তিগতভাবে ফ্রানৎজ কাফকার বিরাট ভক্ত। নিজেকে ও মনে করতো কাফকার বিখ্যাত সৃষ্টি 'মেটামরফোসিস' এর গ্রেগর সামসার মতো। গ্রেগর সামসা মানুষ থেকে গুবড়ে পোকায় রূপান্তরিত হয়েছিল আর ও বলতো ওর নিজের রূপান্তর নাকি এখনো শেষ হয়নি। যাই হোক আমি আর ও মিলে সরকারিভাবে খোঁজ লাগাতে শুরু করি কিভাবে সেই টুইন কালীকে দেশে নিয়ে আসা যায়। সেই সময়ে তত্ত¡াবধায়ক সরকারের দশজন উপদেষ্টার একজন ছিল আমার আত্মীয়। আমরা তাকে গিয়ে ধরলে উনি আন্তর্জাতিকভাবে খোঁজ খবর শুরু করেন। সেই সময়েই ডেভিড এসে জোটে আমাদের সাথে। সে নিজেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে জানায় সে ইংরেজ সরকারের একজন প্রতিনিধি। চাইলে সে এটার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।"

"তার প্রস্তাব শুনে আমি আর বিজয় খুশি হয়ে উঠি। কারণ দীর্ঘদিন ধরে এটা-ওটা করতে করতে আমরা তখন বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে আমি তখনো জানতাম না যে বিজয় আর ডেভিড দুজনেই আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। দুজনে আসলে দুধরনের মতলব নিয়ে কাজ করছিল। বিজয় আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিলো কারণ সে আমাকে বলেছিল ময়মনসিংহের ইতিহাসের একটা অংশ সেই সাথে তার পরিবারের ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া একটা অংশ নিয়ে গবেষণা করতে চায়, আসলে সে চাইছিল অন্য কিছু। অন্যদিকে ডেভিড বলেছিল সে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি, সে আসলে ছিল একজন আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোর। তবে বিভিন্ন মহলে তার যোগাযোগ ছিল খুবই ভালো। সে আমাদেরকে ব্যবহার করে টুইন কালীকে মিউজিয়াম থেকে বের করে এই দেশে আনতে চাইছিল যেকোনভাবে। এরা দুজনে কখন একসাথে হয়েছে কখন মিউজিয়ামে ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি," বলে রিফাত একটু থামলো।

“ডাকাতির ঘটনাটা যখন ঘটে ঠিক ওই সময়েই মুর্তিটার সিকিউরিটি ছিল সবচেয়ে কম। তবে অবাক করা ব্যাপার হলো আমার ধারণা ছিল ডেভিড আর বিজয় মিলে চুরি করলেও ডেভিড ছিল বহুত চালু মাল সে ঠিকই বিজয়কে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। আর তার কাছে ধোঁকাবাজির শিকার হয়ে বিজয় বোকার মতো তার ফাঁদে পা দিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো যদি ডেভিড পানিতে ডুবে মরে থাকে, বিজয় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মরে থাকে তকে টুইন কালী কোথায় গেল? এতোদিন ধরে সবাই যা ভেবে এসেছিল সবই তো ভুল প্রমাণ হয়েছে আপনি পুকুরের নিচ থেকে ডেভিডের মৃতদেহ উদ্ধার করার পর।”

“টুইন কালী এই শহরেই আছে,” অনেকটা ঘোষণা দেয়ার মতো করে বলে উঠলো জয়া। “আর সেটা এই শহরের চৌহদ্দির ভেতরেই আছে। কারণ শশীলজ থেকে ডাকাতি হয়েছে রাত আটটায়। আপনার বন্ধুর ভাষ্য অনুযায়ী ডেভিড পানিতে ডুবেছে রাত এগারোটার দিকে। নিশ্চই সে এর মধ্যেই কোথাও মুর্তিটা সরিয়ে ফেলেছে।”

“এখানে অবশ্য আরেকটা ভার্সন আছে। আমরা একজন মানুষকে স্কিপ করে গেছি। বিজয়ের একজন সহকারি ছিল। মোক্তার নাম, ময়মনসিংহেরই দাপুনিয়ার এক ছেলে, খুব চালু। সে প্রায় এই পুরো ব্যাপারটাতেই বিজয়ের সাথে ছিল। ডাকাতির ঘটনার পর ওই ছেলেকেও আর দেখা যায়নি।”

জয়া একটু রাগের সাথে রিফাতের দিকে তাকালো। “আপনার কি মনে হয় ডেভিডের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালকে এই দাপুনিয়ার ছেলে বোকা বানিয়ে কালী মুর্তি নিয়ে পালিয়েছে?”

“আমি ঠিক সেটা বলিনি,” রিফাত একটু যেন বিব্রত। “অমি যেটা বলছি এমনও তো হতে পারে বিজয় ডেভিডকে মেরে মুর্তিটা নিয়ে পালিয়েছিল তারপর কোন কারণে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়, আর গিয়ে সে পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়ে।।”

“সেটা খুবই দূর্বল যুক্তি। আর সেক্ষেত্রেও তো মুর্তিটা এই শহরেই রয়ে গেছে,” জয়া বাধা দিয়ে বলে উঠলো। “কারণ বিজয়ই যদি ডেভিডকে মেরে থাকে তবে সেও তো মুর্তিটা নিয়ে পালাতে পারেনি।”

“এক মিনিট, আমরা এতোটা উত্তেজিত না হই,” বাশার বলে উঠলো। ওর ইনভেস্টিগেটিভ মাইন্ড ওকে বলছে পরিস্থিতি অ্যানালিসিস করে দেখতে।

“আমার ধারণা ডেভিড বা বিজয় কিংবা মোক্তার যার কথাই বলি না কেন সত্যি যদি আমরা পুরনো রহস্যের কিনারা করতে চাই তবে আমাদেরকে এখান থেকে শুরু করতো হবে,” বলে ও টেবিলের ওপরে রাখা বাক্সটা দেখিয়ে বললো। “এভাবে মুখে-মুখে দিন-রাত তর্ক করলেও কাজের কাজ কিছু হবে না। তারচেয়ে আমাদের কাছে এভিডেন্স যা আছে সেগুলো নিয়ে শুরু করতে হবে। আর শুরুটা আমরা এখান থেকেই করবো।”

“আর এখানে যদি কিছুই না পাই, তবে?” প্রশ্নটা জয়ার

“ট্রাস্ট মি, বাশার, আমি কিছুই বাদি দিইনি। এই ঘটনার পরে যখন ডেভিডকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, বিজয় মারা গেল আমি ছিলাম পুলিশের সন্দেহেরে কেন্দ্রবিন্দুতে। ওরা আমার জীবন ¯ফে শেষ করে দিয়েছিল তবে আমার ভাগ্য ভালো ছিল দুটো কারণে। একদিকে আমার পরিবার ছিল প্রভাবশালী, অন্যদিকে আমার সাথে আসলে বিজয় কিংবা ডেভিডের এই ডাকাতির ব্যাপারে কোন সংযোগ ছিল না সেটা আমি সবাইকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম কারণ ওপর মহল থেকে তখন চাপ আসছিল পুরো ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার। কর্তৃপক্ষ তখন আমার সাথে একটা চুক্তিতে আসে। আমি সব হজম করে নেবো এর বিনিময়ে আমাকে তারা আর ঘাঁটাবে না। আমি এই ঘটনার পরে বিদেশ চলে গেলাম পড়তে। যাই হোক, তখন আমি কোনকিছুই বাদ দিইনি পরীক্ষা করতে। কাজেই আমি মনে করি এখানে খুব বেশি কিছ নেই,” একটানা বলে রিফাত থামলো।

“আমারও একই অভিমত, আমাকে যখন এই কেস থেকে বাদ দেয়া হলো তখন আমিও ব্যক্তিগতভাবে কম চেষ্টা করিনি কিন্তু সত্যি কথা হলো ডাকাতির সময় থেকে শুরু করে ওই কয়েক ঘন্টা আসলে কি ঘটেছিল কিছুই বের করা যায়নি,” জয়া মৃদু কাঁধ ঝাকিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো।

বাশার বড় করে দম নিলো একবার,“ঠিক আছে আমি নিশ্চিতভাবে বলছি না যে কিছু পাওয়া যাবেই তবে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেখতে চাই। দেখো এখানে একটা ব্যাপার বলি, রিফাত কিংবা জয়া তোমরা কেউই ট্রেইন্ড ইভেস্টিগেটর না, আর আমি পরিস্থিতি যতোটুক বুঝতে পেরেছি ঘটনা ঘটার পর থেকে কর্তৃপক্ষ হয় ডাকাতির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদের ধরার চেষ্টা করেছে আর না হয় ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে। কাজেই এভিডেন্সগুলোকে ট্রেইন্ড কোন ইনভেস্টিগেটর পরীক্ষা করে দেখেনি। তাই

আমি যা-যা আমাদের হাতে আছে সব পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আগে এগুলো দেখবো এরপরে পকুরের নিচের গাড়ি থেকে যা যা পাওয়া গেছে সেগুলো ঘেঁটে দেখবো আরেকবার। কারণ এবার আমাদের সাথে রিফাত আছে। আর সে এই পুরো ব্যাপারটাতে সংশ্লিষ্ট ছিল কাজেই আমরা শুরু করতে পারি," বলে বাক্সটা খুলে জিনিসপত্রগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দিলো। অনেকগুলো ছোট-ছোট বই, পেপারের কাটিং, পার্চমেন্টসহ আরো বেশ কিছু জিনিস ছড়িয়ে পড়লো টেবিলের ওপরে।

***

গাড়ির ভেতরে বসে কানে হেডফোন লাগিয়ে অন্যমানুষের প্যানপ্যানানি শোনা যে কি বিরক্তিকর কাজ যে না করেছে সে জীবনেও বুঝতে পারবে না। আর লোকগুলো কারা সেটাও তো দেখতে হবে। একটা পুলিশ, একটা সাংবাদিক আর একটা, ওইটারে কি বলে সে জানে না। তবে শেষেরটা একটা সেরকম মাল ছিল। সকালবেলা তারে ধরার অভিজ্ঞতা মনে আসতেই শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। বিরক্তিকর কথা শুনতে-শুনতে তার মধ্যে ঝিমানো-ঝিমানো একটা ভাব চলে এসেছিল হঠাৎ একটা কথা শুনে সে ঝটকা দিয়ে উঠে বসলো। মনে হয় এইবার কিছু একটা পাইছে ওরা।

***

প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে ওরা কাজ শুরু করেছে। এরমধ্যে প্রতিটি পেপার ক্লিপিং, প্রতিটা ব্রশিয়ার থেকে শুরু করে প্রতিটা ছোট-ছোট বইসহ সবার ইন্টারভিউয়ের রেকর্ড ঘেঁটেছে ওরা। কিছু এখনো বাকি আছে কিন্তু রাত এখন প্রায় দশটা বাজতে চলেছে।

“আমার একটা ব্রেক দরকার,” রিফাত বলে উঠলো। “এক কাজ করি, বুয়াকে বলি রাতের খাবার দিয়ে দিতে।”

“আরে না না, পাগল নাকি, শুধু-শুধু এসব ঝামেলা করার কোন মানেই হয়না,” জয়া বলে উঠলো। “আমরা বাইরে খেয়ে নেব।”

“আশ্চর্য কান্ড! আমাদের মধ্যে এখনো ফরমাল সম্পর্ক আছে নাকি। আর আমি বুয়াকে আগেই বলে দিয়েছি সবার জন্যে রান্না করতে। বাশার তোমার কোন আপত্তি নেই তো?”

“না না,” বলে ও জিনিসপত্র দেখতে লাগলো। দুটো ছোট-ছোট সিডির আনকোরা প্যাকেট তুলে ধরে রিফাতের কাছে জানতে চাইলো, “এগুলো কিসের সিডি? প্যাকেটই খোলা হয়নি দেখছি।”

রিফাত খাবার আয়োজন করার জন্যে রওনা দিয়েছিল বাশারের প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকালো। “ওহ, এগুলো। এগুলোও রয়ে গেছে। শশীলজে প্রদর্শনীয় আয়োজন করার পর যেদিও উদ্ভোধনি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় আমি দুটো ছেলেকে ঠিক করেছিলাম পুরো অনুষ্ঠান ভিডিও করতে। ওরা ক্যামেরা-টেমেরা নিয়ে এসে সেটআপ করে সব ঠিক ঠাক করে আমার আর বিজয়ের ইন্টারভিউও নিয়েছিল, শশীলজের টুকরো টুকরো কিছু অংশ, সেইসাথে প্রদর্শনীর জিনিসপত্রেরও কিছু কিছু অংশ ভিডিও করেছিল। প্রাথমিক কাজ শেষ কওে ওরা ক্যামেরা-ট্যামেরা সেট করে প্রধান অতিথীর জন্যে অপেক্ষা করছে এমন সময় সময়ই তো ডাকাতি হয়ে গেল। তারপর পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যায়। ওরা ভিডিও করলেও আর আমার সাথে যোগাযোগ করেনি। এই ঘটনার বহু পরে সব যখন মিটে গেছে তখন একদিন এসে আমাকে যা-যা ফুটেজ ছিল সেগুলো একসাথে দুটো সিডিতে রাইট করে দিয়ে গেছিল। আমার ততোদিনে এই ঘটনার ওপর থেকে মন উঠে গেছে, আর তাছাড়া আমি তখন বিদেশ যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি তাই আর ওগুলো খুলে দেখিনি। ওভাবেই রয়ে গেছে।”

বাশার মনে-মনে ভাবলো তারমানে এখানে ডাকাতির সময়ের ফুটেজ রয়ে গেছে। ভেতরে-ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো ও। “তোমার কাছে সিডি-ডিভিডি প্লেয়ার জাতীয় কিছু আছে?” সিডির কভার খুলতে-খুলতে জানতে চাইলো ও।

“ল্যাপটপ এনে দিচ্ছি কিন্তু ওগুলো নিয়ে পরে বসবে। আগে খেয়ে নাও,” রিফাত বলে উঠলো।

বাশার সিডিগুলো রেখে উঠে দাঁড়ালো। জয়া ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠলো। “স্যারকে খুব খুশি মনে হচ্ছে,” ম্যাডাম বলতেই একেবারে খেতে

রওনা দিয়ে দিলো," বলে সে খিক খিক করে হেসে উঠলো।

"কি যে বলো না," বাশার একটু বিব্রত।

"কি যে বলি, তাইনা! যেভাবে সারাদিন তাকাচ্ছিলে একে অপরের দিকে, সে তো আমি দেখিনি। অমি তো অন্ধ," জয়া ফোড়ন কাটতে-কাটতে বললো।

রিফাত ফিরে আসতেই ওরা খেতে বসে গেল। "আচ্ছা একটা ব্যাপার আমার জানার ছিল," খেতে খেতেই বাশার জানতে চাইলো। "এই ঠগীরা তো নিছক ডাকাত ছিল না। এরা এরকম করতো কেন। এতো নিয়মনীতি, এতো আইনকানুন এতো রিচুয়াল। কারণ কি?"

"কারণ এটা ওরে জন্যে আসলে কোন পেশা বা জীবনধারনের পাথেয় ছিল না বরং তাদের কাছে এটা ছিল একটা ধর্ম। যারাই ঠগী হোত যেকোন ধর্মের লোক নির্বিশেষে সবাই মা ভবানীর পূজো করতো আর ভাবতো ওদের এই সমস্ত কর্মকান্ড আসলে তাদের মা ভবানীর জন্যে," বলতে লাগলো রিফাত। "আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চাও তবে আমি বলবো, ওরা... ওরা আসলে রিপু আক্রান্ত ছিল।"

"রিপু, সেটা আবার কি?" বাশার অবাক হয়ে খাওয়া থামিয়ে জানতে চাইলো।

"কেন ষড়পিুর কথা শোনেন নি? কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য?" বাশারের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে রিফাত জানতে চাইলো। "আমার ব্যক্তিগত অভিমত যদি শুনতে চাও তবে বলবো ওরা ছিল সপ্তরিপু'তে আক্রান্ত।"

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য," বাশার বাম হাতের আঙ্গুলে গুনলো। "আমিতো দেখতে এখানে পাচ্ছি রিপু হলো ছয়টা, তবে সপ্তরিপু কোথা থেকে এল?"

"অ্যানথ্রপলজিক্যাল ফিলোসফিতে রিভার্স থিউরি বলে এক ধরণের থিউরি প্রচলিত আছে। এ-থিউরিতে সবকিছু উল্টো করে দেখা হয়। ভালো-মন্দ, সৃষ্টি-ধ্বংস সবই এখানে উল্টোভাবে প্রচলিত। রিভার্স থিউরি অনুযায়ি মানুষের রিপু আসলে ছয়টা নয় বরং সাতটা। ভেঙে বলছি। ধরো ইংরেজিতে বলা হয় সেভেন ডেডলি সিন'স। মানে রিপু হলো সাতটা, তবে বাংলায় রিপু ছয়টা কেন। সপ্তম রিপুটা হলো আসক্তি, যেটাকে সহজভাবে

বলতে গেলে ভক্তি-এক্সট্রিম ডেভোশন। রিভার্স থিওরিতে ব্যাপারটাকে এভাবে বলা হয়; ‘এক্সট্রিম ডেভোশন ক্রিয়েটস ইভিল’। মানে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি মাত্রাহীন খারাপ। যেমন ধরো প্রতিদিনই খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাবে ধর্মের নামে দাঙ্গা, যুদ্ধ, বোমাবাজি। এর মানে না বুঝে অতিরিক্ত ভক্তি কখনো কখনো খুবই খারাপ। ঠগীদের ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই। ঠগীরা ছিল তাদের দেবী মা ভবানির প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে অনুরক্ত। তাদের এই অতিমাত্রায় ভক্তির বহিঃপ্রকাশ ছিল এই ফাঁস দিয়ে খুন।”

“হুম্, বুঝলাম। তবে...” বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই জয়া পাশ থেকে কথা বলে উঠলো। “বিজয় নিজেও এই সপ্তরিপুতেই আক্রান্ত হয়েছিল, যেকারণে সেও নিজে ঠগী হতে চাইতো,” আনমনেই বলে উঠলো সে।

“একদম ঠিক, আমি আপনার কথা সাপোর্ট করি। টুইন কালীকে হাত করার চেষ্টার পেছনে ডেভিডের উদ্দেশ্য ছিল মুর্তিটা চুরি করে বিক্রি করা। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিজয়ের ব্যাপারটা ভিন্ন ছিল। মুর্তির দাম নিয়ে কোন মাথাব্যাথা তার ছিল না। সে আসলে তার পূর্বপুরষের মতো ঠগী হতে চাইতো। সে আসলে নিজের ভেতরের স্বত্ত¡াকে নিয়ে সন্তুষ্ঠ ছিল না, সে চাইতো নিজেকে আরো বেশি কিছু ভাবতে, আরো বেশি কিছু করতে। সেটারই বহিঃপ্রকাশ ছিল এই ঠগী চর্চা।”

“এই একুশ শতকে ঠগী! ভাবতেও তো হাস্যকর লাগে,” বাশার বলে উঠলো।

“হাস্যকরের কিছু নেই। এই একুশ শতকে অনেক কিছুই ঘটে যা হাস্যকর কিন্তু ঘটে চলেছে। এই যুগেও নারীদেরকে পাথর মেরে মেরে ফেলা হয়। এই আধুনিকতার যুগেও মানুষ মানুষের মাংস খায়। এই যুগেও যুদ্ধের নামে শত-শত শিশু হত্যা করা হয়। হয়না?” জয়ার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, সে বেশ উত্তেজিত। “এই যুগেও মানুষ ধর্মের নামে বোমা মারে, মানুষ বলি দেয়, দেয় না? তবে? এইযে আমি হাতে প্রজাপতির ছবি আঁকা অষ্টধাতুর আংটি পরে আছি, এটা হাস্যকর না? তুমি বলো, এই যে তুমি আধূনিক শিক্ষিত একটা ছেলে, তোমার বাম হাতে ওই অদ্ভুত দেখতে মেয়েদের আংটিটা পরে আছো কেন? কিছু হলেই দেখি একটু পর-পর ওটা চেপে ধরে বিড়-বিড় করে কি জানি বলো। এটাও তো হাস্যকর, হাস্যকর না? কিন্তু তুমি করো তো? করোনা?”

জয়ার শেষ কথাটা শুনে বাশারের মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে খাওয়া থামিয়ে জয়ার চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। “হ্যা, অবশ্যই হাস্যকর। কারণ এই আংটিটা আসলে আংটি না,” বলে ও আংটি পরা বাম হাতটা দেখালো। ওটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো। “এটা আসলে কি জানো। আমার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। আমি যেদিন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশে পড়তে যাই সেদিন মা তার হাত থেকে খুলে এটা আমাকে দিয়ে বলেছিল; সবসময় এটাকে সাথে রাখতে। যে-মা ছিল আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। সে-মায়ের মৃত্যুর সময়ে আমি তার পাশে ছিলাম না। যে-মায়ের মৃত্যু বদলে দিয়েছিল আমার পুরো জীবনটা। সেই এলোমেলো জীবনটা যখন ধ্বংসের মুখে, তখুনি সবেচেয়ে কাছের বন্ধুর পরামর্শে আমি পুলিশে যোগ দিয়েছিলাম। সেই বন্ধুকেও আমি নিজ হাতে খুন করেছি,” বলে ও ভেজা চোখে জয়ার দিকে তাকালো।

জয়ার দৃষ্টি অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে। কিন্ত বাশার বলেই চলেছে। “যে-দুজন মানুষের জন্যে আমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দরকার ছিল তারাই আমাকে রেখে চলে গেছে। প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে আমিই তাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ি। যখন তুমি তোমার পরিবার, তোমার বন্ধু-বান্ধব, তোমার ক্যারিয়ার সব হারাবে তখন অবশ্যই এরকম হাস্যকর কিছু একটা আঁকড়ে না ধরলে তুমি বাঁচতে পারবে না,” বলে ও বাম হাতে চোখ মুছলো। “এক্সকিউজ মি,” বলে ও টেবিল থেকে উঠে হাত মুখ মুছে ফিরে এল ড্রইং রুমে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ল্যাপটপে ঢোকালো দুটো সিডির প্রথমটা। এটাতে বিশেষ কিছু নেই। প্রাথমিক কিছু ভিডিও, এর-ওর ইন্টারভিউ। রিফাতকে দেখা গেল শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন তার বয়স ছিল আরো অনেক কম, দেখতে আরো চোখ ধাঁধানো সুন্দরি ছিল। বাশার তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলো। প্রথম সিডিটা বের করে এবার দ্বিতীয়টা লাগালো। রিফাতের কথামতো এটাতেই ডাকাতির সবকিছু থাকার কথা। সিডিটা প্লে হতে-হতে জায়গামতো চলে এল। বাশার ভীষণ উত্তেজনার সাথে দেখতে লাগলো প্রায় পুরো ডাকাতির ঘটনাটাই রেকর্ড হয়ে আছে এটাতে। জয়া গতদিন যেভাবে বলেছিল ঠিক সেভাবেই ঘটেছে ব্যাপারটা। ও মনোযোগ দিয়ে ডাকাতিটা দেখতে লাগলো। দেখতে-দেখতে এক পর্যায়ে এসে থেমে গেল। আবার রিওয়াইন্ড করে দেখলো। তারপর আবার, তারপর আবার।

“বাশার, আমি দুঃখিত। যদি আমি ব্যক্তিগত কোন আক্রমণ করে থাকি না বুঝে...”

ও জয়ার দিকে না তাকিয়েই তাকে ইশারায় চুপ থাকতে বললো। আরেকবার ভিডিওর একটা বিশেষ অংশ দেখলো। তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে অনেকটা ঘোষণার মতো করে বললো, "টুইন কালী যেখান থেকে ডাকাতি হয়েছিল ওটা এখনো ওখানেই আছে।"

"মানে?" রিফাত একটা কফির মগ হাতে এইমাত্র প্রবেশ করেছে ড্রইং রুমে। বাশারের শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছে সে। "মানে, তুমি বলতে চাইছো ওটা এখনো শশীলজেই আছে?"

"সেটা কিভাবে সম্ভব?" জয়া গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলো।

"সম্ভব, কারণ প্রমাণ আছে এখানে," বলে ও ল্যাপটপটা ফিরিয়ে ধরলো ওদের দুজনার দিকে। এখানে দেখ। ডাকাতরা গাড়ি থেকে নেমে এসে অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে একদিকে সারি দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। "ডাকাতির সময়টা ভালোভাবে খেয়াল করো। এই যে রিফাত, এই যে বিজয় সবাই একদিকে, শুধুমাত্র একজন বাদে। ডেভিড। দেখ সে দাঁড়িয়ে আছে ডাকাতদের পেছনে।

"এইবার এখানে দেখ," বলে বাশার একটা জায়গায় ফোকাস করলো। ডাকাতরা প্রদর্শনীর জিনিস কালো রঙের ব্যাগে ভরছে। প্রথমেই টুইন কালীর মুর্তিটা এক ডাকাত পলিথিনের মতো দেখতে একটা ব্যাগে ভরে ফেললো। ভরে সে সরে এল ওখান থেকে। বাকি ডাকাতরা যখন অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত সে এসে দাঁড়িয়ে গেল ঠিক ডেভিড যেখানে দাড়িয়ে আছে তার সামনে। সবার অলক্ষ্যে চট করে ব্যাগটা চালান করে দিলো ডেভিডের হাতে।

"সর্বনাশ," আনমনেই বলে উঠলো রিফাত।

"সর্বনাশের এখনো বাকি আছে," বলে ও ভিডিওটা আরেকটু এগিয়ে দিলো। "এবার দেখ। ডাকাতরা অন্যান্যদের নিয়ে ব্যস্ত, কালো ব্যাগটা হাতে নিয়ে ডেভিড পেছন থেকে গায়েব হয়ে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। তখন তার হাতে ব্যাগটা নেই।

"তারমানে তারমানে কালী মুর্তিসহ ব্যগটা সে কোথাও রেখে এসেছে," জয়া বলে উঠলো। "আর সেটা অবশ্যই শশীলজের ভেতরেই হবার কথা। কারণ এই সময়ের ভেতরে সে আর কোথাও সরতে পারার কথা নয়।"

“কিন্তু এর মানে এই না যে টুইন কালী এখনো ওখানেই আছে। সে তো ওটা অন্যকারো হাতেও দিতে পারে,” জয়া বলে উঠলো।

“না, ওটা সে শশীলজেই রেখেছে। কারণ আছে,” রিফাত কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বলতে লাগলো। “কারণ শশীলজ সে খুব ভালো চিনতো। সে আমাকে বলেছিল শশীলজ নিয়ে অনেক মিথ আছে। এই প্রদর্শনীর বছর দুয়েক আগে নাকি একবার সে আর তার বন্ধু মিলে প্রায় তিনমাস ধরে শশীলজের ওপরে গবেষণা করেছে। আর তখনই সে নাকি এই টুইন কালীর ব্যাপারে জানতে পারে। এরপরে আমরা যখন টুইন কালী বিষয়ক খোঁজ-খবর করতে থাকি তখন সে আগ্রহী হয়।”

“তারমানে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো, ডাকাতির সময়ে ডেভড কালী মুর্তি নিয়ে শশীলজের ভেতরে গায়েব হয়ে যায় আর ফিরে আসে খালি হাতে। তারমানে মুর্তিটা শশীলজের কোথাওই আছে। কারণ সে মুর্তিটা সরানোর সময় পায়নি যদি পেত তবে সেটা পুকুরের নিচে তার গাড়িতে থাকতো,” বলে বাশার একে একে দুজনার দিকে দেখলো সেটা যেহেতু ছিল না কাজেই মুর্তি এখনো শশীলজেই আছে।”

***

বাশারের শেষ কথাটা শুনে কানে হেডফোন পরে থাকা মানুষটার মুখে দুইকান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি ফুটে উঠলো। এতোক্ষণে মজা পেতে শুরু করেছে সে। তবে এখুনি সে কিছুই করবে না, শুধুই অপেক্ষা করবে। ওরা মিলে শশীলজে অভিযান চালিয়ে বেড়াক। যদি কিছু পায় তখন পর্দায় হাজির হবে সে। তবে সে-জন্যে প্রস্তুতি লাগবে, লোক লাগবে। হাসিমুখেই সে মোবাইলটা বের করে কল দিলো তার নিয়োগকর্তার নম্বরে।

অধ্যায় একত্রিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

তালুকদার পরিবারের আবাসস্থল, ময়মনসিংহ

“সর্বনাশ! তারমানে ঠাকুরকে ওরা কখনোই সন্দেহের বাইরে রাখেনি,” হেনরি স্লীম্যানের ঠগীদের সাথে সংঘর্ষের বর্ণনা শেষ হতেই ম্যাকফি বলে উঠলো।

“না, ওকে দিয়ে ওরা একটা ফাঁদ পেতেছিল মাত্র,” কথাটা বলে উঠলো চেয়ারে বসে পাইপ টানতে থাকা হেনরি।

ওরা এই মুহূর্তে বসে আছে তালুকদার পরিবারের বসার ঘরে। কালন্তি বিলের কাছে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর হেনরি ওদের দুজনকে উদ্ধার করার পর বেশ কিছুক্ষণ নদীর পাড়েই লুকিয়ে থাকে ওরা। ভোরের আলো একটু-একটু ফুঁটে ওঠার পর পায়ে হেঁটে ওরা রওনা দিয়ে কিছদূর এগোনোর পর ওদের দেখা হয়ে যায় লাল পাগড়ি বাহিনীর সাথে। ওরাই পাহারা দিয়ে সবাইকে নিয়ে আসে তালুকদার বাড়িতে। এখানে বসেই গত এক ঘন্টা ধরে হেনরি বলে চলেছে ঠগীদের সাথে তার ভয়াল অভিজ্ঞতার কথা।

“হ্যা, ওরা ফাঁদ পেতেছিল। টোপ ছিল ঠাকুর নিজে। আর সেই ফাঁদে বোকার মতো ধরা দিয়েছি আমি। এই বোকামির মাশুলও গুনতে হয়েছে। ঠাকুর মাশুল গুনেছে নিজের জীবন দিয়ে। আর আমি মাশুল গুনেছি নিজের লোকেদের মৃত্যুর দ্বায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে।”

“ওদের মানে?” অনেকক্ষণ পর কথা বললো জোহরা। প্রথমে স্বামি, নায়েব মুন্সি, এরপরে আজরাতে লাল পাগড়িদের প্রধান আর মানিকের মৃত্যুশোক তাকে কাবু করে ফেলেছে সেইসাথে নিজেও মৃত্যুর দুয়ার থেকে একটুর জন্যে ফিরে এসেছে এটা ভাবতেই বার-বার গা শিউরে উঠছে তার।
“ঠাকুরের সাথে আর কাউকে খুন করেছিল নাকি ওরা?”

হেনরি চোখ তুলে তাকারো তার দিকে। টকটকে লাল দুই চোখে পানি টল-টল করছে। “শুধু ঠাকুর না। ওইদিন আমার বাংলো, কাস্টমস হাউজ, কোম্পানির অফিসের পাহারাদার, বাবুর্চি, জনাকয়েক ঘুমন্ত সৈনিক কাউকেই ওরা বাদ দেয়নি। প্রায় সবাইকেই ফাঁস পরিয়ে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল। ঠাকুরকেও ওভাবেই মারলেও বেঈমানির শাস্তি স্বরূপ ওকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, কেটে দিয়েছিল পেট।”

আরেকবার শিউরে উঠলো জোহরা। ম্যাকফিও গম্ভীর হয়ে আছে। ও মহাবীর সিং আর জোনাথনকে খবর পাঠিয়েছে। ওরা না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না। “এরপর আপনি কি করলেন?”

“ওইদিন ওখানে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করি, আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো। কিন্তু পরিস্থিতি তখন আমার অনুকূলে ছিল না। একে তো বেখেয়ালিপনার দ্বায়ে আমাকে এমনিই সমন দেয়া হয়েছিল। তার ওপরে এতোগুলো মানুষের মৃত্যুর জন্যে আর কোম্পানির সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্যে সবাই আমাকেই দায়ি করবে। সাসপেন্ড তো করা হবেই সেইসাথে গ্রেপ্তারও করতে পারে। তাই আমি পালাই ওখান থেকে।”

“পালিয়ে গেলেন?” ম্যাকফি একটু অবাক হয়েছে।

“হ্যা, আসলে ঠগীদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে আমার আর কোন উপায় ছিল না। কোম্পানি আমার কথা বিশ্বাস করতো না। অন্য কেউই আমাকে বিশ্বাস করতো না। আমাকে আরো প্রমাণ সংগ্রহ করতে হোত। তাই আমি টুকিটাকি কিছু জিনিস যা ছিল আমার কাছে সেগুলো নিয়ে পালালাম। বিশ্বস্ত লোকজন যারা ছিল ওখানে তাদেরকে বললাম আমার অন্তর্ধানের ব্যাপারে যেন কাউকে কিছু না জানায়। তবে আমি জানতাম কনের্লের সৈন্যরা গিয়ে ঠিকই রিপোর্ট করবে। তাই পালালাম। তবে আমার পালানোর পেছনে আরেকটা কারণ ছিল। আমার হাতে এমন একটা জিনিস ছিল যেটা দিয়ে আমি ওদের পিছু ধাওয়া করতে পারতাম। ”

“সেই বটুয়াটা, তাইনা?” জোহরা জানতে চাইলো।

“হ্যা, সেই বটুয়াটা, আমার পালাবার পেছনে ওটাও একটা বড় কারণ ছিল।”

“কিন্তু আপনি তো চাইলে ওটাকেই প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পারতেন,” ম্যাকফি বললো।

“না, পারতাম না। এতোবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল সেটার পেছনে প্রমাণ হিসেবে কয়টা কাগজ তাও আবার অজানা এক ভাষায় লেখা কাগজ যথেষ্ঠ ছিল না। তাই আমি পালালাম। সোজা চলে এলাম কোলকাতা। সেখানে আমার পরিচিত এক ভাষাবিদ ছিল, তাকে নিয়ে জিনিসটা দেখালাম সে বললো এটা বহু পুরনো ফার্সি ভাষার কোন একটা রূপ। সে চেষ্টা করলে ওটাকে ভাঙতে পারবে। তার কাছে ওটা দিয়ে আমি বাইরে খোঁজ-খবর করতে লাগলাম। প্রথমত, লোক মারফত খবর লাগালাম আমার নিজের এলাকাতেই। সেখান থেকে যা জানতে পারলাম তা খুবই অবিশ্বাস্য।”

“ঠগীরা নাকি বছরের বেশিরভাগ সময় চলার ওপরেই থাকে। এরকমই একটা দল নাকি নর্মদাতে এসে আস্তানা গেড়েছিল। যাদের সাথে আমার টক্কর লেগেছিল। ওদের এই দলটা নাকি পুরো ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রভাবশালি দলগুলোর ভেতরে একটা। কারণ ওদের কাছে নাকি জোড়া কালী নামে মা ভাবানীর মুর্তি আছে যা ঠগীদের অন্যতম প্রভাবশালী প্রতীকগুলোর ভেতরে একটা। এই দলের নেতার নাম ফিরিঙ্গিয়া। এই ফিরিঙ্গীয়া নাকি মাদ্রাজ এলাকার সবচেয়ে কুখ্যাত ঠগী। সেদিনের সেই ঘটনার পর ওরা নর্মদা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে সেটার খোঁজ করতে গিয়ে আমি জানতে পারি ওরা গেছে ইলোরাতে। সাথে সাথে সেখান থেকে গেলাম ইলোরাতে, ইলোরা থেকে এলাহাবাদে। এলাহাবাদে পৌছে আমি জানতে পারি তারা বাঙ্গাল মুল্লুকের দিকে গেছে। এলাহাবাদ থেকে কোলকাতায় ফিরে যাই আমি। সেই বইটার অনুবাদ সংগ্রহ করি ভাষাবিদের কাছ থেকে। ওটা নিয়ে চলে আসি ঢাকায়। ঢাকায় এসে জানতে পারি বাঙ্গাল মুল্লুকে ঠগীদের সবচেয়ে বড় আস্তানা নাকি কুমিল্লায়। সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করবো ভাবছিলাম এমন সময় এই মুক্তাগাছা অঞ্চলে ইংরেজ অফিসারদের হারিয়ে যাবার খবর জানতে পারি। ওদের গায়েব হবার ধরণ জানতে পেরে আমার সন্দেহ লাগে এটা ওদের কাজ হতে পারে।”

“আপনি এতো সহজে কিভাবে নিশ্চিত হলেন?” ম্যাকফি জানতে চাইলো।

“আমি নিশ্চিত হই, কারণ কুমিল্লা এলাকায় পৌছে আমি একটা গুজব শুনতে পাই। সেখানে গিয়ে আমি জানতে পারি মধুপুর এলাকায় নাকি ইদানিং ঠগীদের উৎপাত বেড়ে গেছে, কারণ স্থানীয় কোন এক রাজা নাকি ঠগীদেরকে সহায়তা করছে। এরকম একটা গুজব আমি এলাহাবাদেও শুনেছিলাম। নর্মদাতে আমার সাথে টক্কর লাগার পর ওরা ইলোরাতে বাৎসরিক ঠগী জমায়েতে গিয়ে এই এলাকার সেই রাজার সাথে মোলাকাত

হবার পর ওরা বাঙাল মুল্লুকে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই এই এলাকাতে ইংরেজ অফিসারদের গায়েবের খবর শুনে এখানে চলে আসি।"

"স্থানীয় রাজা মানে কি। সূর্যকান্ত কি তবে ঠগীদের সহায়তা করছে?" ম্যাকফি প্রশ্ন করলো।

"অসম্ভব, সে সহায়তা চাইছিল ইংরেজদের কাছে আর ইংরেজদেরকেই মেরেছে ঠগীরা। কাজেই সে হতেই পারে না," জোহরা বলে উঠলো।

"আমারও তাই মনে হয়। তবে কে হতে পারে?" বলে ম্যাকফি ফোড়ন কাটলো। "গতরাতে আপনি ওখানে কিভাবে একেবারে সময়মতো পৌছালেন সেটা কিন্তু বলেন নি।"

"এখানে পৌছে প্রথমে আমি একটু থমকে যাই। কাউকে চিনি না। তবে এখানে আসার আগে পুরনো এক ইংরেজ বন্ধুর কাছে জানতে পেরেছিলাম এই এলাকাতে ইংরেজদেরকে খবর পাচার করে বিল্লাল শেঠ নামে একজন ব্যবসায়ি। তো এখানে এসে এক সরাইখানায় উঠলোাম। বিল্লাল শেঠকে খুঁজে বার করে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম কিন্তু বেটা বহুত ধুরন্ধর। আমি তাকে বের করার আগে সে ই জানতে পারে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি তাকে খুঁজে বেড়াই আর সে আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তো যাই হোক গতকাল খাগড়হরের হাটে দড়ির খেলা দেখানোর সময়ে তারে ধরি কিন্তু গন্ডগোলের সুযোগে আমার মনোযোগ সরে যাওয়াতে সে পালায়। এরপওে লোক পাঠিয়ে খবর লাগাই। এবার সে নিজেই দেখা করতে আসে আমার সাথে," বলে হেনরি ফিরে তাকালো সবার দিকে।

ম্যাকফি একটা হেলানো চেয়ারের মতো চেয়ারে বসে পাইপ হাতে ধরে বসে আছে। আগুন নিভে যাওয়াতে সরু ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটা থেকে। ওদের থেকে বিপরীত দিকে বসে আছে জোহরা। দুই চোখ ছল-ছলে তার কিন্তু বেশ সচেতনভাবে বেশ শক্ত একটা ভাব ধরে রেখেছে মুখে। "ঘন্টাখানেক এটা-ওটা বলে কিন্তু কাজের কথা কিছুই বলে না। আমি বুঝতে পারি এই লোককে দিয়ে কিছুই হবে না। তাই সে যখন বেরিয়ে আসে তখন তার পিছু নিতে শুরু করি। পিছু নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত... বাকিটা আপনারা জানেন," বলে হেনরি মাথা নাড়লো।

"এখন কি করতে চান?" প্রশ্নটা করেছে ম্যাকফি।

ওর প্রশ্ন শুনে সবাই নড়েচড়ে বসলো। সবাই তাকিয়ে আছে হেনরির দিকে।

সবার দৃষ্টি নিজের ওপরে অনুভব করে মৃদু হেসে উঠলো হেনরি। "আপাতত আমি সকালের ব্রেকফাস্ট করতে চাই, বেশ ক্ষুধা লেগেছে। এরপরে আমার কিছু মানুষ লাগবে," বলে সে ম্যাকফির দিকে ফিরে তাকালো। "আপনার দলটাকে লাগবে, সেইসাথে লাগবে জমিদার সূর্যকান্ত আচার্যকে আর ডোংরু মহারাজ নামের সেই ব্র²ণ পুরুতকে," শেষ কথাটা সে জোহরাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে। কারণ এরা জোহরার শত্রু।

সে ভেবেছিল এদের কথা শুনলে জোহরা প্রতিক্রিয়া দেখাবে কিন্তু সেটা না করে বরং সে কৌতুহলি দুষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হেনরির দিকে।

জোহরার প্রশ্নটা করে বসলো ম্যাকফি, "এদেরকে দিয়ে আপনি কি করবেন?"

"ওয়েল," বলে মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো হেনরি। "প্রথমত, সূর্যকান্তের কাছ থেকে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে," বলে সে একটু থেমে যোগ করলো। "দ্বিতীয়ত, আমি একটা ফাঁদ পাততে চাই। এজন্যেই এদের সবাইকে দরকার আমার। সাথে আপনাদেরকেও।"

অধ্যায় বত্রিশ

বর্তমান সময়

শশীলজ, কাচারি রোড, ময়মনসিংহ

“সবাই একসাথে এসেই বা লাভটা হলো কি?” কড়া রোদে ঝলসাতে থাকা শশীলজের দিকে তাকিয়ে জয়া আনমনেই বলে উঠলো।

সূর্য তার শেষ বিকেলের উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে শশীলজের পুরনো ভবনগুলোর ওপরে। কড়া রোদের ভেতরে দাড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিতেই কপাল থেকে টুপ করে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়লো বাশারের। কিভাবে যেন ঘামের ফোঁটাটা কপাল থেকে নেমে সানগ্লাস আর ভ্রুর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ঢুকে সরাসরি চলে গেলে চোখের ভেতরে। চোখ জ্বালা করে উঠতেই পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছতে যাবে তার আগেই জিপের হুডের ওপরে বসে সিগারেট টানতে থাকা জয়া আবারো কথা বলে উঠলো।

“এভাবে হবে না,” বলে সে একরাশ ধোঁয়া ছড়ে দিয়ে যোগ করলো। “আমরা ভুল করছি। এভাবে খুঁজতে গেলে মাসের পর মাস পার হয়ে গেলেও কিছুই পাওয়া যাবে না।”

জয়ার দিকে তাকিয়ে প্রথমেই বাশারের মনে হয় এই মেয়ে বিড়ি খেতেও পারে। তার কথায় চূড়ান্ত বিরক্তি বোধ করলেও বাশার মনে মনে ভাবলো সে ঠিকই বলছে। “কিন্তু এছাড়া আর করারই বা আছে কি?”

“ওই দেখ, তোমার সুন্দরি বান্ধবি আর তার সার্চ পার্টি ফিরে আসছে। আমি নিশ্চিত এবারও ওরা কিছুই পায়নি,” জয়া সিগারেটটা অর্ধেক টেনে সেটা বাড়িয়ে দিলো বাশারের দিকে। নিবে না ভেবেও সিগারেটটা নিয়ে টান দিলো ওতে। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ও সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগলো।

ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে শশীলজ মানে ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভেতরে আমগাছতলা নামে একটা জায়গা আছে সেখানে। গতকাল রাতে ডেভিডের মুর্তি লুকানোর ব্যাপারটা খুঁজে পাবার পর রাতের বেলা কিছুই করার ছিল না। বাশার ফিরে যায় নিজের বাড়িতে, পথে জয়াকে নামিয়ে দিয়ে যায় তার হোটেলে। রিফাত নিজের বাসাতেই ছিল, তার বাড়ির বাইরে পুলিশ পাহারা ছিল। পর দিন সকাল হতেই বাশার কাজ শুরু করে দেয়। কিন্তু সময় লাগে শশীলজে সার্চ করার জন্যে অনুমতি বের করতে। ওটা করতে করতেই আধাবেলা পার হয়ে যায়। এরপরে বাশারের সময় লাগে আরো কিছু সাপোর্টিং হ্যান্ড জোগাড় করতে গিয়ে। অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিজের টিম নিয়ে শশীলজে এসে কাজ শুরু করতে করতেই বেলা তিনটে বেজে যায়।

সার্চ পার্টির নের্তৃত্ব দেয় রিফাত। কারণ শশীলজের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানে একমাত্র সে-ই। পুরো রাজবাড়িটা এক কথায় বিশাল, তাই ওরা কয়েকটা অংশে ভাগ করে কাজ শুরু করে। কিন্তু দুই ঘন্টার ওপরে টানা কাজ করার পরেও কোন ফলাফল নেই। বাশার মনে-মনে ভাবলো জয়ার কথা ঠিকই আছে। এই বিরাট রাজবাড়িতে এভাবে অভিযান চালিয়ে একটা তিনফুটি ছোট মুর্তি খুঁজে বের করা খুবই অসম্ভব একটা কাজ। এটা অনেকটা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতোই, যেখানে তুমি নিশ্চিত না সূঁচটা আদৌও এই গাদায় আছে কিনা।

বাশার জিপের দরজা থেকে সামনের দিকে এগিয়ে ফিরে আসতে থাকা সার্চ পার্টির দিকে তাকালো। তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল রাজাবাড়ির দিকে। ছোটবেলা থেকে ময়মনসিংহ শহরে বড় হবার কারণে এই রাজবাড়ি নিয়ে এমন কোন গল্প নেই ও শোনেনি। বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ও মনে-মনে ভাবলো, এই বাড়ি গল্প করার মতোই। এতোশত বছর চলে যাবার পরেও এর সৌন্দর্য এখনো এতোটুক মলিন হয়নি। লাল ইটের তৈরী বাড়ি, মেঝেতে মার্বেল, কাঁচের দরজা, প্রতি রুমে বিরাট-বিরাট ঝাড় বাতি। ওর মনে পড়ে গেল ছোটবেলা ওর খালা এখানে এমএড করার সময়ে প্রায়ই ও এখানে আসতো। রুমে রুমে ঘুরে বেড়াতো ও। কিন্তু এই মুহূর্তে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে কোন সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছে না। বরং এর সৌন্দর্য আর ব্যাপকতা কেমন যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে।

“ফুউফফ,” বলে রিফাত এসে বসে গেল জিপের একপাশের সিটে। “মাই গড! এতোবড় বাড়ি এভাবে একটা জিনিসের জন্যে সার্চ করা, রীতিমতো

অসম্ভব," বলে সে বোতল থেকে পানি খেতে লাগলো। বাশার দেখলো তার পরনের জিন্স আর ফতুয়াতে ময়লা লেগে আছে।

"কিছুই পাওয়া গেল না?" ও জানতে চাইলো যদিও আসলে উত্তর কি হবে সেটা জানাই আছে।

রিফাত ¯ুফে মাথা নাড়লো। "কিছুই না। এভাবে সম্ভব, বলো? তবে এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যেতে পারে খোলা জায়গা আর বাড়িগুলোর ভেতরের সাধারণ জায়গা যা আছে আমরা সব খুঁজে দেখেছি। কিছুই পাইনি। পাবার কথাও না। তবে এখনো অনেকগুলো রুম আছে যেগুলো তালা দেয়া। সেগুলোর ব্যাপারে বলতে পারবো না। সেগুলো ঘেঁটে দেখতে চাইলে অনেক ওপরের মহলের অনুমতি লাগবে।"

"সেগুলোতে কিছু পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না। কারণ সেগুলো বহু আগে থেকেই বন্ধ। এমনকি ডেভিডের পক্ষেও সেগুলোতে ঢোকা সম্ভব ছিল না। আর তাছাড়া..." জয়া আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই আবদুল্লাহ ডাক দিলো বাশারকে। সে জানালো সার্চপার্টির জন্যে নিয়ে আসা কন্সটেবল দুজনকে থানায় ফেরত পাঠাতে হবে। তাদেরকে বিদায় দিয়ে আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে কিছু একটা খেয়ে আসতে বললো। এসে বাশার আবারো আলোচনায় যোগ দিলো।

"জয়া, একটা কথা বলেছে, কথাটা আমার মনে ধরেছে," রিফাত বলে উঠলো। তাকে দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে আনলো। "আমরা আসলে ভুল পন্থায় কাজ করেছি। আরো আগেই এভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল। এখানে দেখ," বলে সে মোবাইলে একটা ভিডিও প্লে করে দুজনকেই দেখতে বললো। ভিডিওটা দেখার জন্যে কাছে যেতেই রিফাতের চুল থেকে মিষ্টি একটা সুগন্ধ মাথায় ঝিম ধরিয়ে দিলো বাশারের। মুহূর্তের জন্যে তাল হারিয়ে ফেলেছিল সে, যেই দেখলো জয়া তার দিকে তাকিয়ে মিচকি হাসি দিচ্ছি সাথে-সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে ভিডিওতে মনোযোগ দিলো। "এই দেখ। ওই ভিডিওটা আমি সিডি থেকে মোবাইলে ঢুকিয়ে নিয়েছি। এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করো। ডাকাতটা ডেভিডকে মুর্তিটা ধরিয়ে দিলো। এর একটু পরেই ডেভিড চলে গেল ভেতরের দিকে। ফিরে এল পাঁচ-ছয় মিনিটেরও কম সময়ে। ঠিক?"

ওরা দুজনেই মাথা নাড়লো। "আমার সাথে এসো। বলে সে শশীরজের মূল ভবনটার দিকে রওনা দিলো। বাশার একবার জয়ার দিকে তাকিয়ে

অসহাভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওর পিছু হাঁটতে লাগলো। কিন্তু রিফাত মূল ভবনটার দিকে এগোল না। সে মূল ভবনটা পর হয়ে চলে এল মূল ভবন আর পুকুর পাড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। এখান থেকে বামে খানিকটা এগোলে আধুনিক প্রসাশনিক ভবনটা চোখে পড়ে। অন্যদিকে শশীলজের মূল ভবনটা আর সেটার পেছনে বিরাট পুকুরের অনেকটা অংশও পরিষ্কার দেখা যায়।

“এখানে,” রিফাত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখালো। “এই জায়গাটাতেই সেদিন প্রদর্শনী হচ্ছিলো। এখান থেকে সম্ভবত ওদিক দিয়ে ডেভিড সবার চোখ এড়িয়ে সরে পড়েছিল। আমার প্রশ্ন হলো এখান থেকে পাঁচ বা ছয় মিনিটের ব্যবধানে কোন জায়গাতে গিয়ে জিনিসটা নিরাপদে রেখে আর এই পাঁচ-ছয় মিনিটের ব্যবধানে ফিরে আসা সম্ভব? এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে ডেভিড এমন কোন জায়গায় জিনিসটা রাখবে না যাতে কারো চোখে পড়ে যায়। কারণ সে ভালোভাবেই জানতো ডাকাতি হতেই পুলিশ আসবে আর ওরা এলে প্রথমে এখানেই সার্চ করবে। আর পুলিশ সেটা করেছিলও কিন্তু কিছু পায়নি কাজেই জিনিসটা যদি থেকে থাকে তবে ওটা এখানেই কোথাও আছে। আমার অনুমান জিনিসটা আছে হয় ওই মূল ভবনটার কোথাও, আর না হয় পুকুরের ঘাটের আশেপাশে কোনদিকে আর না হয় ওই ওটাতে,” বলে পুকুর পাড়ের বিরাট ¯œানাগারটা দেখালো। আমরা এই কয়টা জায়গাতেই দেখবো। জয়া তুমি যাবে ওই ¯œানাগারে, আমি আবারো দেখবো মূল ভবনটা আর বাশার, তুমি দেখবে পুকুরের আশপাশটা আর পুকুরের বিরাট বাঁধানো ঘাঁট।”

রিফাতের কথামতো ওরা ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করলো। ওরা দুজনে দুদিকে চলে যেতেই বাশার এসে দাঁড়ালো পুকুর পাড়ে। ওর মনে পড়লো ছোটবেলা এই পুকুরপাড়ে ওরা খেলতো। বিশেষ করে এই পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট ফলের গাছ ছিল যেগুলো অন্যকোথাও দেখেনি ও। আশেপাশে তাকিয়ে গাছ-গাছড়ার জঙ্গলের ভেতরে এখনো দুয়েকটা গাছে অন্যরকম ফল চোখে পড়লো। গাছ খুঁজতে তো আসেনি যা খুঁজতে এসেছে সেটাই করার নেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। সুন্দর বাঁধানো পুকুর ঘাঁেটর আশেপাশে খুঁজে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে-ধীরে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচের দিকে।

পুকুরের বাঁধানো ঘাট থেকে দুইপাশে দুইটা পাথওয়ের মতো এগিয়ে গেছে। দূর থেকে দেখতে জিনিসটা অনেকটা লাগে ইংরেজি আক্ষর ‘ট’ এর মতো। দুইপাশে দেখতে-দেখতে ইউ এর দুই মাথার একটার একেবারে কিনারায়

চলে এল ও। ইউয়ের মাথা দুটো আবার অষ্টভূজ আকৃতির। ওর মন বলছে এই পুকুর পাড়ে কিছুই পাওয়া যাবে না। ইউ এর মাথায় এসে বসে পড়লো ও। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো। রোমন্থন করতে লাগলো ছোটবেলার স্মৃতি।

ছোট খালা ওকে ভীষণ আদর করতো। বলতে গেলে কখনো কখনো ওর মায়ের চেয়েও বেশি। ওরা গ্রামে থাকতো, ওকে নিয়ে মাঝ মাঝে শহরে আসতো। এটা-ওটা কিনে দিতো। আর বিশেষ করে এখানে পড়ার সময়ে প্রায়ই ওকে নিয়ে আসতো রাজবাড়িতে। খালা ক্লাস করতো আর ও বসে থাকতো বাইরে কিংবা এই পুকুর পাড়ে। ওর মনে পড়লো, এখানে একটা বুড়ো দারোয়ান ছিল, সে ওকে এই রাজবাড়ি নিয়ে নানা গল্প শোনাতো। বিশেষ করে এই পুকুর নিয়ে। এই পুকুরের তলায় নাকি সিন্দুক আছে। সেগুলো নাকি জ্বিন পাহারা দিয়ে রাখে। এই রাজবাড়ির কোথায় নাকি একটা সুরঙ্গ পথ আছে যেটার ভেতর দিয়ে নাকি মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যায়।

হঠাৎ ওর ওই বুড়ো দারোয়ানের একটা কথা মনে পড়লো। সে বলতো এই পুকুর পাড়েই নাকি এই ইউয়ের নিচে একটা বড় লোহার আংটা আছে সেটা ধরে টান দিলে নাকি এই সুরঙ্গের মুখ খুলে যায়। মনে-মনে বাশার হাসলো, ছোটবেলা এসব গাল-গল্প গোগ্রাসে গিলতো ও। সিগারেটের মোথাটা পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে হঠাৎ ছোটবেলার সেই কৌতুহল জেগে উঠলো ওর মনে। আছে নাকি ইউয়ের শেষ মাথার সেই আংটা।

ইউয়ের একেবারে কিনারায় বসে নিচের দিকে উঁকি দিলো ও। হালকা সবজে রঙের পরিষ্কার পানি। প্রায় স্থিরই বলতে গেলে। সবজে রঙের সেই স্থির পানির ভেতরে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে কালচে রঙের লোহার ডান্ডাটা পরিষ্কার দেখতে পেল ও। ইউয়ের শেষ মাথাটা ঠিক যেরকম অষ্টভূজ আকৃতির। লোহার ডান্ডাটার শেষ মাথাটাও ঠিক সেরকমই অষ্টভূজ আকৃতির। মাথা উঁচু করে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলো ও নিজের এই আবিষ্কারে। এবার হেঁটে চলে এল ইউয়ের অন্য মাথায়। এবারও মাটিতে একেবার শূয়ে পড়ে উঁকি দিলো নিচের দিকে। এবার একটু হতাশ হয়ে আবিষ্কার করলো এটাতে ওরকম কিছু নেই। একটু হতাশ হয়েই উঠে বসতে যাচ্ছিলো হঠাৎ ওর গা শিউরে উঠলো একটা কথা মনে করে।

“কি ব্যাপার? কি করছো তুমি?” হঠাৎ পুকুরের অন্য পাড় থেকে জয়ার ডাক শুনে চমকে উঠলো ও। “এদিকে এসো একটা জিনিস দেখাই,”

জয়াকে ডাক দিলো ও।

“আমি তো কিছুই পেলাম না, এভাবে খুঁজে আসলে...” জয়ার কথা শেষ করতে না দিয়ে বাশার বলে উঠলো। “রিফাত কোথায়? ওকেও ডাকো একটা জিনিস দেখাতে চাই। জয়ার কল পেয়ে ঘেমে নেয়ে একাকার রিফাত একটু পরেই এসে হাজির হলো। “কি ব্যাপার, কিছু পেয়েছো নাকি? আমি তো এতোবড় বাড়ি খুঁজে-খুঁজে হয়রান।”

“কিছু পেয়েছি কিনা জানি না তবে একটা জিনিস দেখাতে চাই। তার আগে একটা মিথ শুনে নাও,” বলে ও ছোটবেলার ঘটনাটা খুলে বললো। “এখন এদিকে এসো। ও প্রথম ইউয়ের মাথায় এসে আংটাটাকে যেখানে দেখেছিল সেদিকে নির্দেশ করে দেখতে বরলো দুজনকেই। “কই আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না...” বলেই জয়া থেকে গেল। “শিট, ওইতো।”

“হ্যা, আছে। কিন্তু এটা দিয়ে তো কিছু প্রমাণ...” রিফাতের কথার আগেই বাশার ওদেরকে অন্য ইউটার শেষ মাথায় আসতে বললো। “এবার এখানে দেখ,” বলে একই দিকে নির্দেশ করলো।

অনেক্ষণ তাকিয়ে থেকে দুজনেই প্রায় একই সাথে জানালো তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। “কিছুই নেই, তাই না?” বাশার তাকিয়ে আছে দুজনার দিকে।

“না নেই, বাশার তুমি কি বলতে চাচ্ছো পরিষ্কার করে বলো।”

“প্রথম ইউয়ের নিচে যে অষ্টভূজের আংটাটা দেখছো হিসেব অনুযয়ি দ্বিতীয় ইউয়ের নিচেও ওরকম একটা আংটা থাকার কথা কিন্তু নেই। কিন্তু এরকম একটা আংটা আমি দেখেছি সম্প্রতি। কোথায় জানো। পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার করা ডেভিডের গাড়ির অন্যন্য জিনিসপত্রের সাথে। আমি নিশ্চিত ওই আংটার সাথে এটার কোননা কোন সংযোগ আছে।”

দুজনেই চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

***

“ব্যাপারটা খেয়াল করো, ডেভিড ফিরে গেল ব্যাগটা হাতে নিয়ে। সে ফিরে এল সুট্যের গায়ে ডান হাতটা মুছতে-মুছতে। তারমানে হতে পারে সে এমন কোন জায়গায় জিনিসটা রেখেছে বা রাখার জন্যে কিছু একটা করতে হয়েছে যাতে তার হাত ভিজেছে। তো এই জায়গা হতেই পারে,” বাশার রিফাতের মোবাইলের ভিডিওটা আবারো অ্যানালিসিস করে সবাইকে দেখালো। ওরা এখনো সেই পুকুরপাড়েই বসে আছে।

সন্ধ্যে আসন্ন। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে পাঠানো হয়েছে নতুন বাজার ল্যাবে। সেখান থেকে জিনিসটা এনে পরীক্ষা করে দেখা হবে। তবে তার আগে অবসর সময়ে ওরা ভিডিওটা আবারো অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করছে। বার-বার দেখতে দেখতে যদি আরো কিছু বেরিয়ে আসে। একটা জিনিস ওরা যদিও বের করতে পেরেছে।

“এটাতে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেটা শুধুই একটা হাইপোথিসিস,” একটা মানুষ তার কোটের গায়ে একশ একটা কারণে হাত ঘসতে পারে। সেটা পানি মোছার জন্যেই হবে এমন নাও হতে পারে,” কথাটা বলে জয়া বাশারের দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলো। “তুমি যা বলছো সেটার প্রমাণ হয়ে যাবে আবদুল্লাহরা ফিরে এলেই। দেখা যাক। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেক্ষেত্রে ওই আংটাটা সে বাইরে নিলো কিভাবে?”

“আশ্চর্য কথা বলো, খুব সহজেই সেটা কোটের ভেতরে ভরে নেয়া সম্ভব।”

বাশার কড়া গলায় কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা। আবদুল্লার হাতে পত্রিকায় মোড়ানো কিছু একটা। সেটা সে বাড়িয়ে দিলো বাশারের দিকে। বাশার জিনিসটা নিয়ে হাতে ধরে একটু ওজন করলো। পেপারে মোড়ানো হলেও জিনিসটা লম্বায় দেড় ফিটের বেশি হবে না কিন্তু সে-অনুযায়ি এটার ওজন একটু বেশিই। পত্রিকার ভাঁজ খুলে পুকুর পাড়ের মার্বেল বেঞ্চের ওপরে রাখলো ও। লোহার তৈরী জিনিসটা একটা রডের মতো দেখতে কিন্তু পার্থক্য আছে। রডটার আকৃতি অস্টভূজের মতো আবার লম্বা মোটা রডের মাথায় অষ্টভূজ আকৃতির একটা গোলক। “দেখা যাক,” কথাটা জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে ও পুকর পাড়ের ইউয়ের শেষ মাথায় গিয়ে টুপি খুলে পাশে রাখলো। একেবারে শুয়ে পড়ে দুই হাত লম্বা করে ঘাটের নিচের দিকে ঠেলে দিলো রডটাকে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হাতড়েও কিছুই পেল না। বরং অরেকটু হলেই পড়ে যেতে বসেছিল পানিতে।

“এভাবে হবে না,” বলে ও পরনের শার্টটা খুলে ফেলে অবদুল্লাকে ডাক দিলো। “আমি শরীরটাকে পানির নিচের দিকে নিয়ে যাবো তুই শক্ত করে আমার দুই পা আর কোমর ধরে রাখবি যাতে আমি পড়ে না যাই। আবদুল্লাহ মাথা নাড়লো। তার সাথে রমিজ দারোগাও এসে যোগ দিলো। বাশার শক্ত ক’রে দুইহাতে জিনিসটাকে ধরে মাথা নামিয়ে দিলো পানিতে। পায় কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল সবজে রাঙের শীতল পানিতে। পানির নিচে কয়েকবার চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি স্বাভাবিক করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। তারপর মনোযোগ দিলো ঘাটের নিচের দিকে। ইউ আকৃতির মার্বেলের পালিশিং যেখানে শেষ হয়েছে সেটানে একটা লোহার তৈরী কিছু দেখা যাচ্ছে। ওটার ঠিক মাঝখানে গোলচে টাইপের শ্যাওলা ধরা একটা ছিদ্র। জিনিসটা খুঁজে বের করতে-করতেই দম ফুরিয়ে গেল ওর। পা ছুঁড়তেই ওকে টেনে তুলে ফেললো। ওপরে।

“কিছু পেলে?” রিফাত জানতে চাইলো। জবাব না দিয়ে আবারো পানিতে ডুব দিলো ও। এবা দুই হাতে ধরে শরীরটাকে যতোটা সম্ভব নিচের দিকে নামিয়ে লোহার তৈরী জিনিসটার রডের মতো অংশটা ঠেলে দিলো সেই শ্যওলা ধরা গহŸরের ভেতরে। প্রথমে ঢুকতে না চাইলেও ঠেলাঠেলি করে শ্যওলা কমে যেতেই একেবারে খাপা-খাপে ঢুকে গেল জিনিসটা। হাঁপাতে-হাঁপাতে ওপরে উঠে এল বাশার। “একেবারে...একেবারে খাপে-খাপে বসে গেছে জিনিসটা,” হাঁপাতে হাঁপাতেই বলতে লাগলো সে।

“কই দেখি, ” বলে রিফাত এগিয়ে গেল ইউয়ের শেষ প্রান্তে, সাথে জয়াও আছে। প্রথমে ওদের দুজনের কেউই দেখতে পেল না কিছুক্ষণ পরে অবশ্য চোখ পড়লো সেদিকে। “কিন্তু এটাতো বাঁকা হয়ে আছে, মানে অন্যপাশের অষ্টভূজটা যেরকম ওরকম না মোটেই,” ওদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো রিফাত।

“হ্যা, সোজা করতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের কাজ। আবদুল্লাহ,” বলে আবারো পানির নিচে হাত ঢুকিয়ে দিলো। এবার আর শরীর ঢোকাতে হলো না। অষ্টভূজের দুইপ্রান্ত শক্ত করে ধরে সর্বশক্তিতে মোচড় দিলো। আরো জোরে আরো জোরে। প্রাণপণ ঠেলেই একবিন্দু নাড়াতে পারলো না অষ্টভূজের রিংটা। সোজা করা তো দূরেই থাক।

“ওর বাপরে,” দম, ফুরিয়ে হাঁপাতে লাগলো বাশার। একটু নড়লোও না।”

“স্যার, আমি হাত লাগাই,” বলে এগিয়ে এল রমিজ দারোগা। এই লোক নিজ থেকে কাজ করতে চাইছে। বাশার অবাক হলেও তাকে এগাতে বললো। এবার বাশার আর সে দুজনে মিলে পানিতে হাত ডুবিয়ে অষ্টভুজের রিংটা দুদিক থেকে ধরে সর্বশক্তিতে মোচড় দিলো। প্রথমে মনে হলো এবার বুঝি জিনিসটা দুজনেরই শক্তিতে পরাজিত করবে কিন্তু ধীরে-ধীরে চাপ বাড়াতে বাড়াতে একটু নড়ে উঠলো রিংটা, তারপর ধীরে-ধীরে মাটিতে লাঙল চলে যে গতিতে সে-গতিতে ঘুরতে শুরু করলো। ওরা আরো চাপ বাড়ালো। ঘুরতে ঘুরতে সোজা হয়ে এল মাবের্লের সাথে সমান্তরালে চলে এল অষ্টভূজের রিং। একেবারে স্থির হয়ে গেল একসাথে।

দুজনেই হাঁপড়ের মতো হাঁপাতে লাগলো ঘাটের ওপরে সোজা হয়ে। “বাবারে বাবা, পানির পাম্পে ইস্টার্ট দিতেও এমুন শক্তি লাগে না,” কিছু না বলে নীরবে মাথা নেড়ে রমিজ দারোগার কথার সাথে সম্মতি জানালো বাশার। জবাব দেয়ার শক্তি নেই।

“কিন্তু ওটা বসালেই বা লাভটা হলো কি? কিছুই তো টের পাচ্ছি না...” জয়ার কথা শেষ হবার আগেই পুকুরের পনিতে মৃদু তরঙ্গ খেলা করে গেল। ধীরে-ধীরে পুকুরের ঠিক মাঝ বরাবর তৈরী হচ্ছে ছোট্ট একটা পাক।

“ও... ওটা কি?”

পুকুরের পাক ধীরে-ধীরে ঘুরতে ঘুরতে একটু থেকে আরেকটু বড় হলো তারপর প্রায় একটানে পুকুরের পানির উচ্চতা কমে গেল যেন কয়েক ইঞ্চি। ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে আসতে লাগলো পানি। আর সেইসাথে আশেপাশের কোথা থেকে যেন ঘড়-ঘড় শব্দ ভেসে আসতে লাগলো।

“ওদিকে,” বলে পুকুরের পাশেই বিরাট স্নানাগারটা দেখালো রিফাত। ঘর-ঘর শব্দটা ভেসে আসছে ওদিক থেকেই। আরো কিছুক্ষণ ঘর-ঘর শব্দ করে থেমে গেল। প্রথমে জয়া আর রিফাত রওনা দিলো ওদিকে। ওদেরকে অনুসরণ করলো আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা, সবশেষে বাশার। যখন স্নানাগারের ভেতরে পৌছালো ওটার ভেতরে ঢুকে দেখলো সবাই দাঁড়িয়ে আছে। স্নানাগারের একটা অংশের মেঝের বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে একটা ছোট্ট করিডরের মতো চোখে পড়ছে মাটির নিচের দিকে। “সর্বনাশ। একটা গোপন প্যানেল,” কথাটা আনমনেই বেরিয়ে গেল বাশারের মুখ দিয়ে।

***

বাশারের মুখ দিয়ে কথাটা উচ্চারিত হতেই মৃদু হাসি ফুটে উঠলো কানে হেডফোন লাগানো গাড়িতে বসা একজন মানুষের মুখে। যাক মনে হয় কাজ হতে যাচ্ছে অবশেষে। এই গাধাগুলো কিছু একটা বের করতে পেরেছে। অবশ্য যেভাবে ওরা জিনিসটা বের করতে যাচ্ছে সেটা জানার পর সবাইকে সাধুবাদ দেয়া যেতেই পারে। মনে-মনে সে ভাবলো কতগুলো বছর সে অপেক্ষা করেছে এরকম কিছুর জন্যে। একরকম বলতে গেলে তার সারাজীবন সে ঢেলে দিয়েছে এরকম কিছুর আশায়। অবশেষে সেটা ঘটতে যাচ্ছে। মোবাইলটা আনলক করে সে কল দিলো একটা নির্দিষ্ট নম্বরে। তারপর নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশের ভঙ্গিতে বলে উঠলো, “সবাই প্রস্তুত হও। এবার আমরা কাজে নামবো।”

অধ্যায় তেত্রিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

বৃহত্তর মধুপুর এলাকা, ময়মনসিংহ

যজ্ঞের কাজে নামে আগে সবসময় একই উত্তেজনা কাজ করে ফিরিঙ্গীয়ার ভেতরে। ।

কারণ যজ্ঞ মানেই এলাহি কাজ-কারবার। তবে আজকের যজ্ঞটা বিভিন্ন কারণে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকের যজ্ঞে কয়েকটা ব্যাপার একসাথে ঘটতে চলেছে। যজ্ঞ পালনের সাধারণত তিনটে অংশ থাকে।

প্রস্তুতি, সম্পন্নকরণ আর ভোজ।

তবে আজকের যজ্ঞে বাসনার মাত্রা অনেক বেশি, যে-কারণে এই তিনটের বাইরেও আরো দুটো অংশ যোগ করা হবে আজ; বলি আর শপথ।

যজ্ঞের প্রস্তুতি হিসেবে সময় নেয়া হয় এক সপ্তা, কখনো কখনো দু-হপ্তা কিন্তু এবারের যজ্ঞের জন্যে সময় পাওয়া গেছে ¯ফে একদিন। কারণ যজ্ঞের সময় মেলানোর জন্যে দুটো ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দিনটা সপ্তাহের মঙ্গল, বুধ কিংবা শুক্রবার হতে হবে, সেইসাথে সময়টা হতে হবে চন্দ্র তিথী। তবে সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সময়টা হতে হবে একবার পথে নামার পর অন্যবার পথে নামার মাঝখানে যে অবসর থাকে সেই সময়। গতবার সফলভাবে পথে নামার পর হিসেব করে দেখা গেছে একদিন পরেই বুধবার, সেইসাথে চন্দ্রতিথীও বটে। তাই একদিনেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বাধ্য হয়েছে ওরা। তবে অনেক বয়ষ্ক লোকের এতে আপত্তি ছিল কিন্তু ফিরিঙ্গীয়া কোন আপত্তি শোনার মানুষ নয়। পথ থেকে ফিরে এসে দিন গনণা করে যখন জানা গেল একদিন পরেই সময়, সে ¯ফে কয়েকঘন্টা বিশ্রাম নিয়েই কাজে লেগে গেছে। নিজেদের বসতবাড়ি থেকে গোপন পথে চলে এসেছে মন্দিরে। মন্দিরের প্রাঙ্গনেই আগুন জ্বেলে লোহা গরম করে তৈরী করেছে বিশেষ কোদাল।

এই কোদালই হলো ওদের দলের মূল প্রতীক- মা ভবানীর আশীর্বাদ। পেহলু, মানে রুমাল, সিক্কা মানে সেই রুমালের ভেতরে দেয়া কয়েন আর কাসসি মানে কোদাল এই তিনটেই সরাসরি মা ভবানীর আশীর্বাদ।

কথিত আছে পৃথিবীতে তখন রক্তবীজ দানবদের উৎপাত চলছিল। তাদের অত্যচারে পৃথিবী অতিষ্ঠ। এমনকি দেবী মাতা খোদ তাদের সাথে লড়াইয়ে অবসন্ন, কারণ রক্তবীজদের আঘাত করলে এদের দেহনিসৃত রক্ত মাটিতে পড়তেই সেখান থেকে আরো শত-শত রক্তবীজের উৎপত্তি হয়। এদের সাথে লড়াইয়ের ক্লান্ত-অবসন্ন দেবী মাতা যখন বিপর্যস্ত তখন তার দেহ নিসৃত ঘাম থেকে জন্ম হয় দুই অনুচরেরর। এরাই মানুষ। দেবী মাতা তাদের দেখে খুশি হয়ে নিজের কাপড়ের একফালি মানুষদের হাতে উঠিয়ে দিয়ে বললেন, এটাই তাদের অস্ত্র এটা দিয়েই তাদের শত্রু বধ করতে হবে।

অস্ত্র হিসেবে কাপড়ের ফালি দেবার পেছনে কারণ ছিল এটা দিয়ে খুন করলে শত্রুর রক্তপাত হবে না-রক্তবীজদের সাথে লড়াইয়ে এই ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুচরেরটা দেবীর আশীর্বাদে সেই ফালি দিয়ে রুমাল তৈরী করে রক্তবীজদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। সেই লড়াইয়ে বীনা রক্তপাতে তারা একে-একে ফাঁস পরিয়ে ধ্বংস করলো সব রক্তবীজদের। যুদ্ধ শেষে দেবী মাতা এই রুমাল চিরতরে তাদের হাতে উঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যারা দেবীর অপমান করে, যারা শত্রুকূলের সৃষ্টি, যারা তোমাদের পাথেয়র যোগানদার তাদেরকে এই রুমাল দিয়ে হত্যা করবে। সেইসাথে দেবীমাতা নিজের একটা দন্ত খুলে দিয়ে বললেন, ‘এই রইলো তোমাদের মাটি খোড়ার হাতিয়ার; কোদাল। ফাঁস দিয়ে শত্রু নিধন করে কোদাল দিয়ে কবর খুড়ে মৃতদেহ কবরে রাখবে’।

সেই থেকে কোদাল হয়ে দাঁড়ায় ওদের প্রতিটি দলের প্রতীক, দেবীর আশির্বাদপুষ্ট হাতিয়ার। তবে প্রতিবার পথে নামার আগে নতুন ক’রে কোদালকে মন্ত্রপূত করে দেবীর আশীর্বাদ পুষ্ট করতে হয়, সেটাই এই যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য।

ফিরিঙ্গীয়া দলের নেতা হিসেবে নিজ হাতে আগের দিনে তৈরী করেছে কোদাল। তৈরী হবার পর মন্দিরে জোড়া দেবীর পায়ের কাছে পবিত্র স্থানে রেখেছে কোদালটা। মাত্র পাঁচ থেকে ছ-ইঞ্চি লম্বা কোদাল, সের দুয়েকের মতো ওজন, কোন হাতল নেই। এইটাই ওদের দলের প্রতীক হতে যাচ্ছে।

সারারাত দেবী মাতার পায়ের কাছে রাখার পর শুভ সময় দেখে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। আগে ওরা বাড়ির ভেতরেই করতো কিন্তু এখন জোড়াদেবীর মন্দিরে দেবী মাতার বেদীর সামনেই গোল হয়ে বসেছে সবাই। এরা সবাই অভিজ্ঞ-পোড় খাওয়া-শক্তিশালী খাঁটি ঠগী একেকজন।

ভারতবর্ষে প্রচলিত ঠগীদের ভেতরে এই দল হলো সেরাদেরও সেরা। কারণ বেশিরভাগ ঠগীই সংসার ধর্ম করলেও এরা করে না। মা ভবানীর অনুকম্পাই এদের একমাত্র প্রাণসঞ্চারণী। দলের সবার প্রাণ কেন্দ্রে বসে আছে থুত্থুরে বুড়ো একজন। এই লোকই আসলে দলের প্রকৃত নেতা। ফিরিঙ্গীয়া তারই পালক সন্তান কিন্তু সে অথর্ব হয়ে পড়াতে এখন ফিরিঙ্গীয়াই দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা।

মন্দিরের প্রবেশ পথ এখন বন্ধ, ভেতরের রুদ্ধদ্বারে দেবীমাতার পায়ের কাছে সবাই গোল হয়ে বসে যেতেই উঠে দাঁড়ালো ফিরিঙ্গীয়া। দলের নেতা হিসেবে এবার তার কর্মকান্ড শরু হবে।

পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি দীর্ঘ ফিরিঙ্গীয়ার সুঠাম পেশীবহুল দেহটা বিশেষ তেল লাগানোর ফলে একেবারে চকচক করছে। তার পায়ে লাল ধূতি, মাথায় সাদা পাগড়ি, কপালে তিলক। উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে সে দেবী মাতার পায়ের কাছে গিয়ে একেবারে নত হয়ে কোদাল ঢেকে রাখা লাল কাপড়টা সরিয়ে দিলো। দুহাতে বিশেষ কায়দায় কোদালের মুখ দক্ষিণ দিকে রেখে উল্টো হাঁটতে লাগলো গোল হয়ে বসে থাকা লোকগুলোর মাঝামাঝি। দেবী মাতার দিকে পেছন ফেরা বেয়াদবি। সে উল্টো হেঁটে গোল বৃত্তের ঠিক কাছাকাছি এসে থেমে গেল। শরীরটা সামান্য একটু ঘুরে গেল দক্ষিণ দিকে, সেইসাথে তার শরীরটা বাঁকা হয়ে একটু ঝুঁকে এল সামনের দিকে। বৃত্তের মাঝখানে আগে থেকেই একটা ছোট গর্ত করে রাখা হয়েছিল সেটার ওপরে ধরতেই আরেকজন বয়স্ক ঠগী কোদালটাকে ধীরে-ধীরে পরিষ্কার জলে ধুয়ে দিলো। তার ধোয়া শেষ হতেই আরেকজন উঠ এল, এবার সে আরেকটা পাত্র নিয়ে কোদালটাকে ধুয়ে দিলো চিনি জলে, একই প্রক্রিয়ার পূনরাবৃত্তি হলো আরো দুবার; একবার ঘোল দিয়ে, সবশেষে মদ দিয়ে।

ধৌতকরণ শেষ হতেই একজন এসে গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে ওটার ওপরে তৈরী করলো একটা ছোট অগ্নিকুন্ড, অগ্নিকুন্ড তৈরী করতে করতে ওদিকে সদ্য ধোয়া কোদালকে সাতটি সিদূরের ফোটায় সজ্জিত করা হয়েছে। সিদূর দেয়া হতেই সেই কোদাল অগ্নিকুন্ডের ওপরে এসে সাতবার সেঁকে অগ্নিশুদ্ধ করা হলো। অগ্নিশুদ্ধ হয়ে যেতেই এতোক্ষণ গোল হয়ে থাকা বৃত্তটা জোড়া

দেবীর দিকে মুখ করে অর্ধবৃত্তাকারে বসে গেল। আর দলনেতা ফিরিঙ্গীয়া অগ্নিশুদ্ধ কোদাল হাতে এগিয়ে গেল বেদীর দিকে।

যজ্ঞের এই অংশটাই সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ। কারণ এবার কোদালের শক্তি পরীক্ষা করা হবে। পাশ হলে এইটাই হবে দলের প্রতীক। ফেল হলে এতোক্ষণ যা করা হয়েছে সব ব্যর্থ। আবারো নতুন দিন-তারিখ ঠিক করে নতুন করে করতে হবে সব। ফিরিঙ্গীয়া পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বেদীর দিকে। জোড়া দেবীর পায়ের কাছে একটা ছোবড়া ছাড়ানো নারিকেল রাখা আছে। কোদালের কোপে সেটাকে নিখূত দু'টুকরো করতে হবে। ঠিকমতো দু-টুকরো না হলেও সব ব্যর্থ আবার একাধিক টুকরো হয়ে গেলেও সব ব্যর্থ।

ফিরিঙ্গীয়া মন্ত্রপূত কোদালটা দুহাতে উঠিয়ে ধরলো মাথার ওপরে, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে নামিয়ে আনলো নারকেলটার ওপরে। স্বস্তির সাথে দেখলো নারকেলটা নিঁখূত দু'টুকরো হয়ে গেছে। আবেগে চোখে জল চলে এল ফিরিঙ্গীয়ার। দেবীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো সে, দেবীর আশীর্বাদ আছে তার ওপরে। দলনেতা হবার পর থেকে সবার অমতে সে বার-বার যে-ঝুঁকি নিয়েছে, বারবার বিপদে ফেলেছে তার দলের লোককে সেটা ঠিকই ছিল। দেবী মেনে নিয়েছেন সব। নারকেল দু'টুকরো হতেই সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, 'জয়, মা-ভবানী, জয়, মা-ভবানী'।

ফিরিঙ্গীয়া উঠে দাড়াতেই একজন এসে তার হাত থেকে কোদালটাকে নিয়ে গেল। এটা এখন প্রাণ সঞ্চারিত, অগ্নীশুদ্ধ, দেবীর অশির্বাদপুষ্ট কাসসি। এখন থেকে এটাকে কেউই আর কোদাল বলবে না, সবাই এটাকে 'কাসসি' নামেই ডাকবে। পথে নামার আগে এটাকে পবিত্র কোন স্থানে রাখা হবে, যাতে কারো দৃষ্টি, হাতের ছোয়া কিংবা পায়ের নিচে না পড়ে। সেটা হলে দেবী রুষ্ঠ হবেন। এখন থেকে এই কাসসিই হবে তাদের দলের পথ নির্দেশক, তাদের দলের প্রতীক। ঠগীরা মনে করে পথে নামার পর তাদের সাফল্য ব্যর্থতার অনেকটাই নির্ভর করে এই কাসসির ওপরে।

যজ্ঞের এই পর্যায়ে সাধারণত ওরা আবারো গোল হয়ে বসে যায়। তারপর তাদেরকে পরিবেশন করা হয় তুপানির গুড়। কিন্তু আজ যজ্ঞে একটু পরিবর্তন আনা হবে। কারণ আজ একজন নতুন ঠগীর শপথ করানো হবে। ফিরিঙ্গীয়া সোজা হয়ে দুবার তালি দিলো। তার তালি দেয়ার কিছুক্ষণের ভেতরেই। মন্দিরের দুদিকের মূল প্রবেশপথ দিয়ে কয়েকজন প্রবেশ করলো। একজন সামান্য নিচু হয়ে হাঁটছে তার একহাতে ধরে রাখা একটা সাদা রঙের ছাগল। সে ছাগলটাকে নিয়ে এসে দেবী মাতার পায়ের কাছে

একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে চলে গেল। অন্যদিক থেকে আরেকজন প্রবেশ করলো তার সাথে সদ্য কৈশোর পেরনো এক যুবক। বয়স বেশি না হলেও ইতিমধ্যেই তাকে দুবার পথে নামতে হয়েছে অন্যদের সাথে। এই দুইবারেই সে নিজের সাহস আর মনের জোর প্রমাণ করেছে। এবার তাকে ঠগী হবার জন্যে সর্বশেষ শপথ নিতে হবে।

সদ্য গোসল করানো সাদা ধূতি-পাগড়ী আর লাল তিলক পরানো ছেলেটাকে এনে দেবীর পায়ের কাছে বসিয়ে দেয়া হলো। ফিরিঙ্গীয়া এক কলসি পানি হাতে ছাগলটার সামনে এসে মন্ত্র পড়তে-পড়তে পরিষ্কার পানির সবটাই ধীরে-ধীরে ঢেলে দিলো ছাগলটার গায়ে। পানি ঢেলে দিতেই প্রসন্ন চিত্তে সে দেখলো ছাগলটা গা ঝাড়ছে। মনে-মনে সে ভাবলো, যাক দেবীর সমর্থন আছে, ছাগলটা চুপ-চাপ থাকলে বোঝা যেত দেবী খুশি নয়।

দেবীর প্রসন্নতা অনুভব করে সে বেদীর সামনে থেকে একটা খগড় উঠিয়ে নিয়ে তাতে তিলক মাখালো। এরপর সেটাকে ধরিয়ে দিলো সেই যুবকের হাতে। এবারই যুবকের ঠগী হবার অন্তিম পরীক্ষা। তাকে এক কোপে ছাগলের মাথাটা ধর থেকে আলাদা করতে হবে। যদি সেটা সে নির্ভয়ে করতে পারে তবে তাকে শপথ করিয়ে অন্যদের মতোই তুপানির গুড় খেতে দেয়া হবে। আর একবার যে তুপানির গুড় খাবে সে জন্মের মতো ঠগী হয়ে যাবে। আর যদি সে এক কোপে সাহসের সাথে ছাগলের মাথা আলাদা করতে না পারে তবে তাকে আবারো দীক্ষার জন্যে তৃতীয়বারের মতো পথে নামানো হবে, এরপর আবারো যজ্ঞ আবারো বলি দেয়া, দ্বিতীয়বারের মতো যদি সে বলি দিতে ব্যর্থ হয় তবে তাকেই বলি দেয়া হবে দেবীর চরণে। অথবা তাকেও ফাঁস পরিয়ে অন্যন্য শিকারের মতোই ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে।

ছেলেটা খগড় হাতে ছাগলটার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত ফিরিঙ্গীয়া কোন ধরণের মায়া অনুভব করে না কিন্তু এই ছেলেটার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। কারণ একে দীক্ষা দিয়েছে সে নিজে। কাজেই এর ব্যর্থতা তাকে কষ্ট দিবে। আর সফলতা এনে দিবে প্রসন্নতা।

ফিরিঙ্গীয়া বুকে দুই হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলো। ছেলাটা খগড় মাথার ওপরে তুলে সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলো ছাগলটার ওপরে। ছিটকে পড়লো ছাগলের রক্তাক্ত সাদা মাথা। ফিরিঙ্গীয়া নিজের ভেতরে একই সাথে স্বস্তি আর উল্লাস অনুভব করলো। পেছন থেকে অর্ধবৃত্তাকারে বসে থাকা

মানুষগুলো সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, ‘জয় মা-ভবানী, জয় মা-ভবানী’। ফিরিঙ্গীয়া আনন্দের সাথে খেয়াল করলো ছেলেটা যেভাবে রক্তাক্ত খগড় আর ছাগলের কাটা মাথাটা দেখছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় এই ছেলে একদিন অসাধারণ ঠগী হবে। ফিরিঙ্গীয়া শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

দুজন এসে ছাগলটাকে নিয়ে গেল আর কাটা মাথাটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখলো জোড়া-দেবীর পায়ের কাছে। ফিরিঙ্গীয়া ছেলেটাকে এনে বসিয়ে দিলো অর্ধবৃত্তের এক প্রান্তে। নিজে এসে বসে পড়লোা বৃত্তের মাঝখানে। একেবারে মাঝখানে বসে আছে দলের প্রকৃত নেতা, তার বাপ। এখনো ফিরিঙ্গীয়া নিজে একেবারে কেন্দ্রে বসার অনুমতি পায়নি। যতোদিন সে পরোপুরি দলনেতা না হচ্ছে ততোদিন পাবেও না। ফিরিঙ্গীয়া বসে একবার ইশারা করতেই যজ্ঞের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়ে গেল। তাদের অর্ধবৃত্তের সামনে চুন আর হলুদ দিয়ে একটা চৌক ছক কেটে রাখা হয়েছিল আগেই। সবাই বসে যেতেই সেটার ওপরে মাপে মাপে সুন্দর পরিষ্কার একটা কাপড় বিছিয়ে সেটার ওপরে একটা নারকেল মালার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হলো। প্রদীপটাতে দুটো সলতে দেয়া হয়েছে তবে আগুন জ্বলছে চারটে শিখায়, কারণ প্রতিটি সলতের দুই দিকে ধরানো হয়েছে আগুন। আগুন জ্বালানোর পর শুরু হবে যজ্ঞের সবচেয়ে আকাঙ্খিত ব্যাপার।

তুপানির গুড় পরিবেশন।

ঠগীরা মনে করে এই তুপানির গুড় একবার যে খেয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে সে চিরকালের মতো ঠগী হয়ে গেছে। তুপানির গুড় পরিবেশনের পর ওরা ‘ঝিম’ দিবে। ঝিমের পর আলোচনা, তারপর ছাগলের মাংস আর সাদা ভাত দিয়ে ভোজ।

পরিষ্কার মাটির সানকিতে করে একজন তুপানির গুড় নিয়ে আসতেই ফিরিঙ্গীয়ার বাপ উঠে দাঁড়ালো। সবসময় দলতেনাই দলের সবাইকে গুড় খায়িয়ে দিবে, এটাই নিয়ম। এমনকি ফিরিঙ্গীয়াও চাইলে দলের দ্বিতীয় নেতা হিসেবে এটা করতে পরবে না।

ফিরিঙ্গীয়ার বাপ প্রথমেই শানকি থেকে এক টুকরো গুড় তুলে ফিরিঙ্গীয়ার হাতে দিলো। এরপর শপথ গ্রহণকারীকে দিতে হবে। ফিরিঙ্গীয়া গুড়ের টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে কিছুক্ষণ ওটার মিষ্টি আবেশে আবেশিত হয়ে রইলো। ছোট্ট নরম এক টুকরো খয়েরি রঙের বস্তু। মুখে পুরে দিতেই মুখের

ভেতরে গলে গেল। হালকা তিতকুটে একটা মিষ্টি ভাব সরাসরি গিয়ে ধাক্কা মারলো তার মস্তিষ্ক আর নার্ভ সিষ্টেমে। নেশাতুর বিভোরতায় হারিয়ে যাবার আগে একবার চোখ পড়লো নতুন ছেলেটার দিকে। চোখ বন্ধ করে বিভোর হয়ে সে তুপানির গুড়ের স্বাদ ভোগ করছে। সে নিজেও গুড়ের মিষ্টি রস আহোরন করতে করতে তিতকুটে মিষ্টি রসের জগতে হারিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল নিজের ঠগী হবার অভিজ্ঞতা।

অধ্যায় চৌত্রিশ

বর্তমান সময়

শশীলজ, কাচারি রোড, ময়মনসিংহ

“তাজ্জুব ব্যাপার! এইরহম তো কিছু দেহি নাই কুনো সময়,” রমিজ দারোগা অবাক হয়ে বলে উঠলো শশীলজের ¯œানাগারের খুলে যাওয়া অন্ধকার প্যানেলটার দিকে তাকিয়ে।

বাশার নিজেও বেশ অবাক হয়ে গেছে এরকম কিছু সে নিজেও আসলে কল্পনা করেনি। একবার প্যানেলটার দিকে তাকালো ও আরেকবার বাইরে দেখলো। শেষ বিকেলের আলো কমে গিয়ে ইতিমধ্যেই সন্ধ্যে নামতে শুরু করেছে।

“রমিজ ভাই, আবদুল্লাহ আপনারা দুজনেই বাইরে চলে যান। আমাদের জিপটাকে পুকুর পাড়ের যতোটা সম্ভব কাছাকাছি এনে রাখেন। আর শোনেন,” বলে সে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলো। “এখুনি থানায় এই ব্যাপারে জানানোর দরকার নেই। আগে দেখি কী পাওয়া যায়। একটু সাবধানে থাকবেন,” কেন জানি বাশারের মনে অজানা আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে। বার-বার গতকাল দুপুরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওই লোকটা রিফাতের বাড়িতে কিভাবে পৌছেছিল এখনো সে বুঝে উঠতে পারেনি। কাজেই সাবধান থাকতে হবে।

দুজনকেই বিদায় দিয়ে ও ফিরে এল সদ্য খুলে যাওয়া অন্ধকার প্যানেলটার মুখের সামনে। রিফাত আর জয়া মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে দেখার চেষ্টা করছে ভেতরে। “এভাবে হবে না,” বল ও পকেট থেকে ছোট কিন্তু শক্তিশালী একটা লাইট বের করলো। “আমাদেরকে ভেতরে যেতে হবে,” বাশার লাইট মেরে দেখছে ভেতরে। প্যানেলটার আকৃতি হবে চার ফিট বাই পাঁচ ফিট। গহŸরের মুখটা একেবারেই অন্ধকার। তবে ওটার দিকে তাকিয়ে বাশারের খুব বেশি বড় মনে হলো না প্যানেলটা। “আমি ভেতরে ঢুকছি। চাইলে তোমরা আসতে পারো।”

“কিন্তু যদি আটকে যায়?” রিফাতের ভয়ার্ত গলা।

“সমস্যা কি? আটকে গেলে রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহ তো আছেই,” জবাব দিলো বাশার। তার গলা একেবারেই শান্ত। “তবে হ্যা, পুরনো দিনের এইসব জায়গায় অনেক ধরণের বুবি ট্র্যাপ থাকে, কাজেই সাবধান,” বলে সে চলে এল বাশারের পেছনে। বাশার লাইট হাতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। জায়গাটাকে আসলে প্যানেল না বলে ছোট একটা করিডর বলা উচিত। বাশার লাইট হাতে ছয় সাত ফিটের মতো এগিয়ে গেল সামনেই করিডর শেষ হয়ে আসছে। করিডরটার শেষ মাথায় এসে দেখলো বামে মোড় নিয়েছে ওটা। বামে আরো কয়েক ফিট এগোনোর পর ছোট একটা কামরার মতো জায়গায় প্রবেশ করলো ওরা। একটু স্যাঁতসেতে ভাব থাকলেও এতোক্ষণ জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর শান বাঁধানো থাকলেও ছোট কামরাটাতে প্রবেশ করতেই দেখা গেল ওটার একটা পাশ ধ্বসে গেছে। মেঝে দেয়ালেরও বিভিন্ন অংশে উঠে গেছে চলটা।

“আমার মন হয় এটা জমিদারদের কোন গোপন পথ ছিল। হয়তো আসামের সেই ভূমিকম্পে ধ্বসে গেছে জায়গাটা কিন্তু এর মুখটা ঠিকই কার্যকর রয়ে গেছে,” রিফাত আনমনেই বলে উঠলো।

“আর সেই জায়গাটা ঠিকই ডেভিড তার রিসার্চে বের করে ডাকাতির সময়ে কাজে লাগিয়ে ফেলেছে,” বলে বাশার ইশারা করলো কামরাটার ভাঙাচোড়া ধ্বংসস্তুপের একপাশে। ভাঙাচোরা ¯øœ্যাব আর এটা ওটার ছোট একটা স্তুপরে পাশেই রাখা একটা কালো রঙের ব্যাগ।

“সর্বনাশ এই ব্যাগটাই তো,” রিফাতের কথাটা শেষ করে দিলো জয়া। “ডেভিডের হাতে ছিল,” বলেই সে হাঁটু গেড়ে গিয়ে বসে পড়লো ব্যাগটার সামনে। পলিথিনের খচখচে শব্দ তুলে আলগা করে ফেললো মুর্তিটার বাইরের আবরণ। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ঘনকালো রঙের একটা মুর্তি। ফিট তিনেক উঁচু মুর্তিটার এখানে ওখানে ময়লা লেগে সাদা হয়ে আছে। দুয়েক জায়গায় সবজে শ্যাওয়লাও দেখা গেল কিন্তু মুর্তিটার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে, কোথায় যেন একটা কালচে আভিজাত্য আছে, সেই সাথে যেন একটা সম্মোহনি ক্ষমতা।

মুর্তিটার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে এর কারিগরের প্রশংসা না করে পারলো না বাশার, কালীর ভেতর থেকে শক্তি, ক্ষমতা আর অন্ধকারের অন্য এক

জগতের হানছানি টের পাওয়া যায়। মনে-মনে নিজেকে গালি দিলো বাশার। কল্পনাশক্তি বেশি হয়ে যাচ্ছে।

জয়া এখনো মুর্তিটার সামনেই বসে অছে। আলতো করে হাত বুলাচ্ছে ওটার গায়ে। “এতোদিন পর, অবশেষে,” সে খুব আবেগি হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো বাশার বেরসিকের মতো বাঁধা দিলো। ভারি মুর্তিটা দুই হাতে তুলে ধরে আবারো পলিথিনি মুড়িয়ে ফেললো। “আমাদেরকে যেতে হবে। এখান থেকে যতো দ্রুত সরে পড়া যায় ততোই ভালো। চলো চলো।”

বাশার মুর্তিটা প্রথমে দুই হাতে নেয়ার চেষ্টা করলো। আকৃতির তুলনায় মুর্তিটা ভারি। ওটাকে কাঁধের ওপরে তুলে নিলো সে। রিফাতকে নির্দেশ দিলো আলো হাতে আগে থাকতে। আর জয়াকে বললো, “তুমি আগে যাও গিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে তোমার গাড়িটা পুকরের পাড়ে নিয়ে এসো।”

অনিচ্ছা স্বত্বেও সে আাগে-আগে রওনা দিলো। বাশার মাঝখানে আর রিফাত ওর পেছনে। প্যানেল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই রিফাত জানতে চাইলো। “এটা কি এভাবে খোলাই থাকবে নাকি বন্ধ করে দিতে হবে?”

এক মুহূর্ত ভাবলো বাশার। “আপাতত এরকমই থাক পরে বন্ধ করে দেয়া যাবে। আবদুল্লাহ বা রমিজ দারোগাকে বলবো এটা বন্ধ করে দিতে। আসলে এই মুহূর্তে আমি এটা নিয়ে চিন্তিত আছি,” বলে ও মুর্তিটা দেখালো। “যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে নিরাপদ কোথাও নিতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। ”

ওরা দুজনে মিলে ¯œানাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে এসে জিপ, জয়ার গাড়ি কিংবা আবদুল্লাহদের কাউকেই দেখতে পেল না ও। “কি ব্যাপার, সব গেল কোথায়?”

“হ্যালো, ম্যান,” অচেনা একটা গলা ভেসে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে সেইসাথে ধাতব এবটা শব্দ। পুলিশের চাকরি করে এই ধাতব শব্দ চিনতে না পারার কোনই কারণ নেই।

অস্ত্র লোড করার শব্দ। আওয়াজ শুনে বাশার অনুমান করলো মাঝারি সাইজের কোন অস্ত্র। পিস্তলের চেয়ে বড়, বন্দুকের চেয়ে অবশ্যই ছোট। প্রায় সাথে সাথেই অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মানুষটা। গতকালের সেই লোক। এই লোকই রিফাত সেজে ওদের সাথে কথা

বলেছিল। এই লোকের সাথেই গতকাল ওর হাতাহাতি হয়েছিল। লোকটাকে দেখা মাত্রই বাশার হাতের মুর্তিটা ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করে আনলো নিজের কোমর থেকে। একহাতে রিফাতকে আড়াল করলো নিজের পেছনে।

“আস্তে অফিসার,” বাশার দেখলো লোকটার হাতে একটা নল কাটা শটগান। এটা দিয়ে গুলি করলে শরীরে ফুটবলের সমান গর্ত হবে। যদিও অস্ত্রটা ওর দিকে তাক করা না। ওটার নল মাটির দিকে। তবুও ও চিৎকার করে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলো।

“আরে, আপনাকে বললাম না ধৈর্য ধরতে। যদিও পুলিশ হিসেবে আপনি যথেষ্টই স্ট্যামিনা রাখেন। আমি ইমপ্রেসড। তবে লাভ নেই অফিসার। একটু আমার পেছনে তাকান। লোকটা পেছনে একটা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠেই নিভে গেল কিন্তু তাতেই যা দেখার দেখে নিয়েছে বাশার। দুইপাশে দুজন মানুষ পিস্তল ধরে আছে, আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহ।

“বুঝতেই পারছেন পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে, কাজেই যা বলি শুনুন, মন দিয়ে শুনুন,” বলেই লোকটা মৃদু হাসি দিলো। এই হাসিকে বলে বিজয়ের হাসি।

বাশার থৃলার বইতে পড়েছে এরকম পরিস্তিতিতে নাকি মানুষের গলা শুকিয়ে যায়, শিড়দাড়া বেয়ে ভয়ের ঠান্ডা ¯্রোত নামতে থাকে।

ও মনে-মনে ভাবলো থৃলার বইতে যা পড়েছে ব্যাপারটা ভুল নয়।

অধ্যায় পয়ত্রিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

মধুপুর গড়, ময়মনসিংহ

তুপানির গুড়ের তিতকুটে মিষ্টি রসের নেশার সাগরে ভাসতে-ভাসতে নিজের স্মৃতি রোমন্থন করছে ফিরিঙ্গীয়া। সেইসাথে নিজের ঠগী হয়ে ওঠার গল্পও।

ফিরিঙ্গীয়া কখনো নিজের আসল মা-বাপকে দেখেনি। রতন সিং, যাকে সে বাপ বলে জানে সে আসলে তার পালক বাপ। তার মুখেই শুনেছে নিজের আসল মা-বাপের করুণ কাহিনী।

ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসন গেড়ে বসে গদি সবেমাত্র শক্ত করতে শুরু করেছে। ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজরা ততোদিনে বুঝতে পেরেছে ভারতবর্ষে তাদের আর কোন আশা নেই। যে যেখানে যা পারছে লুটে নিয়ে কিভাবে ভারত ছাড়বে সেই ধান্দা।

ইংরেজরাও ততোদিনে বণিক থেকে শাসক, শাসক থেকে শোষক হবার পথে। তাদের শোষণের ঝান্ডা প্রথমেই তারা তাক করে নিজেদেরই স্বজাতির দিকে। ভারতবর্ষের যেখানেই ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন সাদা চামড়া চোখে পড়ছে তাকেই তাড়িয়ে মারছে আর না হয় বস্তাবন্দি করে তুলে দিচ্ছে জাহাজে। ইংরেজদের সাথে এরকমই কোন এক খন্ডযুদ্ধে পরাজিত পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীর দল স্থানীয় ফৌজের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল মাদ্রাজ বন্দরের দিকে। পলানোর পথে তারা এক গ্রামে থামে।

এই গ্রামেরই মোড়ল ছিল ফিরিঙ্গীয়ার আসল বাবা। অনাহূত অতিথীদের সে যথেষ্টই আপ্যায়ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু অতিথীরা সবেমাত্র খেতে বসেছে এমন সময় ইংরেজ ব্রিগেড ফিরিঙ্গীদের খোঁজে গ্রাম আক্রমণ করে। প্রতিরোধ করে ফিরিঙ্গীরা।

দুই বিদেশী দলের যুদ্ধে তছনছ হয় গ্রাম। এই যুদ্ধের মাঝে পড়ে ভীষণ আহত ফিরিঙ্গীয়ার আসল বাবা কোনমতে নিজের অন্তস্বত্বা স্ত্রীকে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে পালানোর সুযোগ করে দিতে পারলেও নিজে বাঁচতে পারেনি। তার অন্তস্বত্তা স্ত্রী কোনমতে কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের ভেতরেই একাকী নির্জনে জন্ম দেয় এক শিশু সন্তানের।

পরদিন ভোরে ওই জঙ্গলের পায়ে চলা পথ দিয়ে যাচ্ছিলো একদল লোক। তাদেরই একজন জঙ্গলের ভেতরে শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে থেমে যায়। কান্নার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মৃত মায়ের পাশে তারা আবিষ্কার করে সদ্য জন্ম নেয়া এক শিশু। সেই শিশুই ছিল ফিরিঙ্গীয়া। আর লোকগুলো ছিল ঠগী।

সেই ঠগীদলের সর্দার রতন সিং জানতো আগের দিন এখানে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। কি ঘটেছে সেটা অনুমান করা খুব কষ্টকর না। শিশুটিকে ফেলে দিতে গিয়েও সর্দার কী মনে করে রেখে দেয় নিজের কাছে। চিরকুমার ঠগী সর্দার রতন সিংয়ের মনের গহীনে চাপাপড়া পিতৃস্বত্তা হয়তো সেদিন জেগে উঠেছিল। ফিরিঙ্গীদের আক্রমণের সময়ে জন্ম হয়েছিল বলে শিশুটির নাম রাখা হয় ফিরিঙ্গীয়া।

রতন সিংয়ের বাড়িতেই বড় হতে থাকে ফিরিঙ্গীয়া। রতন সিং ছিল গ্রামের সর্দার, সেইসাথে সে ছিল ঠগীদের বেশ বড় একটা দলের সর্দার। এই ব্যাপারটা অবশ্য ফিরিঙ্গীয়া তার প্রথম বয়সে কোনভাবেই জানতো না, জানা সম্ভবও ছিল না। তবে রতন সিং তার পরিচয় নিয়ে কখনোই কিছু গোপন করেনি, তাকে কিভাবে পেয়েছে, নাম দিয়েছে এটা ফিরিঙ্গীয়া বেশ ভালোভাবেই জানতো। বাপকে সে বেশ ভালোবাসতো, শ্রদ্ধাও করতো, তবে বাপের আচরণ খুব রহস্যময় লাগতো তার কাছে।

মাঝে মাঝেই তার বাপ দল-বল নিয়ে গায়েব হয়ে যেত। ফিরে আসতো দুই, তিন, চার সপ্তা কখনো কখনো এক মাস এমনকি দুইমাস পরেও। সে জানতো তার বাপ আর গ্রামের সমর্থ পুরুষেরা চুক্তিতে কাজ করতে যায়। কাজ সেরে টাকা নিয়ে ফিরে আসে। কৌতুহল হোত খুব কিন্তু তারা কোথায় যায় জানার উপায় ছিল না।

পনেরো বছর বয়সের সময়ে তার গ্রামেরই সমবয়সি এক ছেলের সাথে বাড়ি থেকে পালায় সে। পালিয়ে দক্ষিণে চলে যায়। ওখানে তখন যুদ্ধের দামামা বাজছে। মারাঠা সেনাপতি পেশোয়া বাজিরাওয়ের সৈন্যবাহিনীতে

যোগ দেয়। লম্বা সময় যুদ্ধের ময়দায়ে থেকে দুটো ব্যাপার আবিষ্কার করে ফিরিঙ্গীয়া। সাদা চামড়ার লোকজনের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর নিজের ভেতরে অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা। দুটো ব্যাপারই হয়তো তার মজ্জাগত ছিল কিন্তু ব্রাপারগুলো সে আবিষ্কার করে যুদ্ধের ময়দানে। বছর দেড়েক পরে বাড়ি ফিরে আসে ফিরিঙ্গীয়া। সময়টা ছিল অনেক কম কিন্তু পরিবর্তনটা ছিল অনেক বেশি। বাড়ি ফিরে আসার পর সে আসলে বুঝতে পারছিল না কী করবে।

নিজেকে তার সবসময় মনে হোত খাপখোলা একটা তলোয়ার যে তলোয়ার কাটার জন্যে কিছু খুঁজে পাচ্ছিলো না। এমন সময় তার বাপ তাকে নিয়ে পথে নামে। সরাসরি না জানলেও ততোদিনে সে এটা খুব ভালোভাবে টের পেয়ে গেছে তার বাপ আর গ্রামের সমর্থ পুরুষেরা উল্টোপালা কিছু একটা করে।

পথে নেমে ফিরিঙ্গীয়া প্রথমেই অবাক হয়ে খেয়াল করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এক জায়গায় থেমে সবাই পোশাক বদলে নেয়। তাকেও বদলাতে হয়। পারিবারিকভাবে তারা বেশ সম্পদশালী তাই পোশাক আশাকও খারাপ নয়। তবে পোশাক বদলে তারা অতি সাধারণ পোশাক পরে নেয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার পাগড়ি পরা বাধ্যতামূলক। তাকে সাবধান করে দেয়া হয় যাকে কোন অবস্থাতেই পথে চলতে গিয়ে পাগড়ি পড়ে না যায়। পাগড়ি পড়ে যাওয়া নাকি অশুভ। ফিরিঙ্গীয়া অবাক হয়ে জানতে চায় কিসের জন্যে অশুভ। পাশ থেকে তার বাপ জানায় পথ চলার জন্যে। বাপের ভারি গলার গম্ভীর জবাব শুনে চুপ মেরে যায় ফিরিঙ্গীয়া। তবে মনের ভেতরে ঠিকই খচ-খচ করতে থাকে।

এভাবেই ওরা দিন সাতেক চলার ওপরেই থাকে। নিজেদের কোন পরিচর্যা নেই, খাওয়া শুধু রুটি আর শুকনো ফল। সাথে ডাল, শুকনো মাংস আর পেয়াজ থাকার পরও কেউ ওগুলোতে হাত দেয়না। পথ চলতে গেলে নাকি আমিষ খাওয়া বারন। ফিরিঙ্গীয়ার মনের কৌতুহল বাঁধ মানে না। সে লুকিয়ে-ঘুমের ভান ধরে বড়দের আলোচনা শোনার চেষ্টা করে কিন্তু লাভ হয়না। কারণ তারা নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে এক বিচিত্র ভাষায়। ফিরিঙ্গীয়া সেই ভাষা বুঝতে পারে না। সে অপেক্ষায় থাকে।

তবে অপেক্ষার অবসান হয় শিঘ্রই। দিন সাতেক যেতেই তাদের দলের হালচাল পাল্টে যায়। পথের মোড়ে মোড়ে দলনেতারা বার-বার দাঁড়িয়ে কি যেন দেখে, কী যেন খোঁজে। ফিরিঙ্গীয়া জানতে চায় না। কারণ ইতিমধ্যে

সে বুঝে গেছে জবাব পাবে না। বরং সে অপেক্ষায় থাকে। যাত্রার নবম দিনে হঠাৎ এক রাস্তার মোড়ে তাদেরকে থামতে বলে দলনেতা, মানে তার বাবা। উৎসূক হয়ে কি যেন দেখছে সবাই হঠাৎ ওদের সামনে দিয়ে একটা খোরগোশ দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে চলে যায়। সাথে সাথে দলের বড়রা গুঙিয়ে ওঠে। জরুরি সভা বসে। সিদ্ধান্ত হয় পথ পরিবর্তন হবে। আরো দুদিন পথ চলার পর দুপুরে খেয়েদেয়ে তারা বিশ্রাম করছে। কেউ হুঁকো টানছে, কেউ ঘুমিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছে। হঠাৎ মাথার ওপরে গাছের ডাল থেকে একটা কাক ডেকে ওঠে।

কাকের ডাক আর এমন কি কিন্তু ওদের দলের ভেতরে যেন ঝলকের মতো বয়ে যায়। বড়দের দুয়েকজন শোয়া থেকে উঠে বসে, বন্ধ হয় যায় তামাক টানা। আবারো কাক ডেকে ওঠে মাথার ওপরে, একবার নয় পর-পর দুবার। সাথে সাথে দলের লোকজন সহাস্যে চেঁচিয়ে ওঠে, ‘জয় মা ভবানী’ ফিরিঙ্গীয়া অবাক হয়ে সব দেখছিল। সেই ভর দুপুরেই পথ চলা শুরু করে তারা।

মাইল দুয়েকের মতো এগোতেই আট-দশজনের একটা দল দেখতে পায় ওরা। দলটাকে দেখে ওরা চাপা আনন্দ প্রকাশ করে নিজেদের ভেতরে। ফিরিঙ্গীয়া শুনতে পায় কেউ একজন বলে ওঠে মা ভবানীর ইশারা কখনো ভুল হতে পারে না। ভেতরে ভেতরে কৌতুহলে ফেটে পড়লেও চুপ থাকে সে। একটু পরেই অবসান হয় তার সব কৌতুহল। দলটার সাথে গিয়ে তারাও বসে পড়ে। দলের ভেতরে লোকজন গল্প শুরু করে দেয়।

তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা করে এরকম একটা দল। ইন্দোরে গেছিল তারা, মাল বিক্রি করে ফিরে আসছে। দুপুরে খেয়ে যাত্রা বিরতিতে আছে এখন। নতুন দলটাকে দেখে তারা খুশি হয়। গল্পে-গল্পে আসর জমে ওঠে। হঠাৎ ওদের দলের একজন ওকে ডেকে আড়ালে নিয়ে যায়। উঠে যাবার সময়ে সে শুনতে পায় দলের কেউ একজন ব্যবসায়ি প্রধানের কাছে জানতে চায়, সে তামাক খাবে কিনা। ওরা দুজনে হেঁটে একটু আড়ালে চলে আসতেই পেছন থেকে আবছাভাবে ফিরিঙ্গীয়া শুনতে পায় কেউ একজন চিৎকার করে বলছে, ‘তাম্বাকু লাও, হুজুরকে লিয়ে পান লাও’।

ফিরিঙ্গীয়া আর তার সঙ্গি এটা-ওটা আলাপ করছে আর হাঁটছে কিন্তু ফিরিঙ্গীয়ার মন পড়ে আছে পেছনের সেই ব্যবসায়িদের ওখানে। তার মন বলছে ওখানে কিছু একটা হচ্ছে যেটা দলের লোকেরা তাকে দেখতে-জানতে দিতে চায়না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দৌড় দেয় সে।

পেছন থেকে তার সঙ্গি থামাতে চেয়েও পারেনা। সেকেন্ডের ব্যবধানে সে দৌড়ে চলে আসে গাছপালার আড়ালে, একটু আগে যেখানে সবাই বসেছিল সেখানে। এপারে আসতেই যা চোখে পড়ে সেটা দেখে মুহূর্তেই থেমে যায় সে। হঠাৎ থামতে গিয়ে দৌড়ানোর ঝোঁক সামলাতে না পেরে মাটিতে পেড়ে যায় ফিরিঙ্গীয়া। গাছপালার আড়ালে থাকার সময়ে ফিরিঙ্গীয়া মনে মনে অনেক কিছ্ ুভেবেছিল কিন্তু চোখের সামনে সে যা দেখতে পায় সেই বিভৎসতার কোন তুলনা নেই। এমনকি যুদ্ধের ময়দানের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থাকার পরও ফিরিঙ্গীয়ার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

সেই সাত আটজনের দলের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে গলায় ফাঁস দিয়ে। তীব্র ফাঁসের টানে চেখের মণি-জ্বিভ অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে একেকজনের। যাদেরকে পরে মারা হয়েছে তাদের দুয়েকজনের গলা থেকে এখনো ফাঁস খোলা হয়নি। বাকিদেরকে মেরে উল্টো করে ফেলা হয়েছে। ফিরিঙ্গীয়া দেখতে পেল তার বাপ সেই ব্যবসায়ি প্রধানের পিঠের ওপরে উঠে মৃত লোকটার থুতনির নিচে শক্ত হাতে ধরে কটাস করে লাশের মেরুদন্ড ভেঙে দিলো। মেরুদন্ড ভেঙে সে উঠে এল লোকটার ওপর থেকে। সে সরে যেতেই দুজনে এসে লাশের পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি সব বাইরে বের করে ফেললো। বিভৎস দৃশ্যটা দেখে আরেকটু হলেই পেটের ভেতর থেকে সব উগড়ে দিয়েছিল ফিরিঙ্গীয়া।

মিনিট দশেকের ভেতরেই সব হয়ে গেল। প্রায় প্রতিটা লোকের ভাগ্যে একই পরিণতি ঘটলো। সবাইকে ফাঁস দিয়ে মেরে, ভেঙে দেয়া হলো মেরুদন্ড, পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে লাশটা মুড়িয়ে ফেলা হলো সাদা কাপড়ে। ওরা যখন এসব কাজ করছিল একদল পাহারা দিচ্ছিলো আর অন্য দল রাস্তার পাশের একটু নিচু জমিতে মাটি খুঁড়ছিল। ফিট পাঁচেক খোড়া হতেই নিপূণ হাতে সবগুলো লাশ দাফন করে গাছের পাতা দিয়ে সব চিহ্ন ঢেকে ব্যবসায়িদের সব টাকা পয়সা ভাগবাটোয়ারা করে ওরা সেখানেই বসেই তামাক টানকে লাগলো। ফিরিঙ্গীয়া অনুমান করলো সব মিলিয়ে একঘন্টাও হয়নি আট-দশ জনের সেই দলটা ঁেফে গায়েব হয়ে গেছে ধরিত্রীর বুক থেকে।

এরকম কিছু হতে পারে সেটা কারো কল্পনাতেও আসবে না। সেদিন সারারাত সে ঘুমাতে পারেনি। নিজের ভেতরে এক অদম্য উত্তেজনা অনুভব করছিল। এভাবে প্রায় একমাস পথে থাকে ওরা। এই এক মাসে অন্তত দশ থেকে বারোটা এরকম দলকে সুযোগ বুঝে গায়েব করে দেয়া হয়। প্রতিটি ঘটনাই ঘটে ফিরিঙ্গীয়ার চোখের সামনে কিন্তু তাকে ধরতে

দেয়া হয় না। এটাই নিয়ম। ফিরিঙ্গীয়া আবিষ্কার করে ওরা নিয়ম ছাড়া কিছু ুকিরে না। প্রত্যেকেরই মূল্যবান জিনিসপত্র টাকা পয়সা লুটের পর প্রাথমিকভাবে জমা থাকে দলনেতার কাছে। তারপর সে নিখুঁত হিসেবে সেগুলো ভাগ করে দেয় সবার মাঝে।

এই একমাসে সে অনেক কিছুই শেখে। সবার আগে শেখে নিয়ম। ঠগীরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল আর নিয়ম-নীতি পরায়ন। নিয়মেই বাইরে তারা কিছুই করে না। প্রতিটি কাজ তারা করে সময় মেনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। সুশৃঙ্খলা আর নিয়মের পরে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো দেবীর নির্দেশ।

ঠগীরা বিশ্বাস করে তারা যা করছে সবই শুধুমাত্র দেবীর প্রতি ভক্তি থেকে করছে, তারা বিশ্বাস করে দেবী সবসময়ই তাদের মাঝে বিরাজমান। সবসময় তিনি ভক্তদের ভালো-মন্দের ব্যাপারে খেয়াল রাখছেন, সতর্ক করে দিচ্ছেন, আর সেইসাথে সর্বক্ষণই দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন নির্দেশ। বেশিরভাগ নির্দেশনাই তারা গ্রহণ করে প্রকৃতি আর পশুপাখির নানা ধরণের আচরণ থেকে। এই কারণে ঠগীরা বলে পশু-পাখি আর প্রকৃতি হলো তাদের গণক ঠাকুর, পাজি-পুঁথি। একারণেই তাদের জীবনে শুভ আর অশুভের ফর্দটা বিরাট।

যেমন যাত্রা শুরু হবার পর মাথা থেকে পাগড়ি পড়ে যাওয়া অশুভ, যাত্রার প্রথম কয়দিন আমিষ খাওয়া, মুখে খৌরি করা অশুভ, যাত্রপথে রাস্তায় খরগোশ দেখতে পেলে অশুভ, সেক্ষেত্রে যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে হবে, রাতের বেলা ঘুঘুর ডাক শুনতে পেলে সেটা চরম অশুভ।

আবার যাত্রার সময়ে মাথার ওপরে কাক ডেকে ওঠা খুবই শুভ, বাড়ি থেকে বের হয়েই কোন কুকুরের সামনে পড়া শুভ। এরকম হাজারো লক্ষণকে শুভ অশুভ মেনেই জীবন যাপন করে তারা। এগুলোকেই ওরা প্রতিনিয়ত দেবীর নির্দেশ মনে চলে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচালে দুলতে-দুলতে ফিরিঙ্গীয়া একে একে এগুলো সব শিখে নিতে থাকে বর্ষীয়ান এক বুড়ো ঠগীর কাছ থেকে। সে জানতে পারে প্রাকৃতিক কোন লক্ষণ না থাকলেও দেবীর নির্দেশ গণনা করে বের করা যায়।

এই বুড়ো ঠগীই তাকে শেখায় ঠগীদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি সেইসাথে ওদের বুলি। ঠগীদের কোন আলাদা ধর্ম নেই, যে-যেই ধর্ম থেকেই আসুক ঠগী হিসেবে দীক্ষা নেয়ার পর তারা সবাই শুধু ঠগী ধর্মই পালন করে,

শুধুমাত্র মা ভবাবনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। তার কাছেই ফিরিঙ্গীয়া জানতে পারে ঠগীদের এমনকি নিজেদের ভাষাও রয়েছে। লোক সম্মুখে নিজেদের ভেতরে অলোচনার সময়ে, শিকার করার সময়ে তারা এই বুলিই ব্যবহার করে। এই বুলিকে তারা বলে 'রামসি'। এই ভাষাতেই দলপতির কোদালকে বলে 'কাসসি', শিকারের ওপরে অক্রমণকে বলে 'ঝিরণী দেয়া', 'তাম্বাকু লেও, পান লেও' অর্থাৎ এবার শিকারের ওপরে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। এরকম হাজারো শব্দ, বাক্য সে শিখে নিতে থাকে। প্রথমবারের যাত্রায় সে প্রতিবার ঝিরণী দেয়ার সময়ে নিজের ভেতরে সেই হিংস্র সত্বাটাকে বার বার ভিন্নভিন্নভাবে আবিষ্কার করতে থাকে। এতোদিনে ফিরিঙ্গীয়া অনুভব করে এবার নিজের ভেতরের সেই খাপখোলা তলোয়ারকে কাজে লাগাতে পারবে। সে ধীরে ধীরে সেই তলোয়ারকে শান দিতে থাকে।

প্রথমবার যাত্রার পরে সে তিন মাসের বিরতির পর আবারো দ্বিতীয় যাত্রায় রওনা দেয়। এই তিনমাস সে শুধু একটা কাজই করেছে রুমাল দিয়ে খুন করার চর্চা। ঠগীরা এক টুকরো হুলদ কাপড়ের ফাঁসকেই তাদের প্রধান হাতিয়ার মনে করে। ব্যাপারটা খুব সহজ আর জিনিসটা খুবই সুন্দর। দুই ফিট লম্বা সাধারণ কাপড়ের একটা হলুদ রুমাল। অন্য যেকোন সময়ে ওরা সেটা কোমরেই গুঁজে রাখে কোমর বন্ধনির সাথে। তবে এই রুমালের একপ্রান্তে থাকে একটা পয়সা। সিঁদুর মাখানো পয়সাটাকে রুমালের এক প্রান্তে গিট দিয়ে আটকে রাখা হয়। দিনের অন্যান্য সময়ে কোমর বন্ধনীর সাথে রাখা পয়সা লাগানো সাধারণ এই রুমালই শিকারের সময় হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর অস্ত্র।

দ্বিতীয় অভিযানের সময়ে ফিরিঙ্গীয়া যখন প্রথমবারের মতো একজনের গলায় রুমাল পরায় সে অনুধাবন করতে পারে বাকি জীবন তাকে এই কাজই করতে হবে। কারণ এরচেয়ে প্রশান্তি সে এর আগে কখনো অনুভব করেনি। এরপরে শপথ গ্রহণের পর সেই তুপানির গুড়। ফিরিঙ্গীয়া বিশ্বাস করে এই গুড় যে একবার মুখে দিয়েছে সে কোনদিন ঠগী ধর্ম থেকে বেরুতে পারবে না। প্রথমবার তুপানির গুড় মুখে দেয়ার সময়েই সে সমস্ত অবিশ্বাস আর সন্দেহের দোলাচাল থেকে বেরিয়ে আসে। আজো সেই তিতকুটে মিষ্টি স্বাদের মহিমা...

"সর্দার, ভোজ তৈয়ার হয়ে গেছে," হঠাৎ কানের কাছে কেউ একজন বলে উঠলো। নেশায় বিভোর চোখ খুলে ফিরিঙ্গীয়া তার বাপের দিকে তাকালো। সে মাথা নেড়ে সম্মতি দিতেই ফিরিঙ্গীয়া খাবার পরিবেশনের আদেশ দিলো। খবার খুব সাধারণ। সাদা ভাত আর দেবীকে উৎসর্গ করা সেই

ছাগলের ঝাল মাংস। এমনকি এই বিশেষ ভোজেরও ওদের নিয়মনীতি আছে। খেতে হবে দেবীর সামনে চক্রাকারে বসে, খাবার পর সব ধরণের উচ্ছিষ্টাংশ সাবধানে একসাথে করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে যাতে কারো পায়ের নিচে না পড়ে কিংবা কোন পশুপাখি সেগুলোকে টানাটানি না করে। এতে দেবীর অসম্মান। অল্প সময়েই খাওয়া হয়ে যেতেই তারা সেখানেই গোল হয়ে আলোচনায় বসলো। পরিবেশন করা হলো তামাক আর পান। এই দুটো জিনিসই তাদের মৌলিকত্বের প্রতীক। পান চিবুতে-চিবুতে আর তামাক টানতে-টানতে এবার আলোচনা চলবে।

বিষয় দুটো; বর্তমান পরিস্থিতি আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

অধ্যায় ছত্রিশ

বর্তশান সময়

শশীলজ, কাচারি রোড, ময়মনসিংহ

বাশার আর রিফাতের দিকে হাতের কাটা শটগানটা তাক করেই কথা বলে উঠলো লোকটা।

“মন দিয়ে শুনুন, আপনাদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই, কাজেই আপনাদের কোন ক্ষতি করারও ইচ্ছে নেই,” বলে সে কাটা শটগানের নল তুলে ইশারা করলো বাশারের পাশে মাটিতে পড়ে থাকা কালো ব্যাগটার দিকে।

“ভালোভাবে ওটা দিয়ে দিন, কারো কোন ক্ষতি হবে না। হাত থেকে পিস্তলটা নামান,” বলে সে এগিয়ে আসতে লাগলো ব্যাগটার দিকে। বাশারের মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। এতো কষ্ট করে পাওয়া জিনিসটা এভাবে হারাতে হবে। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তবে ও কিছু করার আগেই ঝট করে ওর পেছন থেকে সামনে চলে এল রিফাত। সে বাশারের হাত ছাড়িয়ে পেছন থেকে একেবারে ব্যাগটার সামনে এসে দাঁড়ালো ওটাকে আগলে রেখে ঘোষণার সুরে বলে উঠলো, “এটা আমি কিছুতেই নিতে দেবো না। একবার এটার জন্যে আমি সমস্ত কিছু হারিয়েছি এবার...”

“এইযে ভদ্রমহিলা, এটা দেখেছেন?” বলে লোকটা নিজের হাতের কাটা শটগানটা নাড়লো। “দিয়ে দিন, আপনার পায়েও গুলি করি তবে যেখানে গুলি করবো সেই জায়গা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আর বুকে কিংবা মাথায় করলে কি হবে বোঝেন। বাহাদুরি না দেখায়া সরেন।”

“আমি কিছুতেই...” রিফাত কথা শেষ করার আগে বাশার হাত তুলে ওকে মানা করতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই ধপ করে একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠলো। হঠাৎ অন্ধকারে আলো জ্বলে ওটাতে প্রায় সবারই চোখ ঝলসে উঠলো। কিন্তু আলো জ্বলে ওঠার প্রায় সাথে সাথেই দুটো গুলির শব্দ

শোনা গেল। বাশার আলো আড়াল করে আবছাভাবে দেখতে পেল রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাকে ধরে থাকা দুইজনের একজন মাটিতে পড়ে গেল গুলি খেয়ে, সাথে সাথে অন্যজন লাফিয়ে সওে গেল। বাশার পরিষ্কার দেখতে পেল না, তবে একটু বুঝতে পারলো ওদের দিকে শটগান ধরে রাখা লোকটা রাগে চিৎকার করে কাউকে কিছু একটা নির্দেশ দিলো কিন্তু সে নিদের্শ পালন করার আগেই তীব্র বেগে একটা গাড়ি এগিয়ে এসে বাড়ি মারলো লোকটাকে। কাপড়ের দোকানের ম্যানিকিনের মতো বাড়ি খেয়ে লোকটা একদিকে ছিটকে পড়লো। চিৎকার করে কেউ একজন ওদেরকে গাড়িতে ওঠার নির্দেশ দিলো। বাশার একহাতে রিফাতকে ধরে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে অন্যহাতে ব্যাগটাকে ছুঁড়ে দিলো গাড়ির ভেতরে, সেইসাথে নিজেও ঢুকে পড়লো গাড়িতে।

“আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা, ওদের কি হবে?” ও উঠে বসতেও পারেনি তার আগেই বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে গাড়ি। “তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে টাউনহলের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ওদের নিয়ে আসছি,” ও ঘুরতে থাকা গাড়ির ভেতর থেকে লাফিয়ে নেমে এল। মাটিতে নেমে একটা গড়ান দিয়ে হাতে বের করে আনলো পিস্তলটা। হাঁটুতে ভর দিয়ে আধো অন্ধকারের ভেতরেই বুঝে নেয়ার চেষ্টা করলো পরিস্থিতি। আবদুল্লাহ সমানে দৌড়াচ্ছে তার পেছনে মোটা রমিজ দারোগা। যে-জিপের উদ্দেশ্যে তারা দৌড়াচ্ছে সেটা এখনো ওদের থেকে শ’দুয়েক গজ দূরে। ওদের পেছনে দুজন দৌড়াচ্ছে, দুজনের হাতেই অস্ত্র কিন্তু মনে হচ্ছে জরুরি না হলে পুলিশের গায়ে গুলি করবে না এরা।

বাশার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। সেইসাথে লোকদুজনার মাঝ বরাবর দুটো গুলি করলো ঁফে ভয় দেখানোর জন্যে। প্রায় সাথে-সাথেই দুজন লাফিয়ে পড়লো দুদিকে। কিন্তু ও গুলি করার সাথে সাথেই আরেকটা গুলির বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো ও। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল সাথে-সাথেই। বাশার নিশ্চিত এটা সেই শটগানের গুলি। ও মাটিতে আরেক গড়ান দিয়ে উঠে প্রাণপনে দৌড়াতে লাগলো। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা জিপে উঠে বসেছে ও নিজেও দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লো। আবদুল্লাহ জিপ স্টার্ট করছে ও দুইপাশে দেখে নিলো। সেই দুজন আবারো দৌড়ে আসছে, কিন্তু শটগানওয়ালাকে দেখা গেল না। প্রায় সাথে-সাথেই আরেকটা গাড়ির আলোতে অন্ধ হয়ে গেল ওরা।

অন্যদিকে থেকে একটা গাড়ি থেকে আলো আসছে। বাশার নিশ্চিত ওটা শটগানওয়ালার গাড়ি। একপাশ থেকে দুজন অস্ত্রধারী দৌড়ে আসছে,

অন্যদিক থেকে একটা গাড়ি। খর-খর করে স্টার্ট নিলো ওদের জিপ। প্রায় সাথে-সাথে আবদুল্লাহ জিপ ফুল গিয়ারে দিয়ে আগে বাড়তে যাচ্ছিলো বাশার থামিয়ে দিলো তাকে। “আস্তে, আমি বললে।” একদিক থেকে সেই দুজন দৌড়ে আসছে অন্যদিকে থেকে গাড়িটা। দুই গ্রæপই প্রায় পৌছে গেছে ওদের জিপের কাছে এমন সময় বাশার চিৎকার করে উঠলো। “এইবার,” সাথে সাথে আবদুল্লাহ এক্সেলেটরে পুরো চাপ বসিয়ে দিলো। সাথে-সাথে শিকারী কুকুর যেভাবে লাফ দেয় সেভাবে লাফ দিলো গাড়ি। অন্যপাশ থেকে ছুটে আসা গাড়িটার উদ্দেশ্য ছিল ওদের জিপে বাড়ি মারবে, ওটা সরে যেতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওটা গিয়ে পড়লো উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা ওদেরই নিজের লোকের ওপরে। একজন লাফিয়ে সরে গেল অন্যজন বাম্পারে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

অন্যদিকে বাশারদের জিপ লাফ দিয়ে আগে বেড়ে গতি জড়তার কারণে ফিট শয়েক সামনে এগিয়ে গেল। অতিরিক্ত চাপ পড়াতেই কিনা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল ওটার। ওদের জিপ থেমে যেতেই আবুদুল্লাহ প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগলো সার্ট দেয়ার কিন্তু কাজ হচ্ছেনা। বাশার পেছনে তাকিয়ে দেখলো অন্য গাড়িটা নিজেদের একজনকে চাপা দিয়ে এখন ঘুরে এদিকে এগিয়ে আসছে। অক্ষত লোকটাও উঠে দাড়িয়ে বন্দুক তাক করলো। সেইসাথে গাড়ির জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল সেই কাটা শটগানের নল। “সবাই সাবধান,” এটুকু বলার সাথে সাথেই ধাম-ধাম করে এক পশলা গুলি এসে লাগলো জিপে। আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা আগেই নিচু হয়ে গেছে। বাশার সিটের আড়ালে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলো যতোটা সম্ভব। ধাম ধাম গুলি আসছেই। ডান কাঁধের কাছে তীব্র এক ঝটকা খেয়ে সোজা সিট থেকে নিচে পড়ে গেল ও। “আবদুল্লাহ জিপ স্টার্ট করো, না হলে মরতে হবে।”

ও সিটের ফাঁক দিয়ে একটা হাত বের করে কয়েক রাউন্ড গুলি করলো অন্ধের মতো। আবদুল্লাহ পাগলের মতো চেষ্টা করছে পেছন থেকে অন্য গাড়িটা এসে বাড়ি মারলো। বাড়ি খেয়ে জিপের একটা অংশ শূণ্যে উঠে ওটা সামনে এগোতে লাগলো। আবারো পেছনের গাড়িটা এসে বাড়ি মারলো। রমিজ দারোগা সমানে চেঁচাচ্ছে। বাশার দেখলো এরকম বাড়ি আরেকটা লাগলে ওদের গাড়ি ছিটকে গিয়ে মাঠের কিনারায় একটা গাছে বাড়ি খাবে। পেছন থেকে গাড়িটা দানবের মতো এগিয়ে আসছে আবদুল্লাহ প্রাণপনে চাবি ঘোরালো তাও স্টার্ট হোত না কিন্তু পেছনের গাড়িটা এসে বাড়ি মারতেই অটোমেটিক স্টার্ট হয়ে গেল জিপ। আগে বাড়তে গিয়ে কোনমতো মাঠের কিনারায় গাছটা এড়িয়ে একপাশে ঘুরে গেল ওদের

জিপ। অন্যদিকে জিপটা সরে যেতেই পেছনের গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের দিকে ধেয়ে চললো। অভিজ্ঞ ড্রাইভার ঘুরিয়ে ফেলে কোনমতে এড়িয়ে গেল সংঘর্ষ, তবে একটু আগে বাশারদের জিপের ভাগ্যে যা ঘটেছিল সেই একই ঘটনা ঘটলো এর ভাগ্যে। সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে পারলেও গাড়ির একটা পাশ গাছের গায়ে বাড়ি খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল ওটার ইঞ্জিন।

শশীলজের গেট দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে এল ওদের গাড়ি। আধমাইলের মতো এগিয়ে টাউন হলের কাছে এসে জয়ার গাড়িটা দেখে জিপ থামালো আবদুল্লাহ। “বাপরে বাপ, কোনমতে বাইচ্চা গেছি।”

“এরম কাহিনী আমার পুরা পুলিশ বয়সে হয় নাই, আরেট্টু অইলে হার্ট ফেইলেই মইরা যাইতাম,” রমিজ দারোগা এখনো হাঁপাচ্ছে।

“আবদুল্লাহ, রমিজভাই, আপনারা থানায় রিপোর্ট করে শশীলজে ফোর্স পাঠান। আমি পরে যোগাযোগ করছি আপনাদের সাথে,” ওর মনের ভেতরে ঝড় চলছে সেই ঝড় থামাতে হলে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে ওকে।

ও জিপ থেকে বেরিয়ে জয়ার গাড়ির কাছে এসে পেছনের দরজা খুলে উঠে পড়লো। দুজনেই ঝিম মেরে বসে ছিল। ওকে দেখে নড়ে-চড়ে উঠলো। “তোমরা ঠিক আছো?” দুজনেই মাথা মাথা নেড়ে জানালো তারা ঠিক আছে।

“কি হলো ওখানে? সর্বনাশ তোমার কাঁধ থেকে তো রক্ত পড়ছে,” বাশারের কাঁধের ক্ষতটা দেখে চমকে উঠলো। জয়াও সামনে থেকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো। “তেমন কিছু না, মনে হয় শটগানের ছড়রা লেগে স্রেফ চামড়া ছিলে গেছে। গুলি আমি আগেও খেয়েছি সে-অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি ক্ষত গভীর না, চামড়া ছিলেছে শুধু। এটা পরে দেখলেও চলবে, আগে গাড়ি চালাও।”

“কোথায় যাবো? থানায়?” গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে জয়া জানতে চাইলো।

“না না, প্রশ্নই আসে না, সোজা রিফাতের বাসায় চলো। থানায় গেলে সমস্যা আছে, বারবার এরকম হচ্ছে আমাকে বুঝতে হবে। কাজেই থানায় যাওয়া চলবে না। রিফাতের বাসাই এখন নিরাপদ।”

জয়া কিছু না বলে গাড়ি ছেড়ে দিলো। দশ মিনিটের মধ্যে রিফাতের বাসার গেট দিয়ে প্রবেশ করলো গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে আগে গেট বন্ধ করলো বাশার। ও গেট বন্ধ করে আসতে আসতে দেখতে পেল গাড়ির ভেতর থেকে রিফাত কালো ব্যাগটা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। "জলদি ভেতরে ঢোক সবাই।" বাসা ভেতরে ঢুকে আগে দরজা বন্ধ করলো ও।

"আমি ফার্স্ট-এইড কিট নিয়ে আসছি," বলে রিফাত ব্যাগটাকে ড্রইং রুমের মেঝেতে রেখে ভেতরের রুমের দিকে রওনা হতে যাচ্ছিলো তার আগেই বাশার বলে উঠলো, "বললাম তো এটা তেমন সিরিয়াস কিছু না। আগে এখানে এসে বসো কথা আছে আমার সবার সাথে," বলে দুজনকেই ওর সামনে বসার নির্দেশ দিলো বাশার। জয়া আর রিফাত দুজনকেই বিদ্ধস্ত লাগছে।

"আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না এই লোকগুলো মানে যারা আমাদের পিছে লেগেছে এরা বারবার আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ কিভাবে বুঝতে পারছে। হয় আমাদের ভেতরে ওদের লোক আছে আর হয় অন্যকিছু," বলে ও একটু থামলো। জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "জয়া তোমাকে ধন্যবাদ। শশীলজে তুমি সময়মতো না এলে উদ্ধার করা জিনিসটা আমাদের হারাতে হোত। তবে আমার একটা কথা আছে, তোমার কাছে একটা পিস্তল আছে এটা তো তুমি আমাকে বলোনি। তোমার কি মনে হয় না কথাটা আমাকে জানানোর প্রয়োজন ছিল?"

বাশারের শক্ত দৃষ্টি ওর ওপরে অনুভব করার পরও জয়ার ভেতরে কোন ভ্রুক্ষেপ দেখা গেল না। সে নিজের জিন্সের পকেট থেকে ছোট্ট সুন্দর দেখতে একটা গ্লক পিস্তল বের করে আনলো। এই বিশেষ ডিজাইনের পিস্তল সাধারণত মেয়েরাই বেশি ব্যবহার করে থাকে। "এটা লাইসেন্স করা পিস্তল," বাশারের চোখের দিকে তাকিয়েই জয়া জবাব দিলো।

"আমি তো সেটা বলিনি, আমি বলছি তোমার উচিত ছিল ব্যাপারটা আমাকে আগে জানানো।"

জয়া বাশারের কথার জবাব দিলো না বরং হাতে ধরা পিস্তলটা দেখছে। "এটা আমি রাখি যথাযথ সময় ব্যবহার করার জন্যে। শশীলজে এটা কাজে এলেও এর যথাযথ ব্যবহার হয়নি। এখন হবে।"

জয়ার শেষ কথাটা শোনার সাথে সাথে বাশারের হাত চলে গেল নিজের কোমরের দিকে কিন্তু তার আগেই ভীষণ অবাক হয়ে ও অনুভব করলো

জয়া পিস্তলটা তাক করে আছে রিফাতের দিকে। “একটু আগে তুমি বলছিলে না বার-বার এরকম কেন হচ্ছে, আমাদের পিছু নেয়া লোকেরা কিভাবে আমাদের সবকিছু জানতে পারছে আমার মনে হয় এই বিষয়ে তোমার বান্ধবির কিছু বলবার আছে। সে শুরু থেকেই মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, কি ঠিক কিনা?” শেষ প্রশ্নটা সে করেছে রিফাতের উদ্দেশ্যে।

বাশার তাকিয়ে দেখলো রিফাতের বড়-বড় দুই চোখ আরো বড় হয়ে গেছে গ্লক পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে।

***

গাছের সাথে বাড়ি খেয়ে দুমড়ে থাকা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে তার বিরক্ত হওয়া উচিত। আরো বিরক্ত হওয়া উচিত একটু আগের ব্যর্থতার জন্যে কিন্তু তার বিরক্তি লাগছে না। বরং কেন জানি এরকম অদ্ভুত এক মুহূর্তে তার কোল্ড কফি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মারামারি, যন্ত্রণা আর কষ্ট যেমন তার জন্যে নতুন নয়, তেমনি এরকম উদ্ভট সময়ে উদ্ভট ইচ্ছের ব্যপারটাও তার জন্যে নতুন নয়। এসবের মাঝেই তার বসবাস। এসব কাজেই সে এক্সপার্ট। এসব কাজের জন্যেই লোকে তাকে ভাড়া করে। অন্য লোকের নোংরা পরিষ্কার করতে সে যেমন অভিজ্ঞ ঠিক তেমনি তার ব্যর্থতা ঢাকার লোকেও কোন অভাব হবে না।

গাড়ির সাথে বাড়ি লাগা কাঁধটা দুবার ডলে নিয়ে ডান হাতের স্পোর্টস ঘড়িটাতে সময় দেখে নিয়ে কিছুক্ষণ হিসেব করলো সে। সময় হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সময়ের ওপরেই চলছে এই দুনিয়া। মনে মনে সে হিসেব করে ফেললো ওরা কতোক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে, কতোক্ষণের ভেতরে পুলিশ চলে আসতে পারে। হিসেব শেষ করে সে আবারো গাড়িটার দিকে ফিরে তাকালো।

“এই,” নিজের অক্ষত লোক দুজনকে সে ডাক দিলো। “বাদ দে, এই বালের গাড়ি ঠিক হবে না। অন্য গাড়ি আসাতাছে। গাড়ির নম্বর প্লেটটা খুলে ফেল, যাতে আপাতত বাইর করতে না পাওে এইটা কার গাড়ি। আর মরা দুইটার ব্যবস্থা কর,” নিজের লোকদের নির্দেশ দেয়া শেষ করে সে মোবাইল বের করলো। কয়েকটা কল করতে হবে। এইবার নিয়োগকর্তার ঝাড়ি খেতে

হবে। তবে তার আগেই ব্যবস্থা করতে হবে ওই পুলিশ অফিসার আর জিনিসটার। এবার সে নিজে কাজ করবে না বরং ওদের ওষুধ ওদেরকেই দেবার সময় এসে গেছে। নিজের লোকবল কমে গেছে কাজেই নিজের লোকবল ক্ষয় করতে চাচ্ছে না সে। তারচেয়ে কাঁটা দিয়েই যদি কাঁটা তোলা যায় তবে সমস্যা কোথায়।

শেষ কথাটা মাথায় আসতেই মৃদু একটা হাসি খেলে গেল তার মুখে, লেখকদের বর্ণনায় যে হাসিকে বলে শয়তানি হাসি।

***

“এর মানে কি?” রিফাতের বড়-বড় চোখ আরো বড় হয়ে গেছে। “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?”

“আমি বলতে চাই, আপনি একটা মিথ্যুক। শুরু থেকেই মিথ্যে বলছেন। একের পর এক মিথ্যে বলেই চলেছেন,” বলে সে বাশারের দিকে তাকিয়ে বললো, “তোমার বান্ধবিকে জিজ্ঞেস করো ডেভিডের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিল? করো? নাকি সেটা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে কিংবা সাহস তোমার নেই।”

বাশার কিছু বলার আগেই রিফাত বলে উঠলো। “কি বলছেন আপনি ডেভিডের সাথে আমার সম্পর্ক মানে?”

“এই ডাকাতির ঘটনার বহু আগে,” বলে জয়া বাশারের দিকে তাকিয়ে একটা ভ্রু নাচিয়ে সোফায় বসে পড়লো। পিস্তলটা এখনো রিফাতের দিকেই তাক করা। “তোমার সুন্দরি বান্ধবি আর্কিওলজিতে যখন মাস্টার্স করে তখন সে তার ডিজার্টেশন করেছিল একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রজেক্টের অধীনে,” বলে সে আবারো বাশারের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইলো। “তাকে জিজ্ঞেস করো সেই প্রজেক্টের সুপারভাইজার কে ছিল?”

এতোক্ষণ রাগ আর হতবিহŸল এবকটা ভাব ছিল তার চোখে-মুখে কিন্তু জয়ার কথা শোনার সাথে সাথে তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। “জিজ্ঞেস করো বাশার?”

বাশার কিছু জানতে না চেয়ে অবিশ্বাসের সাথে তাকিয়ে রইলো রিফাতের দিকে। “রিফাত, জয়া যেটা জানতে চাইছে সেটার উত্তর দাও।”

“সে জবাব দিবে না,” বলে জয়া পিস্তল নাচালো। “তার হয়ে জবাবটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। সেই প্রজেক্টে তার সুপারভাইজার ছিল ডেভিড। যে-ডেভিডের মৃতদেহ তুমি ওই পুকরের নিচ থেকে উদ্ধার করে এনেছো। সত্যি কথা হলো ডেভিড শুধু তার সুপারভাইজারই ছিল না। ডেভিড ছিল ওর বয়ফেন্ড। ও শুরু থেকেই আমাদের সাথে মিথ্যে কথা বলে এসেছে। ও বলেছে বিজয় ওর সাথে যোগাযোগের পর ওরা আন্তির্জাতিকভাবে খোঁজ-খবর করতে গেলে তখন ডেভিডের সাথে ওদের পরিচয় হয়। সত্যি কথা হলো, ডেভিডের সাথে ওর পরিচয় অনেক আগে থেকেই। বিজয়ের সাথে আসলে ডেভিডের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রিফাতই। বিজয় যখন পাগলের মতো তার পারিবারিক ইতিহাস উদ্ধারের জন্যে কোন একটা লিঙ্ক খুঁজছে ঠিক তখন রিফাতের সাথে তার পরিচয় হয়। আর রিফাতই ডেভিডের সাথে বিজয়কে পরিচয় করিয়ে দেয়। ঠিক কিনা?” বলে সে রিফাতের দিকে তাকালো। রিফাত দুইহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। “তোমার বান্ধবিকে জিজ্ঞেস করো আমি একটাও মিথ্যে কথা বলেছি কিনা। তোমার বান্ধবি ভুলে গেছিল আমিও সাংবাদিকতার সূত্রে এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তাই কিছু ব্যাপার আমিও জানতাম। সে একের পর মিথ্যে বলে ভেবেছিল পার পেয়ে যাবে। আমি থাকতে সেটা হবে না। ওকে জিজ্ঞেস করো আর কি কি মিথ্যে বলেছে ও?”

“আমি আর কিছুই মিথ্যে বলিনি,” হঠাৎই প্রায় চিৎকার করে উঠলো রিফাত। বাশার তাকিয়ে দেখলো তার বড়-বড় দুই চোখে পানি। নীরবে কাঁদছে মেয়েটা। “হ্যা, ডেভিড আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল, আমি তোমাদেরকে বিজয়ের সাথে ওর পরিচয়ের ব্যাপার মিথ্যে বলেছি কিন্তু কিন্তু আর কিছুই মিথ্যে বলিনি। আর ওই অংশটুকু মিথ্যে বলেছিলাম কারণ আমার নিজের জীবনের ওই অংশটুকু আমি চিরতরে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। ডেভিডের মৃতদেহ যেমন পুকুরের তলায় দাফন হয়ে ছিল, ঠিক তেমনি এই সম্পর্ক আর ওই সময়টুকু আমি মনের গহীন কোনে দাফন করে দিয়েছিলাম। আমি মিথ্যে বলেছি কারণ আমি ওই পুরনো ক্ষত আরেকবার নতুন করে তাজা করতে চাইনি,” বলে সে হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

রিফাত কান্নায় ভেঙে পড়তেই জয়া বাশার দিকে ফিরে তাকালো। তাকে খানিকটা বিহŸল দেখাচ্ছে এখন। হাতের পিস্তল নামিয়ে নিয়েছে আগেই। বাশারও বেকুবের মতো তাকিয়ে রইলো তার দিকে। দুজনের কেউই বুঝতে

পারছে না মেয়েটাকে কি অবিশ্বাস করবে নাকি তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করবে।

“আমি যখন আমার মাস্টার্সের ডিজার্টেশনের সময়ে প্রজেক্ট খুঁজছিলাম তখন আমাদের এক ম্যাডামের মাধ্যমে তার সাথে আমার পরিচয়। ইউরোপ ভিত্তিক একটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের দক্ষিণ এশিয়ার প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিল সে। আমি তখন ¯ফে ছাত্রি, ওরকম একটা প্রজেক্টে কাজ করতে পারা আমার জন্যে বিরাট ব্যাপার। প্রথমদিকে ডেভিডের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল গুরু শিষ্যের। আমি প্রজেক্টে বেশিদিন কাজ করিওনি। আমার থিসিসের কাজ শেষ হয়ে যায় ছয় মাসের ভেতরেই। এরপরে আমি যখন মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে যোগ দিয়ে বোর হচ্ছিলাম সেইসময়েই ডেভিড নতুন প্রজেক্টের কাজ নিয়ে আসে। ওই সময়টাতেই তার সাথে ক্লোজ হয়ে পড়ি আমি। বয়স কম, দুচোখে স্বপ্নের শেষ নেই এরকম একটা সময়ে অগাদ জ্ঞান, অপরিসীম প্রজ্ঞা আর মাধুর্য নিয়ে সে ধরা দেয় আমার চোখে,” রিফাতের ভেজা চোখে বিষণœতা। “বলতে দ্বিধা নেই আমার চেয়ে বয়সে প্রায় দেড় গুন বড় ডেভিডের প্রতি আমিই প্রথম তার দূর্বল হয়ে পড়ি। তখন তো আর বুঝতে পারিনি আসলে সে আমাকে নিয়ে খেলছিল, আমাকে ব্যবহার করছিল তার উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে।”

“আমার মাধ্যমেই সে ময়মনসিংহের শশীলজ, পুরনো জমিদার বাড়ি আর এই এলাকার ইতিহাস নিয়ে সরকারিভাবে গবেষণা করার সুযোগ পায়। এই গবেষণাতেই সে জানতে পারে এই এলাকার বিশেষ করে এই জমিদার পরিবারের ইতিহাসের একটা অন্ধকার অধ্যায় আছে। সে যখন এই বিষয়ে কলু খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন সময় বিজয় এসে ধরা দেয়। ডেভিড এক উদ্দেশ্যে কাজ করছিল আর বিজয় ভিন্ন উদ্দেশ্যে। দুজনেই আমাকে ব্যবহার করেছে। আমার জীবনে এরকম কলঙ্কময় সময় আর আসেনি। ওই ঘটনার পর আমি ¯ফে ভেঙে-চুড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছি,” বলে সে দুজনকেই দেখলো। “আমার বাইরের খোলসের ভেতরে কতোটা বিদীর্ণ একটা মন রয়েছে সেটা কখনোই কাউকে বুঝতে দেইনি। সময় নিয়ে পরিশ্রম করে আবারো নতুন করে শুরু করার চেষ্টা বরেছি কিন্তু অতীত কেউই মুছে ফেলতে পারে না। কেউই না।”

“আবারো পুরনো সেই ঘটনা যখন আমার সামনে এসে হাজির হলো আমি সাহস পাইনি, সত্যি কথা হলো আমি মনের গহীনকোণে দমিয়ে দেয়া ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলার সাহস পাইনি। পেলে হয়তো সত্যি বলে দিতাম।

ডেভিডের বেঈমানি আমাকে এতোটাই কষ্ট দিয়েছে সেই ছাইচাপা কষ্ট আমি তুলে আনতে চাইনি বলেই ওই কথাগুলো মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়েছি। এইটুকই বলার ছিল আমার। বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমাদের ব্যাপার। আর গতকাল কিংবা আজ যাই ঘটেছে, আমাদের ওপরে আক্রমণ এসবে আমার কোন হাত নেই। বাকিটা তোমরা বুঝবে," কথা শেষ করে রিফাত চোখ তুলে তাকালো ওদের দুজনার দিকে।

"আমি বিশ্বাস করেছি তোমার কথা," বাশার কিছু বলার আগেই জয়া বলে উঠলো। "মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেচেঁ থাকলে বদলায়, না বদলালে মারা খায়। বাশার তোমার কাঁধ থেকে অনেকক্ষণ ধরে রক্ত পড়ছে। আমার মনে হয় এটার কিছু একটা করা উচিত।"

"আমি ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে আসছি," বলে রিফাত উঠে গেল।

"আমরা ওকে বিশ্বাস করে ভুল করছি না তো?" বাশার প্রশ্ন করলো জয়াকে। ও হাতে টেনে কাঁধের ক্ষতটা দেখার চেষ্টা করছে।

"আমার মনে হয় ও সত্যি বলছে। কারণ ও যা বলেছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য। তবে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড থরোলি চেক করা উচিত। সেটা তুমি করলেই বেশি ভালো হয়।"

জয়ার কথা শুনে বাশার মোবাইল বের করে কল দিলো তৌফিককে। কথা বলার জন্যে চলে এল বারান্দায়।

"হ্যালো তৌফিক, তোকে একটা কাজ দিচ্ছি, একজন মানুষের ব্যকগ্রাউন্ড চেক করে দেখতে হবে," বলে বিস্তারিত সব জানিয়ে ভেতরে এসে দেখলো রিফাত ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে বসে আছে। ওর কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করার জন্যে পুলিশের পোশাকটা সরিয়ে নিলো রিফাত। "এটা কি?" বলে ও চেপ্টামতো দেখতে অনেকটা ঘড়ির ব্যাটারির মতো একটা জিনিস বাশারের ইউনিফর্মের কলারের ফোকড় থেকে বের করে চোখের সামনে তুলে ধরলো।

"দেখি," বলে জিনিসটা দু-আঙ্গুলে তুলে নিলো বাশার। জয়াও তাকিয়েছিল জিসিনটার দিকে।

জিনিসটা চিনতে পেরে শিউরে উঠলো বাশার। তবে ও কিছু বলার আগে কিংবা কাউকে সাবধান করার আগেই জয়া রীতিমতো চিৎকার করে

উঠলো। “এটা তো একটা...” বাশার জিনিসটাকে মাটিতে ফেলে পায়ের জুতো দিয়ে চেপ্টা করে দিলো।

ওদের দুজনারই এই অদ্ভুত আচরণে চমকে উঠলো রিফাত, “ব্যাপার কি, হচ্ছেটা কি... তোমরা...” রিফাতের দিকে তাকিয়ে বাশার বলে উঠলো, “ওটা একটা লিসেনিং ডিভাইস ছিল। তারমানে... তারমানে কেউ একজন প্রতিনিয়ত আমাদের কথা শুনেছে। এভাবেই তাহলে ওরা বার-বার আমাদের সবকিছু আগে থেকেই জানতে পারছিল। আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়া উচিত।”

বলে ও মাটি থেকে মুর্তির ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে এল বাইরে। সাথে-সাথে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে গেল ওর। চোখ বন্ধ করতেই শুনতে পেল ওকে দুই হাত ওপরে তুলে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কেউ এসে চেপে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলো। ও দেখতে পেল ঘরের ভেতর থেকে রিফাত আর জয়াকে বাইরে এনে বন্দি করা হচ্ছে। “কি হচ্ছে এখানে?”

“আমি বলছি, এই লাইট অফ কর,” গলাটা বাশারের খুবই পরিচিত মানুষ ওসি মল্লিকের। “ইন্সপেক্টর বাশার, তেমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তুমি একটি মামলার এভিডেন্স গায়েব করেছো, সেইসাথে পুরনো এক ডাকাতি মামলার লুট হওয়া মাল উদ্ধার করে সেটাকে নিজের লাভের জন্যে গায়েব করার চেষ্টা করেছো। বিশেষ ক্ষমতাবলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি,” বলে সে বাশারের কানের কাছে একটা মুখ এনে ফিসফিস করে বলে উঠলো।

“বন্ধু, এইবার তুমি শ্যাষ,” বলে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো ওসি মল্লিক।

অধ্যায় সাইত্রিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

তালুকদার পরিবারের বৈঠকখানা

“ভবিষ্যত পরিকল্পনার চইতে বর্তমান পরিস্থিতি সামলানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ,” হঠাৎ ধমকে উঠলো হেনরি। “আপনারা কি বুঝতে পারছেন না পরিস্থিতি কতোটা গুরুতর। এই ঠগীরা ভারত ছেড়ে এভাবে দলে-দলে এখানে চলে এসেছে কেন সেটা অনুধাবন করতে পারছেন না? কারণ এই এলাকায় ওরা নিজেদের একটা বিরাট আস্তানা তৈরী করতে চায়। আর সেটা খুবই সম্ভব, কারণ ওদের কাছে ভারতবর্ষে ঠগীদের জন্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক জোড়া কালীর মুর্তি আছে, ওদের দলের নেতা ফিরিঙ্গীয়া অত্যন্ত শক্ত মানুষ,” বলে সে আবারো একটু থামলো। “তারচেয়ে বড় কথা ওরা এখানকার স্থানীয় শক্তির সহায়তা পাচ্ছে।”

হেনরি থেমে যেতেই বৈঠকখানায় নিরবতা নেমে এল। ওরা এই মুহূর্তে জরুরি আলোচনায় বসেছে তালুকদার পরিবারের বৈঠকখানায়। হেনরি যখন ঘোষণা দিলো সে একটা ফাঁদ পাততে চায় কিন্তু এর জন্যে তার বেশ কিছু মানুষের সহায়তা লাগবে তখন জরুরি পরিস্থিতির জানান দিয়ে সমন পাঠানো হয় সবার কাছে।

সবাইকে একসাথে করার ব্যাপারটা সহজ ছিল না। কারণ যুগ-যুগ ধরে চলে আসা শত্রুতাকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসাটা সহজ ব্যাপার নয়। তাই হেনরি সূর্যকান্তকে বিশেষ একটা চিঠি লিখে পাঠায়। সেটা পাবার সাথে সাথেই আসতে রাজি হয়ে যায় সূর্যকান্ত। এরপরে ডোংরু মহারাজকে আনতে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। এই মুহূর্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে ক্যাপ্টেন ম্যাকফি আর তার দলের লোকজন, হেনরি স্লীম্যান, সূর্যকান্ত আচার্য, ডোংরু মহারাজ আর পর্দার আড়াল থেকে আলোচনায় অংশ নিবে জোহরা তালুকদার।

“পরিস্থিতি এতোটা খারাপ হোত না যদি না আপনারা সত্য লুকাতেন। বিশেষ করে আপনি,” বলে ক্যাপ্টেন ম্যাকফি একটা আঙ্গুল তুলে দেখালো

সূর্যকান্তের দিকে। “আমরা যখন এই এলাকায় এলাম তখন যদি আপনি আমাকে সব খুলে বলতেন তবে সময়ও বাঁচতো আর আমাদেরকে এতোটা ঝুঁকির মুখে পড়তে হোত না। আপনি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু সত্য বলেননি,” বলে ম্যাকফি তামাকের পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো।

“আমি আমি...” জেরার মুখে পড়ে সূর্যকান্ত তোতলাতে লাগলো। “আমি তো তখন এতোকিছু জানতাম না আর বুঝতেও পারিনি।”

“অপনি ঠিকই বুঝেছিলেন,” বলে ম্যাকফি পাইপটা নামিয়ে রাখলো। “আপনি যেটুকু জানতেন সেটুকু তো বলতে পারতেন। সেটাও যদি আমরা জানতাম তবে অনেক আগেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেত। এখন সত্যটা বলুন। সবাই সত্যটা জানতে চায়, সবার জানার অধিকার আছে।”

সূর্যকান্ত একবার ম্যাকফির দিকে দেখলো তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল ডোংরু মহারাজের দিকে। ডোংরু মহারাজের মুখে কোন ভাব নেই। সে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কারো কাছ থেকে কোন সাপোর্ট না পেয়ে সূর্যকান্ত বুঝতে পারলো কথা বলা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। “আমি আমি...”

“বুঝতে পেরেছি আপনি বলতে পারবেন না। আমিই বলছি। ভুল হলে ঠিক করে দেবেন। সূর্যকান্তের বাবার মৃত্যুর পর তাদের পারিবারিক জমিদারির প্রকৃত উত্তরাধিকার ছিল সূর্যকান্তের বড় ভাই রমাকান্ত আচার্য। বাবার মৃত্যুর পর সে পারিবারিক সবকিছু বুঝে নিচ্ছিলো এমন সময় ভারত মুল্লুক থেকে এলাকায় এসে হাজির হয় সূর্যকান্ত। তার বড় ভাই তখনো জমিদারির শপথ নেয়নি। কিন্তু তার আগেই সে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বেশ কিছু বড়-বড় কাজে হাত দেয়। এরমধ্যে একটা ছিল নতুন জমিদার বাড়ির কাজ শুরু করা। মূলত সূর্যকান্ত যেটাকে শশীলজ নাম দিতে যাচ্ছে এটার কাজও সে শুরু করেনি, করেছিল তার বড় ভাই। তো যাই হোক, সে ভারত থেকে এসে এই বিরাট জমিদারি এসব দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী মানুষের সহয়তায়,” বলে সে এক ঝলক ডোংরু মহারাজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। “তার বড়ভাইকে খুবই বাজেভাবে জমিদারি থেকে উৎখাত করে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে...” এই পর্যন্ত বলতেই সূর্যকান্ত চেঁচিয়ে উঠলো।

“আমি মোটেও রমাদাকে মেরে ফেলতে চাইনি। আমি শুধু চেষ্টা করেছি আমার প্রাপ্যটা বুঝে নিতে। আমার মা ছিল বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী। রমাদার মা সবসময় সবচেয়ে বেশি সুবিধে পেয়েছে, আমরা সবসময় বঞ্চিত হয়েছি কাজেই আমি আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছি ¯ফে। কিন্তু দাদা আমাকে ভুল বুঝেছে। আমি জমিদারি দখলের পর সে পালিয়ে চলে যায় ভারত।”

“হ্যা, এখান থেকেই ঠগীদের গল্প শুরু। পরাজিত বিদ্ধস্ত চিরকুমার রমাকান্ত ছিল একটু সাধক ধরণের মানুষ। কালীপূজো করতো সে। সে যখন ভারতে পালিয়ে যায় সেখানে গিয়ে এক ঠগীর সাথে পরিচয় হয় তার। সেই লোকের মাধ্যমে সে ইলোরায় ঠগীদের বাৎসিক উৎসবে যোগদান করে। সেই উৎসবে এসেছিল ভারতের আরেক দূর্ধর্ষ ঠগী দলের নেতা ফিরিঙ্গীয়া, দক্ষিণ ভারত থেকে এক ইংরেজ অফিসারের সাথে ঝামেলা বাধিয়ে সে তখন এলাকা ছাড়া। তার ওপরে তার কাছে আছে ঠগীদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীকগুলোর একটি, জোড়া কালী। একদিকে রমাকান্তের দরকার শক্তিশালী একটা পক্ষ, অন্যদিকে ফিরিঙ্গীয়ার দলের দরকার শক্ত একটা ঘাঁটি। তাই দুজনে মিলে তারা একটা চুক্তিতে আসে। ফিরিঙ্গীয়ার দল রমাকান্তকে সহায়তা করবে তার জমিদারি ফিরে পেতে, অন্যদিকে জমিদারি ফিরে পেলে রমাকান্ত ফিরিঙ্গীয়াদেরকে এই এলাকায় একটা চিরস্থায়ী শক্ত ঘাঁটি তৈরী করতে দিবে। কারণ ওদের সাথে মিশতে-মিশতে রমাকান্তও ততোদিতে ঠগী জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে। এরপর তারা সবাই মিলে চলে আসে এই এলাকায়। ওরা এলাকায় এলে সেই খবর পেয়ে সূর্যকান্ত বুঝতে পারে একদিকে তালুকদার পরিবার অন্যদিকে নিজের ভাই, এদের সাথে একা লড়ে সে কুলিয়ে উঠতে পারবে না তখন সে চেষ্টা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে আঁতাত করতে।”

“কিন্তু ওরা আসার পর ওরাই গায়েব হয়ে যায়। তাদের সাথে-সাথে গায়েব হয়ে যায় স্থানীয় আরো কয়েকজন প্রভাবশালী মানুষ। ফিরিঙ্গীয়া আর তার দলের মুখোমুখি আমি হয়েছি। আমি জানি কতোটা দূর্ধর্ষ আর ভয়ঙ্কর ওরা। ফিরিঙ্গীয়া এই এলাকাকে তার ঘাঁটি হিসেবে তৈরী করে পুরো ভারতবর্ষের একক ঠগীনেতা হতে চায়। আর সেটা সে পারবে। কারণ ঠগীরা প্রতীকে বিশ্বাস করে, ইশারায় বিশ্বাস করে। তার কাছে ওদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক জোড়া কালী আছে। তার ওপরে সে সাহসী, সে শক্তিশালী ও চতুর। উদাহরণ দিচ্ছি, এটা আপনাদের এলাকা। এখানে সে বাইরে থেকে এসে একের পর এক কাজ করে যাচ্ছে অথচ আপনারা কেউ বেরই করতে

পারছেন না সে আছেটা কোথায়। পেরেছেন?” হেনরির প্রশ্নের জবাবে সবাই চুপ করে রইলো। আসলে কেউই পারেনি।

“কাজেই তাকে আর তার দলকে ধরতে হলে গর্ত থেকে বের করে আনতে হবে। আর যদি এখুনি আমরা সেটা করতে না পারি তবে রমাকান্তের সহায়তায় ধীরে-ধীরে ফিরিঙ্গীয়ারা এই এলাকাতে স্থায়ি হয়ে বসবে। আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আপনাদের মধুপুর এলাকা ব্যবসায়ি ও নদীবন্দর এলাকা। এখান দিয়ে মেঘালয়, আসামের ব্যসায়িরা নিয়মিত যাতায়াত করে, লোকে তীর্থে যায়। কাজেই এই এলাকায় ওদের শিকারের অভাব হবে না। আপনারা যদি নিজেদের এলাকা, নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করতে চান তবে এক্ষুণি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে এই এলাকা ঠগীদের দখলে যাবে। আর সবার আগে ধ্বংস হবেন আপনারা,” বলে হেনরি একে একে সূর্যকান্ত, ডোংরু মহারাজকে দেখালো।

“আপনি কি করতে চান?” গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ পরে জানতে চাইলো ডোংরু মহারাজ। “আমি সর্বত্মক সহায়তা করবো।”

ম্যাকফি তাকিয়ে আছে ব্রাহ্মণের দিকে। এই লোকটাকে ওর বুদ্ধিমান মনে হয়। এর আগেও একবার সে ঘোড়ার ব্যাপারটা জানিয়ে ওদেরকে সহায়তা করেছে। যদিও ম্যাকফি এখনো জানে না কিভাবে সেটা করেছে সে, তবে ওর বিশ্বাস এই লোক চাইলে এখনো পারবে। হেনরির দিকে তাকিয়ে ও ইশারা করলো। হেনরি বলতে শুরু করলো।

“আমি একটা ফাঁদ পাততে চাই, তবে এরজন্যে আপনাদের সবার সহায়তা লাগবে। ক্যাপ্টেন ম্যাকফি, সূর্যকান্ত,” বলে ও একটু বিরতি দিয়ে ডোংরু মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললো, “বিশেষ করে ডোংরু মহারাজ, আপনার সহায়তা লাগবে আমার। কারণ স্থানীয় লোকজনের ভেতরে আপনার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। এর আগে একবার আপনি ক্যাপ্টেন ম্যাকফিকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস চাইলে আপনি এবারও পারবেন,”

হেনরি থামতেই পর্দার আড়াল থেকে মুখ ঢাকা জোহরা এগিয়ে এল ওদের দিকে। “আমিও থাকতে চাই,” বলে ও ক্যাপ্টেন ম্যাকফি আর হেনরির দিকে দেখলো। “মানা করে লাভ হবে না। কারণ আমার অধীনে এই এলাকার সবচেয়ে শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী আছে। আমি নিজে ওদেরকে নেতৃত্ব দিতে চাই।”

সবাই চুপ হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর হেনরি বলে উঠলো, “ঠিক আছে, তাহলে আমরা কাজ শুরু করে দেই। আগেই বলেছি আমি একটা ফাঁদ পাততে চাই। আমি যতোটুক জানি এই সময়ে প্রতিবছর তীর্থাযাত্রা শুরু হয়। ঠিক,” বলে সে ডোংরু মহারাজের দিকে তাকালো।

“হ্যা, আর সপ্তাখানেক পরেই আমাদের যাত্রা করার কথা,” ডোংরু জবাব দিলো।

“সেটাকে এগিয়ে আনুন, আর এবার আপনার যাত্রার সঙ্গি হবে খোদ জমিদার সূর্যকান্ত,” হেনরির কথা শেষ হতেই সূর্যকান্ত লাফিয়ে উঠলো।

“কি বলছেন এসব, আমি পারবো না। আমি...”

“আপনার অনুমতি কে চেয়েছে। আমরা যা বলি সেটা আপনাকে মানতেই হবে,” হেনরি এই পর্যন্ত বলতেই ডোংরু মহরাজ মৃদু হেসে উঠলো, সাথে আরো দুয়েকজন। হেনরি অনুমান করলো সূর্যকান্তের কাপুরুষতা তাহলে সর্বজন বিদিত। “ফাঁদ পাতার জন্যে আমার একটা পরিকল্পনা আছে তবে তার আগে হাট থেকে আমরা যে ঘোড়াচোর বাজিকর ধরেছিলাম ওদেরকে নিয়ে এস। আমার পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হলে ওদেরকে দরকার আমার।

***

“দরকার নেই,” ফিরিঙ্গীয়া তার সামনে ধরে থাকা পানের বাটাটা একহাতে সরিয়ে দিলো। ভোজের পর আলোচনায় বসা মানেই হলো, তামাক আর পান চলবেই, কিন্তু ফিরিঙ্গীয়ার এখন পান নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বরং সে তামাকের নলে টান দিলো। গুড়-গুড় করে বড় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। ধোঁয়া টানার চাইতে বরং এই গুড়-গুড় শব্দটা তার কাছে বেশি ভালো লাগে। চোখ বন্ধ করে তামাক টানলেও প্রতিটি মানুষের প্রত্যেকটা কথা তার কানে যাচ্ছে। নিজে বলার আগে সবারটা শুনতেই বেশি পছন্দ করে সে। তারপর যখন নিজে বলে তখন সবাইকে সেটা শুনতে বাধ্য করে।

“গতবারের ঘটনায় আমরা যখন ঝিরণী দিতাছি তহন ওই লোকগুলা আতকা বাইরে থাইক্কা আইসা পড়লো। আমরা সাবধান আছিলাম, আমাগো

পাহারা আছিল তারপরেও লোকগুলান কই থাইক্কা আসলো কিছুই তো বুজলাম না। আর হেরা কেডা হেইডাও তো বাইর করুন যায় নাই," আমার মনে অয় এইডা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অইবো," বয়স্ক এক ঠগী বলে উঠলো। ফিরিঙ্গীয়ার বাপের পরে এই লোকেরই ঠগীনেতা হবার কথা ছিল কিন্তু ফিরিঙ্গীয়া পটভূমিতে আসার পর চিত্রটা বদলে গেছে।

"হেরা যারাই হোক, তাগোরে নিকেশ করা অইছে, অইছে না?" তার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিরিঙ্গীয়া বলে উঠলো। "আমি নিজ হাতে ঝিরণী দিছি। কাজেই মরা মানুষ কোন বিপদ না। আমাগো ভাবতে অইবো..."

"পরথমে ইংরেজরা, তারপর এই ঘটনা, পরিস্থিতি বেশি সুবিধার লাগের না। তুমার নেতৃত্বে বার-বার আমরা নিয়মের বাইরে যাইতাছি। ওইদিন রাইতে ইংরেজ অপিসারগো আর তালুকদাররে মারুনের কুনো দরকার আছিল!" আরেক বয়স্ক ঠগী রাগের সাথে বলে উঠলো।

"দেবীর নির্দেশ। তুমরা কি আমারে দেবীর নির্দেশ অমাইন্য করতে কও। আমরা তো গেছিলাম নজর রাখতে। দেবী শুভ নিদর্শন দেওয়াতেই না ঝিরণী দিতে অইলো," কথাগুলো বলে ফিরিঙ্গীয়ার ভালো লাগলো না। কেমন জানি জবাবদিহি মনে হচ্ছে তার কাছে।

"দেবীর নির্দেশ! বারে বারে তুমি উল্টা-পাল্টা করবো আর দেবীর কথা কইবা। আগেও তুমি ইংরেজগো লগে বাজছো। তুমার বাজাবাজির কারণেই নিজের মুল্লুক ছাইড়া এইহানে আইতে অইছে আমগো," প্রথম বুড়ো ঠগী বলে উঠলো।

"তো কি অইছে?' রক্ত চক্ষু করে ফিরিঙ্গীয়া তাকালো তার দিকে। এতোক্ষণে ধৈর্য আর মেজাজ দুটোই হারিয়ে ফেলেছে সে। "সারাজীবন তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছো। আমার বাপে না থাকলে এহনো কুনো রাস্তার পাশে লাশ অইয়া পইড়া থাকতা। আর আমার কথা কও। মুল্লুক ছাড়ছি তো কি অইছে। যেকুনো সময়ের চেয়ে ভালা আছি আমরা। জোড়া দেবী আমগোর লগে আছে। আগে গোপনে দেবীর পূজা দিতে অইতো, ভোজ করতে অইতো, এখন নিজেগর বিরাট মন্দির আছে আমাগোর। ভাবতে পারো এক বছর আগে যহন আমি দলের দায়িত্ব নিলাম ভাবতে পারতা এক বছর পরে নিজেগো মন্দিরে দেবীর পূজা দিতে পারবা। আর হ বিপদ আইছে কিন্তু দেবীর আশির্বাদে বিপদ কাটায়া আরো শক্তিশালী অয়া উঠছি আমরা। কাজেই কিসের এতো সমইস্যা তোমাগো। আর যদি কইতে চাও আরো

বিপদ আইবো কিন্তু আমি এই এলাকারে আরেকটা ইলোরা বানায়াই ছারমু। ইলোরার পরে এই এলাকা অইবো ভারতের ঠগীগো লাইগা দ্বিতীয় তীর্থস্থান। কি বলো রমাকান্ত অইবো না?" শেষ প্রশ্নটা করলো সে ঝিমোতে থাকা প্রাক্তন জমিদার রমাকান্তের দিকে তাকিয়ে।

সূর্যকান্তের সৎভাই রমাকান্ত আচার্য। সেই ঠগীদেরকে এই এলাকায় নিয়ে এসেছে। "অবশ্যই হবে," বলে সে লাল টকটকে চোখ জোড়া খুললো। "জোড়া দেবীর আশীর্বাদ থাকলে হতেই হবে।"

"হ, জোড়া দেবীর আশির্বাদ আমাগো লগে আছে। এরচেয়ে বড় আর কিছু কি অইতে পারে। কাজেই প্যানপ্যানানি বাদ দিয়া আমি কি কই শুনো। হেইমতো কাম করলে আমরাই হবো এই এলাকার অলিখিত জমিদার যেই এই ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত কেউই করতে পারে নাই। তয় এর লাইগা আরো ঝুঁকি নিতে অইবে, বিশেষ করে সূর্যকান্তরে শেষ করতে হবে," হঠাৎ সে থেমে গেল। দূর থেকে একজন অনুচর কিছু একটা বলার জন্যে ইশারা করছে। ইশারায় তাকে কাছে ডাকলো ফিরিঙ্গীয়া। তার কানে কানে কিছু একটা বললো অনুচর। চুপচাপ শুনে গেল সে। অনুচরের কথা শেষ হতেই তাকে যাবার ইশারা করে নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাকালো।

"একটা খবর আইসা পৌছাইছে," সবাই কৌতুহলি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "আমাগো ঘুড়াচোর বাজিকর খবরি নাকি খবর পাইছে মেঘালয় থাইক্কা নাকি একদল ব্যবসায়ি মুধপুর আইসা পৌছাইছে। হেরা নাকি উত্তরের দিকে রওনা দিবো। তাগো লগে ডোংরুর দলও একসাথে তীর্থে রওনা দিবো। তবে এইডাও বড় খবর না। হেগো লগে এইবার যাইবো খোদ জমিদার সূর্যকান্ত," ফিরিঙ্গীয়ার শেষ কথাটা শুনে সভায় ফিসফাস শুরু হয়ে গেল।

"আমাগো মূল দুই শত্রু, যাগো কব্জায় আনতে পারলে এই এলাকা আমাগো কব্জায় আইবো, রমাকান্তরে আবার জমিদার বানাইতে পারবো আমরা। হেই দুই শত্রুরে একসাথে এরহম অরক্ষিত অবস্থায় আর পাওয়া যাবে না। কাজেই এইটা আমাগো জন্যে বিরাট সুযোগ। কারণ সবকিছু ঠিক আছে। দেবী প্রসন্ন আছেন, যোগ শুভ আছে। সব লক্ষণ পরিষ্কার। কাজেই এইবারই আমাগো মাঠে নামা উচিত। সবাই কি বলেন?"

সবাই একযোগে সম্মতি জানালো। ফিরিঙ্গীয়া তার বাপের দিকে তাকালো। বাপ সামান্য মাথা নেড়ে তাকে কাছে ডাকলো। কানের কাছে ফিসফিস

করে বরলো কিছু একটা। বাপের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলো সে। তারপর সবার দিকে ফিরে বলে উঠলো। “তাইলে আমরা পথে নামার প্রস্তুতি নেই। তবে এইখানে একটা কথা আছে। আব্বার কথা যদি ঠিক হয় তাইলে এইডা একটা ফাঁদ,” বলে সে থেমে গেল। ধীরে-ধীরে গোঁফে তা দিতে দিতে দিতে তার মুখে ফুঁটে উঠলো এক টুকরো নিষ্ঠুর হাসি। “তয় অগো কি করতে অইবো হেইডা আমি খুব ভালাই জানি। বাইরে খবর পাঠাও, আমার লোক লাগবো। সব আলগা ঝামেলা শেষ করতে হইবে এইবার।”

অধ্যায় আটত্রিশ

বর্তমান সময়,

বিশেষ সেল, কতোয়ালি মডেল থানা, ময়মনসিংহ

“সব শেষ!” জয়া আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো। “এতো কষ্ট, এতো অপেক্ষা সব এভাবে শেষ হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। এখন তো মান সম্মান বাঁচানো নিয়েই প্রশ্ন উঠবে,” ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। কথাগুলো রিফাতের দিকে তাকিয়ে বললো সে। রিফাতও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

ওরা এই মুহূর্তে বসে আছে ময়মনসিংহ কতোয়ালি মডেল থানার একটা বিশেষ রুমে। এখানে সাধারণত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। তবে প্রথমেই ওদেরকে এখানে এনে বসানো হয়নি।

ওসি মল্লিক ওদেরকে রিফাতের বাসার সামনে থেকে অ্যারেস্ট করার পর ওদের প্রতি তার আচরণ আর দশটা সাধারণ ক্রিমিনালের মতোই ছিল। ওদেরকে থানায় এনে সেলে বন্দি করে রাখা হয়। অবশ্য একটা ভালো কাজ করেছে সে। বাশারের ক্ষতটা চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করেছে থানার ডাক্তার ডাকিয়ে। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেলে রাখার পর বাশার তৌফিককে ডেকে পাঠিয়ে এসপি আমজাদের সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়। ওর কপাল ভালো একটা কাজে কাছাকাছিই ছিল সে । তাই বাশারের কল পেয়ে সব শোনার পর সে ওসি মল্লিককে কল করে নির্দেশনা দেয় ওদেরকে সেলে বন্দি করে না রেখে গেস্টরুমে পাহারা দিয়ে রাখা হোক। কারণ সে নিজে আগে ওদের সাথে কথা বলবে, তারপরে যা করার করা হবে। ওসি নাকি আপত্তি জানানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তৌফিকের কাছ থেকেই ব্যাপারটা শুনেছে বাশার। ও তৌফিককে নির্দেশ দিয়েছে থানাতেই থাকতে কারণ ওর দরকার হতে পারে। সেইসাথে এও জানিয়েছে রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাকেও জানিয়ে রাখতে যাতে কোন দরকার পড়লে ওদের সাহায্য পাওয়া যায়।

“কে বলেছে সব শেষ, গল্প তো সবে শুরুমাত্র,” বাশার ওদের দিকে দেখছে না। ও তাকিয়ে আছে সাদা দেয়ালের দিকে। বাম হাতের আংটিটা ক্রমাগত

ঘুরিয়ে চলেছে। অবাক ব্যাপার, যখন তার চারপাশের সবকিছু ভেঙে পড়ছে, যখন ওর জীবনটাই শেষ হতে চলেছে এরকম সময়ে কেন জানি খুব মজা লাগছে ওর। গত এক বছরে ও এরকম স্বস্তি বোধ করেনি। ভীষণ ক্লান্ত অবস্থায় টানা আট ঘন্টা ঘুম দিয়ে উঠলে সকালবেলা যেরকম ফ্রেশ লাগে ওর অনুভূতি হচ্ছে অনেকটা সেরকম। বাশার আপন মনেই হাসতে লাগলো।

“কি ব্যাপার এরকম পরিস্থিতিতে তুমি হাসছো?” কথাটা বলে রিফাত জয়ার দিকে তাকালো। দুজনেই আনমনে কাঁধ ঝাঁকালো একবার। দুজনেই ভাবছে লোকটা কি অতিরিক্ত মানসিক চাপ নিতে না পেরে পাগল হয়ে গেল নাকি।

“বললাম তো গল্প মাত্র শুরু হয়েছে,” বাশার আবারো হেসে উঠলো। “শোন, মানুষের জীবন থেকে যখন কিছুটা অংশ হারিয়ে যায় তখন সে অসহায় হয়ে পড়ে, আর যখন সে তার জীবনের সবকিছু হারিয়ে ফেলে তখন সে হয়ে ওঠে ভীষণ শক্তিশালী। কারণ তখন তার হারাবার মতো আরকিছু থাকে না। বুঝেছো”

জয়া চোখ মটকে তাকালো তার দিকে। “সে তো বুঝলাম কিন্তু চারশো পৃষ্ঠার উপন্যাসের সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা পড়ার পর তোমাকে যদি কেউ বলে গল্প মাত্র শুরু হলো তাহলে তোমার কেমন লাগবে। তাও আবার গল্পের প্রধান সব চরিত্র যখন ধরা খেয়ে গেছে, তখন? তুমি যদি লেখক হতে তবে পাঠক তোমাকে ধরে পেটাতো,” জয়া একটু রেগে উঠেছে।

ওর কথা শুনে বাশার আবারো হেসে উঠলো। ও দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকালো। বারোটা বেজে থেমে আছে ওটা। কবে ওটার বারোটা বেজেছে কে জানে। তবে ওদের বারোটা বাজতে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাশার অনুমান করার চেষ্টা করলো কতোক্ষণ আগে এসপি আমজাদের সাথে কথা হয়েছে ওর। মনে-মনে আন্দাজ করলো এসপি স্যারের এসে পৌছাতে আরো আধা ঘন্টার ওপরে লাগবে। এই সময়ের ভেতরে ওকে কিছু জিনিস বের করতে হবে।

“আচ্ছা আমাকে একটা ব্যাপার বলো,” বলে ও দুইহাত ওপরে তুললো। “এই কেসে কাজ শুরু করার পরেই বুঝতে পারলোম কেউ একজন রেকর্ড গায়েব করেছে। আচ্ছা সেটা পরে বুঝলাম অথরিটিই করেছে। কিন্তু তারপরে একজন বিদেশীকে দেখলাম আমাকে অনুসরণ করতে, সে কে আমরা জানি না। রিফাতের সাথে কথা বলতে গিয়ে আক্রমণের শিকার

হলাম, যে-লোকটা রিফাতকে অপহরণ করতে চাইলো সেই একই লোক শশীলজেও আমাদের কাছ থেকে মুর্তিটা কেড়ে নিতে চাইলো। আর সম্ভবত এই লোকই আমার ইউনিফর্মের কলারে ট্র্যাকার লাগিয়েছিল। সম্ভবত হোটেল মোস্তাফিজের লবিতেই এই কাজটা করেছিল সে," বলে ও একটু কাঁধ ঝাঁকালো। "আর এভাবেই আমাদের প্রতিটা কথা প্রতিটা মুভমেন্ট জানতে পারছিল। এই লোকটাকে আমার কাছে অত্যন্ত প্রফেশনাল মনে হয়েছে। তারমানে একে কেউ লাগিয়েছে অমাদের পেছনে। তারমানে অত্যন্ত শক্তিশালী কেউ আছে এসবের পেছনে। আমার প্রশ্ন হলো কে?" বাশার তাকিয়ে আছে দুজনার দিকে। "তোমাদেরকে আমি একটা কথা এখন পর্যন্ত বলিনি কারণ এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না," বলে ও লাইব্রেরির সামনে সাদা গাড়িতে দেখা বিদেশি লোকটার কথা খুলে বললো। তবে লোকটা যে দেখতে মৃত ডেভিডের মতো সেটা এড়িয়ে গেল।

"এখানে আমার একটা কথা আছে," বলে রিফাত একটা হাত তুললো। "তুমি বিদেশী যে লোকটার কথা বলছো তার ব্যাপারে আমার একটা থিউরি আছে। ডেভিডের একজন পার্টনার ছিল। এই লোকটাকে আমি কখনো দেখিনি কিন্তু যতোটুকু জানতাম সেই ডেভিডের বেশিরভাগ ব্যবসার দিকটা দেখাশোনা করতো। হয়তো এই লোকই গাড়ি উদ্ধারের ব্যাপারটা শুনে ফিরে এসেছে। টুইন কালী একটা অমূল্য অ্যান্টিক পিস। যার হাতে থাকবে তার ব্যাপারে... " রিফাত কথা শেষ করলো না। বরং ইশারায় বুঝিয়ে দিলো ব্যাপারটার গভীরতা।

"এখানে আমারও একটা কথা বলার আছে। বিজয় আচার্যের একজন অ্যাসিসটেন্ট ছিল বলেছিলাম না, দাপুনিয়ার ছেলে, মোক্তার নাম। বিজয় মারা যাবার পর তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। সেও হতে পারে। হয়তো সেও এই গাড়ি উদ্ধারের ব্যাপারটা জানতে পেরে ছুটে এসেছে যদি কোনভাবে টুইনকালী হাত করতে পারে," জয়া বললো কথাটা।

"যাক একেবারে ছায়াশরীরের চেয়ে অন্তত সম্ভাব্য দুটো নাম তো পাওয়া গেল। এখানে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে তারপর আমি মূল প্রসঙ্গে যাবো। আচ্ছা তোমরা বার-বার বলছো টুইন কালী। কিন্তু মুর্তিতো আমি দেখি একটা। তাহলে একটাকে টুইন কালী বলা হয় কেন?" বাশার জানতে চাইলো।

“আশ্চর্য এটাই তো এই মুর্তির বৈশিষ্ট্য,” রিফাত বলে উঠলো। “এই মুধুপুর অঞ্চলে নাকি ঠগীদের অত্যন্ত শক্তিশালী একটা দল ছিল। ওরা এই জোড়া কালী মুর্তির পুজো করতো। এই জোড়া কালী মুর্তির নাকি অস্বাভাবিক শক্তি ছিল। তাই ঠগীদের এই বিশেষ দলটাকে সবাই ভয় পেতো। লেজেন্ড বলে ইংরেজ অফিসারদের একটা দল ওদেরকে ট্র্যাক করতে-করতে এখানে চলে আসে। ওদের সাথে নাকি এই ঠগী দলের ব্যাপক গন্ডগোল হয়। এরপর এই জোড়া কালীমুর্তিকে সরিয়ে ফেলা হয়। একটা পাঠিয়ে দেয়া হয় ইংল্যান্ডে আরেকটা কোথায় রয়ে যায় কেউই জানে না। তবে এটাও প্রচলিত যে ইংল্যান্ডে যে মুর্তিটা পাঠানো হয় সেটাতেই নাকি ক্লু দেয়া আছে অন্য মুর্তিটা কোথায়,” টানা বলে রিফাত থামলো।

ও থামতেই বাশার কথা বললো না। “আচ্ছা, এবার অনেককিছুই পরিষ্কার হয়ে আসছে আমার কাছে। এবার বুঝতে পারছি কেন সবাই পাগল হয়ে এই মুর্তির পেছনে লেগেছে। এই মুর্তি আসলে দ্বিতীয় কালী মুর্তি উদ্ধারের হাতিয়ার। আর এই মুর্তি হাসিল করে সেটাকে পরীক্ষা করে দ্বিতীয় মুর্তিটা উদ্ধার করতে পারলে তবেই আসল খেলা জমবে আর সেটাই সবার উদ্দেশ্য। এবার বুঝতে পারছি কেন আমরা গ্রেপ্তার হলাম।”

“মানে?” জয়া জানতে চাইলো।

“মানে বুঝতে পারছো না। একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখ। আমরা শশীলজ থেকে মুর্তিটাকে উদ্ধার করে যখন বাসায় নিয়ে যাই তখনো কিন্তু আমার কলারে ট্র্যাকারটা লাগানোই ছিল। সম্ভবত আমার কাঁধে আঘাত না লাগলে ওটার ব্যাপারে আমরা জানতেই পারতাম না। তাহলে ওই লোকটা আর দল খুব সহজেই আমাদেরকে খুঁজে বের করে রিফাতের বাসায় আক্রমণ করতে পারতো। কিন্তু সেটা হয়নি বরং একটু পরেই কোন জানান না দিয়ে ওসি মল্লিক তার বাহিনীসহ এসে হাজির হয়। তারমানে বুঝতে পারছো?” বলে ও দুজনারই চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

“আমি কিছুই বুঝিনি,” রিফাতের সরল স্বীকারোক্তি।

“মানে হলো, যে বা যারাই আমাদের কাছ থেকে মুর্তিটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল তারাই ওসি মল্লিককে আমাদের গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়েছে।

“সর্বনাশ,” জয়া বলে উঠলো।

“সর্বনাশের কিছু নেই। এটাই আমাদের জন্যে সাপে বর হবে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে ওসি মল্লিককে যারাই নিয়োগ দিয়ে থাকুক তারা শুধু আমাদেরকে গ্রেপ্তার করেই অবশ্যই ক্ষান্ত হবে না বরং...”

“মুর্তিটাকেও সরানোর চেষ্টা করবে,” বাশারের অসমাপ্ত বাক্যটা রিফাত শেষ করে দিলো।

“একদম ঠিক। আর এই ব্যাপারটাই আমি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো,” বলে ও আবারো দেয়ালে ঝোলানো বন্ধ ঘড়িটা দেখলো। যদিও ওটা বন্ধ তবুও মনের ভেতরে একটা হিসেব আছে ওর। কিছুক্ষণের ভেতরে এসপি আমজাদ স্যার চলে আসবে। এর আগে কিছু কাজ সারতে হবে ওর। আর সেজন্যে তৌফিককে দরকার। দরকার ওর বন্ধু জামিলকে।

ও ঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে জয়া আর রিফাতের দিকে দেখলো। “শোন, আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আমি একটা ফাঁদ পাততে চাই।”

***

আরো আধা ঘন্টা পর বাশার, জয়া আর রিফাত বসে আছে এসপি সাহেবের রুমে। উনি এখনো আসেননি তবে কাছাকাছি চলে এসেছেন। বিগত আধা ঘন্টা বাশারের খুব ব্যস্ততায় কেটেছে। ওরা যে গেস্টরুমে বসে ছিল সেটার সেন্ট্রিকে ডেকে কোনরকমে তৌফিকের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় ও। তারপর তৌফিককে কিছু নির্দেশনা দিয়ে ওর মোবাইল থেকেই কল করে ওর বন্ধু জামিলকে। জামিলের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে সাহায্য লাগবে ওর। সেই ব্যাপারে অনুরোধ করতেই জামিল একবাক্যেই রাজি হয় যায়। কী করতে হবে, কিভাবে করতে হবে সেটা পরিষ্কার করে জামিলকে জানায়। জামিলের সাথে কথা বলার পর তৌফিককে আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে বিদায় করে ও।

এরপর জয়া আর রিফাতকে ওর পুরো পরিকল্পনা খুলে বলে। ওদের পরিকল্পনা যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে তখুনি গার্ড এসে এসপি’র রুমে নিয়ে যায় ওদেরকে। তখন থেকে বসে আছে ওরা। বাশার ভেতরে ভেতরে বেশ

চিন্তিত। কারণ ও যা পরিকল্পনা করেছে সেটার পুরোটাই নির্ভর করছে এসপি আমজাদের ওপরে।

রুমের দরজা বেশ জোরে খুলে গেল। ফোনে কথা বলতে-বলতে ভেতরে প্রবেশ করলেন ময়মনসিংহ এলাকার এসপি আমজাদ আনোয়ার। ঠিক তার পেছন পেছন দুজন গার্ড, তাদের সাথে ওসি মল্লিক। এসপিসাহেব সোজা গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন। এখনো ফোনে কথা বলছেন। তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো মল্লিক। এসপিসাহেবের কথা শেষ হতেই সে কথা বলতে শুরু করলো।

তার কথা শুনে একটা হাত তুললেন এসপি আমজাদ। “আহ! মল্লিক তোমার কথা তো শুনলাম। আমি একটু বাশারের সাথে কথা বলতে চাই। তুমি এক কাজ করো, ওনাদেরকেও নিয়ে যাও,” বলে উনি জয়া আর রিফাতকে দেখালেন। “উনাদের বাইরের রুমে বসাও। আমি আগে বাশারের সাথে কথা বলি পরে যা হবার হবে।”

“স্যার, আমি...” এসপির কথা শেষ হবার আগেই করে মল্লিক কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো এসপি আমজাদ কিছুই না বলে ¯ফে চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল সে। গার্ডদেরকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে টকিতে কথা বলতে বলতে বাইরের দিকে চলে গেল মল্লিক। বাশার জয়া আর রিফাতের দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা করে ওদেরকে শান্ত থাকতে বললো।

ওরা বেরিয়ে যেতেই এসপি আমজাদ সরাসরি ফিরে তাকালো বাশারের দিকে। “হোটাট দ্য হেল, বাশার! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ! এসব কী করে বেড়াচ্ছো তুমি?”

“স্যার, আমি সরি কিন্তু...”

“মল্লিকের কাছে যা শুনলাম তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয় তবে এইবার তো তোমাকে সরাসরি সাসপেন্ড করে বিচার করা হবে। তুমি বুঝতে পারছো আগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কতোটা কষ্টে তোমাকে সেভ করা হয়েছিল। আবারো এরকম বোকার মতো কাজ কিভাবে করতে পারলো তোমার মতো একটা ছেলে,” উত্তেজনায় দুই হাত দিয়ে টেবিলে একটা চাপড় বসিয়ে দিলো এসপি আমজাদ।

“স্যার প্লিজ, আগে আমাকে বলতে দিন। আমাকে ¯এফে পাঁচটা মিনিট সময় দিন,” বলে ও দেরি না করে শুরু থেকে একেবারে গড়-গড় করে বলে গেল সব। সময় নিতে গেলে বলার সুযোগ নাও আসতে পারে। “স্যার, সত্যি কথা হলো পুরো ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছে।”

এসপি আমজাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। “যদি তোমার কথা সত্যি হয়ও তবুও মল্লিক যেভাবে কেসটা সাজিয়েছে তাতে তো তোমার বারোটা বেজে যাবে। এমনকি আমিও তেমন কিছু করতে পারবো না। তুমি একটা ভুল করেছো। যদি আমাকে আপডেট দিতে কিংবা মুর্তিটা উদ্ধার হবার পর সরাসরি থানায় নিয়ে আসতে তাহলে এই ঝামেলায় পড়তে হোত না।”

“স্যার, যা ঘটেছে ঠিক এই ভয়েই আমি ওটাকে নিয়ে আসিনি কারণ আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না,” বাশার মরিয়া হয়ে বলে উঠলো। এসপি আমজাদের কর্মকান্ডের ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। আবারো ও মরিয়া হয়ে বলে উঠলো, “স্যার, আমার একটা পরিকল্পনা আছে। যদি আপনি অনুমতি দেন।”

এসপি আমজাদ এখনো চুপ করেই আছে। হয়তো কিছু হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছেন। “পরিস্থিতি ভালো না বাশার। তারপরও বলো তুমি কী করতে চাও,” বলে উনি চোখ তুলে তাকালেন বাশারের দিকে।

বাশারও সরাসরি তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। “স্যার, পরিস্থিতি যেরকম খারাপ খুব ভয়াবহ ঝুঁকি না নিলে আমি ব্যাপারটা সমাধান করতে পারবো না,” বলে ও চট করে একটা হাত এসপি আমজাদের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

ঝট করে ওর দিকে তাকালো এসপি। “বাশার, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?”

“স্যার, এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।”

অধ্যায় উনচল্লিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

বৃহত্তর মধুপুর এলাকা

অন্ধকারের নানা প্রকারভেদ থাকতে পারে ব্যাপারটা ম্যাকফি প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছিল যুদ্ধের সময়ে। কিছু অন্ধকার গাঢ় হয়, এর দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন গিলে খাবে, কুয়াশার অন্ধকার হয় কেমন জানি নেশাচ্ছন্ন, ঠিক একইভাবে আমাবশ্যার অন্ধকার থেকে শুরু করে সন্ধ্যাবেলার অন্ধকার আর গভীর রাতের অন্ধকারের মধ্যে যোজন-যোজন পার্থক্য। একেক ধরণের অন্ধকার মনের ওপরে একেক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে।

এই মুহর্তে এই মধুপুর গড়ের লালচে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ম্যাকফির মনে হতে লাগলো এই লালচে অন্ধকার যেন বিপদ আর আতঙ্কের প্রতিনিধি হয়ে ডাকছে। তবে সত্যি কথা এই মুধুপুর গড়ের মতো এরকম লালচে অন্ধকার ম্যাকফি কখনো দেখেনি। লাল মাটির কারণেই কিনা কে জানে টিলার আড়ালে বসে খোলা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ম্যাকফির মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটাই কেমন জানি অদ্ভুত লালচে আঁধারে ভরে উঠেছে। ও আবারো লম্বা নলের মতো দেখতে ফিল্ড গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে সামনে দেখতে যাবে তার আগেই পাশ থেকে কথা বলে উঠলো জোহরা।

“আপনার কি মনে হয় কাজ হবে?” কথাটা অনেকটা আনমনেই বলে ম্যাকফির দিকে বড়-বড় চোখের দৃষ্টি স্থির করলে জোহরা। “ওরা কি আসবে?”

ফিল্ড গ্লাস থেকে চোখ সরিয়ে গভীর দৃষ্টির সাথে চোখ মেলাতে গিয়ে কেমন জানি অহসায় বোধ করলো ম্যাকফি। এই জীবনে খুব বেশি মেয়েদেরে সাথে মেশার সুযোগ হয়নি ওর। যা মিশেছে সেটাও ফরমাল পার্টিতে সাদা চামড়ার মেয়েদের সাথে; যারা ঢং করে পোশাক পরা আর কায়দা করে সিগারেট টানা ছাড়া আর তেমন কিছু করতে পারে না। এসব মেয়েদের সাথেই নিজেকে খুব বেশি মানাতে পারে না ও, তার ওপরে এই মহিলা

আবার স্থানীয়। মহিলার বড়-বড় গভীর কালো চোখগুলো ছাড়া আর সবই ঢাকা। এমনকি মুখও ঢাকা। এই লালচে অন্ধকারে রহস্যময় জঙ্গুলে পরিবেশে ততোধিক রহস্যময় নারীর সাথে অসহায় বোধ করা ছাড়া আর উপায় কি।

বেশিক্ষণ জোহরার চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারলো না ম্যাকফি। চোখ ফিরিয়ে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, "বলা মুশকিল। কারণ আমি যতোটুকু বুঝতে পেরেছি এই ঠগীরা অত্যন্ত ধূর্ত আর নিষ্ঠুর। বিশেষ ক'রে ওদের যে দলনেতা ফিরিঙ্গীয়া তার ব্যাপারে অনেক কথাই শোনা গেছে। সে নাকি দেবীর আর্শিবাদ পুষ্ট, তার নাকি বিশেষ ক্ষমতা আছে। যদি এসব বিশ্বাস নাও করি তবে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে সে অত্যন্ত চতুর আর ভয়ঙ্কর। তবে আমরা জাল পেতেছি যতোটা সম্ভব নিখুঁতভাবে। প্রথমেই ঘোড়ার হাটে ধরা পড়া বাজিকর আর ডোংরু মহারাজের লোকদের দিয়ে তীর্থযাত্রার ভূয়া খবর ছড়ানো হয়েছে, এতে রাজা সূর্যকান্ত শামিল হবে সেটাও ঘটা করে প্রচার করা হয়েছে। কাজেই শশীকান্তকে ধরার এই সুযোগ ঠগীরা ছাড়বে বলে মনে হয় না," এই পর্যন্ত বলে ও ইশারায় মাঠের অন্যপ্রান্তে একটা বিরাট কড়ই গাছ দেখালো।

"ওই গাছে আমার দলের এক লোক জোনাথন দূরপাল্লার বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত আছে। অন্যপ্রান্তে আপনার লাল পাগড়িদের তিনভাগের এক ভাগ নিয়ে মহাবীর সিং আছে, আর আমাদের থেকে আরেকটু দূরে হেনরি আছে লাল পাগড়িদের আরেক বাহিনী নিয়ে। ডোংরু মহারাজের কিছু লোক আর রাজার বাহিনীর কিছু লোক নিয়ে তীর্থ যাত্রার ভূয়া দল সাজানো হয়েছে। ওরা বিকেলে ঘটা করে আনন্দ উৎসবের সাথে যাত্রা শুরু করেছে ব্রহ্মপুত্রের পাড় থেকে। রাত্রির প্রথমভাগে এই মনন্তরের মাঠে এসে যাত্রাবিরতি দিবে। রাতের সময়টা এখানে কাটিয়ে সকালে রওনা দিবে তীর্থযাত্রির দল।"

"এই মাঠ বেছে নেয়ার কারণ কি?" জোহরার কণ্ঠ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।

"প্রতিবার এই মাঠেই তীর্থযাত্রিরা প্রথমবারের মতো যাত্রাবিরতি দেয়। তাই এই মাঠে যাত্রা বিরতি দেয়াই উত্তম, তাছাড়া এই মাঠকে কভার করা আমাদের জন্যে সহজ হবে। কোনভাবে যদি তীর্থযাত্রিদের দলের সাথে মিশে ঠগীরা একবার এই মাঠে প্রবেশ করে তাহলেই হবে। এই মাঠ ছেড়ে ওদের আর বেরুতে হবে না," বলে ও আনমনেই বিড্রেসের পকেটে রাখা নারকেল পাতার বাঁশিটাতে হাত বুলিয়ে নিলো। আজ রাতে এই বাঁশির

গুরুত্ব অপরিসীম। ওদের দলের প্রতিটা লোকের কাছে এই বাঁশি দেয়া আছে। যে যেখানেই বিপদে পড়–ক এই বাঁশি একবার বেজে উঠলেই সবাই সাবধান হয়ে যাবে। এই বাঁশির আরেকটা সুবিধে হলো এই বাঁশির শব্দ অনেকটা পাখির ডাকের মতো।

“আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনি এখানে কেন?” ম্যাকফি আবারো জোহরার সাথে দৃষ্টি মেলানোর চেষ্টা করলো। অনেকটা জোর করেই নিজের দৃষ্টি স্থির রাখার চেষ্টা করলো জোহরার চোখের ওপরে। “আপনি তো চাইলেই বাড়ির আরামে বসে থাকতে পারতেন। যেখানে সাধারণ পরিবারের মেয়েরাই বাড়ির বাইরে বের হয়না, সেখানে আপনার মতো অভিজাত পরিবারের মেয়েদের তো এভাবেই বাইরে এসে একদল ভয়ঙ্কর লোকের মোকাবেলা করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।”

ম্যাকফির কথা শুনে জোহরার মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। এবার সে ম্যাকফির চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। “প্রয়োজন আর পরিবেশ মানুষকে তার কল্পনা থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়,” বলে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। “সময়ের চেয়ে বড় নিরামক যেমন আর হয়না ঠিক তেমনি সময়ের চেয়ে শক্তিশালী আঘাতকারীও আর কিছু হতে পারে না,” বলে সে আবারো দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো ম্যাকফির দিকে।

গভীর চোখের শক্তিশালী চাহনির দিকে তাকিয়ে আবারো সেই অসহায় ভাবটা ফিরে এল ম্যাকফির ভেতরে। “হ্যা, চাইলেও সময়ের কষাঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হয়না,” বলে ও মৃদু হেসে উঠলো।

“এই জন্যেই সেই চেষ্টা বাদ দিয়েছি,” বলে জোহরাও হেসে উঠলো। “একারণেই আমি এখানে। যেটা অভিসম্ভাবি সেটা থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সেটার মুখোমুখি হয়ে মোকাবেলা করাটাই শ্রেয়। কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।”

জোহনার চোখের দিতে তাকিয়ে ম্যকফি জবাব দিলো, “বলুন।”

“আপনার কপালের ডাপাশে ওই কাটা দাগটা কিসের। আমি লক্ষ্য করেছি আপনি প্রায়ই ওই জায়গাটা চেপে ধরে কী-কী জানি বিড়-বিড় করেন।”

জোহরার কথার জবাবে ম্যাকফি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই অনেক মানুষের কথাবার্তা আর হট্টগোলের শব্দ শোনা গেল। “ওইযে, ওরা

আসছে," উৎসক হয়ে ফিল্ডগ্লাসে চোখ লাগালো ম্যাকফি। যদিও অন্ধকারে এই ফিল্ড গ্লাস খুব একটা কার্যকর না তাই আগে থেকেই ওদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে বেশি আলো সাথে রাখার জন্যে। কারণ যথেষ্ঠ পরিমাণে আলো না থাকলে দূরপাল্লার বন্ধুক নিয়ে জোনাথনও কিছু করতে পারবে না। ওরা কথা রেখেছে দেখে খুশি হয়ে উঠলো ম্যাকফি।

বেশ বড় একটা দল জঙ্গলের রাস্তা থেকে মাঠে প্রবেশ করেছে। একেবারে সঠিকভাবে গুনতে না পারলেও দলটার দিকে তাকিয়ে ম্যাকফি মনে-মনে হিসেব করতে লাগলো কতজন আসার কথা দলে আর অতিরিক্ত কতোজন আছে। হিসেব শেষে ওর ধারণা মিলে গেল দলটার সাথে অন্তত পনেরো বিশজন মানুষ অতিরিক্ত আছে। কিন্তু এরা কি আসলে ঠগী না অন্যকিছু সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব যতোক্ষণ পর্যন্ত ওরা আক্রমণ না করছে। ও দেখা শেষ করে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো জোহরার দিকে। দেখিয়ে দিলো কিভাবে ওটার ভেতর দিয়ে তাকাতে হবে।

জোহরা ওটাতে চোখ লাগিয়ে হেসে উঠলো। "সর্বনাশ, এইটাতে দেখি সবকিছু কাছে দেখায়।" ম্যাকফিও হেসে উঠলো।

জোহরা আনন্দের চোটে স্থানীয় ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে। "এত্তো কাছে!"

"আসলে ওরা এতো কাছে না, কি করছে ওরা?"

"তাম্বু টানাইতেছে, কিছু মানুষ রান্না-বান্নার আয়োজন করতাছে, ডোংরু মহারাজ আর রাজাও আছে, তারা চেয়ারই পেতে বসে তামাক টানছে।"

"এখন শুধুই অপেক্ষা করতে হবে," বলে ম্যাকফি নিজের দুইটা পিস্তল আর ছুরি পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে ব্রিচেসের পকেট থেকে বের করে আনলো পাতার বাঁশিটা। একবার ওটার গায়ে হাত বুলিয়ে রেখে দিলো পকেটে। ফিরে তাকালো মাঠের দিকে। "এরা কারা?" ফিল্ড গ্লাসে চোখ লাগিয়ে জোহরা বলে উঠলো।

তার কাছ থকে ফিল্ড গ্লাসটা নিয়ে চোখে লাগালো ম্যাকফি। আরেকটা নতুন দল যোগ দিয়েছে মাঠে। দলটা মোটামুটি বড়ই। দশ বারো জনের কম হবে না। ছেলেবুড়ো সব প্রকারের লোক আছে। "মনে হচ্ছে তীর্থযাত্রার আরেকটা দল। তীর্থের তো এটাই মনে হয় নিয়ম। পথ চলতে-চলতে বড় একটা দলর সাথে ছোট-ছোট আরো দল যোগ হতে থাকে," ম্যাকফির কথা

শুনে মাথা নাড়লো জোহরা। কিছুক্ষণের ভেতরেই মাঠের দিকে থেকে খাবারের সুবাস আর নাচ-গানের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো।

জোহরা আবারো ফিল্ডগ্লাসটা চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো, "কি অদ্ভুত জিনিস! কত্তো দূরের জিনিস কাছে দেখা যায়। আমি এরকম জিনিস জীবনেও দেখি নাই," বলে সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠলো জোহরা।

"কি ব্যাপার? কি হলো?" ম্যাকফি জানতে চাইলো। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জোহরা। সে ফিল্ডগ্লাসটা ম্যাকফির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো। "নতুন এই দলটার ভেতরে একজন লোক আছে, এরে আমি চিনি।"

"আপনি চেনেন, তাহলে সমস্যা কোথায়?" বলে ম্যাকফি গ্লাসটা চোখে লাগালো। মশালের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বড়-বড় তিনটে তাঁবু ফেলা হয়েছে। তাঁবু তিনটের সামনের খোলা জায়গাটাতে জড় হয়েছে সবাই। সেখানে পেতে রাখা আসনে বসে আছে কয়েকজন তাদের সামনেই আয়োজন চলছে। "কোন লোকটা?"

"নতুন দলটার একেবারে পেছনে একজন তবলচি আছে। তবলচির পেছনে একটা লোক একেবারে মুখ মাথা মুড়িয়ে বসে আছে। ওই লোকটা,"

ম্যাকফি লোকটাকে খুঁজে বের করলো। "কি সমস্যা ওই লোকটার? আপনি তাকে চিনতেই পারেন। কতো লোকই তো আছে এই এলাকায়..." জোহরা কাঁধ চেপে ধরলো ম্যাকফির

"এই লোকটা সাধারন কেউ না। এই লোকটাই সূর্যকান্ত আচার্যের বড় ভাই রমাকান্ত আচার্য, যার কাছ থেকে জমিদারি দখল করে সূর্যকান্ত জমিদার হইছে। এই লোকই পশ্চিমের ঠগীদের পথ দেখিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছে।"

"সর্বনাশ, কিন্তু আপনি চিনলেন কিভাবে তাকে?" ম্যাকফি এখনো লোকটাকে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করছে। কাপড়ে মুড়িয়ে প্রায় একটা পুটলির মতো হয়ে আছে মানুষটা। বসেও আছে সবার থেকে দূরে।

"লোকটা ডান চোখের ওপরে একটা মোটা আচিল আছে। অনেকটা দ্বিতীয় ভুরুর মতো দেখায়। আমি বহুবার এরে বাবার সাথে দেখা করতে দেখেছি। না চেনার কোন কারণই নেই। সে মুখ ঢাকলেও চোখ তো আর ঢাকেনি তাই আঁচিলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

ম্যাকফি মনোযোগ দিয়ে দেখে আঁতকে উঠলো। এই লোকের এখানে উপস্থিতি প্রমাণ করে কিছু একটা গড়বড়। ও পকেট থেকে পাতার বাঁশি বের করে আনলো। বাঁশিটাকে মুখে লাগিয়েও থেমে গেল। তারচেয়ে এখান থেকে হেনরির বা মহাবীর সিংয়ের দলের অবস্থান খুব বেশি দূরে না। সরাসরি গিয়ে সাবাধান করে দেয়াই ভালো। আর পরিস্থিতির বিবেচনায় কি করতে হবে সেটাও পরামর্শ করা দরকার। ম্যাকফি জোহরাকে এখানেই থাকতে বলে একটু দূরেই মাটিত বসে থাকা লাল পাগড়ি দলের দলনেতাকে বললো কি করতে হবে সেইসাথে এটাও বলে দিলো যেকোন অবস্থায় যেন জোহরাকে ছেড়ে ওরা সরে না পড়ে। বলে ও জোহরাকে দলটার সাথে রেখে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগলো হেনরির দল যেদিকে অছে সেদিকে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে গেল ও।

পেছন দিয়ে কি কেউ গেল। চট করে ঘুরে গেল ও পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। মনোযোগ দিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না। ঘুরে রওনা দিতে যাবে জঙ্গলের পায়েচলা পথে দুটো ছায়ামুর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। সাথে সাথে ও অনুধাবন করলো কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে।

ভীষণ গন্ডগোল। হেনরিকে সাবধান করতে হবে, মহাবীর সিংকে সাবধান করে দিতে হবে। ওরা ফাঁদে পড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতেই ও ছায়ামুর্তি দুটোর দিকে পিস্তল তুললো। কিন্তু ও গুলি করার আগেই গাছের ওপর থেকে ওর পেছনে লাফিয়ে পড়লো তৃতীয় মুর্তি। ম্যাকফি পিস্তল ধরা হাত ঘোরানোর আগেই ওর গলায় এটে বসলো শক্ত ফাঁস।

অধ্যায় চল্লিশ

বর্তমান সময়

কতোয়ালি মডেল থানা, ময়মনসিংহ

পুরো ব্যাপারটা যেন ফাঁসের মতো আটকে আছে ওসি মল্লিকের গলায়। এসপি আমজাদের রুমের ঠিক বাইরেই অস্থির হয়ে পায়চারি করছে সে। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। একদিকে তার বহুদিনের অনেকগুলো স্বপ্ন একসাথে পূরণ হতে চলেছে অন্যদিকে আবার সেটার আশেপাশে ভিড় করছে অনেকগুলো শঙ্কা।

মনের ভেতরে অনেক দ্বিধা-দ্ব›দ্ব। তবে এতোদিন পুলিশের চাকরি করে একটা ব্যাপার সে বুঝে গেছে, জীবনে উন্নতি করতে হলে ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায় নেই। ভয়ের কোনই কারণ নেই আসলে। তার পেছনে অনেক বড়-বড় মানুষ রয়েছে। অস্থির হয়ে হাত-ঘড়ি দেখলো সে একবার, ক্রিমিনালটার সাথে এতো কী কথা বলছে এসপি। যতো বেশি কথা, ততোবেশি বিপদ। সে আরেকবার বেঞ্চে বসে থাকা মেয়ে দুটোকে দেখলো, মনে মনে ভাবলো ¯ষ্টার কি বিচিত্র খেয়াল। সব তারই সৃষ্টি কিন্তু একটার সাথে অন্যটার কি বিরাট পার্থক্য।

ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েদুটো দিকে তাকিয়েছিল বলে সে প্রথমে দেখতে পায়নি। কিন্তু এসপির রুমের দরজার দিক থেকে শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই মুখ হা হয়ে গেল তার। যা দেখলো সেটা দেখে আসলে তার খুশি হওয়া উচিত না ভয় পওয়া উচিত সে বুঝে উঠতে পারলো না। তবে স্বাভাবিক রিফ্ল্যাক্সের বসে একটা হাত চলে গেল কোমরের কাছে পিস্তলটার দিকে কিন্তু সেটা বের করতে পারলো না সে।

ওসি মল্লিক পিস্তল বের করার আগেই এসপির মাথায় পিস্তল ধরে থাকা বাশার চেঁচিয়ে উঠলো। “খবরদার! সবাই অস্ত্র নামিয়ে রাখো।” চিৎকার না করলেও চলতো। এরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য এর আগে এই থানায় কেন সিনেমাতে ছাড়া বাস্তবে মনে হয় কেউই দেখেনি। থানার ভেতরে এরকম কিছু ঘটতে পারে সেটাও কেউ ভাবেনি। এসপির মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে বাশারকে তার রুম, থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রথমে সবাই হতভম্ভ হয়ে

গেল তারপর যে যার যার মতো রিঅ্যাক্ট করে উঠলো। কিন্তু আবারো বাশার চেঁচিয়ে সবধান করলো সবাইকে। তার সবধান না করলেও চলতো কারণ ওসি মল্লিক তার চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে সবাইকে মানা করছে অস্ত্র ধরার জন্যে।

বাশার এসপিকে নিয়ে থানার মাঝখানের করিডরে চলে এল। ওখানেই বেঞ্চে বসে ছিল জয়া আর রিফাত। ওদের দুজনকে সহ বাশার সোজা বেরিয়ে এল থানার বাইরে। সেখানে একটা জিপ গেটের কাছে স্টার্ট দিয়ে রাখাই ছিল। সে এসপিকে নিয়ে সোজা সেটাতে উঠে বসলো। সাথে-সাথে রিফাত আর জয়া।

ওরা উঠে বসতেই জিপ ছেড়ে দিলো আবদুল্লাহ। তার সাথে আগে থেকেই বসে ছিল রমিজ দারোগা ওরা উঠে বসতেই সে এসপিকে সালাম দিলো সে। “ও তুমিও আছো এদের সাথে,” দাঁত কট-মট করে বলে উঠলো এসপি আমজাদ। সে একহাতে ঘাড় ডলছে।

“বাশার, তুমি কি যে করো! আরেকটু হলে তো আমার ঘাড়টা ভেঙেই দিতে,” সে ডলতে-ডলতেই বলে উঠলো। “খোদা জানে, তুমি কী করছো। সবদিক নিয়ে ডুববে কিনা কে জানে,” বলে সে আফসোসের সাথ মাথা নাড়লো।

“স্যার, তৌফিক স্যারে এইডা দিছে আপনেরে,” বলে রমিজ দারোগা একটা কমদামি সাধারণ মোবাইল সেট বের করে বাশারের দিকে এগিয়ে দিলো। “এইডাও,” বলে মোবাইলের মতো দেখতে একটু অন্যরকম আরেকটা জিনিস বাশারের দিকে এগিয়ে দিলো। জিনিসটার গায়ে একটা হেডফোন প্যাচানো। এক সেকেন্ড জিনিসটা দেখে নিয়ে পকেটে রেখে দিলো ও আর মোবাইল সেটটা হাতে নিয়ে কল দিলো ওর বন্ধু জামিলকে।

জামিলের সাথে কথা শেষ করে এসপির দিকে ফিরে বললো। “সরি স্যার, ওই সময়তো হুঁশ ছিল না,” বলেই সে আবদুল্লার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “এই এই থামো থামো।” ওদের জিপ বিপিন পার্কের সামনে চলে এসেছে। এখানেই কোথাও জামিলের থাকার কথা। আবদুল্লাহ জিপ থামাতেই সেটা থেকে লাফিয়ে নেমে এল বাশার।

রাস্তার অন্যপাশে দেখতে পেল একটা নীল রঙের মাইক্রোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে জামিল। মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলো ও। দৌড়ে রাস্তা পার হলো। “ধন্যবাদ বন্ধু,” বলে জামিলকে জড়িয়ে ধরলো।

“আরে কি যে কস। কিন্তু ব্যাপারটা কি, তুই কি কোন ঝামেলায় পড়ছোস?” জামিলের গলা একটু উদ্বিগ্ন।

“শোন, আমি তোরে সব বলবো। কিন্তু পরে। এখন তুই যতো কম জানবি ততোই ভালো। কিন্তু পরে যাই শুনিস মনে রাখিস আমি খারাপ কিছু করি নাই। তুই এখান থেকে সরে পড়। আর এই গাড়িতে যে নম্বর প্লেট লাগানো আছে সেটা...”

“কোন সমস্যা নেই। আমি গাড়ির ব্যবসাই করি, তো এইসব ব্যাপার উল্টাপাল্টা করা কোন বিয়ষয়ই না। বেস্ট অব লাক বন্ধু, পরে কথা হবে,” বলে জামিল রাস্তার অন্যদিকে গিয়ে একটা টমটমে উঠে পড়লো।

বাশার মনে-মনে ভাবলো, হ্যা লাকই ওর এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। ও মাইক্রোতে উঠে ওটাকে স্টার্ট দিয়ে ওদের জিপের পাশে নিয়ে এল।

“ওঠো ওঠো, সবাই এটাতে উঠে পড়ো,” এসপি, রিফাত, জয়া আর রমিজ দারোগাকে ওঠার নির্দেশ দিয়েই ও আবদুল্লার কাছে এসে নির্দেশনা দিতে শুরু করলো।

“আবদুল্লাহ, তুমি এই জিপটা নিয়ে চলে যাবে শহরের বাইরে। পুলিশ এখন এটাকেই খুঁজবে, কাজেই সাবধান। শহরের বাইরে গিয়ে রাস্তার পাশে এটাকে আড়ালে কোথাও রেখে তুমি ওখান থেকে সরে পড়বে। তারপরে কল দিবে আমাকে। বুঝেছো?” আবদুল্লাহ মাথা নাড়তেই ও সরে আসবে পাশ থেকে রমিজ দারোগা বলে উঠলো। “স্যার, ও পুলাপান মানুষ। ঠিকমতো নাও বুঝতে পারে। আমি ওর লগে যাই?” রমিজ দারোগা বাশারের দিকে তাকিয়ে আছে। বাশার তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “রমিজ ভাই, আপনি চাইলে চলে যেতে পারেন। কারণ যে কাজে আমরা যাচ্ছি এতে অনেক ঝুঁকি, আর আপনি এখন অফ ডিউটিতে আছেন। মনের রাইখেন অফ ডিউটিতে কিছু হইলে কিন্তু আপনি বা আপনার পরিবার কিছুই পাবেন না,” বাশারের কথা শেষ হবার অগেই রমিজ দারোগা বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো।

“স্যার, কি যে কন। আমার আবার পরিবার। বউ ছাইড়া গেছে গা কবে, দুই পেলার কেউই লগে থাহে না। একমাত্র মাইয়াডা জামাই লইয়া থাহে বিদেশ। পাঁচ বছরেও একবার দেশে আহে নাই। আমি সারাজীবর কামচুরের মতোন কাম করছি। পলায়া পলায়া কুনোরকমে নিজের জান বাঁচায়া চাকরি করছি। জীবনে প্রথমবারের মতো ঝুঁকি নিতে শিখছি আপনের লগে থাইক্কা।

জীবনে প্রথমবারের মতোন নিজেরে হিরু মনে অইতাছে। স্যার, এইডা আমার কাছ থাইক্কা কাইড়া নিয়েন না," বাশার তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বেশি ভাবার সময় নেই। তার দিকে তাকিয়ে জিপ ওঠার ইশারা করে ও দৌড়ে পার হয়ে এল রাস্তাটা।

নীল মাইক্রোতে উঠে ওটাকে স্টার্ট দিয়ে চলে এল থানার কাছে। থানার পেছন দিকের রাস্তার এসে অন্ধকারে পার্ক করে বাতি নিভিয়ে দিলো। এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে, এবার অপেক্ষার পালা।

"বাশার তুমি কি নিশ্চিত?" এসপি আমজাদ অন্ধকারে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানতে চাইলো। এসপিসাহেবের সিগারেটের ধোঁয়া নাকে এসে লাগতেই নিজেরও ধূমপানের তৃষ্ণা পেয়ে বসলো বাশারের। কিন্তু উপায় নেই। এমনকি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও সিনিয়রের সামনে ধূমপান করা যাবে না।

বাশারের মোবাইল বাজতে শরু করেছে। ও কল রিসিভ করে তৌফিকের সাথে কথা বললো। কথা শেষ করে সবার উদ্দেশ্যে মানা নেড়ে ইশারা করলো। "সবাই সবধানে বসো, যদি কপাল ভালো হয় তবে এবার খেলা শুরু হতে যাচ্ছে।"

অধ্যায় একল্লিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

বৃহত্তর মুধুপুর এলাকা, ময়মনসিংহ

একদিকে ম্যাকফি আক্রমণের শিকার হয়েছে অন্যদিকে ম্যাকফির মতোই অস্থির হয়ে উঠেছে আরেকজন মানুষ, সে হলো হেনরি স্লীম্যান।

লাল পাগড়িদের দলনেতার পাশে বসে থাকতে থাকতে অস্থির লাগছে তার। পরিকল্পনাটা যখন করে এটার বেশিরভাগ অংশই সে নিজে সাজিয়েছে কিন্তু কেন জানি সময় যতো গড়িয়ে চলেছে নিজের পরিকল্পনার ওপর থেকে নিজেরই আস্থা দূর হয়ে যাচ্ছে। মাঠের দিক আওয়াজ ভেসে আসছে আর সে হয়ে উঠছে অস্থির।

হঠাৎ বসা থেকেই সে উঠে দাঁড়ালো। এভাবে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। লাল পাগড়ির দলনেতাকে ডেকে সে দুজন পাহারাদার নিয়ে রওনা দিলো ম্যাকফির সাথে কথা বলার জন্যে। মাঝপথে মহাবীর সিং আর শঙ্করের দলটার সাথেও কথা বলতে হবে।

আধমাইলের মতো হেঁটে সে চলে এল মহাবীর সিংয়ের নেতৃত্বে পাহারায়রত দলটার কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো লাল পাগড়িদের সাথে মহাবীর সিং কিংবা শঙ্কর দুজনার কেউই নেই। ওরা কোথায় জানতে চাইলে লাল পাগড়ি দলের নেতা জবাব দিলো ওরা নাকি তার সাথেই দেখা করতে গেছে। একটু আগেই নাকি একজন এসে খবর দিয়ে গেছে হেনরি নাকি ওদেরকে ডেকে পাঠিয়েছে জরুরি কথা বলার জন্যে। কথাটা শোনা মাত্রই হেননিরর গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। সে ওদেরকে ডেকে পাঠায়নি তারমানে কেউ একজন ইচ্ছে করেই ওদেরকে ভূয়া খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। সাথে সাথে সে রওনা দিলো জঙ্গলের ভেতরের দিকে। এক্ষুণি ম্যাকফি আর তার দলকে জানাতে হবে ব্যাপারটা। সেইসাথে সতর্ক করে দিতে হবে ওদের সবাইকে।

মনের ভেতরে একইসাথে যুগপৎ আতঙ্ক আর দোটানা মনোভাব নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে রীতিমতো দৌড়াতে লাগলো হেনরি। কিন্তু বেশিদূর দৌড়াতে হলো না। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল কারা যেন ছুটে আসছে ওদের দিকে। সাথে সাথে তার পাহারাদার দুজন সতর্ক হয়ে গেল। হেনরি নিজেও বের করে আনলো পিস্তল। দুজন মানুষ হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে আসছে ওদের দিকে। হেনরি পিস্তল তুলেও নামিয়ে নিলো কারণ লোকদুজনকে চিনতে পেরেছে ও।

মহাবীর সিং আর শঙ্কর । দেখতে দেখতেই ওরা একেবারে কাছে চলে এল। ব্যাপার কি থামছে না কেন ওরা। কারণটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠলো হেনরি। একদল লোক পিছু নিয়েছে ওদের। ওকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে করতে এসে থেমে গেল সামনে। “হুজুর, হুজুর ঠগী।

না বললেও চলতো। কারণ ইতিমধ্যেই লোকগুলো ঘিরে ধরেছে ওদেরকে। হেনরি গুনে দেখলো প্রায় ছ’জন। ওরা পাঁচজন আর লোকগুলো ছয়জন। ওরা গোল হয়ে ঘুরছে আর লোকগুলোর প্রত্যেকের হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরি আর একটুকরো রুমালের মতো কাপড়। মুহূর্তের জন্যে সব যেন থমকে গেল।

হেনরিই প্রথমে গুলি করলো একজনকে উদ্দেশ্য করে। লোকটা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে শরীর বাঁকিয়ে এড়িয়ে গেল তার গুলি। বাতাসের বেগে এগিয়ে এল তার দিকে। গুলি ব্যর্থ হলেও পিস্তল ব্যর্থ হলো না হেনরির। লোকটা কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরতেই পিস্তলের ভারি বাটটা বসিয়ে দিলো ব্যাটার কপালে। ঢলে পড়লো সে।

একজন ঠগী শঙ্করকে মাটিতে ফেলে তার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিল হেনরির লাথিতে উল্টে পড়লো লোকটা। মহাবীর সিং একাই বীরবিক্রমে দুজনকে শূণ্যে তুলে মাটিতে আচড়ে ফেললো। অবস্থা খারাপ দেখে কি জানি বিচিত্র ভাষায় কিচির-মিচির করে উঠলো লোকগুলো। প্রায় যন্ত্রের মতোই যেমন হঠাৎ আক্রমণ করেছিল ঠিক তেমনি হঠাৎই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের দিকে দৌড়ে পালালো চারজন। পেছনে পড়ে রইলো তাদের দুই সঙ্গির অজ্ঞান দেহ।

সেইসাথে লাল পাগড়িদের একজনের লাশ। এক ঠগীর ছুড়ি আমূল গেঁথে আছে তার বুকে। ওদের পিছু নিবে কিনা ভাবছে এমন সময় কাছেই পাতার বাঁশির শব্দ শুনে চমকে উঠলো ওরা। হেনরি আর মহাবীর সিং একে

অপরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে উঠলো খুব কাছেই বিপদে পড়েছে ওদের কেউ।

***

গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া ঠগী আর ম্যাকফির লড়াই ততোক্ষণে তুঙ্গে উঠেছে। ফাঁস পরানোতে ঠগীর দক্ষতা প্রশ্নাতীত কিন্তু মারামারি আর যুদ্ধের ময়দানে ম্যাকফির অভিজ্ঞতাও অতুলনীয়। হঠাৎ গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ম্যাকফির গলায় ফাঁস পরিয়ে পেছন দিকে টান দেয় লোকটা যাতে এক ঝটকায় গলার হাড় ভেঙে দিতে পারে। ম্যাকফি যদি বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করতো কিংবা কিংবা ছাড়ানোর চেষ্টা করতো তবে সত্যিই তাই হোত। কিন্তু ম্যাকফি সেরকম কিছু না করে বরং লোকটার টানের সাথে সেদিকেই গড়িয়ে দেয় শরীরটাকে। ফলে লোকটা ওর সাথে সাথে উল্টে পড়ে। ফলে ম্যাকফির গলা থেকে আলগা হয়ে যায় ফাঁস। তবে ফাঁস আলগা করতে গিয়ে পিস্তলটাও পড়ে যায় মাটিতে।

ম্যাকফি মাটিতে পড়েছে, লোকটা পড়ে আছে ওর নিচে, আবারো ফাঁসটাকে গলায় এঁটো করার চেষ্টটা করছে ম্যাকফি। মাথার পেছন দিয়ে ঠুকে লোকটা নাম সমান করে দেয় ও। তবে অন্য দুজনের একজন ওকে টেনে সরিয়ে ফেলে লোকটার ওপর থেকে। অপরজন পা তুলে লাথি মারার জন্যে। একপাশে গড়িয়ে পড়ে ম্যাকফি। তিনজনই ওর মুখোমুখি এখন। একজনের নাকমুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে, অপরজন কোমরের পাশ থেকে ফাঁস বের করে এনেছে, অন্যজনের হাতে ছুরি। ম্যাকফি পকেট থেকে পাতার বাঁশিটা বের করে একবার ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে ছুরিওয়ালা তেড়ে আসে ওর দিকে। লোকটার ছুরিধরা হাতটা ধরে একপাশে ঠেলে দেয় ম্যাকফি। সেইসাথে কুস্তির কায়দায় মাটিতে আছড়ে ফেলে তাকে। তবে অন্য লোকটা এসে আধবসা অবস্থায় ফাঁস পরিয়ে টেনে ধরে ওকে।

এবার আর কোন জারিজুরিতেই কাজ হয়না। এক হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে এক প্যাঁচ দিয়ে ফাঁস টেনে ধরেছে লোকটা। প্রায় সাথে সাথেই ছুরিওয়ালা ছুরি ফেলে লাফিয়ে এসে পা জাপটে ধরে ম্যাকফির। ঠগীর ফাঁস কি জিনিস হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে ম্যাকফি।

গলায় মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুই কান, আর না চাইতেই ইতিমধ্যেই জ্বিভের বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে মুখের ভেতর থেকে। ওর মনে হচ্ছে যেকোন সময়ে কোঠর থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়বে চোখ জোড়া। হঠাৎই অগুনের ঝলকানি আর সাথে সাথেই গলার ফাঁস আলগা হয়ে গেল ওর। পায়ের বাঁধনও খুলে গেছে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারলো না ম্যাকফি। কাশতে-কাশতে মনে হলো মাথার খুলি ভেঙে যাবে। কেউ একজন ওকে এসে ধরার চেষ্টা করতেই দূরে সরে গেল ও। শত্রু-মিত্র জানা নেই। একটু স্বাভাবিক হতেই বুঝলো এরা নিজের লোক।

হেনরিকেও চিনতে পারলো। ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “আরেকটু হলেই তো গেছিলে,” বলে ওর দিকে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিলো হেনরি। ম্যাকফি দেখলো এখনো হালকা ধোঁয়া উড়ছে ওটা থেকে। কাশতে কাশতে ও দেখলো ওকে ফাঁস পরানো ঠগ মাথার একপাশ হারিয়ে পড়ে আছে। ওপর এক ঠগীর খুলি ভর্তা করে দিয়েছে মহাবীর সিং তার লাঠির এক বাড়িতে। অপরটা পালিয়েছে।

“ব্যাপার কি? হচ্ছেটা কি আসলে? হেনরি চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো।

“বুঝতে পারছো না?” ফ্যাঁসফ্যাস গলায় জবাব দিলো ম্যাকফি। “ওরা ওরা,” এখনো ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না ও। “ওরা আমাদের পরিকল্পনা আগে থেকেই জানতো। ব্যাটা ফিরিঙ্গীয়া ঠিকই বুঝতে পেরেছিল আমরা একটা ফাঁদ পাততে যাচ্ছি তাই ওরা আগে থেকেই নজর রেখেছে। ওরা শুধু মাঝখানে অক্রমণ না করে ছড়িয়ে পড়ে টুকরো টুকরোভাবে আমাদের দলগুলোর প্রধানের ওপরে আক্রমণ করেছে। কিন্তু কিন্তু,” বলে ম্যাকফি একটু থেমে গেল।

“কি ব্যাপার?” হেনরি নিজের পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে থেমে গেল।

“কিন্তু আমি এক ঠগীকে মাঠের মাঝখানেও দেখেছি, তারমানে...”

ম্যাকফির কথাটা শেষ করলো হেনরি, “তারমানে ওরা আমাদের ছোটদলগুলোর দলপ্রধানদের শেষ করে মাঝখানে আক্রমণ করবে,” পিস্তলে গুলি ভরা হতেই ওটাকে কক করলো হেনরি।

“তাহলে এক্ষুণি জোহরা আর দলকে সাবধান করে দিতে হবে,” ম্যাকফি বলে উঠলো।

“রাজা আর ডোংরু মহারাজকেও সাবধান করে দিতে হবে। যেকোন সময়ে ওদের ওপরে...” হেনরি কথা শেষ করার আগেই জঙ্গলের এক প্রান্তে যেখানে জোহরা আর লাল পাগড়ি বাহিনীর থাকার কথা সেখান থেকে ভেসে এল পাতার বাঁশির শব্দ। ম্যাকফি নিজের পিস্তলে গুলি ভরছিল, থেমে গেল ও, “জোহরা...” ও কতা শেষ করার আগেই মাঠের মাঝখান থেকে ভেসে এল একাধিক পাতার বাঁশির শব্দ। বাজতেই থাকলো বাজতেই থাকলো।

“সর্বনাশ! এক্ষুণি,” বলে ওরা দৌড়ে চলে এল মাঠের কিনারায়। লাল পাগড়িদের তিনজনকে মরে পড়ে থাকতে দেখলো ওখানে। জোহরা কিংবা বাকিদের কোন হদিশ নেই। “সময় নেই, সময় নেই, ম্যাকফি।”

মহাবীর সিং একটা মশালে আগুন ধরিয়ে ওটা এগিয়ে দিলো হেনরির দিকে। হেনরি ওটা ধরে একটা বিশেষ কায়দায় নাড়তে লাগলো। সাথে সাথে মাঠের চারপাশ থেকে একযোগে বেজে উঠলো পাতার বাঁশি। মশালের সিগন্যালটা ছিল সবাইকে সতর্ক করার ইশারা। আর বাঁশির শব্দটা ছিল ওদের জবাব। ওরাও মাঠের কেন্দ্রের দিকে দৌড় দিলো। কাছে গিয়ে দেখতে পেল ক্যাম্পের ভেতরে ভোজের আয়োজন করতে থাকা তীর্থাত্রিরা এবার খুনে মেতে উঠেছে। তবে রাজার প্রহরী আর তীর্থাত্রিদের সমানে সমানে মোকাবেলা চলছে তাদের। মাঝেমাঝে দুয়েকটা ঠগী ছিটকে পড়ছে গুলি খেয়ে। ম্যাকফি বুঝলো এটা জোনথনের বন্দুকের কাজ।

ম্যাকফিরা গিয়ে পৌছানোর প্রায় সাথে সাথেই ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌছে গেল লাল পাগড়িদের দল। ওদের দুটো দল আর ম্যাকফিরা মিলে একেবারে সামরিক কায়দায় ঘিরে ফেললো ক্যাম্পটাকে। তিনবাহিনীর সামনে খন্ডযুদ্ধে টিকতেই পারলো না ঠগীদের দলটা। পিস্তল আর তলোয়ারের সামনে ফাঁসহাতে ঠগীদের দলটা ¯ফে কচুকাটা হয়ে গেল। জীবিত দুয়েকজন সহ বাকিদেরকে হাজির করা হলো ডোংরু মহারাজ আর সূর্যকান্ত জমিদারের সামনে। জীবিতদের ভেতরে সূর্যকান্তের বড়ভাই রমাকান্তও রয়েছে। তবে তার অবস্থা খুবই খারাপ। বুকের একপাশে গুলি খেয়েছে। সূর্যকান্তের সামনে নিতেই সে ঝুঁকে এল ভাইয়ের ওপরে। বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ কথা বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে।

“কি বললো সে?” হেনরি নিজের পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে জানতে চাইলো।

সূর্যকান্ত একটু বোকা-বোকা চেহারায় তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। “অনেক কথাই বললো কিন্তু শেষ কথাটা ছিল ‘তোমরা শেষ’।”

“এর মানে কি?” হেনরি প্রশ্ন করলো। ওর চোখ এখনো ফিরিঙ্গীয়াকে খুঁজছে। জীবিত বা মৃতদের ভেতরে এখনো সে তাকে দেখেনি। “যুদ্ধে জিতলাম আমরা আর শেষ হবো কিনা...” তার কথা শেষ হবার আগেই উলু ধ্বনির মতো শব্দ উঠলো চারপাশ থেকে সেইসাথে অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এল একটা ফিসফিসে শব্দ,

‘রামসি, রামসি, রামসি...’ ‘রামসি, রামসি, রামসি...” একবার বাম থেকে ডানে আরেকবার ডান থেকে বামে বাতাসের মতো ভেসে যেতে লাগলো শব্দটা।

“হচ্ছেটা কি...” ক্যাম্পের ভেতরে প্রতিটা লোকের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে ভয়ঙ্কর শব্দটা শুনে।

“অনেক মানুষ, হেরা হেরা ঘিইরালাইছে আমগোরে...” লাল পাগড়িদের এক দলনেতা কাঁপতে-কাঁপতে বলে উঠলো। না বললেও চলতো কারণ ছায়ামুর্তিগুলো অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের পরনে কালো ধূতি, খালি গা, মাথায় কালো পাগড়ি, কপালে লাল তিলক আর মুখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। প্রত্যেকের কোমরে বাঁধা এক টুকরো সাদা কাপড়।

ওদেরকে দেখতে পাওয়া মাত্র ক্যাম্পের ভেতরে থাকা প্রত্যেকেই যার যার অস্ত্র বের করে আনলো। হেনরি আর ম্যাকফির একহাতে তলোয়ার অন্য হাতে পিস্তল। লাল পাগড়িদের সবার হাতে চকচকে লাঠি ক্যাম্পের লোকজনকে ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে লাল পাগড়িরা বেড় দিয়ে দাঁড়ালো সবাইকে। তাদের অগ্রভাগে ম্যাকফি, হেনরি আর মহাবীর সিং। স্বল্পভাষি মহাবীর সিং তার বড় লাঠিটা মাথার ওপরে দুই পাক দিয়ে বলে উঠলো,“এলোগ রুমাল লেকে হামারা কেয়া করেগা?”

তার কথার জবাবেই মনে হয় প্রত্যেক ঠগী কোমরের পেছন থেকে টান দিয়ে বের করে আনলো একটা বিরাট আকারের লম্বা সরু বাঁকা ছুরি, স্থানীয় ভাষায় একে বলে কুকরি। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, চুপ হয়ে গেল মহাবীর সিং।

ম্যাকফি আন্দাজ করলো ওরা ক্যাম্পের ভেতরে আছে সর্বসাকুল্যে বিশ থেকে পঁচিশ জন। আর যে দলটা ওদেরকে ঘিরে ধরেছে ওরা কম করে হলেও পঞ্চাশজনের কম হবে না। ওদেরকে ঘিরে থাকা দলটা কৌণিক আকৃতিতে ভাগ হয়ে গেল। একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে সুঠামদেহি এক যুবক। খানিকটা এগিয়ে এসে সে কোমরের পেছন থেকে কুকরি বের করে আনলো একহাতে। অন্যহাতে মুখের অবরণটা সরিয়ে সাদা দাঁত বের করে হেসে উঠলো ফিরিঙ্গীয়া। হেনরির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “হুজুর, তাম্বাকু খায়েগা কিয়া?”

সাথে সাথে ঠগীদের দলটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর।

অধ্যায় বিয়াল্লিশ

বর্তমান সময়

থানা রোড, ময়মনসিংহ

বাশারসহ সবাই থানার পেছনে পার্ক করা নীল মাইক্রোর ভেতরে বসে আছে চুপচাপ ।

কিছুক্ষণ পরেই ঘটনা ঘটতে শুরু করলো। থানার পেছনের ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা জিপ। সেটার ভেতরে বসে থাকা ওসি মল্লিককে চিনতে পেরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো বাশার। মনে হচ্ছে ওর পরিকল্পনা কাজে লাগতে যাচ্ছে।

পরিকল্পনাটা ছিল খুব সহজ। মল্লিককে যদি সত্যিই কেউ নিয়োগ দিয়ে থাকে তবে সে কালী মুর্তিটা হাত করতে চাইবেই। বাশার এসপিকে জিম্মি করার নাটক করাতে সবাই যখন ব্যস্ত থাকবে এই সুযোগে ওসি মুর্তিটা তার নিয়োগকর্তার কাছে চালান করতে চাইবে। এই ভরসাতেই বাশার পুরো পরিকল্পনাটা সাজিয়েছিল। বাইরে ওরা নজর রাখছিল আর অন্যদিকে থানার ভেতরে তৌফিক নজর রাখছিল ওসির ওপরে। সে বেরুতেই তৌফিক জানিয়ে দেয় মল্লিক মুর্তিটা নিয়ে জিপে উঠেছে। সেই জিপটার দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। জিপটা থানার গেট দিয়ে বেরিয়ে বামে বাঁক নিলো।

“এখন কি করতে চাও, বাশার?” এসপি হাসান জানতে চাইলো।

“স্যার, আমরা জিপটার পিছু নিয়ে দেখবো সে কোথায় যায়... আর,” বাশার প্রশ্নটা শেষ করার আগেই এসপি জানতে চাইলো। “তুমি যেটা প্রমাণ করতে চাইছিলে সেটা প্রমাণ করার মতো উপাদান তো পেয়েই গেছ। মল্লিক মুর্তিটা নিয়ে বাইরে এসেছে। ওর গাড়ি থামিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়?”

“স্যার, এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে, কারণ এই ওসি ব্যাটার পেছনে অনেক বড় কারো হাত আছে। সেটা কে বের করতে হবে, সেইসাথে পুরো ব্যাপারটার সাথে একটা ঐতিহাসিক রহস্য লুকিয়ে আছে সেটারও সমাধান হওয়া

দরকার," বাশার একমনে সামনের জিপটাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওটা থানা থেকে বেরিয়ে বামে মোড় নিয়ে কাচারি মোড়ের দিকে চলেছে এখন। "যদি আমরা এখন ওসি মল্লিককে গ্রেপ্তার করি তাহলে সে কার সাথে কাজ করছে সেটা বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। কাজেই ঝুঁকি নিয়ে হলেও এখন ওসিকে অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র এভাবেই বের করা সম্ভব ওসি আসলে কার নির্দেশে কাজ করছে," কাচারি মোড় থেকে আবারো বামে মোড় নিয়ে গাড়ি এখন ছুটে চলেছে কাঁচিঝুলি মোড়ের দিকে। রাতের বেলা ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গতি বেড়ে গেছে জিপের। বাশারও মাইক্রোর গতি বাড়িয়ে দিলো।

"কি জানি, আমার কাছে মনে হচ্ছে ঝুঁকিটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। ওসি এখন ওই জিপের ভেতরে আছে। তৌফিকের দেয়া তথ্য ঠিক থাকলে তোমাদের উদ্ধার করা মুর্তিটাও ওর সাথেই আছে। বাই এনি চান্স ওসিকে আমরা হিারয়ে ফেললে তো সব গেল," এসপিকে ঠিক সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।

"স্যার, সেটা হবার প্রায় কোন সম্ভবনাই নেই," বলে ও আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। হঠাৎ সামনে দেখতে পেল জিপের গতি কমে আসছে বেশ অনেকটাই দূরত্ব বজায় রেখে বাশারও মাইক্রোর গতি একেবারে কমিয়ে আনলো। জিপের গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল ওটা কাঁচিঝুলি মোড়ে।

"করছে কি, হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন?" প্রশ্নটা করার প্রায় সাথে সাথেই জবাব পেয়ে গেল ওরা। পেছন থেকে একটা সাদা মাইক্রো এগিয়ে গিয়ে থামলো ওটার পাশে।

"সর্বনাশ! মুর্তিটা চালান করে দেবে না তো?" পেছন থেকে জয়া বলে উঠলো, তার গলায় ভীষণ আতঙ্ক। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না বরং পাশে একটু থেমেই সাদা মাইক্রোটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ওটার পিছু পিছু চলতে শুরু করলো ওসি মল্লিকের জিপ। দুটো গাড়িই আরেকটু এগিয়ে যেতে বাশার মাইক্রো ছেড়ে দিলো। সামনের গাড়িগুলো কাঁচিঝুলি মোড় ছাড়িয়ে টাঙ্গাইল বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাসস্ট্যান্ড এলাকাতে এই রাতের বেলাও বেশ ভিড়। সামনের গাড়িদুটো ছাড়িয়ে যেতেই একটু জ্যামে পড়ে গেল ওদের গাড়ি। বেশ খানিকটা এগিয়ে স্টেডিয়ামের সামনে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে ফেললো বাশার।

“কি ব্যাপার, কোনদিকে গেল? দেখতে পাচ্ছি না তো। সবাই আশেপাশে দেখ তো,” বাশার জানালা দিয়ে মাথা বের করে আশেপাশে দেখার চেষ্টা করছে। “গেল কোথায়?”

“বাশার সামনের দিকে এগিয়ে যাও, থেমে গেলে ওরা আরো এগিয়ে যাবে, হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাবেড়ে যাবে,” এসপি হাসান বলে উঠলো।

“হারিয়ে যাবে না তবে...” ও মাইক্রোটাকে স্টেডিয়ামের গেট থেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

“ওই যে পাশের গলিতে,” পেছন থেকে জয়া চেঁচিয়ে উঠলো। বাশার স্টেডিয়ামের গেট ছাড়িয়ে সামনের দিকে চলে গেছিল জয়ার কথা শুনে আবারো পিছিয়ে আনতে লাগলো। স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে একটা সরু গলিতে পুলিশি জিপের ব্যকলাইট দেখা যাচ্ছে। বাশার গলির মুখের কাছে জিপ থামালো।

“কি ব্যাপার, পিছু নিচ্ছো না?” এসপি হাসান প্রশ্ন করলো।

“স্যার, এই সরু গলি দিয়ে পিছু নেয়া যাবে না, ধরা পড়ে যাবো। তারচেয়ে অন্য উপায় আছে,” বলে ও পকেট থেকে তৌফিকের দেয়া অন্য জিনিসটা বের করলো। মোবাইলের মতো দেখতে জিনিসটার গা থেকে হেডফোনটা খুলে গলায় ঝুলিয়ে অন করলো ওরা। আগের দিনে হ্যান্ড ভিডিও গেমগুলো দেখতে যেরকম ছিল জিনিসটা দেখতে অনেকটা সেরকম।

ওকে জিনিসটা বের করতে দেখেই এসপি আমজাদ বলে উঠলো, “এই কারণেই তুমি এতো নিশ্চিন্তে ছিলে যে জিপটা হারাবে না?”

“জি, স্যার। ওসির গাড়ির সাথে ট্র্যাকার লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সে যেখানে যাবে আমরা টের পাবো। ট্র্যাকার অন করতেই ছোট একটা জ্বলজ্বলে বিন্দুকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। “এবার এগোতে হবে। সবাই সাবধান অন্ধকার গলিতে ঢুকতে যাচ্ছি কাজেই সামনে কোথায় কি আছে জানিনা। শক্ত হয়ে বসো,” বলে বাশার গলির ভেতরের অন্ধকারে মাইক্রো চালাতে লাগলো। ওর এক চোখ পথের দিকে অন্য চোখটা ট্রাকারের ছোট্ট জ্বলজ্বলে বিন্দুটার দিকে। জ্বলজ্বলে বিন্দুটা ওদের থেকে খুব বেশি সামনে না। বাশার মাইক্রোর গতি কমিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বললো।

ট্র্যাকার থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। এই এলাকাটা কিছুটা গ্রামের মতো। পরপর অনেকগুলো কাঠ কাটার স'মিল আছে। দুতিনটে স'মিল পার হয়ে গেল ওদের মাইক্রো। "ব্যাপার কি? দুটো গাড়ির একটাও তো দেখতে পাচ্ছি না," আনমনেই বলে উঠলো বাশার। ও মাইক্রো থামিয়ে ট্র্যাকারটা আবারো অন করার জন্যে হাতে নিতেই এসপি হাসান হাত তুলে সামনে দেখালো। বেশ বড় একটা স'মিলের প্রঙ্গনে ঘোলাটে হলদে আলোয় পুলিশের জিপটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তবে সাদা মাইক্রোটাকে দেখা গেল না আশেপাশে। বাশার একেবারে আস্তে-আস্তে চলতে থাকা মাইক্রোটাকে স'মিলের কাঠের দেয়ালের পাশে থামিয়ে ফেললো।

"এবার কি করবে?" এসপি আমজাদ আশেপাশে দেখার চেষ্টা করছে। আধো অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

"বুঝতে পারছি না। গাড়ি এরকম নির্জন জায়গায় চলে আসবে ভাবতেও পারিনি এখানে তো কিছু করা..." ও যা বলতে যাচ্ছিলো সেটা শেষ করার আগেই তৌফিকের দেয়া সস্তা মোবাইলটা বাজতে লাগলো।

"শিট," চমকে উঠে তাড়াতাড়ি মোবাইলটা বের করে কানে লাগালো বাশার। আবদুল্লাহ কল করেছে। ওখানকার অবস্থা শুনে নিয়ে ওরা কোথায় আছে সেটা জানালো। আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই অন্ধকারের ভেতরে ধপ করে জ্বলে ওঠা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে গেল সবার।

"শিট," হাতের মোবাইলটা ফেলে মাইক্রোটাকে স্টার্ট দিতে যাবে বাশার তার আগেই পেছন থেকে সাদা মাইক্রোটা এসে সর্বশক্তিতে বাড়ি মারলো ওদের নীল মাইক্রোর পেছনে। পেছন থেকে জোরে বাড়ি খেয়ে ওদের গাড়ি সামনের দিকে ছুটে গিয়ে একটা কাঠের খুটির সাথে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। হুইলের পেছনে বসে থাকা বাশারের দুই চোখের মাঝখানের অংশ হুইলের মাঝ বরারবর জোরে বাড়ি খেয়ে হুইলের ওপরেই ঢলে পড়লো ও।

***

জায়গাটা কি আবছা আলো? নাকি আবছা অন্ধকার ঠিক বুঝতে পারছে না বাশার। চোখ খোলার আগেই জিভের ডগায় নোনতা একটা স্বাদ অনুভব করলো ও, সেই সাথে নাকের ভেতরে চুলকানি। পর-পর দুবার হাঁচি দিয়ে চোখ খুললো ও। তবে খোলার পরে মনে হলো চোখ বন্ধ ছিল সেটাই ভালো ছিল।

“আরে, নায়ক নাকি? গিয়ান ফিরলো তাইলে!” তীব্র শ্লেষে ভরা কণ্ঠস্বরটা অপরিচিত নয় ওর। কয়েকবার চোখ পিট পিট করতেই পরিষ্কার দেখতে পেল মানুষটাকে। ছয় সাত মাসের গর্ভবতী মহিলাদের মতো পেটধারী ছোটখাট মানুষটার পরনে সাদা রঙের পাজামা আর হাফহাতা শার্ট। ঠোট দুটো লাল হয়ে আছে পানের রসে।

“সাঈদ আলী!” অস্‌ফুটে বাশারের মুখ দিয়ে নামটা বেরিয়ে এল।

“সাঈদ কন্ট্রাকটারও কইতে পারো, আগে সাঈদ আলী নামে লুকে বেশি চিনলেও অহন সাঈদ কন্ট্রাকটার নামেই ডাহে বেহেই। তয় বাতিজা তুমি আমারে বহুত যন্ত্রণা দিছো,” বলে সে পিচিত শব্দ তুলে পানের পিক ফেলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের সামনে বসে পড়লো।

বাশার তাকিয়ে দেখলো চারপাশে, ও নিজে বসে আছে একটা বার্নিশ ছাড়া কাঠের চেয়ারে, ওর পাশেই বসে অসে এসপি আমজাদ, তার অন্যপাশে জয়া আর রিফাত।

ওদের পাশেই দুপাশে দুজন বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনেই একইরকম চেয়ারে বসেছে সাঈদ আলী। ওদের পায়ের নিচে ভেজা কাঠের মেঝে, চারপাশে কাঠের সোঁদা গন্ধ। ও অনুমান করলো এটা সেই স’মিলেরই কোন কামরা হবে। আশেপাশে কোনদিক দিয়ে খাল বা নালা বয়ে চলেছে। কারণ পানির কুল-কুল শব্দ ভেসে আসছে। ওদের থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে একটা টেবিলের ওপরে ওদের সবার মোবাইল, মানিব্যাগ আর অস্ত্রগুলো দেখতে পেল বাশার। টেবিলটার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি সেই লোকটা- যে ভূয়া রিফাত সেজেছিল। বাশারের ঘাড় ঘুরানো দেখে সে মুচকি একটা হাসি দিলো সে। বাশার ওর দিকে শক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

তবে ও যা খুঁজছে সেটা পেল না। মুর্তিটা নেই আশেপাশে কোথাও। বুঝলো ওটা খুঁজে লাভ নেই। নেই ওটা এখানে। ও নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো

সাঈদ আলীর দিকে। সাঈদ আলী আর এসপির মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। ওদের সাথে যোগ দিয়েছে জয়া।

“আপনি জানেন, আমি একজন সাংবাদিক, আমি আপনার কন্ট্রাক্টারির বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি,” জয়া পারলে চোখের দৃষ্টি দিয়ে সাঈদ আলীকে পুড়িয়ে দেয়। তবে জয়ার দৃষ্টি কিংবা গলার আওয়াজ কোনটাই সাঈদ আলীর ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না। সে জয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর পানের পিক ফেলার মতো করেই পিচিক করে হেসে উঠলো। “সাম্বাদিক! না? এই মাইয়া তুমি কি আমারে ওই বলদ ইন্সপেক্টর পাইছো? সাম্বাদিক মারাইতে আইছে হেয়,” বলে সে হাত তুলে এসপি আমজাদের দিকে দেখালো। “আস্তা একটা এসপি বইসা আছে হেরে বাদ দিয়া তুমার মতোন পাতি সাম্বাদিক লইয়া আমারে চিন্তা করতে কও? হাসাইলা মাইয়া।”

“সাঈদ, তোমার সমস্যা কি? তুমি জানো না তোমারে যে শেল্টার দেয় রফিক ভূইয়া তার সাথে আমার সম্পর্ক কেমন?” এসপি আমজাদ বলে উঠলো পাশ থেকে। “তোমার বারোটা আমি আমি কিভাবে বাজাবো তোমার কোন ধারণা আছে।”

সাঈদ কমিশনার জয়ার দিক থেকে শরীরটা ঘুরিয়ে এসপির দিকে তাকালো। “আপনেরে যখন প্রথম মাইক্রোর ভিতরে থাইক্কা বাইর হইতে দেখলাম আমি আসলেই চিন্তায় পাইরা গেছিলাম। কারণ আমার হিসাব আছিল একটা ডিমোশন পাওয়া ইন্সপেক্টর আর দুইডা মাইয়া সামলান তেমন কঠিন কিছু না কিন্তু পুরা একটা এসপি তাই বইল্লা। তারপরে মনে পড়লো আরে এসিপরে আমার সামলাইতে হবে ক্যান। দুষতো সব যাইবো এই বলদ ইন্সপেক্টরের ঘাড়ে। কারণ এসপিরে তো হেয়ই সবার সামনে থাইক্কা জিম্মি কইরা বাইর কইরা আনছে,” বলে সে হেসে উঠলো ভুরি দুলিয়ে। “কাজেই আপনেরে আমি যাই করি না ক্যান দুষ অইবো ইন্সপেক্টরের।”

“তারমানে শুরু থেকে এসব কিছুর পেছনে আপনিই ছিলেন?” বাশার প্রশ্ন করলো।

“একরকম কইতে পারো, তুমি আমার এতো সাধের জায়গাটার কাম বন্ধ করনের পর কুটি টেকার প্রজেক্ট তো বন্ধ হইয়া গেল। আমি যখন কপাল চাপড়াইতাছি আর রাগে ফুলতাছি এমুন সময় চাল্লি নামের এক বিদেশি

আইসা আমার সাথে যুগাযুগ করে। হেয় আমারে একটা ঘটনা কয়, লগে জানায় এইহানে নাকি বিরাট লাভের ব্যাপার আছে। আমিও আগ্রহ পাই। নুরুরে আমিই নিয়োগ দিছি," বলে সে খোঁচা খোঁচা দাড়িকে দেখালো। "এরপরে পুরা ঘটনার সময়ে নুরু আর চাল্লি মিইল্লাই যা ঘটানির ঘটাইছে।"

"তারমানে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব এই নুরু আর চাল্লি'র কান্ড?' বাশার জানতে চাইলো। "এই চাল্লিটা কে?

"দেখবা, এটটু পরেই দেখবা। তুমার শার্টের মধ্যে এই হাবিজাবি লাগানি এইসব ওরই বুদ্ধি। তাও মুর্তিটা শেষ পর্যন্ত পাইছে। ভাতিজা তুমি, এসপি, এই সাম্বাদিক তুমগো কেউরেই আমার দরকার নাই দরকার শুধু তুমারে," বলে সে রিফাতের দিকে আঙ্গুল তুললো। "ক্যান দরকার এটটু পরেই বুঝবা। তয় ভাতিজা তুমারে একটা কথা কউনের আছে। তুমি এসপিরে জিম্মি করুনের সময় ভাবছিলা খুব একটা বিরাট বুদ্ধি পাকাইয়া উঠলোাইছো। আসলে তুমি একটা গাধা," বলে সে নুরুর দিকে একটা হাত বাড়ালো। খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা নুরু পাশের টেবিলের ওপর থেকে ট্র্যাকিং ডিভাইসটা তুলে তার হাতে দিলো।

"এইটা লাগাইছিলা না?" বলে সে ছোট ছোট দুটো চেপ্টা ব্যাটারির মতো দেখতে জিনিস বের করে দেখালো। বাশার বুঝতে পারলো ওরা ডিভাইসগুলো আগেই খুঁজে পেয়েছিল।

"তুমি ওসির গাড়িত এইগুলা লাগায়া, এসপিরে জিম্মি কইরা ভাবছিলা আমগো লাইগা ফাঁদ পাতছো, বিয়ষটা আসলে উল্টা। তুমারো এইগুলা ভজায়া আমিই আসলে এইখানে আনতে চাইতেছিলাম। কারণ তুমাগোরে আমার দরকার ছিল,"

"মানে কি? কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?" বাশার প্রশ্ন করলো। ওর চোখ সরু হয়ে গেছে।

তবে সাঈদ কন্ট্রাকটারকে উত্তর দিতে হলো না তার আগেই রুমের কাঠের দরজা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো দুজন মানুষ। একজন ওসি মল্লিক, তার পাশের মানুষটাও চেনা। বাশারের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলো, "হ্যালো, বস," বলে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সিল্কি চুলে হাত বুলালো সে।

“তৌফিক তুই?” বাশারকে কেউ যদি বলতো ও নিজে বেঈমান তাও ও এতোটা অবাক হোত না। “তুই শেষ পর্যন্ত!” ও কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

“কি করবো বস? এরা এতো টাকা দিলো,” বলে সে আরেকবার চুলে হাত বুলালো। “আর তুমি তো জানো আমি টাকার পাগল।”

বাশার আফসোসের সাথ মাথা নেড়ে এসপির দিকে তাকালো। তবে এসপি ওর দিকে তাকিয়ে নেই। বাশার তাকানোর সাথে সাথেই সে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই ওসি মল্লিকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

***

“এইহানেই তো হওয়ার কথা,” আবদুল্লাহ স’মিলগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। “বাশার স্যারে তো মোবাইলে এইহানকার কথাই কইলো।”

“আর হাঁটতে পারতাম না,” রমিজ দারোগা একটা কাঠের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলো। আবদুল্লাহ সবসময় রমিজ দারোগাকে ইউনিফর্মে দেখে অভ্যস্ত তাই গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর টিশার্ট পরা মোটা মানুষটাকে দেখতে ওর কাছে কার্টুনের মতো লাগছে। ওরা বাশারের নির্দেশ মতো জিপটাকে ডাম্প করে বাশারকে কল দিয়ে ওরা কোথায় আছে জানতে পারে। ওখান থেকে একটা টম-টম নিয়ে স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে খানিকটা ঢুকে ওটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। “কল দে, বাশাররে কল দে। আর হাঁটতে পারতাম না। উফ্।”

“মোবাইল তো বন্দ দেহায়,” মোবাইলে কল দিতে দিতে আবদুল্লাহ আবারো হাঁটতে শুরু করলো। “ওই খাড়া,” বলে রমিজ দারোগা এগোল তার দিকে। “কি যে করে,” বলে সে থেমে গেল।

“এইরহম থামলে তো হারা রাইতেও...” রমিজ দারোগা থেমে যাওয়াতে আবদুল্লাহ রাগের সাথে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই দেখলো রমিজ দারোগা কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখছে। “কি দেখো?”

“চুপ চুপ, ভিতরে দেখ,” আবদুল্লাহ উঁকি দিয়ে দেখেলো কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে নীল রঙের একটা মাইক্রো দেখা যাচ্ছে। সেটার পাশেই কাটা শটগান হাতে দাড়িয়ে আছে এক লোক।

“ব্যাপার কি, এইহানে এই মাইক্রো। ভিতরে আবার বন্দুক লইয়া একজন খাড়ায় আছে,” ফিস ফিস করে বললো রমিজ দারোগা। জবাবে আবদুল্লাহ বললো, “বাশার স্যারেরা মনে হয় কুনো ঝামেলায় পড়ছে। তুমার পিস্তলটা বাইর করো।”

রমিজা দারোগা পিস্তল হাতে নিলো। “কিন্তু এইডা দিয়া গুলি করন যাইবো না। শব্দ অইলে সব শেষ। খাড়া বুদ্ধি আছে। তুই এই দেয়াল টপকাইতে পারবি?”

জবাবে আবদুল্লাহ জানালো পারবে।

***

“হেই হেই হেই, আস্তে,” বলে নুরু নামের লোকটা তার কাটা শটগানের নলটা চেপে ধরলো এসপি আমজাদের মাথায়। “তুমি এসপি হও আর যেই হও এইটা দিয়া গুলি করলে শরীর থাকবো শরীরের জায়গায় আর মাথা আশেপাশের সবার শরীরে ছিটকা পড়বো।”

প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যেতেই এসপি ছেড়ে দিলো মল্লিককে। এসপিকে ঠেলা দিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে। বাশার জানতে চাইলো সে ঠিক আছে কিনা? এসপি কোন জবাব দিলো না।

“আরেকবার যে-ই উল্টা-পাল্টা কিছু করুক সুজা মাথা উড়ায়া দিবি,” নুরুর দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলো সাঈদ আলী। “এসপি বেশি গরম দেহাইয়ো না ঠান্ডা কইরা দিবো।”

“আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,” বাশার বলে উঠলো। ও একটু সময় ক্ষেপন করতে চাচ্ছে। “আমাদেরকে আপনার দরকার তাহলে তো রিফাতের বাসা থেকেই সরাসরি ধরে আনতে পারতেন। মল্লিক, থানা এতোসব নাটকের কি দরকার ছিল?”

“আর কইয়ো এইটা এই নুরু আর চাল্লির বলদামির কারণে অইছে। তুমগোরো লাগবো এইডা চাল্লি কইছে অনেক পরে। হেয়...”

“হেই কি হচ্ছে এখানে?” কাঠের বেড়া দেয়া দরজার কাছ থেকে ইংরেজি আর ভাঙা বাংলা মেশানো গলায় বলে উঠলো কেউ একজন। সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল সেদিকে। দরজায় দাড়ানো আর্মি ট্রাউজার আর কালো টি-শার্ট পরা মাথা ন্যাড়া সাদা চামড়ার মানুয়টাকে দেখে জয়া আর রিফাত দুজনেই হা হয়ে গেল।

“ডেভিড?” অস্‌ফুট স্বরে বলে উঠলো রিফাত। বলেই সে জয়ার দিকে তাকালো, তাকেও বিহŸল দেখাচ্ছে। বাশারও এই লোকটাকেই সে পাবলিক লাইব্রেরির সামনে গাড়িতে দেখেছিল।

“অহ, নো নো ডিয়ার। আমি ডেভিড না, আমি চার্লি,” বলে সে কারো উদ্দেশ্যে ইশারা করতেই একজন লোক এসে ওদের সামনে ছোট্ট একটা টেবিল রেখে গেল। “মুর্তিটা নিয়ে এসো,” লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলে সে সবার দিকে ফিরে বলতে লাগলো। “আমি আর ডেভিড আসলে পিঠাপিঠি ভাই। ডেভিড আমার থেকে মাত্র এক বছরের বড় ছিল। আমরা দেখতে

অনেকটাই একরকম। চেহারা হয়তো হুবুহু মিলে না তবে প্রায় কাছাকাছি। আর শারিরীক গঠন, উচ্চতা প্রায় একই হওয়াতে লোকে প্রায়ই আমাদেরকে একই মানুষ হিসেবে ভুল করতো। আমি অ্যান্টিকের ব্যবসা করতাম আর ডেভিড ইউনিভার্সিটিতে পড়াতো। ডেভিড নিজে এসব বিষয়ে এক্সপার্ট ছিল," বলে সে কাঁধ ঝাঁকালো একবার। "আমার ছিল ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা আর ওর ছিল ডিগ্রী। তাই আমরা দুজনে মিলে একটা চক্র চালাতাম," ওই লোকটা এসে টেবিলের ওপরে সেই কালো প্যাকেটটা রেখে গেল।

"আমাদের কাজ ভালোই চলছিল যতোদিন না ডেভিড এই ফাকিং মুর্তিটার পেছনে এসে লাগলো। বাট দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। ইউ মাস্ট সি দিস," বলে প্যাকেট খুলে দুই ফিটের কিছু বেশি লম্বা মুর্তিটা আলগা করে ফেললো। কালো পাথর যেন চমকাতে লাগলো সবার চোখের সামনে।

"হোয়াট আ বিউটি, ঠিক? কিন্তু শুধু বিউটি নয় এর ভেতরে মারাত্মক রহস্য আছে," বলে সে মুর্তিটার গায়ে হাত বুলাতে লাগলো। "সবাই জানে ভারত উপমহাদেশের ঠগী কাল্টের অন্যতম প্রতীক ছিল কালী মুর্তি-যেটা টুইন কালী নামে পরিচিত। এই দুটো মুর্তি নাকি একসাথে থাকলে অদ্ভুত শক্তি তৈরী হয়। অন্তত ঠগীরা তাই বিশ্বাস করতো। তাই ইংরেজ অফিসারেরা এদেরকে আবিষ্কার করার পর একটা থেকে আরেকটাকে সরিয়ে ফেলে। তখন থেকেই এই একটা মুর্তিই ছিল ইংল্যান্ডের এক মিউজিয়ামে কিন্তু অপর মুর্তিটাকে আর কেউই দেখতে পায়নি। কিন্তু এখানে ইংরেজ অফিসারেরা একটা ট্রিক করে। এই মুর্তিটাকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেও এই মুর্তিটাতেই ওরা ক্লু দিয়ে রাখে কিভাবে অন্য মুর্তিটা খুঁজে পাওয়া যাবে," বলে সে মুর্তিটাকে টেবিলের ওপরে শুয়িয়ে দিয়ে পেছনের একটা বিশেষ অংশে চাপ দিলো।

সাথে সাথে মুর্তির নিচে একটা ছোট্ট প্যানেল খুলে গেল। ওটার ভেতর থেকে চার্লি ছোট্ট একটা কাগজের মতো মোড়ানো জিনিস বের করে আনলো। জিনিসটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে সে বিজয়ীর মতো ঘোষণা করে উঠলো, "এটা মুর্তির বেদীতে বসানো একটা আলগা প্যানেল। এটা মূল মুর্তির অংশ না। আমার ধারণা মূল মুর্তির সঙ্গে এই প্যানেলটা ইংরেজ অফিসারেরা যোগ করেছিল অন্য মুর্তির নির্দেশনাটা রাখার জন্যে। এটা সেই নির্দেশনা, যেটা অনুসরণ করলে দ্বিতীয় মুর্তিটাকে খুঁজে বের করা যাবে। এটার জন্যেই ডেভিড ইংল্যান্ড থেকে মুর্তিটাকে এই দেশে আনানোর ব্যবস্থা করেছিল, এটার পেছনেই লেগেছিল বিজয় আচার্য থেকে শুরু

ইতিহাসের বহু লোকজন কিন্তু কেউই বের করতে পারেনি। ইতিহাসের সেই রহস্য এখন আমার হাতে তবে এটার সমাধার বের করতে হলে আমার আর্কিওলজিস্ট রিফাতের হেল্প লাগবে," বলে সে রিফাতের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

সাথে সাথে নুরু তার কাটা শটগানটা রিফাতের দিকে তাক করলো।

***

শটগানের কাটা নল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীকে খুব গাড়লের মতো কুপাকাত করলো ওরা। অবশ্য রমিজ দারোগার আইডিয়া গাড়লের মতো হবে সেটাই স্বাভাবিক। সে আবদুল্লাকে নির্দেশনা দিয়ে গেটের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো কাঠের নড়বড়ে দেয়ালের ওপরে চড়ে বসেছে আবদুল্লাহ। সাথে-সাথে সে অনুচ্চ শিস দিলো। প্রহরী তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল দুই পা। কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে মুখ খুলবে তার আগেই আবুদুল্লাহ নড়বড়ে দেয়ালের ওপর থেকে তার ওপরে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিল কিন্তু সেটা হলো না। দেয়াল তার ভার নিতে না পেরে কাঠের বেড়া সহ লোকটার ওপরে পড়ে গেল। একটা আস্ত মানুষ সহ কাঠের বেড়া এসে আঘাত করাতে তার অস্ত্র ছিটকে গেল। সেইসাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মানুষটা।

"তুই ঠিক অছোস?" কিছু না বলে হাঁটু ডলতে ডলতে উঠে বসলো আবদুল্লাহ। লোকটাকে মাইক্রোর নিচে ঢুকিয়ে তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে রওনা দিলো ভেতরের দিকে। ভেতরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বিশাল স'মিল। আট ফিট দশ ফিট উঁচু সারি সারি কাঠের গুড়ি পাহাড়ের মতো উঁচু করে রাখা। ওগুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে একটা ভবন পার হয়ে এল ওরা। দূরে ঘোলাটে আলো দেখে সেদিকে এগোল। দূর থেকে জায়গাটা দেখে অফিস ঘরের মতো মনে হচ্ছে। ঘরটার নিচ দিয়ে নালার মতো বয়ে চলেছে পানি।

অনেকগুলো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে উঁচু করে পাটাতনের ওপরে বানানো হয়েছে ঘরটা। সামনে পেছনে পাশে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে রাখা হয়েছে ওঠা-নামার জন্যে। ঘরটার ভেতর থেকে উত্তপ্ত কথোপকথন ভেসে আসছে।

আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা নিঃশব্দে একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে কাঠের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো ভেতরের দিকে।

এসপি আমজাদকে দেখলো ওসি মল্লিকের ওপরে চড়ে বসেছে। তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা এক লোক। তাকে টেনে সরিয়ে দেয়া হলো ওসির ওপর থেকে। ঠেলে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে।

“সর্বনাশ,” আবদুল্লাহ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তাকে চুপ করিয়ে দিলো রমিজ দারোগা। তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এল নিচে। “হেরা তো দেহি মহা বিপদে আছে।”

“হেইডা তো বুঝবার পারছি কিন্তু করন কি? থানাত খবর দিবাম?” রমিজ দারোগা বলে উঠলো।

“ধূর মিয়া, থানায় যে খবর দিবেন কে শত্রু আমরা জানি?”

“হেইডাও তো ঠিক, তাইলে করন কি?” বলে সে পেছনে তাকালো আবদুল্লাহও একই দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনেই দুজনার দিকে তাকালো একই ভাবনা খেলে চলেছে দুজনার মাথায়।

***

“এটা বুঝতে হলে ইউ মাস্ট বি লোকাল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,” বলে সে রিফাতের দিকে তাকালো। “ইফ ইউ ইনসিস্ট।”

“ও কেন আপনাকে সাহায্য করবে?” পাশ থেকে জয়া ছ্যাঁত করে বলে উঠলো। “আপনারা এমনিতেও আমাদেরকে মেরে ফেলবেন ওমনিতেও।”

“ধইন্যবাদ, এইডা অবশ্য আমার মাথায় ছিল না,” সাঈদ আলী বলে উঠলো। “সাহাইয্য করবো কারণ সেইটা করলে পরে মরবো। আর না করলে অহনই মরবো,” বলে সে নুরুর দিকে তাকালো। নুরু কিছু না বলে ¯ফে কাটা শটগান হাতে দুপা এগিয়ে এলো ওর দিকে। রিফাত উঠে দাঁড়ালো।

“আমি দেখবো। কারণ আমার নিজেরও কৌতুহল আছে, এই ব্যাপারে,” বলে সে হলদে হয়ে আসা কাগজের রোলটা তুলে নিয়ে বিছিয়ে দিলো টেবিলের ওপরে। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। ছোট একটা ম্যাপের মতো আঁকা। ছোট তবে বেশ বিস্তারিত, এমনকি দিক আর কোণগুলোও দেখানো আছে পরিষ্কার। তবে মূল জিনিস দুটো সমান্তরাল রেখা একটা ওপরে আরেকটা মাঝখানে দুটো ছোট বিন্দুর মাঝখানে একটা আকৃতি। আবার সেই আকৃতিকে কেন্দ্র ধরে বেশ দূরত্বে দুটো আকৃতি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই দুটো আকৃতির একটাকে পরিষ্কার চিনতে পারলো ও। কারণ এই জায়গাটা নিয়েই সে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। একটাকে চিনতে পারার সাথে সাথে অন্যটাও পরিষ্কার ধরতে পারলো। কারণ দুটো জায়গাই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই দুটো আকৃতিকে দুটো প্রান্ত ধরলে মাঝখানের সমান্তরাল রেখাটাকে বোঝা খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে না যদি কেউ স্থানীয় উপকথাটা জানে।

“শিট... এতো এতো,” বলে ও টেবিলের ওপরে রাখা চার্লির ম্যাপের এক জায়গায় আঙ্গুল রাখলো। চার্লিও ওর দিকে ঝুঁকে এসেছে। রিফাত বর্ণনা করার সাথে সাথে সেও চিনতে পারলো জায়গাটা। চিনতে পেরেই অস্ফুটে কথা বলে উঠলো। “মাই হলি গড... দিস ইজ ক্রেজি। হোয়াট হিস্ট্রি সেজ ইজ ট্রু...”

চার্লি কথা শেষ করার আগেই পাশ থেকে সাঈদ কমিশনার ধমকে উঠলো। “এই, তুমরা দুইজনে কি গুজুর গুজুর শুরু করলা, কতা পরিষ্কার কইরা কও।”

চার্লি কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললো কিন্তু রিফাত চিৎকার থামতে বললো, “চার্লি চুপ।”

“কিন্তু কেন...” কে জানি বলে উঠলো। “চুপ চুপ...” আবারো রিফাত বলে উঠলো। এবার সবাই শুনতে পাচ্ছে। ভূমিকম্পের মতো একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে।

“সর্বনাশ! এতো ভূমিকম্প হচ্ছে মনে...” বাশার কথা শেষ করার আগেই ওদের পায়ের নিচের কাঠের ফ্লোর নড়ে উঠলো। কেউ ওদের কাঠের কামরাটাকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেছে। হঠাৎই একদিকে কাত হতে শুরু করলো কামরাটা।

***

আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা দুজনেই যেদিকে তাকিয়েছে সেদিকে জিনিসই আছে দেখার মতো। সারি সারি শ্যাওলা পড়া কাঠের গুড়ি। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে রমিজ দারোগা এগিয়ে যেতে শুরু করলো। আবদুল্লাহ আসলে বুঝতে পারছে না মানুষটা কী করতে যাচ্ছে। রমিজ দারোগা যখন গুড়িগুলো আটকে রাখা কাঠের তক্তাগুলি ধরে টানাটানি শুরু করলো ভয়ে আঁতকে উঠলো আবদুল্লাহ। এই লোক নিজে তো মরবেই পারলে ওকেও মারবে। "এই মিয়া আপনে কি করেন! মারবাইন তো।" বলে সে টেনে থামালো রমিজ দারোগাকে।

"ক্যান, সমস্য কি ওইহানে যে-পরিমাণ লোক আছে তাগো লগে লাইগা আমরা কিছু কিরতে পারুম না। তার চেয়ে এডি খুইলা দিল্লে একটা গন্ডগোল লাগবো তাইলে যদি কিছু করুন যায়," রমিজ দারোগার কথা শুনে আবদুল্লাহও একটু দ্বিধান্বিত হয়ে গেল। ভুল বলেনি তো লোকটা। "ঠিক আছে কিন্তুক এমনে এইগুলা সরাইতেও পারবেন না। আর পারলেও এইগুলা তো আইসা পড়বো আপনের আর আমার উপরে। তারচেয়ে অন্যকিছু করতে অইবো," বলে সে আশেপাশে দেখতে লাগলো। ওপরে কাঠের রুমের ভেতরে চিৎকার চেঁচামেচি আরো বেড়েছে।

"জলদি কিছু করতে অইবো," বলে আবদুল্লাহ আশেপাশে খুঁজছে রমিজ দারোগা ওর হাত থেকে কাটা শটগানটা ছিনিয়ে নিলো। "এইটা দিয়াই কাম অইবো," বলে সে জিনিসটা তাক করলো কাঠের গুড়িগুলোর দিকে। আবদুল্লাহ তার হাত ধরে ফেললো। "এই মিয়া। আপনে কি পাগল নাকি। এমনে গুলি কইরেন না," বলে ও নিচের দিকে এদিক সেদিক দেখে একটা পুরনো ছালা তুলে তার দিকে বাড়িয়ে বললো।

"ওইটার মাথায় এইটা প্যাঁচায়া লন। শব্দ কম অইবো। আর আমাগোর আরো সইরা গুলি করা উচিত। রমিজ দারোগা তার কথামতোই আরো বেশ খানিকটা সরে এল। পাহাড় সমান উঁচু কাঠের গুড়ি। সেগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে বেশ কিছু মোটা মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে। এরকমই একটা তক্তার দিকে তাক করে গুলি করে দিলো রমিজ দারোগা। আবদুল্লাহ ভেবেছিল এই লোকের একটা গুলিও জায়গামতো লাগবে না। কিন্তু প্রথম গুলিটাই জায়গামতো লেগে যাওয়াতে খুবই অবাক হয়ে ও দেখলো একটা তক্তা মাঝ বরাবর ভেঙে গেছে।

“সবাশ, আবার,” না বললেও চলতো রমিজ দারোগা আবারো গুলি করলো। আবার তৃতীয় গুলিতে দ্বিতীয় তক্তাটা ভেঙে পড়লো। আরো আগ্রহী হয়ে সে আবারো কাটা শটগান তুলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই অবাক হয়ে দেখলো স্তুপাকৃতির কাঠের গুড়িগুলো নড়তে শুরু করেছে, আর বাজ পড়ার মতো শব্দ করছে।

ঠেকনা দিয়ে রাখা তক্তাগুলো ভেঙে পড়াতে গুড়িগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। আপনা আপনি নড়তে শুরু করেছে। দেখতে দেখতেই বাকিদুটো তক্তা আপনা আপনি ভেঙে পড়লো। বিকট শব্দ আর পায়ের নিচের মাটি মৃদু কাঁপতে শুরু করতেই আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো। চরটে তক্তাই ভেঙে গুঁড়িগুলো স্রোতের মতো গিয়ে আছড়ে পড়লো ছোট্ট অফিসঘরের মতো দেখতে পলকা বাড়িটার খুঁটিগুলোর ওপরে। ককশিটের কোন আকৃতির ওপরে লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারলে ককশিটের অবস্থা যেরকম হবে পলকা বাড়িটার খুঁটিগুলো ঠিক সেভাবেই ভেঙে পুরো বাড়িটাই একদিকে কাত হয়ে পড়লো।

***

পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে শুরু করতেই বাশার প্রথমে ভেবেছিল ভুমিকম্প শুরু হয়েছে কিন্তু একটু পরেই বুঝে গেল আসলে অন্যকিছু হচ্ছে। রুমটা প্রথম দফা কেঁপে উঠতেই রুমের প্রায় সবাই পড়ে গেল।

ভূমিকম্পের কথা মাথায় আসতে বাশার প্রথমেই স্বাভাবিক রিফ্ল্যাক্সের বশে যে চেয়ারটাতে বসে ছিল সেটাই ধরে ফেলেছিল কিন্তু কাজ হয়নি। চেয়ারসহই উল্টে পড়েছে ও, চেয়ারটা পড়েছে ওর গায়ের ওপরে। এটা ওটা ছিটকে চলেছে পুরো রুম জুড়ে। এমনকি রুমটার কাঠের কাঠামোও ভেঙে ছিটকে পড়েছে।

পুরো রুম জুড়ে নরক গুলজার। বাশার চেয়ার নিয়ে উল্টে গিয়ে পড়লো নুরুর এক পাহারাদারের ওপরে পড়তে পড়তে লোকটা ওকে ধরে ফেললো। হাতের শটগান ঠেকালো ওর থুতনির নিচে। আরেকবার পুরে রুমটা কাত হয়ে গেলে অন্যদিকে। যেদিক থেকে কাত হয়েছে সেদিকের সব জিনিসপত্র ছিটকে চলে এল ওদের দিকে। কাটাশটগানের নলসহ হাতটা ধরে ফেলেছিল ও কিন্তু যেই বুঝলো লোকটার সাথে শক্তিতে পেরে উঠছে না আনমনেই চোখ বন্ধ হয়ে গেছিল ওর কিন্তু আচমকতাই লোকটার শরীর কাদার মতো নরম হয়ে গের। ও চোখ খুলে দেখলো একটা চোখা কাঠের

টুকরো লোকটার গলার একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। লোকটার হাতের শটগানটা নিয়ে ঘুরে ওঠার চষ্টা করলো ও কিন্তু শরীরটাকে পুরোপুরি ঘোরানোর আগেই কে যেন ওর ওপরে ছিটকে এসে পড়লো। দুজনেই গাড়িয়ে সরে গেল।

মানুষটা রিফাত। ওকে এক হাতে ধরে অন্যহাতের শটগানটা কোমরে গুঁজে সোজা হবার চেষ্টা করলো ও। পুরো রুমটা এমনভাবে একদিকে কাঁত হয়ে হেলে পড়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেকোন সময় আবারো হেলে পড়বে। বাশার রিফাতকে এক কোনায় সরিয়ে দিয়ে প্রথমেই দেখে নিলো রুমের ভেতরে কে কোথায় আছে। জয়াকে দেখলো একপাশে বসে অছে, তার ঠিক পাশেই এসপি আমজাদ পড়ে আছে চোখ বন্ধ করে। খোঁচাখোঁচা দাড়ির এক পাহারাদার শেষ। অন্য আরেকটাকে ও দেখতে পেল মাটিতে পড়ে থাকা কালী মুর্তিটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

দয়া-মায়ার সময় নেই। লোকটার দিকে শটগান তুললো বাশার। তবে গুলি করার আগেই কে যেন পা ধরে টান মারলো ওর। মাটিতে পড়তে পড়তে মুর্তির দিকে হাত বাড়ানো লোকটার বেল্ট ধরে ফেললো ও লোকটাকে সহই মাটিতে পড়ে গেল। সাথে-সাথে দেখতে পেল কে টান দিয়েছে ওর পা ধরে। সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি- সাঈদ আলী যার নাম বলেছিল নুরু। এক লাথি দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিলো বাশার।

দুজনেই লাফিয়ে উঠে দাড়ালো, পরষ্পরের দিকে তাকিয়ে আগুন ঝড়ছে লাগলো। লোকটার মুখে হাসি ফুঁটে উঠেছে। বাশার লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে অনুধাবন করলো এই ব্যাটা পরোপুরি একটা সাইকো। এর সাথে মারামারি করতে যাবার কোনই কারণ নেই। শটগান তুলে সোজা গুলি করলো। কিন্তু লোকটার ভাগ্য ভালো নাকি বাশারের ভাগ্য খারাপ কে জানে। পায়ের নিচের মাটি আবারো নড়তে শুরু করেছে। গুলি করার আগেই বাশারের শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল। আর ওর শটগানের নল উঠে গেল ওপরের দিকে। কালী মুর্তিটা গড়িয়ে চলে গেল রিফাত যেদিকে আছে সেদিকে। রিফাত মুর্তিটা ধরে ফেললো কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না। চার্লি নামের সেই টেকো এতোক্ষণ পড়ে ছিল মাটিতে। সে উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল মুর্তিটা রিফাতের ওপরে। সোজা হামলে পড়লো তার ওপরে। এক টানে মুর্তিটা ছিনিয়ে নিলো সে। এমন সময় উল্টানো রুমের দরজার কাছ থেকে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো কেউ।

“খবরদার, সবাই, দুইহাত তুলে উঠে দাঁড়াও,” বাশার আবারো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেছিল ও উল্টো হয়েই দেখতে পেল দারজার কাছে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহ কিন্তু ওদের দুজনার কেউই খেয়াল করেনি উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা দরজার ঠিক পেছনেই কেউ একজন নড়ে উঠলো।

“আবদুল্লাহ সাবধান!” বলে চেঁচিয়ে উঠলো বাশার কিন্তু তার আগেই যা ঘটার ঘটে গেছে। রুমটা উল্টানোর সময়ে গড়িয়ে দরজার আড়ালে চলে গেছিল সাঈদ আলী। পুরো রুমে যখন তান্ডব চলছে সে তখন তক্কে-তক্কে ছিল কখন পরিস্থিতি বুঝে পালাবে। কিন্তু পালাতে পারেনি। অবশেষে যখন বেরুতে যাবে ঠিক তখুনি কাত হয়ে থাকা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা। ওরা ভেতরে ঢুকে যেই সারেন্ডার করতে বলে সাথে সাথে দরজার আড়াল থেকে প্রথমে দরজাটা ওদের দিকে ঠেলে দেয় সে। দরজার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে ওরা যেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সাথে সাথে দরজার পেছন থেকেই গুলি করে সে। দরজার সাথে প্রায় গা ঘেঁষে ছিল আবদুল্লাহ কিন্তু তাকে গুলির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ঠেলে দিতে গিয়ে রমিজ দারোগা চলে আসে পাল্লার সামনে। সেকেন্ডের ভেতরে আবদুল্লাহ ছিটকে পড়ে একপাশে রমিজ দারোগা গুলি খেয়ে পড়ে যায়। বাশার উঠে বসে ওদিকে এগোতে যাবে তার আগেই ওর দিকে কাটা শটগান তাক করে সাঈদ কমিশনার। একগাল হেসে গুলি করতে যাবে তার আগে নিজেই গুলি খেয়ে পড়ে যায় সে। বাশার তাকিয়ে দেখে এসপি আমজাদ একটা পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার পাশেই দাড়িয়ে আছে জয়া।

বিপদ এখনো পুরোপুরি কাটেনি। রুমের পেছন দিকে অস্ত্রহাতে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল নুরুর সেই পাহারাদার বলার আগেই দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু রুমের ভেতরে নুরু কিংবা চার্লি দুজনের একজনকেও দেখতে পেল না ও। “ওরা পালিয়েছে, সাথে মুর্তিটাও নিয়ে গেছে,” রিফাত আনমনেই বলে উঠলো।

“কি! ওরা পালালো কিভাবে?” রীতিমতো আর্তনাদ করে উঠলো জয়া।

“সমস্যা নেই, ওরা বেশিদূর পালাতে পারেনি,” বলে ও চলে এল দরজার কাছে রমিজ দারোগার ওপরে ঝুঁকে আছে আবদুল্লাহ। তার দুই চোখে

পানি। “স্যার,” ওকে দেখে বলে উঠলো সে। “অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে। খবর দিতে হবে থানাতেও। ওদেরকে ফোর্স পাঠাতে বলতে হবে। ”

“সমস্যা নেই, যা করার আমিই করছি। তোমাকে ভাবতে হবে না মাই বয়,” বলে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে মাটি থেকে তুলে নেয়া একটা মোবাইলে লেগে থাকা ধূলোমাটি পরিষ্কার করতে লাগলো এসপি আমজাদ। “তোমরা কেউ ওসি মল্লিককে কিংবা তৌফিককে দেখেছো?”

বাশার আশেপাশে তাকিয়ে কাঠের তক্তার ভাঙাচোড়া স্তুপের নিচ থেকে বেরিয়ে থাকা মল্লিকের রক্তাক্ত দেহটার দিকে ইশারা করে দেখালো। “ওইযে মল্লিক, বেঁচে আছে কিনা কে জানে তবে তৌফিক...”

“প্রথমবার, ঘরটা নড়ে ওঠার সময়েই সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে, মনে হয় পালিয়েছে...”

“না, পলাইতে পারে নাই, এইহান থাইক্কা বাইর হইতেই ওরে আমরা ধরছি। বাইরেই একটা খুঁটির সাথে বাইন্দা রাহা অইছে। হেরে বানতে গিয়াই দেরি অইছে আমগোর এইহানে ঢুকতে...” রমিজ দারোগার মাথা কোলের ওপরে নিয়েই ভেজা গলায় হঠাৎ বলে উঠলো আবুদল্লাহ।

“সাবাশ, এখন শুধু নুরু আর চার্লি,” বলে বাশার মাটি থেকে ওর পিস্তলটা তুলে নিলো। মনে হয় টেবিলের ওপর থেকে ওটা গড়িয়ে পড়েছে। “স্যার, আমি ওদের পিছু নিচ্ছি দেখি ধরতে পারি কিনা?” বলে ও চলে এল রিফাত আর জয়ার কাছে। “আমি বেরুচ্ছি, ওরা মনে হয় বেশিদূর পালাতে পারেনি। যদি সম্ভব হয় আমি ধরার চেষ্টা করবো ওদেরকে।

“দাঁড়াও এক মিনিট,” বেশ ঠান্ডা গলায় বলে উঠলো রিফাত। “ওরা কোথায় যাবে আমি জানি। আর যদি তাতেও কাজ না হয় তবে সে ব্যবস্থাও আছে,” বলে ও হাতে ধরা ভিডিও গেমের মতো ট্র্যাকারটা দেখালো। “মুর্তিটা যখন আমার হাতে এসেছিল আমি ওটার নিচের ফাঁকা প্যানেলে একটা ট্র্যাকার ঢুকিয়ে দিয়েছি,” বলে জয়া আর বাশারের দিকে তাকিয়ে ও মুচকি হেসে উঠলো। “তবে এটারও আসলে দরকার নেই। ওরা কোথায় যাবে সেটা আমি পরিষ্কার জানি। কারণ ম্যাপটা আমি দেখেছি।” কাত হয়ে থাকা রুমের কাঠের বেড়া ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে ওরা।

“কোথায় যাবে ওরা?”

বাশারের দিকে না তাকিয়েই রিফাত জবাব দিলো। “আমরা সেখানেই যাবো যেখান থেকে এই সমস্ত গল্পের শুরু,” বলে ও একটানে সেই নীল মাইক্রোর দরজা খুলে ফেললো। “মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ি। গল্পের শুরু যেখানে হয়েছিল আমার ধারণা সমাধানও ওখানেই হবে।”

অধ্যায় তেতাল্লিশ

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

বৃহত্তর মধপুর এলাকা, ময়মনসিংহ

ম্যাকফি উঠে যাবার পর থেকেই জোহরার অস্থির লাগছিল। বার-বার চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে মাঠের কেন্দ্রের দিকে দেখছিল সে। হঠাৎই এক লোক এসে জানালো ক্যাপ্টেন হেনরি তাকে পাঠিয়েছে। জোহরাকে তার সাথে দেখা করতে এক্ষুণি মাঠের অন্যদিকে যেতে বলেছে। ব্যাপারটা খুবই নাকি জরুরি। এমনিতেও জোহরার অস্থির লাগছিল। লোকটা এসে এ-কথা বলাতে যেন স্বস্তিই পেল সে।

উঠে দাঁড়িয়ে লাল পাগড়িদেরকে নির্দেশনা দেয়া শুরু করতেই হঠাৎ ওর মনে একটা ব্যাপার খটকা লাগলো, লোকটা বলেছে ক্যাপ্টেন হেনরি। কিন্তু যতোদূর জানে ক্যাপ্টেন হলো ম্যাকফি, হেনরি যদিও অর্মিতে নেই তবুও পদমর্যাদা বলে কর্নেল ছিল সে। খোদ হেনরি নির্দেশনা দিয়ে পাঠালে তো লোকটার এরকম ভুল হবার কথা নয়। লোকটাকে ডেকে জেরা শুরু করতেই সে উল্টাপাল্টা বকতে শুরু করলো। সন্দেহের পারদ মাত্র ছাড়ালো জোহরার।

সে লোকটাকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিতেই যেন নরক নেমে এল ওদের ওপরে। মুহর্তের ভেতরেই একদল কালো পাগড়ি ঘিড়ে ধরলো ওদেরকে। জোহরার বুঝতে সময় লাগলো না এরা সব ঠগী। ওদেরকে ফাঁদে ফেলেছে।

লাল পাগড়িদের সাথে ঠগীদের লড়াই শুরু হতেই লাল পাগড়িদের দলনেতা জোহরাকে নিয়ে জঙ্গলে সরে এল। বিপদের সময়ের জন্যেই এখানে আগে থেকেই একটা ঘোড়া রেখে দেয়া ছিল। জোহরা ঘোড়ায় উঠে পাগড়ি সর্দারকে নির্দেশনা দিলো ক্যাপ্টেন ম্যাকফিকে সতর্ক করে দিতে। ঘোড়া চালিয়ে জঙ্গলের বাইরে আসতে-আসতে মনে-মনে হিসেব করে জোহরা বুঝতে পারলো হেনরি আর ম্যাকফি যে পরিকল্পনা সাজিয়েছে সেটা ভেঙে পড়েছে। কারণ সম্ভবত শত্রুপক্ষের লোক এটা আগেই বুঝতে পেরেছে অথবা তারা খবর পেয়েছে। ঘোড়া থামিয়ে মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়

ফিরে যায় কিন্তু এটাও বুঝতে পারলো ফিরে গেলে কোনই লাভ হবে না বরং নিজের প্রাণটাও হারাতে হতে পারে। তারচেয়ে একটা ভাবনা উঁকি দিলো তার মাথায়। জোরকদমে ঘোড়া ছোটালো সে নিজের বাড়ির দিকে। কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে কিসের সাথে যেন বাড়ি খেয়ে ঘোড়া সহ ছিটকে পড়লো মাটিতে।

***

ছরি হাতে ঠগীদের দলটা অনেকটা ¯ োতের মতোই এসে পড়লো ওদের ওপরে। প্রথম যে ঠগীটা ম্যাকফির দিকে এগিয়ে এল তাকে সোজা গুলি করলো ম্যাকফি। লাল তিলকের ওপরে ততোধিক লাল রঙ ধারণ করে পড়ে গেল লোকটা। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে এবার অন্যহাতে ছুরি বের করলো সে। একহাতে ছুরি নিয়ে অন্য হাতে তলোয়ার বাগিয়ে আরেকজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তবে হেনরি এরকম কিছু করলো না। প্রথমেই পিস্তলটা কোমরে রেখে দিয়েছে সে। এটার একমাত্র গুলিটা সে ফিরিঙ্গীয়ার জন্যে খরচ করবে। তলোয়ার হাতে সামনের দিকে ধাবিত হয়ে থেমে গেল। পাশ থেকে ছুটে আসা কুকরির কোপ এড়াতে শরীরটাকে বাকিয়ে তলোয়ার চালিয়ে দিখন্ডিত করে দিলো একজনকে। একটাকে সরাতেই তার সাথে জায়গা করে নিচ্ছে আরেকটা।

ম্যকফি একজনের সাথে তুমুল লড়াই করছে লোকটা ওর গলার দিকে নিশানা করে কুকরি চালালো তবে সেটার ফলা ম্যাকফির গলায় লাগার আগেই একটা চোখ নেই হয়ে গেল লোকটার। ম্যাকফি বুঝলো জোনাথনের কাজ। চারপাশে লোহার সাথে লোহার, হাড়ের সাথে মাংসের আর লাঠির সাথে হাড়ের সংঘর্ষের শব্দ।

তবে লড়াইটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিছুক্ষণের ভেতরেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রথম আক্রমণেই হেনরি আর ম্যাকফিদের দল সখ্যায় তিনভাগের একভাগ হয়ে ক্যাম্পের ভেতরের দিকে চেপে এল। মাঝখানে রাজা সূর্যকান্ত আর তারপাশে আহত ডোংরু মহারাজ, গুটিকয়েক লাল পাগড়ি আর ম্যাকফিরা। বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে সহজেই। ওদেরকে

উদ্দেশ্য করে এক ঠগী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই মহাবীর সিংয়ের বিরাট লাঠিটার এক বাড়িতে খুলি থেতলে গেল তার। বিরাট বপু নিয়ে ওদেরকে আগলে দাঁড়ালো সে।

একের পর এক ঠগী ভাঙা হাত পা নিয়ে ছিটকে পড়লো এদিক সেদিক। হঠাৎ অনুচ্চ স্বরে একটা শিস বেজে উঠতেই একটা কুকরি ছুটে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে। সোজা এসে বিঁধলো মহাবীর সিংয়ের লাঠি ধরা হাতে। প্রায় সাথে সাথেই আরেকটা কুকরি ছুটে এসে নিঁখূত লক্ষে বিঁধে গেল তার পেটে। দুই কুকরি গেঁথে যাবার পর মাটিতে পড়ে গেল সে। হাত থেকে ছুটে গেল লাঠিটা।

মহাবীর সিং পড়ে যেতেই হঠাৎ সব ঠগীরা থেমে গেল। পিছিয়ে গিয়ে গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে ওদের। পেছন থেকে কে যেন সামনে ঠেলে দিলো কাকে যেন। সাথে সাথে একজন মানুষ ছুটে এসে পড়ে গেল ওদের পায়ের কাছে। ম্যাকফি অস্ত্র সামলে লোকটাকে দেখলো।

শঙ্কর। তাকে ইচ্ছেমতো প্রহার করা হয়েছে। নাক-মুখ ভেঙে দেয়া হয়েছে মেরে।

“ক্যাপ্টেন, তোমার প্রতিটা লোকের যদি এই পরিণতি না চাও তবে অস্ত্র নামিয়ে ফেল। কথা দিচ্ছি যন্ত্রণাহীন মৃত্যু হবে সবার,” হিন্দি টানে বলে উঠলো একজন। সাথে সাথে চিবিয়ে চিবিয়ে হেনরি উচ্চারণ করলো, “বাস্টার্ড।”

“বুজেছি, ভালো কথার মানুষ তোমরা নও,” বলে হেসে উঠলো অন্ধকারের কন্ঠস্বর। ম্যাকফি একবার নিজের লোকদেরকে দেখলো, আরেকবার হেনরিকে দেখলো।

এই তাহলে শেষ পরিণতি। তলোয়ারটাকে শূণ্যে দুবার ঘুরিয়ে স্থির কররো। মহাবীর সিং শোয়া অবস্থাতেই হেসে উঠলো হা-হা করে। তার হাসি সংক্রামিত হলো অন্যদের মাঝেও। হঠাৎ থেমে গেল হাসি। কিসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওদেরকে আক্রমণ করতে থাকা ঠগীরাও থেমে গেছে। পরিষ্কার ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে। দেখতে দেখতেই লাল পোশাকের একদল ঘোড়সওয়ার উদয় হলো শূণ্য থেকে। তাদের অগ্রভাগে কালো পোশাক পরা মুখ ঢাকা এক নারী। দেখতে দেখতেই ঘোড়সওয়ারের দল

ঝাঁপিয়ে পড়লো ঠগীদের ওপরে। লম্বা চকচকে বর্শা আর বন্দুকের মাথায় পরানো বেয়োনেট দিয়ে ছিড়ে খুঁড়ে ফেললো তাদেরকে।

ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্বে ঠগীদের ওপরে জোহরাদের আক্রমণটা হলো খুবই স্বল্পস্থায়ী, কার্যকর ও বিভৎস। একেবারেই অপ্রস্তুত অবস্থায় ঠগীদেও দলটাকে পেছন থেকে অক্রমণ করলো ওরা। ঘোড়ার লাথি, লম্বা বর্শা আর বেয়োনেটের সামনে টিকতেই পারলো না ঠগীদল। প্রথম ধাক্কাতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তাদের সুর্শঙ্খল দল। পেছন থেকে ইংরেজ বাহিনী আর সামনে থেকে ম্যাকফিদের আক্রমণে কিছু মারা পড়লো কিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালো আর একটা অংশ আত্মসমর্পণ করলো।

খন্ডযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর পোশাক পরা ভারতীয় এক লোক এগিয়ে এল ম্যাকফি আর হেনরির দিকে, “সার্জেন্ট অজয় পাল, স্যার। আপনাদের ভেতরে ক্যাপ্টেন ম্যাকফি কে?”

ম্যাকফি হাত বাড়িয়ে দিলো। “আপনারা এখানে কিভাবে?”

“আপনার টিমের কাছ থেকে কোন খবর না পেয়ে স্যার গ্রেগর খুব অস্থির হয়ে পড়েন। গতকাল আমাদের স্থানীয় চৌকিতে খবর পাঠান আপনাদের খোঁজ নেয়ার জন্যে। সেজন্যেই আমরা গতকাল বিকেলে রওনা দিয়ে স্থানীয় জমিদার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম পথে থেমে ক্যাম্প করার প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় এই লেডি ঘোড়াসহ একেবারে আমাদের ক্যাম্পের ওপরে এসে পড়েন। ওনার কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা সোজা এখানে চলে আসি। এরা কারা? হচ্ছেটা কি এখানে?”

“আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, সব বলবো তবে তার আগে আরেকটু কাজ বাকি আছে আমাদের,” বলে ও হেনরির দিকে ফিরলো। সে হন্যে হয়ে ফিরিঙ্গীয়ার খোঁজ করছে। “পেয়েছো ব্যাটাকে?”

“নাহ,” আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো সে। “একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ব্যাটা। কোনদিকে গেছে কে জানে।”

“আমি জানি, আমি পালাতে দেখেছি ওদের কয়েকজনকে,” নতুন একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। কণ্ঠটা জোনাথনের। গাছ থেকে নেমে মাঠের কিনারা ধরে দৌড়ে এসে এখনো হাঁপাচ্ছে সে। “ওরা উত্তরের দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।”

“এক্ষুণি চলো,” বলে হেনরি মেজর পালের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো দুঃখিত আপনাদের কয়েকটা ঘোড়া ধার নিচ্ছি আমরা। ফিরে না আসা পর্যন্ত এদেরকে সামলে রাখুন। ম্যাকফি একবার জোহরার দিকে ইশারা করে ওরা তিনজনে তিনটে ঘোড়ায় চড়ে বসরো।

“দাড়ান আপনারা, আমাকেও নিয়ে চলুন। কারণ ওদেরকে কোথায় পাবেন আমি জানি,” রাজা সূর্যকান্ত এগিয়ে এল। “আপনাদেরকে সেখানেই যেতে হবে যেখানে এই গল্পের শুরু হয়েছিল। আমাদের পুরনো জমিদার বাড়িতে।”

অধ্যায় চুয়াল্লিশ

বর্তমান সময়

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হাইওয়ে

“ব্যাপারটা আসলে কি, খুলে বলোতো?” সামনের অন্ধকার রাস্তা থেকে নজর না সরিয়েই রিফাতের কাছে জানতে চাইলো বাশার। ওদের গাড়ি প্রায় আশি কিলোমিটার বেগে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে। অন্ধকার রাস্তায় এই গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে যদি একটু এদিক থেকে সেদিক হয় তবেই হয়েছে। হাইওয়েতে চলতে থাকা শত-শত ট্রাকের একটাতে লাগলেই ওদের মাইক্রোর স্থান হবে আশেপাশের কোন খাদে, আর ওদের স্থান হবে ইহলোক থেকে পরলোকে।

“তুমি আরেকটু আস্তে চালাও তো, ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরাই ইতিহাস হয়ে যাবার কোন মানে হয় না,” পেছনের সিট থেকে জয়া বলে উঠলো। বাশার ¯ফে মাথা নাড়লো। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ওদের তো আর জানবার কথা নয় এই রাস্তার পাশেই কোন এক এলাকায় ও জন্মেছে, বড় হয়েছে। যদিও অনেক পাল্টে গেছে তবুও এই রাস্তাটা একসময় নিজের হাতের উল্টোপিঠের মতোই চিনতো ও।

“কি হলো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম,” বাশার আবারো রিফাতের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো।

রিফাত কেমন জানি ঝিম মেরে আছে। আরো কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে একবার হাতের ট্র্যাকারটা দেখলো। অন্য বিন্দুটা ওদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। যদিও নড়তে থাকা বিন্দুটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওটা এখনো জায়গামতো পৌছাতে পারেনি। বিন্দুটাকে আরেকবার দেখে নিয়ে ট্র্যাকারটা পাশের সিটে রেখে দিলো রিফাত। সে রাখতেই জয়া তুলে নিয়ে ওটাতে চোখ বুলাতে লাগলো।

“শোন, ওই ম্যাপে আমি যা দেখেছি সেটা এই এলাকার এক বহু পুরনো মিথের সাক্ষাৎ প্রমাণ,” রিফাত আনমনেই বলে উঠলো এখনো সে তার

ভাবনার জগত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি।

“আশ্চর্য কান্ড, কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে ওই কয়েকটা আঁকিবুকি দেখে এতোকিছু বুছে ফেললে?” জয়ার গলায় খানিকটা টিটকিরির সুর। নাকি সুরটা হিংসের।

“বুঝতে পেরেছি তার কারণ বহু বছর ধরে এই এলাকার জিওগ্রাফি আর আর্কিওলজি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমি। আচ্ছা, তোমরা কি জানো বহ্মপুত্র নদকে নদ কেন বলা হয়?” বাশার আর জয়া দুজনেই মাথা নাড়লো। বাশারের চোখ এখনো সামনের দিকেই। ওদের গাড়ি কাঠগোলা বাজার পার হয়ে খাগডহর এলাকার বিডিআর ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে এখন।

“আমি তো জানতাম এই নদ-নদীর ব্যাপারটা ¯েফে ভাষাগত ব্যাপার, অন্যকিছু নয়,” জয়া বলে উঠলো।

“আসলেই এটা ¯েফে ভাষাগত একটা ব্যাপার, তারপরও এতে অনেক সময় জিওগ্রাফিক্যাল একটা অ্যাঙ্গেল থাকে। যেমন ধরো কোন একটা মূল জলধারা থেকে নতুন জলধারা উৎপন্ন হয় তখন মূল জলধারাকে নদ আবার উৎপন্ন জলধারাকে নদী বলে। আবার যেসব নদীর কোন শাখা-প্রশাখা আছে তাদের বলে নদী, যেটার নেই সেটাকে বলে নদ। সবক্ষেত্রে অবশ্য এটাও ঠিক না। তবে আমরা যদি উপকথা অনুযয়ি বলতে চাই তবে ব্রহ্মপুত্র নিয়ে এরকম একটা উপকথা প্রচলিত আছে। এমনকি ময়মনসিংহ গীতিকাতেও নাকি এর উল্লেখ আছে,” রিফাত আগ্রহ নিয়ে বলে চলেছে আর বাশারের বিরক্তি বাড়ছে।

“রিফাত মূল কথাটা বলো।”

“প্রচলিত ব্যাপারটা অনেকটা এরকম; ব্রহ্মপুত্র নাকি একটা নদ বা নদী নয়। এটা নাকি দুটো নদীর একটা সংমিশ্রণ। সংমিশ্রণটাও একটা ব্যাতিক্রম। ব্রহ্মপুত্র নাকি একটা নদীর ওপরে আরেকটা নদী। তাই উপরের অংশটাকে বলা হয় নদ আর নিচের অংশটাকে...”

“তুমি যা বলছো সেটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে বা প্রকৃতিগতভাবে বলতে গেলে ব্রহ্মপুত্র নদের নিচেই আরেকটা আন্ডারগ্রাউন্ড নদী রয়েছে?” জয়া বলে উঠলো।

“ঠিক তাই, তবে ব্যাপারটা ¯ফে উপকথা হিসেবেই রয়ে গেছে এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ আগের সেই ব্র²পুত্রের খুব সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে এখন। নদী ভাঙন, মরুকরণ আর বিশেষ করে আশির দশকে আসামের বড় ভূমিকম্পের সময়ে ব্র²পুত্রের মূল ধারা সরে গিয়ে ছোট হতে হতে এখন নদীটা নিঃশেষ প্রায়। তবে ওই ম্যাপে যা আছে এই ব্যাপারটারই একটা ইঙ্গিত।”

“মানে?” বাশার সামনে থেকে জানতে চাইলো।

“মানে খুব জটিল। ওই ম্যাপের একটা প্রান্তে শশীলজের আকৃতি আঁকা ছিল, অন্যপ্রান্তে মুক্তগাছার জমিদার বাড়ির আকৃতি আঁকা। মাঝখানে দুটো সমান্তরাল রেখার মাঝামাঝি অরেকটা পাতলা রেখা আঁকা এবং সেখানে...” বলে সে একটু নাটকিয়ভাবে থামলো। কৌতুহলের চোটে বাশার আরেকটু হলে একটা ট্রাকের সাথে মাইক্রোর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে যাচ্ছিলো। “আরে ভাই, এভাবে থেমে থেমে না বলে সোজা বলো তো,” বিরক্তির সাথে গজ-গজ করলো বাশার।

“দাড়াও, আমি বলবো,” বলে জয়া একটা হাত তুললো। “ছোটবেলা থেকে আমরা একটা কথা শুনে আসতাম। মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ি থেকে নাকি শহরের জমিদার বাড়িতে যাবার একটা সুরঙ্গ আছে। শত্রু বা ডাকাতরা আক্রমণ করলে তারা নাকি এই সুরঙ্গ দিয়ে মুক্তাগাছা থেকে শহরে চলে যেত। এই সুরঙ্গ আসলে সুরঙ্গ না এই সুরঙ্গ আসলে পাতালের ব্রহ্মপুত্র নদী।”

“ঠিক তাই,” মাথা নেড়ে সায় জানালো রিফাত। “আর এই পাতালেরই কোথাও আছে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরনো কালী মন্দিরগুলোর একটা। সেই ঐতিহাসিক মন্দির, যাকে ডাকা হয়ে থাকে জোড়া দেবীর মন্দির। আর সেই মন্দিরেই আছে জোড়া কালীর দ্বিতীয় মুর্তিটা,” বলে সে দুজনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, “আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি।”

সময়: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

“কি বকছেন আপনি এসব, মন্দির, পাতালের নদী, এসবের সাথে এই ঠগী ফিরিঙ্গীয়ার সম্পর্ক কি?” চরম বিরক্তির সাথে বলে উঠলো ম্যাকফি। একবার হেনরির দিকে ফিরেও তাকালো। হেনরির চেহারা দেখে যদিও মনের ভাব বোঝা গেল না। তবে সেও ঘোড়ার রাশ টেনে থামিয়ে ফেলেছে। এই থামাটা দরকার ছিল। সেই মাঠ থেকে একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে মানুষ আর ঘোড়া উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

“সম্পর্ক আছে। ফিরিঙ্গীয়ারা ওখান থেকে পালিয়ে কোথায় গেছে সেটা বুঝতে হলে ব্যাপারটা আপনাদের জানা দরকার। আমাদের পরিবার বগুড়া থেকে এসে এখানে যখন গোড়াপত্তন করে তার আগে মঙ্গলা দেবীর পূজো হোত এই এলাকায়। আমরা আসার বহু আগেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ওদের অনুসারীরা এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এখন আমাদের বাড়ি যেখানে সেখানে মূল ভিটার পেছনে মঙ্গলা দেবীর একটা মন্দির ছিল। আমাদের বাড়ি বানানোর পরেও জায়গাটা পরিত্যক্তই ছিল। আমার বাবা যখন আমার মাকে বিয়ে করে আনে এরপর থেকে বড় বউ হবার পরও রমাকান্ত দাদার মায়ের কদর আমাদের বাড়িতে কমতে থাকে। বড় মা তখন সারাদিন বাড়ির পরিত্যক্ত অংশের ওই দেবীর মন্দিরে গিয়ে পড়ে থাকতো। ওখানে পড়ে থাকতে থাকতেই সেখানকার পুরনো পুঁথি ঘাটতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে এই মন্দিরটা আসলে একটা কভার। এই মন্দিরের নিচ দিয়ে পাতালে নামা যায়, যেখানে ব্রহ্মপুত্রের পাতাল নদী রয়েছে। এই পাতাল নদীর কিনারায় হাজারো বছর আগে কারা যেন গড়ে তুলেছিল এক বিরাট মন্দির। রমাকান্ত দাদা জমিদারি পাবার পর এই মন্দির আর পাতালের নদীর সাথে সংযোগ আছে এরকম একটা জায়গাতেই গড়ে তুলতে শুরু করে নতুন জমিদার বাড়ি।

যেখানে আপনার সাথে প্রথমবার আমাদের দেখা হয়?” ম্যাকফি ঘোড়া পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলো।

“হ্যা, সেটার কাজ আসলে শুরু করেছিল রমাকান্ত দাদা। ওই নতুন জমিদার বাড়ি আর পুরনো জমিদার বাড়ি দুটোর মাঝখানে আসলে পাতাল পথে যাতায়াত করা যায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে সেই পাতাল নদী দিয়ে যাতায়াত করা যায়।”

“আমাদের মনে হয় রওনা দেয়া উচিত...” জোনাথন বলে উঠলো।

“যাবো, তবে আগে বোঝা উচিত আমরা সঠিক জায়গায় যাচ্ছি কিনা? এই মন্দিরেই ঠগীদের আস্তানা? সেটা কিভাবে সম্ভব?” এবার হেনরি জানতে চাইলো। রমাকান্তকে জমিদারি থেকে উৎখাত করার পর সে ভারতে গিয়ে যখন ঠগীদের সাথে মিশতে শুরু করে তখন সে কথায় কথায় তাদের সাথে এই মন্দিরের ব্যাপারটা জানায়। তখন ফিরিঙ্গীয়া তার কাছে পুরো ব্যাপারটা জানতে চায়। সে সব শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই মন্দিরটাকেই সে তার আস্তানা হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব করে। সে রমাকান্তকে প্রস্তাব দেয় আমাকে উৎখাত করে তাকে জমিদারি ফিরিয়ে দিবে। আর বিনিময়ে তাকে এই মন্দিরটাকেই জোড়া দেবীর মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দেবে। এর পেছনে ফিরিঙ্গীয়ার কিছু যুক্তিও ছিল। পাতালের ওই মন্দির থেকে মাটির নিচ দিয়েই এই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় কারো চোখ না পড়েই সে আর দল যাতায়াত করতে পারবে। এই মন্দিরেই বসে সে ঠগীদের জন্যে ভারতবর্ষে সবচেয়ে সুরক্ষিত গোপন আর শক্তিশালী আস্তানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে।”

“তারমানে এই পুরোটা সময় যখন আমরা এই ঠগীদেরকে খুঁজে বের করে নিধন করার পরিকল্পনা করছি ওরা ঠিক আমাদের নিচেই অবস্থান করেছে। হায় খোদা। কিন্তু এখন গেলে আমরা ওদেরকে পাবো কোথায়? এই পাতাল মন্দিরে ঢোকার বের হবার রাস্তার নিশ্চই শেষ নেই?”

“আমারও তাই মনে হয়। তবে মারা যাবার আগে রমাকান্ত আমাকে বলে গেছে মন্দিরটার অবস্থান ঠিক কোথায়। আর আমাদের বাড়ির পেছনের পরিত্যক্ত সেই মন্দিরের ঠিক কোনদিক দিয়ে ওখানে প্রবেশ করা যাবে। আমার মনে হয় আমরা যদি সময়মতো পৌছাতে পারি তবে অবশ্যই ফিরিঙ্গীয়া আর তার দলের অবশিষ্টদের মন্দিরেই ধরতে পারবো কারণ যতোই খারাপ অবস্থা হোক জোড়া দেবীর মুর্তি না নিয়ে ওরা এই এলাকা ছাড়বে বলে মনে হয় না।”

“আমারও একই মত,” জলদি চলো সবাই। সবাই জমিদার বাড়ির দিকে ঘোড়া ছোটালো।

সময়: বর্তমান

“আর কতোক্ষণ লাগবে?” জয়া একটু অধৈর্য হয়েই জানতে চাইলো।

সামনের অন্ধকার আর নির্জন রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই বাশার জবাব দিলো। “আর সর্বোচ্চ পনেরো মিনিট,” বলে ও গিয়ার পরিবর্তন করে গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

ওর হিসেব পরিষ্কার। ওদের মাইক্রো বেগুনবাড়ি বাজার পার হয়েছে আরো পাঁচ মিনিট আগে। কাজেই রাতের এই নির্জন সময়ে আর খুব বেশিক্ষণ লাগার কথা না।

“ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে,” খুশি হয়ে উঠলো রিফাত। একটু আগে ওদের ট্র্যাকার থেকে বিন্দুর মতো জ্বলতে থাকা সিগন্যালটা গায়েব হয়ে যওয়াতে রিফাত আর জয়া দুজনেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। তবে বাশার জানতো ব্যাপারটা ঘটেছে দূরত্বের কারণে। রেঞ্জের ভেতরে প্রবেশ করলে ঠিকই আবার সিগন্যাল ফিরে আসবে। হয়েছেও তাই।

“বিন্দুটা কি এখনো সচল আছে নাকি...” বাশারের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই জয়া বলে উঠলো। “নাহ, স্থির হয়ে আছে।”

“তারমানে ওরা পৌছে গেছে জায়গামতো,” রিফাত মন্তব্য করলো। “আমরাও প্রায় চলে এসেছি।”

বাশারের মাইক্রো আরো দশ মিনিটের ভেতরেই মুক্তাগাছা সদরে প্রবেশ করলো। ছোটবেলায় জমিদার বাড়িতে বহুবার এসেছে। তাই রাস্তাটা ওর ভালোই চেনা আছে। মুক্তাগাছা পৌরসভা পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে মূল রাস্তা থেকে ডানে মোড় নিয়ে কলেজ রোডে ঢুকে পড়লো ওদের মাইক্রো। বাশারের যতোটুকু মনে পড়ে আরেকটু এগোলেই সামনে শহীদ স্মৃতি কলেজ পাবে। ওটা থেকে আরেকটু এগিয়ে ডানে মোড় নিলেই রাজবাড়ি রোডেই অবস্থিত পুরনো সেই জমিদার বাড়ি।

শহীদ স্মৃতি কলেজ পার হয়ে রাজবাড়ি রোডে প্রবেশ করলো ওদের মাইক্রো। রাজবাড়ির নামেই এই রাস্তার নামকরন হয়েছে। “বিন্দুটার কি অবস্থা?” বাশার জানতে চাইলো। কোমরে গুঁজে রাখা নিজের পিস্তল আর কাটা শটগানটা পরীক্ষা করে রেখে দিলো। খুঁজে পেতে মাইক্রোর ড্যাশবোর্ডে একটা ছোট কিন্তু ভালো মানের টর্চ দেখে তুলে নিলো ওটা।

ট্র্যাকারটা পরীক্ষা করতে করতে জবাব দিলো রিফাত। কাজেই ওখান থেকে পাঁচ-ছয়শো গজের ভেতরেই আছে।"

"তারমানে আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। নামো সবাই," বলে সবাইকে নামার জন্যে ইশারা করে নিজেও নেমে এল। "যদিও অনুমান করছি ওরা সংখ্যায় দুই জনের বেশি হবে না তবুও ওরা কয়জন আছে সঠিকভাব জানি না আমরা। নিশ্চই ওদের সাথে অস্ত্রসস্ত্র আছে। আর তাছাড়া ওরা মরিয়া। কাজেই সাবধান। "

"আমাদের মনে হয় আরো লোক নিয়ে আসা উচিত ছিল," রিফাত বললো।

"কিভাবে লোক নিয়ে আসবো। ওখানে তো আনার মতো কেউ ছিলই না। আবদুল্লাহ রমিজ দারোগকে নিয়ে ব্যস্ত। আর ছিল এসপি স্যার, তাকে নিয়ে আসতে বলছো। ব্যাকআপের জন্যে অপেক্ষা করলেও দেরি হয়ে যেত।"

"যা হয়েছে বাদ দিয়ে চলো কাজে নামি," জয়া শক্ত কণ্ঠে বললো। ওরা তিনজনে মিলে পুরনো দিনের পরিত্যক্ত রাজবাড়ির গেটের ভেতরে প্রবেশ করলো। গেটের ঠিক ভেতরেই বড়-বড় খিলানওয়ালা বাড়িটার সামনেই সেই সাদা গাড়িটা পার্ক করা। মনে মনে বাশার খুশি হয়ে উঠলো, ঠিক জায়গাতেই এসেছে। পুরনো রাজবাড়ির মূল ভবন পার হয়ে ওরা পেছনে চলে এল। অন্ধকারের ভেতরে খুব সাবধানে এগোচ্ছে। আলো জ্বালতে ভয় পাচ্ছে বাশার। তাই অন্ধকারের ভেতরেই যতোটা সম্ভব দেখে-বুঝে এগোতে হচ্ছে। হঠাৎ অস্ফুটে শব্দ করে উঠলো রিফাত।

"কি ব্যাপার, কি হলো?' বাশার যতোটা সম্ভব গলা নিচু করে জানতে চাইলো। তার প্রশ্নের জবাবে রিফাত কিছু না বলে বরং ট্র্যাকারটা এগিয়ে ধরলো বাশারের দিকে। মৃদু আতঙ্কের সাথে বাশার দেখলো বিপ-বিপ করতে থাকা বিন্দুটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। "সর্বনাশ," আনমনেই বলে উঠলো ও। "ওরা টের পেয়ে গেছে আমরা এখানে।"

সময়: অতীত

রাজবাড়িতে পৌছাতে খুব বেশি সময় লাগলো না ওদের। ওদের ঘোড়াগুলো দেখে দৌড়ে এল এক সহিস। তাকে দেখে চিৎকার করে সূর্যকান্ত জানতে

চাইলো। “এই, এদিকে কেউ এসেছে?”

সহিস জানালো তারা বেরোবার পর থেকে কাউকেই এদিকে আসতে দেখেনি ওরা। “যারাই বাড়িতে আছে সবাইকে সাবধান করে দে। পাহারা বাড়াতে বল। আর ব্যারাকে খবর পাঠা, লোক লাগবে আমার,” নির্দেশনা দিয়েই সে ওদেরকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। প্রত্যেকেই যার যার নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করে ঠিকঠাক করে নিলো।

“আমরা কি ব্যারাক থেকে সৈন্যদের দলটা পৌছানোর জন্যে অপেক্ষা করবো?” হেনরি আর ম্যাকফির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো সূর্যকান্ত।

“প্রশ্নই আসেনা। এক মুহূর্তও অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। আমরা যতো দেরি করবো ওদের পালানোর সম্ভাবনা ততোই বেড়ে যাবে। আর একবার ওরা পালিয়ে গেলে এই জীবনে খুঁজে বার করতে পারবো না আমরা। কাজেই এক্ষুণি চলুন। পারলে কিছু মশাল দিয়ে যেতে বলুন।”

কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা চারজন প্রত্যেকে হাতে একটা করে মশাল নিয়ে চলে এল বিরাট বাড়িটার পেছনের প্রাঙ্গনে। বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট জঙলার মতো। ছোট হলেও বেশ গভীর জঙ্গলের মতোই জায়গাটা ওরা মশাল হাতে জঙ্গলে প্রবেশ করতেই সঙ্গমরত দুটো শেয়াল দৌড়ে পালালো ওদেরকে দেখে। এসব জঙ্গলে ছোট মেছো বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়। ওরা সাবধানে জঙ্গলমতো জায়গাটা পার হয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গনে চলে এল। আগের জঙ্গুলে জায়গাটার সাথে এই অংশের কোন মিলই নেই। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যতœ নেয়া হচ্ছে জায়গাটার, সে-ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। ওরা সবাই মিলে মশাল হাতে ঢুকে পড়লো মন্দিরের ভেতরে। ছোট মন্দিরের ভেতরেই বড় একটা বেদীর উপরে মঙ্গলা দেবীর মুর্তি রাখা।

“আশ্চর্য! আমি জনতাম এই মন্দির পরিত্যক্ত। অথচ আমার নাকের ডগাতেই...কিনা?”

“কোথায়, কোন দিকে দিয়ে প্রবেশ পথ পাওয়া যাবে সেটা দেখান,” সূর্যকান্তের কথাকে পাত্তা না দিয়ে, রীতিমতো ধমকে উঠে জানতে চাইলো হেনরি।

“এই যে, এখানে। যদি রমাকান্তের কথা ঠিক থাকে তবে এই দেবী মুর্তির নিচের বেদীর ভেতর দিয়েই প্রবেশ করতে পারার কথা। তার কথা শেষ

হতেই নিজেদের মশালগুলো জোনাথনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দেবী মুর্তিটা ধরে টান দিলো দুজনে মিলে। নড়া তো দূরের কথা একটু হেললোও না ওটা। আবারো চেষ্টা করলো ওরা।

“না না, আমার মনে হয় এভাবে কাজ হবে না,” বলে উঠলো ম্যাকফি। চিকন ঘাম দেখা যাচ্ছে তার কপালে। “এটাকে বেদীর ওপরে ঘোরোতে হবে,” বলে সে আর হেনরি মিলে প্রথমে ডানে ঘোরালো। কাজ হলো না। এরপর বামে ঘোরালো, জোরে মোচড় দিতেই বোতলের মুখে আটকে থাকা শক্ত ছিপির মতোই একট একটু করে ঘুরতে শুরু করলো ওটা। খুশির চোটে জোনাথনের গায়ে চাপড় মারলো সূর্যকান্ত। সাথে সাথে কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো জোনাথন।

মুখ চুপসে গেল সূর্যকান্তের। দুজনে মিলে মুর্তিটাকে ঘুরিয়ে দিতেই বড় একটা ফোকরের মতো দেখা গেল। জোনাথনকে মশাল ধরতে বলে আগে নিজের শরীরটা গলিয়ে দিলো ম্যাকফি। নিচে কি আছে জানে না। ¯ষ্টার নাম নিয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো।

খুব বেশি বড় না গর্তটা। কয়েক ফিট নিচে ধপ করে পড়লো সে। নিচে নেমে জোনাথনকে বললো নিচে মশাল ফেলতে। উপর থেকে মশালটা মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেললো ও। আগেই শব্দটা পাচ্ছিলো মশালের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল বিরাট আকারের একটা গুহায় নেমে এসেছে ওরা। তবে শব্দটা আসছে গুহার শেষ মাথা থেকে। ওদিকেই অলোটা ধরলো। “চকচক করে কি?” সূর্যকান্ত জানতে চাইলো। ইতিমধ্যেই ওরা নেমে এসেছে গুহার ভেতরে।

ম্যাকফি তার দিকে তাকিয়ে হাসলো, “ কী চকচক করে বুঝতে পারছেন না। পানি দেখেননি জীবনে?”

ওরা জলধারার দিকে এগিয়ে গেল। নদী না বলে এটাকে খাল বললেই ভালো হবে। চওড়া পঞ্চাশ-ষাট ফিটের বেশি হবে না। ওটার পাড়েই ছোট একটা ঘাট, তাতে বাঁধা একটা ডিঙ্গি নৌকা।

“এটা দিয়েই মনে হয় আপনার বড় মা অন্যপাড়ে যেত,” হেনরি বলে উঠলো। “চলুন আমরাও যাই,” বলে সে উঠে এল ডিঙ্গিটাতে। ছোট হলেও কোনমতে চেপে বসতে পারলো চারজনেই।

“চলুন দেখ যাক পাতাল নদীর অন্যপাড়ে ভাগ্য কি অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে আমাদের জন্যে,” বলে বৈঠা তুলে নিলো হেনরি।

সময়: বর্তমান

তাজ্জব হয়ে ট্র্যাকারের বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে আছে বাশার। ওটাকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে যে যেদিকে পেরেছে পুরনো রাজবাড়ির ভাঙাচোরা দেয়ালের আশেপাশে আড়াল নিয়ে বসে পড়েছে। ভেবেছিল লোকগুলো টের পেয় গেছে ওদের উপস্থিতি। কিন্তু ওদেরকে তাজ্জব করে দিয়ে বিন্দুটা ওদেরকে পার হয়ে চলে গেল ওদের ওপর দিয়ে।

“আশ্চর্য কান্ড! ওরা তো আমাদের ওপর দিয়েই গেল। তবে তবে...” রিফাতকে কথা শেষ করতে দিলো না জয়া।

“ওরা আমাদের ওপর দিয়ে যায়নি, গর্দভ। ওরা গেছে আমাদের নিচ দিয়ে।”

“তারমানে ওরা পাতালে প্রবেশের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। চলো জলদি চলো,” বাশার অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ওরাও অনুসরণ করলো তাকে। পুরনো দিনের জৌলুসম রাজবাড়ির কঙ্কাল পার হয়ে ওরা চলে এল বাড়ির পেছনের দিকে। মূল রাজবাড়ি পার হয়ে পেছনে একটা ছোট নালার মতো দেখতে পেল ওরা। নালাটার অন্যপাশে আরো দুয়েকটা ভাঙাচোরা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। “ওই দেখ। ভুতুড়ে আকৃতিগুলোর ভেতরে একটা থেকে মৃদু আলোর মতো দেখা যাচ্ছে যেন। শুকনো নালাটা পার হয়ে আরো কয়েকটা ভাঙা আকৃতি পার হয়ে একেবারে রাজবাড়ির প্রান্তে চলে এল। পুরো রাজবাড়িটা যদি ভাগ্নাবশেষ হয় তবে এই আকৃতিটাকে বলতে হবে কবরস্থান। এটাকে এখন শুধুমাত্র একটা আকৃতি ছাড়া আর কিছ্ ুবলার উপায় নেই। ওটার ভেতর থেকেই এলইডি লাইটের মৃদ আলো ভেসে আসছে।

“চলো চলো,” মন্দিরের আকৃতিটির ভেতরে এসে আশেপাশে টর্চ মারলো বাশার। একেবারেই কিছু অবশিষ্ট নেই জায়গাটার।

বড় একটা পাথরের মূর্তির ভাঙাচোড়া দুয়েকেটা আকৃতি দেখা গেল। বিশাল আকারের বেদীর ওপরে একটা বড় কালো পাথর চাপা দেয়া ছিল।

মনে হয়। এখন সেই পাথরটা পড়ে আছে একপাশে। বেদীর ভেতরে গোলাকৃতির গর্তের ভেতর থেকে ভেসে আসছে আলো। "এদিক দিয়েই নামতে হবে," বলে ও শরীরটাকে নামিয়ে নিচে দেখলো গভীরতা খুব বেশি না। লাফিয়ে নিচে নেমে এল। ওদেরকেও বলো নেমে আসতে। জয়াই নেমে এল প্রথমে। তারপর রিফাত নামতে যাবে হঠাৎ জোরে গুরুম-গুরুম শব্দের সাথে কেঁপে উঠলো পায়ের নিচের মাটি। রিফাত গর্তের ভেতরে শরীরটা গলিয়ে নেমে আসছিল হাত ফসকে সোজা নেমে এল বাশার আর জয়ার ওপরে। তিনজনে গড়াগড়ি খেতে লাগলো মাটিতে। পায়ের নিচের কম্পন থেমে গেছে। বাশার উঠে বসে দেখলো রিফাত গোঙাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলো পা মচকে গেছে তার। কোনমতে তাকে ধরে ওঠালো। বাতাসে মৃদু একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

"ডিনামাইট," আনমনেই বলে উঠলো জয়া। সামনে টর্চ মেরে দেখেছে বাশার। বেশ বড় একটা গুহার মতো জায়গাটা। সামনেই একটা গলি। ওটার প্রান্তে আসতে গিয়েই হঠাৎ মাটিতে দেখলো একটা লাঠির মতো পড়ে আছে। জিনিসটা তুলে জয়াকে রিফাতকে দিলো। "এটা ধরে হাঁটো, সুবিধে হবে," জিনিসটা নিয়ে ভর না দিয়ে দেখতে লাগলো রিফাত। আপনমনেই বলে উঠলো, "এটা একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া বৈঠা। তারমানে আশেপাশেই কোথাও একটা নৌকো থাকার কথা, সাথে পানিও।" টর্চ মেরেই বহু পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাঙা নৌকোর অবশিষ্টাংশ দেখতে পেল ওরা।

"তারমানে আমরা এখন যেখানে আছি সেটাই সেই পাতালের নদী। বহু আগেই এটা শুকিয়ে গেছে," বলে মাটিতে পা দিয়ে খোঁচা দিলো জয়া। "রিফাত ভালো বলতে পারবে, তবে আমারও মনে হচ্ছে এখানে আগে পানি ছিল।"

"চলো, আগে দেখতে হবে। ওরা খালের মতো শুকনো জায়গাটা হেঁটে পার হয়ে এল। যতোই এগোচ্ছে, ডিনামাইটের গন্ধ ততোই কড়া হয়ে নাকে বাজছে। সামনেই গুহার মতো একটা জায়গা দেখা গেল। ওটার ভেতর থেকে সাদা আলো ভেসে আসছে। গুহাটার মুখে ভাঙাচোড়া পাথর ছিড়ে-খুঁড়ে আছে। এখনো অনেক পাথর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এই জায়গাতেই যে ডিনামাইট ব্যবহার করা হয়েছে এ-ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।

"জয়া, এটা রাখো," বলে কোমর থেকে কাটা শটগানটা বের করে জয়ার হাতে ধরিয়ে দিলো। নিজের হাতে বের করে এনেছে পিস্তলটা। রিফাত এখন নিজেই হাঁটতে পারছে।

ওরা তিনজনেই হেঁটে গুহার মুখে গর্তের মতো জায়গাটা পর হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

ভেতর ঢুকে টর্চের আলোটা নিভিয়ে দিলো বাশার। ভেতরে পরিষ্কার আলো দেখা যাচ্ছে। উৎসাটা কোথায় সেটা খেয়াল করলো না। কিন্তু সে-আলোয় যা দেখলো সেটা অবিশ্বাস্য। গুহার ভেতরটা বেশ বড় আর ফাঁপা। একবাক্যে বলতে গেলে এটা গুহা না বরং এটাকে কোন পাহাড়ের পাদদেশের মতো লাগছে। ভেতরে গোল দ্বীপের মতো জায়গা। দেখলেই বোঝা যায় একসময় এটার চারপাশে পানি ছিল কিন্তু এখন একেবারে খটখটে শুকনো। সেই দ্বীপের মতো জায়গাটাতেই বিরাট আকারের একটা খোলা মন্দির।

“ইতিহাসের হারানো অধ্যায়, জোড়া দেবীর মন্দির।”

পোড়া মাটির তৈরী মন্দিরটা একসময় যে অসাধারণ ছিল সে-ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু কালের আবর্তে তার রূপ যৌবন সবই গেছে। এখন শধু কঙ্কালটা টিকে আছে। সেই মন্দিরের কঙ্কালের সামনে বিরাট একটা বেদী সেই বেদীর ওপরে ঠিক শশীলজ থেকে ডাকাতি হয়ে যাওয়া কালী মুর্তিটার মতোই দেখতে আরেকটা কালী মুর্তি রাখা। বেদীর ঠিক নিচেই ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে একটা কঙ্কাল। কঙ্কালটা এমনভাবে বসানো যেন পূজো দিচ্ছে দেবীকে। তিনজেনই মুগ্ধ হয়েই দেখছিল হঠাৎ চট করে ঘুরে গেল বাশার।

কিন্তু ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে। ঘুরে গেলেও পরোপুরি ঘোরার আগেই শক্ত কিছু একটার আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। চেতনা না হারালেও ব্যাথার তীব্রতায় চোখে অন্ধকার দেখতে পেল ও। তবে এর ভেতরেও শ্লেষ মাখা হাসিতে পরিষ্কার শোনা গেল কথাগলো। “যাক, অবশেষে দুটোই পাওয়া গেছে। জোড়া দেবী আর বলদ ইন্সপেক্টর,” বলে কেউ একজন লাথি মারলো বাশারের পেটে।

সময়: অতীত

ওদের নৌকোটা পাতাল নদীর অন্যপাশে আসতেই এক লাফে প্রথমেই নেমে এল ম্যাকফি। ওর মনে হচ্ছিলো যেকোন সময়ে নৌকোটা উল্টো যাবে। কারণ এটাতে বড়জোর দুজন বা তিনজন উঠতে পারে। সেখানে ওরা চারজন। ম্যাকিফ কোমর পানিতে নেমে নৌকাটাকে টেনে নিয়ে এল কিনারায়। ঘাঁটের মতো দেখতে একট জায়গা এখানেও আছে। বাকিরা নেমে আসার সাথে সাথে নৌকাটাকে বেঁধে রাখলো। মশালের আলো থাকার পরও পরিষ্কার দেখা গেল পাথরের গুহার মতো দেখতে একটা জায়গার ভেতর থেকে আলো আসছে। ওরা সেদিকেই এগোল। পাথরের মাঝেতে গোল একটা ফোঁকরের মতো। সেটা দিয়ে তীব্র ¯োতের মতো পানি বয়ে যাচ্ছে। পাথুরে চত্বরের মতো একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে দরজার অন্যপাশে।

পানি টপকে সেটার ভেতরে একে-একে প্রবেশ করলো সবাই। ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই মুখ থেকে কথা সরছে না আর কারো। ভেতরে একটা গোল চত্বরের মতো জায়গা সেটার চারপাশে পানি দিয়ে ঘেরা। পানিটা মোটেই শান্ত পানি নয়। কেমন জানি উত্তাল পানি প্রতি মুহর্তে এসে বাড়ি মারছে পাথরে চত্বরে। সেই পানি ঘেরা জায়গাটার ভেতরে ছোট দ্বীপের মতো দেখতে উঁচু একটা জায়গায় পোড়া মাটির মন্দির। পোড়ামাটির এরকম নিখুঁত কারুকাজ এর আগে এখানকার কারো চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। নিখুঁত আকৃতির লালচে মন্দিরটার প্রাঙ্গন ততোধিক লাল হয়ে আছে বলির শুকনো রক্তে। চারপাশে রক্ত আর সিঁদূর দিয়ে ঘেরা জায়গাটার মাঝখানে বিরাট একটা বেদী। বেদীর ওপরে পাশাপাশি রাখা অপূর্ব সুন্দর কালো পাথরের তৈরী দুটো কালী মুর্তি। মুর্তিদুটোর ঠিক সামনেই বেদীর নিচে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একজন মানুষ। এমনভাবে নিজেকে অর্পনের ভঙ্গিতে বসে আছে সে তার চকচকে কালো পিঠ আর পেশীবহুল কালো কাঁধ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিজের বন্দুক লোড করে সেদিকে এগোল হেনরি। সে গলা উঁচু করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই বেদীর সামনে বসে থাকা লোকটা চট করে উঠে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে কথা বলে উঠলো।

“শশশ, চুপ! সবাই চুপ,” মানুষটা ফিরিঙ্গীয়া। তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। কালো ধূতি আরো কালো দেখাচ্ছে, মাথায় পাগড়ি নেই। অবিন্যস্ত চুল, লাল টকটকে চোখ আর মোটা গোঁফে তাকে দেখতে দেখাচ্ছে দানবের মতো।

“দেখতে পাচ্ছিস না মা ভবানীর আরাধনা করছি। মা অসন্তুষ্ট আছেন আমার ওপরে। তাই তো তাইতো তোদের সাথে হেরে গেছি,” বলে সে উন্মাদের মতো একবার ওদেরকে দেখলো আরেকবার। মুর্তি দুটোর দিকে তাকালো।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। কালো শরীরের প্রতিটা পেশী চক-চক করেছে, পেশীর ভেতরে ফুলে উঠছে শরীরের সব শীরা উপশিরা। “অথচ সব ঠিক ছিল। সব লক্ষণ ঠিক ছিল। বলি হইছে, ভোজ হইছে। এমনকি বাইরে যাবার সময় সাদা পেঁচার ডাকও শুনছিলাম। সব ঠিক ছিল তাও হাইরা গেলাম। তারমানে তারমানে...” বলে সে এক লাফে বেদী থেকে নেমে এল।

“তারমানে দেবী বড় কিছু চায়,” ফিরিঙ্গীয়া একেবারে হেনরির বন্দুকের নলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই।

একেবারেই নির্বিকার ভঙ্গিতে সে হেনরির বন্দুকের নলকে অগ্রাহ্য করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মতো বলে চলেছে। “তাই আমি সিদ্ধান্ত নিছিলাম আইজ মানুষ বলি দিবো মা ভবানীর জন্যে। দেবী মানুষ চায়,” শেষ কথাটা সে এতো জোরে চিৎকার করে বললো গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

‘মানুষ চায় মানুষ চায় মানুষ চায়...’ ম্যাকফি আর জোনাথন প্রথমে হেনরির মতোই ফিরিঙ্গীয়ার দিকে বন্দুকের নল ঠিক করে রেখেছিল ধীরে ধীরে ওদের বন্দুকের নল ঘুরে যেতে লাগলো চারিপাশে। ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁশপাতার মতো কাঁপছে সূর্যকান্ত। কারণ ওদেরকে চারপাশ ঘিরে ফেলেছে ঠগীদের ছোটখাট একটা দল।

ওদের দৃষ্টি ঘুরে গেলেও ফিরিঙ্গীয়া আর হেনরি এখনো পরস্পরের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওদেরকে ঘিরে ফেলতেই ফিরিঙ্গীয়া চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, “ভাবছিলাম দেবীরে মানুষ দিবো একটা। পাইয়া গেছি, চাইরটা,” শেষ কথাটা সে হাতের চার আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললো। কথা শেষ হতেই কেমরের পেছন থেকে বের করে আনলো একটা বিরাট আকারের কুকরিটা।

সময়: বর্তমান

“দাড়াও, ইন্সপেক্টর,” ভাসা ভাসা কণ্ঠটা বলে উঠলো। প্রথমে মাথায় বাড়ি এরপরে আবার পেটে লাথি; বাশারের মনে হচ্ছে ব্যথার চোটে অজ্ঞান হয়ে যাবে বিশেষ করে কাঁধের ক্ষতটার মুখ খুলে গেছে টের পাচ্ছে ও। ভেজা ভেজা অনুভূতি হচ্ছে। তারমানে আবারো রক্ত বেরুতে শুরু করেছে ওখান থেকে। কোনমতে উঠে বসার চেষ্টা করেও আবারো পড়ে গেল ও মাটিতে।

“উঠে দাঁড়া ইন্সপেক্টর, শুনেছি তুকি হিজরার মতোন তোর বন্ধুরে গুলি কইরা মারছোস পিছন থাইক্কা,” বাশার এবার কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলো। গলাটা নুরুর। “তোর সাথে অবশ্য যায় ব্যাপারটা,” বলে সে পা এগিয়ে আবারো লাথি মারতে যাবে শোয়া অবস্থাতেই বাশার চট করে তার পা টা ধরে নুরুকে ঠেলে দিলো পেছন দিকে। হঠাৎ এরকম প্রতিরোধ নুরু আশা করেনি। সে ব্যালেন্স রাখতে পারলো না। ধাম করে পড়ে গেল মাটিতে। মাটিতে পড়তেই শোয়া থেকে লাফিয়ে বাশার উঠে এল তার ওপরে। এক

ঘুসি মেরে নামটা সমান করে দিলো। অবশ্য ঘুসি খেয়েও নুরু এক হাতে ওর চুল টেনে ধরে পাশে টেনে ফেলে দিলো। এবার সে উঠে এল বাশারের ওপরে। ঘুসি মারতে যাবে পাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠলো, "এই খবরদার নামো, এর ওপর থেকে নামো," গলাটা জয়ার, সে কাটা শটগানটা চেপে ধরেছে নুরুর মাথার পাশে।

নুরু সরে এল ওর ওপর থেকে। ওর দিকে তাকিয়ে রক্ত মুখে হেসে উঠলো নুরু। "এই বেটির তেজ তোর চেয়ে বেশি।"

"এই চুপ," জয়া ধমকে উঠলো। "চুপ, সরে আয়, নাহলে..." ওর গলা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই পেছন থেকে একটা বন্দুক লোড করার শব্দ শোনা গেল।

"সবাই চুপ," আধা বাংলা আধা ইংরেজি মেশানো গলাটা বলে উঠলো। "এখানে আমরা মারামারি করতে আসিনি। এই নুরু তুমি সরো ওখান থেকে।"

ওরা ফিরে তাকিয়ে দেখলো ডেভিডের ভাই চার্লি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হাতে একটা মেশিন পিস্তল। পায়ের কাছেই সেই কালো ব্যগটা। "আমরা আপনাদের শত্রু নই। আমি ব্যবসায়ি মানুষ। আমি এই মুর্তি দুটো চাই। আমি এগুলো নিয়ে যেতে পারলেই খুশি," আপনাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই।"

বাশার দ্রুত বিবেচনা করছে পরিস্থিতি। সে নিজে আহত, রিফাত আহত। এদের সাথে লড়াইয়ে পারবে না ওরা। তারচেয়ে এরা যদি মুর্তি নিয়ে পালায়ও ট্র্যাক করতে তেমন অসুবিধে হবে না।

"আমি রাজি," বাশার জবাব দেয়ার আগেই জয়া বলে উঠলো। "তবে আমি মুর্তি দুটোকে পাশাপাশি রেখে দেখতে চাই মিথ যা বলে সেটা সত্যি কিনা। আসলেই মুর্তি দুটোকে একসাথে করলে কিছু ঘটে কিনা। চার্লি একবার নুরুর দিকে দেখলো। আরেকবার জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "ঠিক আছে, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এসব বুলশিটে আমি বিশ্বাস করি না," বলে সে ব্যাগটা তুলে ধরলো জয়ার দিকে। জয়া সেটা নিয়ে মুর্তিটা বের করে এক মুহূর্ত দেখলো। তারপর এগিয়ে যেতে লাগলো বেদীর দিকে।

বাশার তাকিয়ে আছে, রিফাতও লাঠিতে ভর দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাশার রিফাতের দিকে তাকিয়ে একটা বিশেষ ইশারা করলো।

সবার আড়ালে কিছু একটা ধরিয়ে দিলো রিফাতের হাতে।

এসব কোনদিকে খেয়াল নেই জয়ার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে এগিয়ে চলেছে বেদীর দিকে। বেদীর সামনের কঙ্কালটা এড়িয়ে মুর্তিটাকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলো সে। প্রায় সাথে সাথেই বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো গুহার ভেতরটা।

সময়: অতীত

হেনরি কোনদিকে না তাকালেও বুঝতে পারলো কিছু একটা ঘটছে। তাদেরকে যে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে এটা বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে গুলি চালালো ফিরিঙ্গীয়ার দিকে। সেই সাথে চিৎকার করে তার সঙ্গিদেরকে গুলি চালাতে বললো। হেনরির গুলিটা সরাসরি ফিরিঙ্গীয়ার গায়ে না লগিলেও গুলি লেগে তার হাত থেকে বিরাট কুকরিটা ছিটকে পড়ে গেল। সে সোজা এগিয়ে এসে হেনরিকে ধরে ফেললো। শক্তিশালী হাতে হেনরির গলা চেপে ধরে শূণ্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেললো তাকে। হেনরি মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই উন্মাদের মতো সে ছুটে এল হেনরির দিকে। খালি পায়ের শক্ত লাথি খেয়ে হেনরির মনে হলো বুকের বাতাস সব বেরিয়ে গেছে।

অন্যদিকে ওদেরকে ঘিরে ধরতেই গুলি চালালো ওরা। ওরা মানে দুজনে। ম্যাকফি আর জোনাথন। দুজনার গুলি খেয়ে দুজন ঠগী পড়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেও পিছিয়ে গেল না ওরা। দুজনার জায়গা দখল করলো আরো চারজন। কিন্তু লড়াইটা বেশি স্থায়ি হলো না। চারজনের ভেতরে দুজনকে পিস্তলের গুলিতে ঘায়েল করে ফেলতেই অবশিষ্ট দুজন আর জীবনের ঝুঁিক নিলো না না ঝেড়ে দৌড় দিলো বাইরের দিকে। দুজনকে পালাতে দেখে গুহার ভেতরে অবস্থানরত বাকি দুজনও দৌড় দিলো। ওদের পিছু না নিয়ে ম্যাকফি আর জোনাথন ফিরে তাকালো হেনরি আর ফিরিঙ্গীয়ার দিকে। দুজনের লড়াই ততোক্ষণে তুঙ্গে উঠেছে।

হেনরিকে লাথি মেরেই ফিরিঙ্গীয়া ভেবেছিল সে কাবু করে ফেলেছে। তার পা ধরে টেনে নিয়ে চলে বেদীর কাছে। বেদীর কাছে পৌছে তাকে ছেড়ে দিয়ে আগের দিন ছাগল বলি দেয়া হয়েছে যে খগড়টা দিয়ে সেটা উঠিয়ে নিলো হেনরিকে বলি দেয়ার জন্যে। খগড় হাতে সে ঘুরে দাড়াতেই শোয়া

অবস্থা থেকে সটান উঠে বসে হেনরি ফিরিঙ্গীয়ার পেটে ঢুকিয়ে দেয় ফিরিঙ্গীয়ারই বিরাট কুকরিটা। তাকে মাটিতে ফেলে টেনে আনার সময়েই মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়েছিল সে ওটা। পেটে ঢুকেই সাথে সাথে টেনে বের করে আনে এবার বসিয়ে দিয়ে গলায়। ফিরিঙ্গীয়া কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ে বেদীর সামনে। তার রক্তে লাল হয়ে যেতে থাকে তারই মা ভবানীর বেদীর পায়ের কাছটা।

ফিরিঙ্গীয়ার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে হেনরি বড় করে একবার দম নিয়ে ফিরে তাকায় ম্যাকফি, জোনাথন আর সূর্যকান্তের দিকে। যে দৌড় শুরু হয়েছিল সেই নর্মদা থেকে তার অবসান হয়েছে। ওরাও হেনরির দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে কিন্তু তাদের হাসি পূর্ণ হবার আগেই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে চারপাশ।

সময়: বর্তমান

যে বিকট শব্দে গুহাটা কেঁপে উঠেছে সেটা দুই কালী মুর্তিকে একসাথে করার কারণে কোন অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে ঘটেনি বরং রিফাতের ছুঁড়ে দেয়া একটা হাত বোমার কারণে ঘটেছে। হাতাহাতির সময়ে এই হাত বোমাটা নুরুর বুক পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল ইন্সপেক্টর বাশার। জয়া যখন বেদীর দিকে এগিয়ে যায় সে ওই বোমাটাই রিফাতের হাতে তুলে দেয়। তারপর জয়া মুর্তিটাকে বেদী বসানোর সময়ে সবাই যখন সেদিকে তাকিয়ে আছে এই সুযোগে রিফাতকে ইশারা দিতেই সেটা সে ছুঁড়ে দেয় নুরুর দিকে। বোমাটা সোজা গিয়ে নুরুর সামনে পড়ে, সে লাফিয়ে সরে যাবার আগেই বিস্ফোরণে উড়ে যায় তার একটা পা। ঠিক একই সময়ে বাশার বের করে আনে তার পিস্তলটা।

চার্লি বেদীর দিকে তাকিয়ে জয়ার কর্মকান্ড দেখছিল। বিস্ফোরণ ঘটতেই সেও একপাশে ছিটকে পড়ে। তবে শোয়া অবস্থা থেকেই হাতের মেশিন পিস্তলটা তুলে গুলি করার আগেই বাশার নিজের পিস্তল তুলে পর-পর দুইটা গুলি করে তাকে। তবে দুইটা গুলি খেয়েও স্বাভাবিক রিফ্ল্যাক্সের বশে তার আঙ্গুল চেপে বসে মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে। এক ঝাঁক গুলি উড়ে আসে ওদের দিকে। বাশার ডাইভ দিয়ে সরে যায় কিন্তু রিফাত গুলি খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে মৃত চার্লির হাত থেকে

মেশিন পিস্তলটা নিয়ে অন্যদিকে ছুঁড়ে দেয় বাশার। তারপর দৌড়ে আসে রিফাতের কাছে।

গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে রিফাত। বাশার পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো দুটো গুলি লাগলেও একটা গুলিও মারাত্মক নয়। আঘাতের চেয়ে বেশি শকেই জ্ঞান হারিয়েছে মেয়েটা। রিফাতকে সাবধানে শুইয়ে দিচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে কাটা শটগান লোড করার শব্দ পেয়ে মৃদু হেসে ওঠে বাশার।

“এতে হাসির কি হলো?” রাগি গলায় জানতে চাইলো জয়া।

রিফাতকে শুইয়ে দিয়ে ওর দিকে হাসি মুখেই ফিরে তাকালো বাশার। বসে পড়লো রিফাতের পাশেই। শরীরের নানা জায়গায় ব্যাথা। তবুও না হেসে পারছে না ও। জয়ার কাটা শটগান ধরা হাতটার দিক তাকিয়ে আবারো হেসে উঠলো ও। “গল্পের এই টুইস্টটা আমি জানতাম। তবে এই কারণে হাসছি না। কিন্তু এই টুইস্টটা যে আমি জানি এটা তুমি জানতে না। এই কারণেই হাসছি,” বলে আবারো হেসে উঠলো বাশার।

“মানে কি? কি আবোল-তাবোল বকছো?” যদিও বন্দুক জয়ার হাতে, পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে তবুও সে রেগে উঠছে।

“আবোল-তাবোল না। এটাতো খুব স্বাভাবিক যে দলের ভেতরে একজন বেঈমান থাকবে যে শেষ মুহূর্তে সব নিয়ে কেটে পড়তে চাইবে, এটা মোটামোটি সব গল্পের কমন প্যাটার্ন। তবে তোমার প্যাটার্নটা আরেকটু ব্যতিক্রম তাই না জয়া?” বাশার একটু থেমে যোগ করলো।

“নাকি আমার বলা উচিত বিজয়, বিজয় আচার্য। মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর বিজয় আচার্য। ওটাই তো তোমার নাম তাইনা?”

সময়: অতীত

“হচ্ছেটা কি?” হেনরি জানতে চাইলো।

“যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে জোনাথন আর ম্যাকফি মিলে সেদিকে দৌড়ে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। এসে জানালো পালায়নরত ঠগীরা যাবার সময়ে ওরা যেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছে সে-পথটা বড় একটা পাথর ফেলে বন্ধ করে গেছে।

“ব্যাপারটা ভালো না,” বলে উঠলো সূর্যকান্ত। “কারণ পানি বাড়ছে। তারমানে ভোরের জোয়ার আসছে। আমরা যেদিক ঢুকেছিলাম সেটাইছিল এদিক দিয়ে পানি বের হবার একমাত্র রাস্তা,” বলে সে উল্টোদিকে দেখালো আঙ্গল তুলে। “ওদিক থেকে আসা পানি এই ফোঁকর দিয়ে বের হয়ে অন্যপাশের নদীতে মিশতো। ওরা যদি রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে থাকে তবে পানি অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সেটা হবার আগেই এখান থেকে বেরুতে হবে।”

“কিন্তু বেরুবোটা কোনদিক দিয়ে?” হেনরি জানতে চাইলো।

“রাস্তা আছে,” বলে সূর্যকান্ত গুহার অন্যপ্রান্তটা দেখালো। “আমার ধারণা এখান থেকে বেরুনোর একাধিক পথ আছে। কারণ ঠগীরা ওসব পথ দিয়েই যাতায়াত করতো।”

“হেনরি, এগুলো কি করবেন?” ম্যাকফি বেদীর কাছে ফিরিঙ্গীয়ার লাশ, আর কালী মুর্তি দুটো দেখিয়ে জানতে চাইলো।

হেনরি এক মুহূর্ত ভাবলো। ফিরিঙ্গীয়ার মৃতদেহটা এমনভাবে বেদীর কাছে মাথা দিয়ে নিচু হয়ে আছে মনে হচ্ছে যেন দেবীর আরাধনা করছে। লোকটা শত্রু হলেও তার দেবী ভক্তি হেনরির মনে দাগ কেটেছে।

“লাশটা এখানেই থাক। সে শত্রু ছিল তবে তার দেবী ভক্তি অসাধারণ। দেবীর পায়ের কাছেই থাক সে বাকিটা জীবন। এই মুর্তি দুটো অশুভের প্রতীক। এই দুটো একসাথে থাকা চলবে না। একটা আমরা নিয়ে যাবো প্রমাণস্বরূপ উপরওয়ালাদের দেখানোর জন্যে যাতে তারা আমাদের কথা বিশ্বাস করে অর অন্যটা এখানেই থাক। ফিরিঙ্গীয়া আর তার দেবী পড়ে থাক একে অপরের কাছে।”

“চলুন চলুন,” জোনাথন আর ম্যাকফি মিলে মুর্তিটা নিয়ে গুহার অন্যপ্রান্তে রওনা দিলো। কিছুদূর এগোতেই ওরা নদীর ¯োতধারার মতো আরেকটা খাল দেখতে পেল। ওটার প্রান্তেও একটা ছোট নৌকো বাঁধা। সবাই মিলে উঠে বসে তীব্র ¯োতের ভেতরে নৌকো ভাসিয়ে দিলো। প্রথমে কিছুক্ষণ

বৈঠা দিয়ে নৌকা বাওয়ার চেষ্টা করে বাদ দিলো ওরা। ¯োতের টানে নৌকা ভেসে চললো ইচ্ছেমতো। ধীরে ধীরে জোয়ার যতো এগিয়ে আসছে ¯োতের বেগ ততো বাড়ছে, সেইসাথে বাড়ছে পানির উচ্চতা। পানির উচ্চতা বাড়তে বাড়তে একটা সময় মনে হলো পানি ওপরের ছাদে উঠে যাবে আর ওরা নালায় আটকে পড়া ইদুরের মতো মরবে। মাথা নিচু করে ¯োতের টানে ভেসে চললো ওরা জীবন বাজি রেখে। চলতে-চলতে পানির ¯োতের সাথে ওদের নৌকা ছিটকে বেরিয়ে এল একটা পুকুরে। এই পুকুরের আরেক প্রান্ত গিয়ে মিশেছে একটা ছোট খালের সাথে।

প্রথমে কিছুক্ষণ পাগলের মতো উল্লাস করলো ওরা বেঁচে থাকার আনন্দে।

“জায়গাটা চিনতে পেরেছেন?” সূর্যকান্ত হেনরি আর ম্যাকফির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। ভোরের আলো সবেমাত্র ফুঁটে উঠতে শুরু করেছে। দুজনেই ফিরে দেখলো জায়গাটা। এইখানেই নতুন রাজবাড়িটা গড়ে উঠছে। চারিপাশে বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন। নির্মাণ শ্রমিকেরা এখনো বেশিরভাগ ঘুমে। দয়েকজন মাছ মারছে গোসল করছে বিরাট পুকুরটাতে। অবাক হয়ে দেখছে তারা ওদেরকে।

“আমি রমাকান্ত দাদার স্বপ্নটা পূরণ করবো। এই বাড়িটা সম্পন্ন হবার পর বাড়িটার নাম রাখবো ‘শশীলজ’। আর যেদিক দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম ওখানে একটা বড় গোসলখানা করে পুরো পাতালপথটাকে ডেকে দিবো। তবে রহস্য রেখে দিবো ওখানেও,” বলে সে ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো।

তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে হেসে উঠলো ওরা।

সময়: বর্তমান

বাশার ভেবেছিল জয়া ব্যাপারটা পুরোপুরি অস্বীকার করবে কিন্তু জয়ার অবাক হবার মাত্রাটা এতোই বেশি সে উল্টো জানতে চাইলো, “তুমি কিভাবে বুঝলে?”

বাশার নিঃশ্বাস ছাড়লো। “কিভাবে বুঝেছি, আসলে কি বলবো? অনুমান করেছিলাম অনেক আগেই কিন্তু পরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করি

অনেক পরে। শুরু থেকেই তোমার চরিত্রটাকে ঠিক গল্পের ভেতরে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না আমি। সাংবাদিকদের কৌতুহলের মাত্রাটা এমনিতেই বেশি হয় তবে তোমারটা অনেক বেশি। একজন মানুষ যতোই কৌতুহলি হোকনা কেন ¯ফে অতীতের একটা ঘটনা জানার জন্যে এতোটা ঝুঁকি নিবে এটা ঠিক মেনে নিতে পারছিলাম না আমি। তার ওপরে তোমার ওপরে মূল সন্দেহটা গিয়ে পড়ে যখন তুমি রিফাতের সাথে ডেভিডের প্রেমের ব্যাপারটা জানালে।"

বাশার আহত হাতটা ধরে ঝাড়া দিলো। "তুমি ওই ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতে, একটা সুযোগ খুঁজছিলে তথ্যটা ফাঁস করার। তথ্যটা ওই সময়ে ফাঁস করো যাতে কোনভাবেই তোমার দিকে আমার মনোযোগ না যায়। কিন্তু বাস্তবে ঘটে উল্টো। ওতেই তোমার ওপরে আমার মনোযোগ স্থির হয়। তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে বলেছিলে রিফাতের ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর করতে। আমি তার ব্যাপারে খোঁজ না করে তোমার ব্যাপারে করি। জানতে পারি তুমি যে পত্রিকাতে কাজ করার কথা বলেছো শশীলজে ডাকাতির সময়ে সে-সময়ে সেই পত্রিকা ছিলই না। ওটা চালু হয়েছে আরো দুবছর পর। এখান থেকে শুরু। এরপরে আগের কিছু ব্যাপার মেলানোর চেষ্টা করি আমি।"

"নুরু যখন রিফাত সেজে আমাদের সামনে আসে তুমি সাথে সাথেই সেটা বুঝতে পেরেছিলে কিন্তু বলোনি, এরপরে এই মুর্তি উদ্ধারের ব্যাপারে তোমার অতি আগ্রহ থেকে শুরু করে আরেকটা ব্যাপার। তৌফিককে যখন আমি তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলি সে সবই জেনেছিল। তাই সাঈদ আলী যখন তোমার সাথে কথা বলে তখন সে তোমাকে ভূয়া সাংবাদিক ডাকে, কারণ তৌফিকের মাধ্যমে সে জানতো তুমি ভূয়া। সন্দেহের পারদ চড়তে শুরু করার পর আমি আরো ছোট-খাট কিছু হিসেব করি। যেমন ধরো যখনই রিফাত বিজয় আচার্য নিয়ে বলতে শুরু করতো তুমি চুপ হয়ে যেতে। কারণ তুমি ভয় পেতে বেশি বলে ফেলো কিনা। এরকম আরো আছে। এসবকিছু মিলিয়ে বুঝতে পারি তুমি আসলে ভূয়া। ডাকাতির দিন রাতে ওই বাড়িতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তুমি মরোনি। কে মরেছিল? লাশটা কার ছিল দাপুনিয়ার ওই ছেলেটার তাইনা? কি যেন নাম ছিল মোক্তার। তবে আমার প্রশ্ন হলো ডেভিডকে তুমি মারলে কেন? তাও আবার গলায় ফাঁস দিয়ে। মেরে পানিসহ গাড়িতে ফেললে কিভাবে?"

"আমি ডেভিডকে মারতে চাইনি। কারণ আমি জানতাম ডেভিড মুর্তিটা এমন কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে যেটা একমাত্র সেই জানে। কিন্তু দুঃখের

ব্যাপার হলো ডাকাতির পর পুলিশের জেরা শেষে ডেভিড আমাকে বলে বাড়িতে নামিয়ে দিবে। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা যেতেই সে আমাকে পিস্তল বের করে শাসাতে থাকে। আমি বুঝতে পারি সে আমাকে পথেই খুন করে কোথাও ফেলে দিবে। আমি মরিয়া হয়ে হাতাহাতির এক পর্যায়ে গাড়ির সিটবেল্ট পেঁচিয়ে ধরে পেছন থেকে টান দিলে সিটবেল্ট তার গলায় চেপে বসে। সম্ভবত তখুনি তার গলার হাড় ভেঙে যায়। বেল্টটা গলায় চেপে বসতেই তার পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে আমার গায়ে লাগে। একদিকে তখন গাড়িটা উল্টেপাল্টে চলতে শরু করেছে, অন্যদিকে গুলির আঘাতে আমি ছিটকে পড়ি গাড়ি থেকে।"

"গুলির আঘাত খুব ভয়ঙ্কর না হলেও অন্ধকার রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি আমি বেশ কিছুক্ষণ। যখন জ্ঞান ফিরে আসে আমি পাগলের মতো ডেভিড আর ওর গাড়ির খোঁজ করি। কিন্তু পাইনি। আমি ভেবেছিলাম সে পালিয়েছে। কিন্তু সে যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে পানিতে পড়ে গেছে এটা কখনোই আমার মাথায় আসেনি। তখন আমার অবস্থা পাগলের মতো। সাথে টাকা নেই, কিচ্ছু নেই। পোশাক ছিঁড়ে গেছে, আহত। সিদ্ধান্ত নেই আগে বাড়ি যাবো। সেখানে গিয়ে ঠিক হয়ে ঠান্ডা মাথায় সব ভাবতে হবে। কিন্তু বাড়িতে যে ইতিমধ্যেই পুলিশ পাহারা বসে গেছে সেটা ভাবতে পারিনি। ওখানে গিয়েই পুলিশের সাথে ঝামেলা বেঁধে যায়। বাড়িতে আগে থেকেই মোক্তার ছিল। সে আর আমি মিলে রান্নাঘরের পেছেনের দরজা দিয়ে পালারোর চেষ্টা করার সময়ই পুলিশের গুলিতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মোক্তার ওখানেই মারা পড়ে। আমি মারাত্মক আহত অবস্থায় পালাই। তারপর ভীষণ পোড়া চেহারায় একাধিকবার সার্জারি আর এরপরে..." বলতে বলতেই জয়া থেমে গেল। "অনেক তো বললা। এবার আমার একটা প্রশ্ন আছে। এটা না হয় বুঝলাম, তুমি বুঝতে পেরেছো আমি ভূয়া কিন্তু তুমি এটা কিভাবে বুঝলে আমিই বিজয় আচার্য।"

"মজার ব্যাপার কি জানো এটা বোঝা খুব সহজ ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি দায়ি তোমার হাতের ওই আংটি। মেটামরফোসিস রিং পরে থাকতো বিজয় আচার্য। সে ছিল আনবর্ন বেবি। বড় হয়েছে হিজরাদের মাঝে। পরে দেখা যায় সে পুরুষ। আসলে সে মানে তুমি পুরোপুরি পুরুষ ছিলে না, তাইনা। একারণেই তুমি হাতে ওই প্রজাপতি রিংটা পরে থাকো। রূপান্তর, তাইনা, ট্রান্সজেন্ডার। প্রজাপতি হলো প্রাকৃতিক রূপান্তরের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সেটারই প্রতীক তুমি ধারণ করে রাখতে নিজের হাতে। পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া। নিজের পরিচয় পাল্টে ফেলার জন্যে এরচেয়ে বড় ছদ্মবেশ আর কি হতে পারে। তাইনা বিজয় আচার্য ওরফে জয়া সরকার?"

শেষ কথাটা বেশ শান্তভাবে বললো বাশার। “কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। কেন? বুঝলাম একসময় তোমার কিছুই ছিল না। কিন্তু এরপরে তো তুমি সব পেয়েছিলে তবে কেন এই ঠগীত্ব? কেন এই রূপান্তর?” বলে ও হাত তুলে জোড়া মুর্তি দেখালো। “এসবের জন্যে? রিয়েলি? তুমি এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো। কি হয়েছে? কিসের বিশেষ শক্তি জোড়া মুর্তির। বলো জয়া।”

“তুমি বুঝবে না বাশার। কারণ তুমি জানো না,” জয়ার কণ্ঠস্বও ঝাপসা হয়ে গেছে। “বদলে যাওয়ার অনেক সংজ্ঞা আছে। তুমি যখন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর হও তখন কি ঘটে কেউই সেটা জানে না। তাই সব পেয়েও সবকিছু আমার জন্যে যথেষ্ঠ ছিল না। বরং পুরনো সিন্দুকের সেই পোকায় খাওয়া ডায়েরিতে আমি নতুন এক জীবন খুঁজে পেয়েছিলাম। এতো কাহিনী কিছুই ঘটতো না যদি আমি পুরো ডায়েরিটা পেতাম। পোকায় খাওয়া ডায়েরিটার ভেতরে শুধু প্রথম অংশটুকুই পড়তে পেরেছিলাম আমি। সেখানেই নতুন এক জীবনের সন্ধান পাই আমি, নতুন এক ডেভোশন, অতি মাত্রায় নিজেকে উৎসর্গ করা। এক মহান দেবীর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া। অন্য এক রিপু, যাকে বলে সপ্তরিপু। এমনকি সার্জারির সময় ইচ্ছে করেই আমার গায়ের রঙও...”

“অহ, কামঅন জয়া, তুমি এসবে বিশ্বাস করো? শত বছর আগে একদল মূর্খ ডাকাত কি মানতো সেসবে তুমিও বিশ্বাস করো, এটা আমাকে অন্তত বিশ্বাস করতে বলো না। প্লিজ,” বাশার মাথা নাড়লো।

“তুমি সেটা মানতে পারবেও না। যাই হোক তবে এই জোড়া মুর্তির কতো দাম হতে পারে সেটা তো বিশ্বাস করো নাকি? এমনিতেই এর অবজেক্ট ভ্যালু মানে শুধু কষ্টি পাথরের দামই হবে কয়েক কোটি টাকা আর ঠগীদের মিথটা ঠিকমতো স্টাবলিশ করতে পারলে...” জয়া কাঁধ ঝাঁকালো।

“নাউ ইউ আর টকিং বিজনেস,” বাশার বলে উঠলো। কিন্তু তুমি তো সেটা পারবে না। “কারণ। আমি তোমাকে সেটা করতে দিবো না।”

“মানে? বন্দুক আমার হাতে, বাশার। আমি সত্যিই তোমাদের দুজনকে মারতে চাইনা। ”

“তুমি পারবেও না। কারণ মনে আছে তোমার হাতে বন্দুকটা আমিই দিয়েছিলাম। ওটার টরশন পিন ভাঙা একটাও গুলি বেরুবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারো। বাশারের শেষ কথাটা শুনে জয়া পাগলের মতো ট্রিগার

টানাটানি করতে লাগলো। কিন্তু আসলেও গুলি বেরুলো না। বাশার এবার আস্তে করে বের করে আনলো নিজের পিস্তল।

“তুমি পারবে না,” বন্দুক কাজ করছে না দেখে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাশারের মুখের ওপরে হেসে উঠলো জয়া। আমি দেখেছি তুমি রিফাতের বাসার বাগানে নুরুকে গুলি করতে পারোনি। আরো বহুবার আমি দেখেছি গুলি করতে গেলে তোমার হাত কাঁপে। কেন বাশার, নিজের বন্ধুকে গুলি করে মেরেছিলে ব’লে। কেন বাশার, এবার কোথায় গেল তোমার যুক্তিবাদি মন?” বলে সে হেসে উঠলো।

বাশার পিস্তলটাকে তুলে ধরেছে। আঙ্গুলে চেপে বসেছে ট্রিগার। “তুমি পারবে না বাশার, তোমাকে দিয়ে...” ভীষণ টিটকিরির সাথে আরোকিছু বলতে যাচ্ছিলো জয়া কিন্তু বিকট এক পশলা গুলির শব্দে থেমে গেল। একাধিক গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেছে তার শরীরের একাংশ। যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছে এরকম ভঙ্গিতে বেদীর ওপরে পড়ে গেল সে। এখনো মরেনি।

নিজের পিস্তলের ঠান্ডা নলের দিকে একবার তাকিয়ে ঝট করে পেছন ফিরলো বাশার। চার্লির মেশিন পিস্তলের ধোঁয়া ওঠা নলটার দিকে একবার দেখে নিয়ে ও অবিশ্বাসের সাথে তাকিয়ে রইলো রিফাতের দিকে। শোয়া অবস্থাতেই সে চার্লির কুড়িয়ে পাওয়া পিস্তলটা দিয়ে গুলি করেছে জয়াকে।

বাশারের অবিশ্বাসের দৃষ্টি আর গুলিবিদ্ধ হয়ে বেদীর ওপরে আর্তনাদ করতে থাকা জয়ার দিকে তাকিয়ে সে বিড়-বিড় করে বলে উঠলো, “রূপান্তর বিজয়, আমিও রূপান্তরিত হয়েছি। তুমি আর ডেভিড আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছিলে। সেই থেকে আমিও রূপান্তরিত হয়েছি।”

ওদের চোখের সামনেই জয়ার দেহটা বেদী থেকে গড়িয়ে জোড়া দেবীর পায়ের কাছে পড়ে গেল।

শেষকথা:

জোহরার বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিতে গিয়ে ম্যাকফির বুকের ভেতরটা বার বার মোচড় দিয়ে উঠছিল। কিন্তু এই বয়সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতার সাথে লড়াই করতে গিয়ে একটা ব্যাপার ও শিখতে পেরেছে।

জীবনে কখনো-কখনো বিদায় নেয়াটা কষ্টের হলেও সেটাই সবদিক থেকে উত্তম। পাতালের নদী থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে আজ সাত দিন। এই সাতদিনে অনেককিছু ঘটে গেছে। পাতাল থেকে উঠে এসে ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রথমেই গেছে সেই ক্যাম্পে, যেখান থেকে ইংরেজ অফিসারেরা গায়েব হয়েছিল। ক্যাম্পের পাশেই প্রায় শুকনো নালার দশ হাত মাটির নিচে তালুকদার-নায়েব সহ সব সব কয়টা ইংরেজ অফিসারের লাশ পাওয়া গেছে।

তালুকদারদের লাশ ওদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে ইংরেজ অফিসারদের লাশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মাদ্রাজে। লাশ পাঠানোর পরের দিনই হেনরি স্লীম্যানকে ডেকে পাঠানো হয়। তার সাথেই বিদায় নেয়ার কথা ছিল ম্যাকফি আর তার দলের। কারণ ওরাও মিশন শেষ করেছে। কিন্তু ম্যাকফি যেতে পারেনি মহাবীর সিংয়ের কারণে।

ঠগীদের সাথে যুদ্ধের সময়ে প্রচন্ড আহত হয় সে। ঠিক হতে কয়েকদিন লেগে যায়। প্রথমে মনে হয়েছিল তাকে বাঁচানোই মুশকিল হবে। স্থানীয় কবিরাজের সহায়তায় আর নিজের বিপুল শক্তির বলে একটা সময় পরে ঠিক হতে শুরু করে সে। অন্যদিকে প্রাণে বেঁচে গেলেও এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি শঙ্কর। প্রচন্ড প্রহারের ধাক্কায় এখনো অসুস্থ সে। তবে কবিরাজ জানিয়েছে সময় লাগলেও সুস্থ হয়ে যাবে সে। এর পাশাপাশি ম্যাকফির দলে যোগ হয়ছে নতুন একজন সদস্য; ডুম্বুর। ম্যাকফি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডুম্বুর রাজি থাকলে তাকে নিজের দলে নিয়ে নিবে ও। কারণ এরকম দক্ষ ট্র্যাকার পুরো ভারতবর্ষ খুঁজেও পাবে কিনা সন্দেহ আছে।

মাঝের এই সময়টা তালুকদার আর আচার্যদের সাথেই ছিল ম্যাকফি আর ওর দল। দুই পরিবার তাদের শত্রুতা ভুলে এখন এক হয়েছে। তারা সিদ্ধান্তে এসেছে এখন থেকে এলাকা আর ব্যবসা দুটোই ভাগ করে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করবে তারা। প্রথমদিন দেখা সূর্যকান্ত আর বর্তমান সূর্যকান্তের ভেতরে অনেক ফারাক।

দুই পরিবারের তরফ থেকেই অনেক অনেক উপহার দেয়া হয়েছে ওদেরকে। অনেক অলংকার, প্রাচীন মুর্তি, সোনার গহনা, রতœ ইত্যাদি-ইত্যাদি। এতো উপহার নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তাই ওরা একটা বড় সিন্দুকে ভরে জমিদারদের কাচারি বাড়ির মাটির নিচের ঘরে রেখে দিয়েছে। সূর্যকান্ত কথা দিয়েছে ওরা আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত ওটাতে কেউ হাত দিবে না।

এই সময়ের ভেতরে অবশ্য ম্যাকফি আরেকটা কাজ করেছে। এখানে যা-যা ঘটেছে তার একটা অংশ সে ডায়েরিতে লিখে জমিদারদের কাচারি বাড়ির নিচের ওই সিন্দুকে রেখে দিয়েছে। তবে ওটাতে পাতাল মন্দিরের বিষয়টা লেখেনি। কারণ সূর্যকান্ত থেকে শুরু করে সবাই মিলে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওটা শুধুই অমঙ্গল বয়ে আনবে কাজেই ওটার বিষয়ে কোন রেকর্ড না থাকাই ভালো। তবুও ভবিষ্যতে যদি কখনো প্রয়োজন হয় সে-কথা ভেবে ও আর হেনরি মিলে একটা ছোট্ ম্যাপ বানিয়ে সেটা রেখে দিয়েছে পাতাল থেকে নিয়ে আসা কালী মুর্তিটার সাথে জুড়ে দেয়া অতিরিক্ত একটা অংশে। এই মুর্তিটাকেও ভারতে না রেখে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাতালের কথা লেখা না থাকলেও এ'সবই লেখা আছে ম্যাকফির দিনলিপিতে।

ওদের আরো কয়েকদিন থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মাদ্রাজ থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওদের, কারণ হেনরির সমস্ত প্রমাণ দেখার পর অথরিটি তার কথা বিশ্বাস করেছে। তারা হেনরিকে নির্দেশ দিয়েছে একটা বিশেষ দল গঠন করে সমস্ত ঠগীদের নির্মূল করতে হবে। ম্যাকফি এখনো জানে না মাদ্রাজ গেলেই তাকে সরাসরি ক্যাপ্টেন থেকে পদোন্নতি দিয়ে হেনরি স্লীম্যানের বিশেষ দলে যোগ দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে। মাদ্রাজে হেনরির এই বিশেষ দলের নাম দেয়া হয়েছে হয়েছে 'হিজ ইয়ং অফিসার্স'।

তবে এসবের কিছুই জানে না ম্যাকফি। সে জানে বাঙ্গাল মুল্লুকের মাটিতে তার কাজ শেষ হয়েছে। তাকে এখন বিদায় নিতে হবে। জোহরার বড়-বড় চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না ও।

জোহরাও কিছু বললো না। দুজনার কেউই জানে না আর কোনদিন দেখা হবে কিনা। ম্যাকফি নিজের পকেট থেকে বের করে একটা জিনিস ধরিয়ে দিলো জোহরার হাতে। "ঠগীদের সাথে যুদ্ধের দিন রাতে আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন," বলে ও নিজের কপালের পাশের কাটা দাগটা

দেখিয়ে বললো। এই দাগটা কিভাবে হয়েছিল?" বলে একবার মাথা নাড়লো ও।

"এই কথাটা কেউ জানে না। আমার বাবার নীল চাষের ব্যবসা ছিল। ভীষণ অত্যাচারি মানুষ ছিল সে। নেটিভ তো বটেই আমার মাকেও ধরে মারতো সে নিয়মিত। কোন একদিন মাকে মারার সময় আমার বাবাকে গুলি করি আমি। বাবা আমার গুলিতে মারা যায়, আর এই ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মা..." ম্যাকফির গলা বুজে আসতে লাগলো। "জীবনে প্রথমবার গুলি করার সময়ে বন্দুকের বাটের ধাক্কায় কপাল কেটে গেছিল আমার। সেদিনই বাড়ি থেকে পালাই আমি। ওইদিনের পর থেকে কোনদিনই নিজের স্বজাতির অতিরিক্ত প্রভুত্ব আমি মেনে নিতে পারিনি। একারণেই সাদা চামড়া হবার পরও ছোটবেলা থেকেই আমি চেষ্টা করেছি ভারতীয় হবার। আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন যেন এই চেষ্টা আমি চালিয়ে যেতে পারি। হয়তো কোনদিন আমি পুরোপুরি ভারতীয় হতে পারবো। হয়তো কোনদিন আবার ফিরে আসবো এই এলাকায়।"

একবার জোহরার দিকে তাকিয়ে বাউ করে ঘোড়ায় উঠে পড়লো। এই চোখের মায়ায় জড়িয়ে পড়া চলবে না তার। অনেক কাজ বাকি এখনো, অনেক কর্তব্য বাকি। দলের সবাই প্রস্থান করার। ধীরে-ধীরে নতুন পথ, নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ালো সে।

ম্যাকফির ঘোড়াটা যতোক্ষণ চোখে পড়লো তাকিয়ে রইলো জোহরা। ঘোড়সওয়ারেরা দৃষ্টির আড়াল হতেই মখমল কাপড়ের আবরণ খুলে জিনিসটা বের করলো জোহরা। সেই দূরবীন, যেটা দেখে বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠেছিল সে। ইংরেজ অফিসারের মুখটা মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই দু-ফোঁটা অশ্রæ গড়িয়ে পড়লো দূরবীনের স্বচ্ছ কাঁচের ওপরে।

***

"তুমি কি নিশ্চিত?" বাশার রিফাতের চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। "আমার কি আসলেই এমনটা করা উচিত?"

রিফাত কিছু না বলে নিজের ভালো হাতটা বাশারের স্টিয়ারিঙের ওপরে রাখা হাতের ওপরে রাখলো। “আমি নিশ্চিত, বাশার। দেখো ওরা তোমার নিজের মানুষ। তারা যা করেছে করেছে। তুমি যদি এখন তাদের ওপরে রাগ করে দূরে সরে থাকো তবে এ-ক্ষতি কার বলো। আমি নিশ্চিত তোমার মা বেঁচে থাকলে উনিও এ’কথাই বলতেন তোমাকে।”

বাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। “আমি যখন বিদেশে বসে মা’র মৃত্যুর খবর পেলাম, বিশ্বাস করো আমি ভেবেছিলাম আমি আর কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারবো না। পাগলের মতো ফিরে এসেছিলাম দেশে। তারপর পুলিশে ঢুকলাম। যেদিন রাজু আমার হাতে খুন হয় সেদিনের ঘটনা আমি এখনো কাউকেই ঠিকমতো বলিনি। সেদিন আমার আর রাজুর ডিউটি ছিল না। কিন্তু আমরা খবর পাই স্থানীয় এক চোরাচালানীর বড় একটা ডিল হতে যাচ্ছে। তবে খবরটা নিশ্চিত ছিল না। তাই অফিসকে না জানিয়েই আমরা সেটা তদারকি করতে গিয়ে ওদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি। প্রচন্ড বৃষ্টির ভেতরে গোলাগুলির এক পর্যায়ে রাজু একটা ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে তীব্র বৃষ্টির ভেতরে ওকে শত্রুপক্ষের লোক মনে করে আমি রাজুকে গুলি করে দেই,” বলেই বাশার থেমে গেল। কিছুতেই পুরনো আবেগকে বাঁধ মানাতে পারছে না ও।

“এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে,” রিফাত বাশারের হাতটা চেপে ধরলো।

আসলেই গত কয়েকদিনে অনেক কিছু বদলে গেছে। ওসি মল্লিককে সাসপেন্ড করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইকসাথে বরখাস্ত করা হয়েছে তৌফিককেও। ওসি মল্লিকের পদে ওকেই বসানোর কথা ছিল কিন্তু ও বিনয়ের সাথে সেটা প্রত্যাখান করে রমিজ দারোগার নাম প্রস্তাব করেছে। কারণ লোকটার রিটায়ারমেন্টের আর বেশি বাকি নেই। অন্তত ওসি হয়ে রিটায়ার করুক। আবদুল্লাহ প্রমোশন পেয়ে সিনিয়র কন্সটেবল হয়েছে। সে মেডেলেও পেয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে এই কেসের সব আলগা সূতো জোড়া লাগানো হয়েছে। পাতালের সেই মন্দির এখন প্রতœতত্ব বিভাগের অধীনে। প্রতœতত্ব বিভাগ থেকে একটা বিশেষ দল গঠন করে ওটার পূণরুদ্ধারের কাজ শুরু করা হবে খুব দ্রুতই। পূণরুদ্ধার কার্যক্রমের এই বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রিফাতকে।

তবে জয়া সরকার সেদিন মরেনি। ওইদিন গুলি খাবার পর বাশার ভেবেছিল মারা গেছে জয়া। কিন্তু পরে পুলিশ জায়গামতো পৌছে আবিষ্কার করে ভীষণ আহত হলেও নিঃশ্বাস চলছে তার। কিছুদিন যমে-মানুষে লড়াই

করার পর ডাক্তার নিরাপদ ঘোষণা করেছে তাকে। তবে অবস্থা এখনো খুব খারাপ। হাসপাতালেই আছে। সুস্থ হবার পর বিশেষ সেল গঠন করে বিচার করা হবে তার। এসবই বেশ কয়েকদিন আগের ঘটনা।

তবে এই মুহূর্তে বাশারকে যা করতে বলছে রিফাত সেটা ওর জন্যে অনেক কঠিন। ওরা বসে আছে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা রোডের একটা বিশেষ জায়গায়। এখানেই ওর নানার বাড়ি, ওর বাবা মারা যাবার পরে যেখানে ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছে ও। মায়ের মৃত্যুর পরে আর কখনো ফিরে আসেনি। রিফাতের অনুরোধেই ও এসেছে এখানে। যাতে পুরনো আত্মীয়দের সাথে বিবাদ মিটিয়ে আবারো মিলেমিশে থাকতে পারে।

বাশার কিছু না বলে ড্যাশবোর্ড থেকে একটা খাম বের করে আনলো। গতকালই চিঠিটা ওর নামে ডাকে এসেছে। চিঠির ভেতরে একটা বিশেষ নিয়োগের ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছে তাকে। কিছুদিন আগে দেশজুড়ে আলোচিত অপারেশন বøাকবুদ্ধার কমান্ডার সৎ, সাহসি, আর দক্ষ অফিসারদের নিয়ে একটা বিশেষ দল গঠন করার পরিকল্পনা করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাশারের এই কেসে সাফল্য দেখে তাকে ওই দলে নিতে আগ্রহী হয়েছে কমান্ডার। ওকে প্রমোশন তো দেয়া হবেই সেইসাথে বিশেষ দলে ওকে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গাও দেয়া হবে। বাশার মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে যোগ দিবে ওই বিশেষ দলে।

“ঠিক আছে তোমার কথাই সই। চলো,” বলে ও জিপটাকে মূল রাস্তা থেকে বামে নামিয়ে দিলো। আগে এই রাস্তা কাঁচা ছিল এখন পাকা হয়েছে। জিপ নিয়ে সোজা একটা বাড়ির সামনে চলে এল ও। বাড়ির বাইরেই বুড়ো এক লোক মোড়ায় বসে আছে। একটু নজর বুলিয়েই লোকটাকে চিনতে পারলো ও। মানুষটা সম্পর্কে ওর নানা হয়, আজহার নাম। ওরা ‘আজু নানা’ ডাকতো।

বাশারও তাকিয়ে আছে, লোকটাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হঠাৎ লোকটা বলে উঠলো। “এই, এইদিকে আইয়ো। তুমি রাহেলার পোলা না?”

বাশার মাথা নাড়লো, “হ, নানা।”

“এই হুনো হুনো,” বুড়ো মানুষটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো। “রাহেলার পোলা আইছে। ওমা, লগে দেহি বউও লাইয়া আইছে।”

শেষ কথাটা শুনে রিফাতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠলো বাশার। শেষ বিকেলের আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে রিফাতের গাল। ওকে পাশে নিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে পা বাড়ালো বাশার।

----- সমাপ্ত -----

লেখক পরিচিতি

রবিন জামান খানের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে, পৈত্রিক নিবাস নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানায়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়ালেখা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষাতত্ত্বে দ্বিতীয় মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। পড়া-পড়ানো, শেখা-শেখানোর চর্চা থেকেই শিক্ষকতাকে পেশা ও লেখালেখিকে নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংকলনে বেশকিছু মৌলিক ও অনুবাদ গল্প লেখার পাশাপাশি লিখেছেন একাধিক টিভি নাটক। তার মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস ২৫শে মার্চ, সপ্তরিপু, ব্ল্যাক বুদ্ধা, ফোরটি এইট আওয়ার্স, দিন শেষে, আরোহী ও অন্ধ প্রহর ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে বিপুল পাঠক প্রিয়তা। বাংলাদেশের পাশাপাশি কলকাতা থেকে প্রকাশিত তার মৌলিক গ্রন্থ ২৫শে মার্চ ও সপ্তরিপু পশ্চিম বঙ্গের পাঠক মহলে ভালোবাসা কুড়িয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের রহস্যময় ঘটনাবলী, সেইসাথে মানব মনের জটিল মনস্তত্ত নিয়ে আগ্রহ থেকে উনি বর্তমানে কাজ করে চলেছেন একাধিক ইতিহাস নির্ভর ও সাইকোলজিক্যাল থ্রীলার উপন্যাস নিয়ে। এরই প্রেক্ষিতে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার মৌলিক থ্রীলার উপন্যাস শব্দজাল, মগরাজ, বিখন্ডিত, রাজদ্রোহী, একটি গল্প বলতে চাই। বর্তমানে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি।